এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

শয়তানের বেহেশ্‌ত
১

মূল
আলতামাস

রূপান্তর
মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

 বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ২০০৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ❑ এপ্রিল ২০০৮

শয়তানের বেহেশ্‌ত (১ম খণ্ড) ❑ এনায়েতুল্লাহ আলতামাস
প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩, কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট ৫০ বাংলাবাজার, মুদ্রণে ❑ রাজধানী প্রিন্টিং প্রেস ২৮/এ প্যারীদাস রোড বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রচ্ছদ ❑ আমিনুল ইসলাম আমিন, গ্রন্থস্বত্ব ❑ প্রকাশক

মূল্য ❑ ১৮০.০০ টাকা

ISBN-984-839-055-03

'ফেরদাউসে ইবলীস' বইটিরই বাংলা রূপান্তর 'শয়তানের বেহেশত'। এনায়েতুল্লাহ আলতামাস এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি প্রথমে লিখেন পাকিস্তানের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে। এটি লেখার সময় প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন মহল থেকে তাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়া হয়। দুই খণ্ডে পূর্ণাঙ্গরূপে তার এই বই বের হলে ইসলাম বিধ্বংসী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ফেরকাবাজরা তার এই বই ভারত ও পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করার আবেদন জানায়। কিন্তু সত্য সুন্দরের জয় অনিবার্য। এই প্রতিবাদের কারণে পাঠক মহলে এই 'ফেরদাউসে ইবলীস' শুধু সাড়াই ফেলেনি বিক্রিও হয় প্রচুর। আর কুসংস্কার ও অসত্যের অন্ধ পূজারী ফেরকাবাজদের বিরুদ্ধে জনমনে সঞ্চার হয় গণক্ষোভ আর তীব্র ঘৃণা। উপন্যাসটি লেখার সময় আলতামাস তিনজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকসহ অসংখ্য বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। এতে উপন্যাসটির তথ্যগত ঋদ্ধতা বেড়েছে প্রশ্নাতীত।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সিদ্দীক বাজার, ঢাকা

উপন্যাস মানেই বিনোদন নয়। উপন্যাসের একটি উদ্দেশ্য বিনোদন হতে পারে। উপন্যাসের উপজীব্য কাম না হয়ে সে উপন্যাসও যে জনপ্রিয় হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলতামাসের উপন্যাসগুলো। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ বঙ্কিম চন্দ্র, শরৎ চন্দ্র এবং রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ লেখক-সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার দিকে তাকালে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় সতত-সহস্র। এনায়েতুল্লাহ আলতামাস উপমহাদেশের সার্থক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের একজন। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় রচিত তার উপন্যাসগুলোতে ইসলামের সোনালি যুগের আনুপূর্বিক বর্ণনা এবং মুসলিম সভ্যতার উত্থান থেকে পতন, পতন থেকে অধঃপতনের রেখাচিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। ইতিপূর্বে অনেকেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। এদের মধ্যে কেউ কোন একটি জাতি-গোষ্ঠীর কাছে, কেউবা বিনোদন এবং ভাবোচ্ছাসের কাছে ইতিহাসের সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাসকে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। তিনি ইতিহাসের নির্জলা সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে গতানুগতিক ধারার বিনোদনকে ক্ষুণ্ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আলতামাসের উপন্যাসীয় কলমে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিটোল-নিখুঁত বর্ণনা ইতিহাসের পাঠক-গবেষকদের বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। ইতিহাসের প্রতি এতটা সত্যাশ্রয়ী থাকতে ইতিপূর্বে আর কাউকে দেখা যায়নি।

উপন্যাস পড়তে কার না ভাল লাগে। কারণ উপন্যাস মুহূর্তের মধ্যেই হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে। তাই প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাসের পাঠক সবসময়ই বেশি। সাধারণত বিনোদনই হল উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কিন্তু বিনোদনের নামে কামাচারকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করা কতটা যুক্তিযুক্ত? এসব কামোদ্দীপক গল্প-উপন্যাস পড়ে অবক্ষয় ছাড়া সমাজের আর কিইবা হবে। এনায়েতুল্লাহ আলতামাস ঔপন্যাসিক। এর চেয়ে বড় কথা তিনি একজন দরদী সমাজ সংস্কারক। তাই উপন্যাস তার হাতে সমাজ সংস্কারেরই হাতিয়ার।

সম্প্রতি 'বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স' ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ এ পর্যন্ত প্রকাশিত এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের সব ক'টি উপন্যাসের বাংলা তরজমা পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যেই দুই খণ্ডে প্রকাশিত একটি অনুবাদ আমাদের হাতে এসে পৌঁছে। অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন। ধীমান অনুবাদক, ইসলামী অনুবাদ সাহিত্যে ইতিমধ্যেই যার অবস্থান বেশ মজবুত, টেকসই ও জুৎসই। বাংলা ভাষায় সর্বাধিক বিক্রীত অনূদিত কোরআনের একটি 'বাংলা কোরআন শরীফ' (অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত তাফসির ও টীকা টিপ্পনী), বিশ্বের সর্বাধিক বিশুদ্ধ সংক্ষিপ্ত বোখারী শরীফ 'তাজরীদুল বোখারী'র অনুবাদক (সংক্ষিপ্ত বোখারী শরীফ-আরবী থেকে অনুবাদ) এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বৃহৎ গ্রন্থ সীরাত বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক মুজাহিদের হাত দিয়েই আলতামাসের উপন্যাসগুলো অনুবাদযোগ্য। তাতে সৎপাত্রে (সিদ্ধহস্ত অনুবাদক) কন্যা দান হয়। কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাও (পরদেশী লেখক) উদ্ধার হয়।

–দৈনিক যুগান্তর, ইনকিলাব, ইত্তেফাক ও বাংলাবাজার পত্রিকা

উ ৎ স র্গ

শাকের হোসাইন শিবলি
উচ্ছল প্রাণ এক সাংবাদিক
সত্যের নিশান নিয়ে ছুটে বেড়ায়
সদা দিক-বিদিক॥

১

সেলজুকিদের রাজত্ব ছিলো ইরাক সংলগ্ন ও এর আশপাশের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য জুড়ে। সেলজুকিদের শাসনকালের পুরোটা ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির গৌরবময় অধ্যায় ছিলো না। অমুসলিম যুদ্ধবাজ সেলজুক ইবনে একায়েকের বংশধরদেরকেই সেলজুকি বলা হয়। প্রথম জীবনে সেলজুক ছিলেন তুর্কী রাজদরবারের এক কর্মকর্তা। তার বংশধররা ছিলো স্বভাবজাত যোদ্ধা জাতি।

ইসলাম ও মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সেলজুকিদের অবদান ইতিহাসকে অনবদ্য গতি এনে দেবে–মহান আল্লাহর বিধানলিপিতে বোধ হয় তাই লেখা ছিলো। একদিন কি হলো! সেলজুক ইবনে একায়েক তুর্কী রাজদরবারের কর্মকর্তার পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দিয়ে তার বংশের সবাইকে নিয়ে বুখারায় পাড়ি জমালেন। তার গোত্রের লোকেরা এই সংবাদ পেয়ে আর বিলম্ব করলো না, তারাও বুখারায় গিয়ে নিজেদের ভিটেমাটির অদল-বদল করলো। তার মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যারা তার গোত্রের সবাই তাকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করতো।

নিজের এই অন্তর্নিহিত গুণপনা ও মুগ্ধতার কথা সেলজুক নিজেও অনুভব করতেন। তার ভেতরের বলিষ্ঠ এক প্রতিভাধর সত্তা যে তাকে সবসময় আলোড়িত করে রাখে তা তিনি বেশ উপভোগ করতেন। ভেতরের এই অদৃশ্য শক্তিমত্তাকে তিনি কোন মহান কাজের জন্য ব্যবহার করতে চাইতেন। এজন্য তিনি এমন এক সজীব বিশ্বাসবোধ ও কল্যাণ ধর্মের খোঁজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন অহর্নিশ যার মধ্যে মানবতার হৃদয় সৌরভ করা অনন্ত আহ্বান আছে, যার নিটোল স্পর্শে মানুষের সুপ্ত শুভাশুভবোধ জেগে উঠে।

বুখারায় গিয়ে তিনি যখন ইসলামের সংস্পর্শে এলেন বিনা বাক্যে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। তার স্বগোত্রীয় সবাইকে ইসলামের পরিচয় দিয়ে বললেন সবাই যেন মুসলমান হয়ে যায়। তারা তো নির্দেশেরই অপেক্ষায় ছিলো। সবাই মুসলমান হয়ে গেলো।

তুর্কীস্তানে সেলজুকিদের জংলী, যাযাবর, হিংস্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরের এক জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধি ছিলো। তারা এমন দর্পী যুদ্ধবাজ ছিলো যে, কেউ তাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর দুঃসাহস করতো না। কিন্তু তাদের জীবনভাগ্যের জন্য বিধাতার বিধান ছিলো ভিন্ন। সেলজুকিরা শুধু মুসলমানই হলো না, ইসলামকে তার মহত্তম চূড়ায় বহাল রাখার সুমহান দায়িত্বও কাঁধে নিলো।

ধুলোয় ধূসরিত ইসলামের পড়ন্ত লাগামটি সেলজুকিরা কি করে সুরক্ষা দিয়েছিলো সে এক চমকপ্রদ উপাখ্যান। যাদের জীবন ছিলো বর্বরতা ও যাযাবরের কালিমায় আচ্ছাদিত তারাই হয়ে গেলো সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানবীয় সুবিবেচনাবোধের এক

অভিজাত প্রতিচ্ছবি। শিক্ষা বিবর্জিত সেলজুকিরা তাদের রাজদরবারে দেশের সর্বশ্রদ্ধেয় আলেম, পণ্ডিত ও সুশীল বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিলো। তাদের সেই পূর্বের সমাজ-সভ্যতার আলো বিবর্জিত মানসিকতা ভব্যতা ও স্বজন ভালোবাসার উষ্ণ রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠলো।

এতো সবাই জানে ইসলাম ও একত্ববাদের সুউচ্চ প্রাসাদটির মহারক্ষক ও পরম সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। যিনি আরবের ভুখা-নাঙ্গা মরুচারী এবং পাপ ও মূর্খতার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া বান্দাদের রেসালত ও তার মনোনীত ধর্ম ইসলামের রৌশনীতে উদ্ভাসিত করেছেন। তেমনি পশ্চাদপদ এই তুর্কীদেরও তিনি ধুলোয় থেকে উঠিয়েছেন মর্যাদার কুলোয়। সৈন্য ও সমরশক্তি এবং নেতৃত্ব দানের অপার বিচক্ষণতা ও ধীমান শক্তিমত্তা তিনি তাদের দান করেন। দেখতে দেখতে তারা ইরাক, ইরান, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপে তাদের শাসনরাজ্য প্রতিষ্ঠাসহ এশিয়ার এক অংশকে তাদের করদরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে। তাদের চলার পথে যখনই ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদল বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে তাদেরকে পায়ে পিষে অপ্রতিরোধ্য চলার গতিকে তারা আরো বেগবান করেছে।

খেলাফতে আব্বাসিয়ার প্রশাসনিক দুর্বলতা ও ফাঁকফোকরের কারণে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তার মূলোৎপাটন তারা নিশ্চিত করে। এভাবে তারা আফগানিস্তান থেকে রোম সাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এর পুরোটাই ইসলামী সাম্রাজ্য।

রাজতন্ত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অনুমোদিত নয়। কিন্তু সেলজুকিরা তাদের সালতানাতে ইসলামিয়াকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনার জন্য রাজ-শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। এর ফলে রাজ্যজুড়ে যে বিশৃংখলা ও অনৈক্যের কালো মেঘ পুঞ্জিভূত ছিলো তা ঐক্যের মিষ্টি হাওয়ায় নিমিষেই কেটে যায়।

এরপরই সেলজুকিরা ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের মুহুর্মুহু আক্রমণকে এমন কঠোর হস্তে নস্যাৎ করে দেয় যে, তাদের কোমর অনেকদিনের জন্য বাত-ব্যামোতে আক্রান্ত থাকে।

সেলজুক ইবনে একায়েকের শাসনকাল পৌঁছে তুঘরল বেগ সেলজুকি ও চেগরা বেগ সেলজুকি পর্যন্ত। যে কোন রাজপরিবারে একটা অনিবার্য প্রথা আছে। তা হলো সিংহাসন দখল নিয়ে এক ভাই আরেক ভাইয়ের রক্ত পান করতেও দ্বিধা করে না। আর কোন সহোদর বোন থাকলে মহল ষড়যন্ত্রে সে আলাদা মাত্রা যোগ করে। এমন কোন রাজপরিবার অতিবাহিত হয়নি যেখানে মহল ষড়যন্ত্র ছিলো না। কিন্তু সেলজুক পরিবার পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পোষণকে পাপ মনে করতো। পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতাকে নিজেদের দুর্বলতা মনে করতো তারা।

তুঘরল বেগ ও চেগরা বেগ সহোদর ছিলেন। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিলো দারুণ প্রীতিপূর্ণ। উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনের অগ্রাধিকার বড় ভাই হলেও ছোট ভাইকে বড় ভাই প্রশাসনে সমান অংশীদারে রাখলেন। এজন্য তিনি রাজ্যের রাজধানী বানালেন দুটি। চেগরা বেগের জন্য রাজধানী বানালেন তুর্কীর মারুকে এবং নিজের জন্য

খোরাসানের শহর নিশাপুরকে রাজধানী নির্ধারণ করলেন। এভাবে দু'ভাইয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বহাল,থাকে এবং বিশালায়তনের এই সাম্রাজ্যে দুটি রাজধানী হওয়াতে প্রশাসনিক অবকাঠামোতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

সেলজুকিরা তদানীন্তন খেলাফতে আব্বাসিয়ার খলীফাকে কোন ধরনের উত্যক্ত না করে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এলাকা তাদের খেলাফতের সীমানাভুক্ত রাখে। এতে সেলজুকি ও আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে চমৎকার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ৪৫০ হিজরীর কথা। তখন খলীফা ছিলেন কায়েম বিআমরিল্লাহ। বাসাসীরী নামক এক অমুসলিম শাসক একদিন খলীফাকে দুর্বল ও অসহায় মনে করে বাগদাদে হামলা করে বসলো এবং খলীফাকে কয়েদখানার অন্ধকার কুঠুরীতে নিক্ষেপ করলো।

তুঘরল বেগ এটা জানতে পেরে বাসাসীরীর উপর পাল্টা হামলা চালালেন। বাসাসীরীকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করে তাকে গ্রেফতার করলেন এবং খলীফাকে কারাগার থেকে মুক্ত করলেন। তারপর তুঘরল বেগ বাসাসীরীকে হত্যা করে তার খণ্ডিত মস্তক খলীফার পায়ে এনে নজরানা স্বরূপ পেশ করলেন।

'তুঘরল! তুমি কি চার বছর অপেক্ষা করতে পারবে?' – খলীফা কায়েম বিআমরিল্লাহ তুঘরলের প্রতি মুগ্ধ হয়ে বললেন।

'কিসের অপেক্ষা?'

'তুমি আমার জন্য যা করেছো আমি এর প্রতিদান দিতে চাই।'

'খলীফায়ে মুহতারাম! প্রথম কথা হলো আমি আপনার জন্য অতিরিক্ত কিছুই করিনি। শুধু আমার কর্তব্যটুকু করেছি। দ্বিতীয় কথা হলো চার বছর অপেক্ষার কথাটা বুঝতে পারছি না– তুঘরল অতি বিনয় কণ্ঠে বললেন।'

'আমার একটি মেয়ে আছে। এখনো খুব কাঁচা বয়সের রয়ে গেছে। বার তের বছর হবে হয়তো। চার বছর পর আশা করি সে তোমার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। তখন তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ করবো। এটা এমন এক তোহফা যা আমি অনাব্বাসীয় গোত্রের বাইরে কাউকে দিতে পারি না। আমরা আমাদের মেয়েদের আব্বাসীয় বংশেই সোপর্দ করে থাকি। তুমি সেলজুকি। কিন্তু তুমি আমার প্রতি যে অনির্বচনীয় অনুগ্রহ করেছো এর বিনিময় আমি এর চেয়ে কম দিতে পারবো না। আমি আমার মেয়েকে তোমার আত্মার কাছে সমর্পণ করলাম। চার বছর পর শুভ বিয়ের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি সাব্যস্ত হবে। অনুরোধ আমার তুমি 'না' করো না' – কথাগুলো বলে খলীফা বেশ আরাম বোধ করলেন।

চার বছর পর অনাড়ম্বর এক আয়োজনের মাধ্যমে তুঘরল বেগের সঙ্গে খলীফার কন্যার শুভ বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

রাজা-বাদশারা নিছক প্রথা পালনের জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী এবং কয়েকজন সাধারণ মন্ত্রী তাদের রাজদরবারে রাখতেন। হুকুম তো চলতো স্বয়ং রাজাদেরই। আর মন্ত্রীরা তা সমর্থন করতো বা তোষামোদের ভূমিকা নিয়ে রাজাকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করতো। যারা রাজার পরামর্শ ও উপদেষ্টা পরিষদে থাকতো তারা দু'চার কথা বলে

রাজার চাটুকারিতা করতে পারলেই বর্তে যেতো। রাজা যদি প্রথামতে কোন কাজে বা কোন সংকটে তাদের পরামর্শ তলব করতেন তাহলে তারা রাজার মর্জির খেলাফ কোন পরামর্শ দিতো না। সেলজুকিদের মধ্যে এসব প্রথার কোন অস্তিত্বই ছিলো না।

সেলজুক শাসকদের কাছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যথেষ্ট কদর ছিলো। প্রচলিত রাজকীয় বর্ণাঢ্য সাজে তাদের কোন রাজদরবার ছিলো না। এজন্য তারা চাটুকার দরবারীদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো না। যে কোন বিষয়ের ফয়সালা হতো অনেক বচসার পর। তাদের সফলতার কারণ ছিলো এটাই।

তুঘরল বেগ ও চেগরা বেগ এক দেশেরই দুই রাজধানীর দুই সুলতান ছিলেন। চেগরা বেগ ছিলেন মারুতে। একদিন এক সদ্য যুবক তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলো। তার পোষাক বলে দিচ্ছিলো সে কোন সাধারণ প্রার্থী নয়। তার চোখে মুখে সম্ভ্রান্ত বংশের ঔজ্জ্বল্য ঝিলিক দিচ্ছিলো।

'আপনি কে–একথা জিজ্ঞেস করলে সুলতানকে কি বলবো? আর আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যই বা কি?' – সুলতানের মহলের দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার নাম খাজা হাসান তুসী। নিশাপুর থেকে এসেছি। আমি নিশাপুরের ইমাম মুওয়াফিকের ছাত্র। তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বেরিয়েছি। ফকীহ ও মুহাদ্দিস স্তর পর্যন্ত পড়েছি। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সুলতানকে বলবো' – সাক্ষাৎপ্রার্থী বললো।

দারোয়ানদের নির্দেশ দেয়া ছিলো, দেশের কোন আলেম বা শিক্ষিত নাগরিক সুলতানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলে তাকে যেন সাদরে গ্রহণ করা হয়। দারোয়ান তাই সুলতান চেগরা বেগকে গিয়ে জানালো।

'তাকে কি ফকীহ বা মুহাদ্দিস বলে মনে হয়'? – সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ সুলতানে মুহতারাম! পরিমিতভাষী এবং আলেমদের পোষাকে সজ্জিত। চেহারাও বেশ অভিজাত।

'তাহলে তাকে এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা তো অভদ্রতা! এখনই তাকে পাঠিয়ে দাও।'

কিছুক্ষণ পর সুলতানের সামনে যে লোকটি সালাম দিয়ে দাঁড়ালো তার নাম খাজা হাসান তুসী। সুলতান তাকে সসম্মানে বসালেন।

'হে যুবক! আমি কি করে মেনে নেবো তুমি ইমাম মুওয়াফিকের ছাত্র? আমি জানি ইমাম মুওয়াফিকের ছাত্র হওয়াটা কত বড় সম্মানের' – সুলতান বললেন।

'আমার কাছে তার সনদ আছে' – হাসান তুসী কয়েকটি কাগজ সুলতানের হাতে দিয়ে বললেন – 'আমি ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়েও তার কাছে থেকে গবেষণা করেছি।'

'তাহলে কি তোমার লেখাপড়ার পাঠ শেষ?'

'না সুলতানে আলী মাকাম! আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি থেকে বের হয়েছি, শিক্ষার গণ্ডি থেকে এখনো বের হইনি। জ্ঞানের তুলনা তো সমুদ্রের অগাধ জলরাশির মতো।

মণিমুক্তা তার হাতেই শোভা পায় যে সাগরের তলদেশ থেকে ঝিনুকের খোল উদ্ধারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে।'

সুলতান চেগরাবেগের চোখে প্রশংসার দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো।

'আমার দেখতে ইচ্ছে করছে তোমার বুদ্ধির ধার কতটুকু? কিতাব বা বই বিদ্যা দিতে পারে, বুদ্ধি নয়..... তুমি নিজেকে কতটুকু বুদ্ধিমান মনে করো?' – সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'মহামান্য সুলতান! মানুষ নিজেকে যতটুকু বুদ্ধিমান মনে করে সে ততটুকুই নির্বোধ এবং সে নিজেকে যত বড় মনে করে ততই সে ছোট। কে বুদ্ধিমান আর কে নির্বোধ এই ফয়সালা ক'জনই বা করতে পারে।'

'আচ্ছা তুসী! একটা কথার জবাব দাও। কোন শাসক যদি চায় সে প্রজাদের মধ্যে জনপ্রিয় হবে এবং মৃত্যুর পর প্রজারা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তাহলে তার কি গুণ আর মানসিকতা থাকা উচিত?'– সুলতান আশ্বস্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'সে তার ধর্ম ও দেশের জন্য হবে অগ্নিঝড়। প্রজাসাধারণের জন্য হবে শীতল পানি, হবে উর্বর মাটির মতো স্বচ্ছন্দ, আকাশের বিশালতার মতো উদার, ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী, কাকের মত সদা সতর্ক, কোকিলের মতো মিষ্টভাষী, বাঘের মতো নির্ভীক এবং চাঁদ তারার মতো বিশুদ্ধ পথনির্দেশক। এমন নয় যে, আজ এদিকে কাল ওদিকে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়' – হাসান তুসী বললেন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে।

'এসব কি আমার মধ্যে আছে?' – সুলতান কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি যদি বলি হ্যাঁ তাহলে এটা তোষামোদি হবে' – হাসান তুসী বললেন– 'তোষামোদি আর মুনাফিকী এক জিনিস। আমি মুনাফিক হতে চাই না। আর যদি বলি সুলতানের মধ্যে এসব গুণের কমতি আছে তাহলে অসন্তোষের পাত্র হবো। কারো অসন্তোষের পাত্র হওয়া আমার কাম্য নয়।'

'হে যুবক!' – সুলতান বললেন– 'তোমার স্পষ্টভাষিতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু একটা কথা বলো... যদি এসব গুণের দু'একটি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে?'

'মহামান্য সুলতান! তসবীহতে সাধারণত দানা থাকে একশটি আর গ্রন্থি থাকে একটি। যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থি খুলে যায় তাহলে তসবীহর সবগুলো দানাই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। হতে পারে আপনার সেই গুণটি বা এর স্থলের ত্রুটিটি আপনার গুণ-গাঁথার গ্রন্থির মূল্যমান রাখে। এর কারণে যে কোন সময় আপনার অর্জিত গুণ-গাঁথার দানাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।'

'হাসান তুসী!' – সুলতান চেগরা বেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমাকে আমার বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করলাম। যদি তুমি তোমার সত্যভাষিতা ও সত্যময় নীতির স্বচ্ছতা ধরে রাখতে পারো তাহলে এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী যে, একদিন তুমি এই সালতানাতের ওযীরে আজম–প্রধানমন্ত্রী হবে।'

বিশ বাইশ বছর পর সুলতান চেগরা বেগের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ঘটে। হাসান তুসী ওযীরে আজম পদে সমাসীন হন। তখন সুলতান চেগরাবেগের পৌত্র মালিক শাহ সুলতান ছিলেন। মারু অর্থাৎ দ্বিতীয় রাজধানীতে ছিলেন সুলতান আলিপ আরসালান। সেলজুকি সুলতানরা হাসান তুসীর উপাধি দিয়েছিলেন 'নেযামুল মুলক'–রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচালক। পুরো দেশ তাকে এই নামেই চিনতো। তার হাসান তুসী নামটা একসময় সেলজুকিদের আরোপিত উপাধির আড়ালে চলে যায়।

নেযামুল মুলক বাগদাদে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাদরাসায়ে নেজামিয়া নামক এক ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও বিখ্যাত মনীষী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ এখান থেকেই এক সঙ্গে বৃত্তি নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

২

একদিন নেযামুল মুলক তুসী কোন এক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাকে জানানো হলো, নিশাপুর থেকে উমর খয়াম নামে এক লোক তার সাক্ষাতে এসেছে। নেযামুল মুলক তার স্মৃতির পাতা হাতড়ে বেড়ালেন। এই নাম তার কিছুটা পরিচিত মনে হলো তবে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কিছুটা সংশয় নিয়ে তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

উমর খয়াম ভেতরে এলেন। নেযামুল মুলক তাকে দেখেই উছলে উঠলেন। দু'জনে দু'জনকে কম্পিত হাতে উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন।

তাদের বন্ধুত্ব ছিলো অতি গভীর। তারা তখন ইমাম মুওয়াফিকের কাছে একই ক্লাসে পড়তেন। ইমাম মুওয়াফিক তার অধীনে ছাত্র নিতেন অত্যন্ত কম। তার কাছ থেকে যারা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বেরোতো তারাই দেশের উচ্চপদস্থ পদে নিয়োগ পেতো বা নিজেকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত একজন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারতো। এর উদাহরণ ছিলেন হাসান তুসী।

দ্বিতীয় উদাহরণ ছিলেন উমর খয়াম। যার লিখিত রুবাঈ, শাহনামা পরে তাকে পৃথিবী বিখ্যাত করেছিলো। তার সাহিত্যে শুধু রসবোধই ছিলো না বড় বড় দার্শনিকরা তার কবিতা থেকে দর্শন ও প্রজ্ঞা লাভ করেন। তার রুবাইয়াতে যদিও রমণীয় সৌন্দর্যের অফুরন্ত সৌরভ পাওয়া যায়, কিন্তু জীবনদর্শন এবং মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞানও এতে কম কিছু নয়। বাস্তবের কালিতে অংকিত কল্পনার গভীর পংক্তিমালায় সাজানো তার রুবাইয়াত আজো পাঠকের অন্তরে লাবণ্য ছড়ায়, মানুষের স্বপ্নের অরণ্যে রুবাইয়াত তাই আজো প্রাণবন্ত।

উমর খয়াম শুধু একজন শ্রেষ্ঠ কবিই ছিলেন না, তিনি একজন দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীও ছিলেন। চিকিৎসা নেই এমন অনেক রোগের ঔষধও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। কথিত আছে, সকল রোগের মহৌষধ ও দীর্ঘ আয়ুর নিশ্চয়তা দানকারী 'আবেহায়াত'ও তিনি তৈরী করেছিলেন। তবে ইতিহাসে এর সত্যতার প্রমাণ মিলেনি।

সেই উমর খয়ামই তার বাল্য ও পাঠ্যবন্ধু হাসান তুসী নেযামুল মুলকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উমর খয়ামের বাবা আমীর ঘরনার লোক ছিলেন না। তার বাবার নাম ছিলো উসমান। তাঁবু ও ত্রিপলের ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। তাঁবুর আরবী প্রতিশব্দ হলো খিমা। এজন্য তাকে উসমান খয়াম বলে লোকে ডাকতো। মানে তাঁবুওয়ালা উসমান। উমর যখন সাহিত্য ও কাব্য জগতে নিজের নাম উচ্চকিত হতে দেখলেন তখন তার বাবার পেশাগত পদবী 'খয়াম' তার নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে উমর খয়াম করে নেন। গোটা দুনিয়ার কাছে তিনি তাই উমর খয়াম।

'উমর!' – নেযামুল মুলক আনন্দিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন – 'এতদিন কোথায় ছিলে? আজ তুমি বাল্যস্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছো।'

'খাজা! প্রথম কথা হলো, আমি এখন শুধুই উমর নয় – উমর খয়াম আমি। ওপর ওয়ালার কৃপায় কাব্যজগতে একটি জায়গা হয়ে গেছে আমার। দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভাগ্য পরীক্ষা দিচ্ছি। সাহিত্যও হচ্ছে দর্শন শাস্ত্রও চর্চা হচ্ছে, কিন্তু রুটি রুজির দরজা এখনো খুলেনি। বাবা তাঁবু তৈরী করেন। এই পেশা ধরতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মন থেকে এর কোন সাড়া পাইনি কখনো। আমার অন্তর-সত্তা আমাকে অন্য পথ দেখাচ্ছে। আমার বাবাও আমার প্রতি বিরক্ত – আমি রুটি-রুজিতে তার সঙ্গ দেইনি বলে।'

'কিছু একটা তো তোমার করা দরকার' – নেযামুলমুলক বললেন– 'কাজ ছাড়া জীবন তো কোন জীবন নয়।'

'আমি একটি অঙ্গিকারনামার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি খাজা! অবশ্য মৌখিক অঙ্গিকারনামা। যা আমরা আমাদের ছাত্রজীবনে করেছিলাম।'

'অঙ্গিকারনামা?' – নেযামুল মুলক তার স্মৃতির পাতার উপর থেকে পরগাছা সরাতে শুরু করলেন- 'বাইশ তেইশ বছর হয়ে গেছে উমর!... একটু ইঙ্গিত তো দিবে।'

নেযামুল মুলক ও উমর খয়ামের আরেকজন পাঠ্যসঙ্গী ছিলো। তার নাম ছিলো হাসান ইবনে সবাহ। ক্লাশে যে শুধু এই তিনজনই ছিলো এমন নয়। আরো অনেকেই ছিলো কিন্তু তাদের তিনজনের ঘনিষ্ঠতা এত গভীর ছিলো যে, তিনজন এক কামরায় ঘুমুতো। এক সঙ্গে খাবার দাবার সারতো এবং একজন যেদিকে যেতো অন্য দু'জনও তার পিছু নিতো।

'আমাদের ছাত্রজীবনের এক রাতের কথা স্মরণ করো খাজা!' – উমর খয়াম হাসান তুসীকে তাদের অঙ্গিকারনামার কথা মনে করিয়ে দিলেন– 'আমরা তিন বন্ধু সেদিন যখন ক্লাশের পড়া তৈরী শেষ করলাম, হাসান ইবনে সবাহ কি মনে করে তখন বললো– এই মাদরাসার ব্যাপারে সবাই জানে, এখান থেকে যারা লেখাপড়া শেষ করে বেরোয় এবং ইমাম মুওয়াফিক যাকে মেধাবী ও যোগ্যতাবান বলে স্বীকৃতি দেন কর্মজীবনে সে অনেক উঁচুতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে... তারপর হাসান সবাহ বলেছিলো– আমরা তিনজনই যে বড় কিছু হবো এমন নাও ঘটতে পারে। হতে পারে আমাদের একজন অনেক বড় কিছু হবে আর বাকী দু'জন কষ্টে সৃষ্টে দু'বেলার রুটি জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাবে....

'হাসান ইবনে সবাহ আরো বলেছিলো– তাহলে এসো আমরা পরস্পর এই অঙ্গিকার করি যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ উচ্চ পর্যায়ে পৌছবে সে তার অন্য দুই বন্ধুকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করবে এবং তার স্বাচ্ছন্দ জীবনে তাদেরকেও সে সমান অংশীদার করবে বা তার জীবিকার বন্দোবস্ত করে দেবে। শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে অমানবিক আচরণ করবে না। আমরা তিনজনই সুস্থ ও সত্য মনে বলেছিলাম এবং অঙ্গিকার করেছিলাম হ্যাঁ এমনই হবে।'

'হ্যাঁ উমর!' – নেযামুল মুলক মুচকি হেসে বললেন– 'আমার মনে পড়েছে। আমার যতটুকু মনে পড়ছে আমিই সবচেয়ে জোর গলায় বলেছিলাম, আমাকে মহান আল্লাহ বড় কোন পদে আসীন করলে এবং আমার দুই বন্ধু যদি আমাকে প্রয়োজন মনে করে আমি অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ সবরকম সহযোগিতাই করবো।'

'তাহলে খাজা এখন বলো'... উমর খয়াম বললেন– 'আমি তো তোমাকে বলেছি এ পর্যন্ত জীবিকার উল্লেখযোগ্য কোন মাধ্যম আমি পাইনি।'

'আমি এর একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করবো' – নেযামুল মুলক বললেন– 'তুমি অনেক বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত তো বটেই। তারপর আবার কাব্যসাহিত্য, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে যাচ্ছো। আমি সুলতানকে বলবো, সালতানাতের জন্য তুমি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। সুলতানকে আরো বলবো, তোমাকে উঁচু কোন পদ দিয়ে যেন আমার সহযোগী করে দেন। সুলতান আমাকে ভালো জানেন এবং আমার প্রতি বেশ আস্থাবান।'

'তুমি আমার জন্য যা করতে যাচ্ছ এর জন্য আমি সত্যিই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ' – উমর খয়াম বললেন– 'খাজা! তুমি তো তোমার সঙ্গে আমাকে উচ্চাসনে বসাতে চাচ্ছো, আমি কিন্তু এর উপযুক্ত নই। সারা জীবন আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত থাকবো।'

'না উমর! আমার মনে হয় তুমি যে এতকাল জীবিকার সন্ধান ছাড়া কাটিয়েছো তাই নিজের ওপর তোমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নেই। আমি তোমার আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাই। আমি পুরোপুরি আশাবাদী মহামান্য সুলতান তোমাকে উঁচু কোন পদে গ্রহণ করে নেবেন।'

'না খাজা! কথা এটা না। কোন কাজে আমি ঘাবড়াই না এবং রোজগারবিহীন জীবনও কোন ক্ষতিকর প্রভাব আমার ওপর ফেলেনি। আমার মন যে পথে আমার প্রতিভাকে শানিত করতে চাচ্ছে আমি সে পথের বাতিঘর পর্যন্ত পৌছতে চাই। আমি আমার লেখালেখি, কাব্যচর্চা এবং দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে যে গবেষণা করেছি এর সব পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে আরো অনেক গবেষণা ও উদঘাটনের বিষয় বাকী আছে আমার। পাণ্ডুলিপির বোঝাটি এক নজর দেখে নাও। আমার কাছে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ পয়সা নেই। এ কাজে তাই আমি সামনে অগ্রসর হতে পারছি না। আমি যদি এই চাকরি গ্রহণ করি তাহলে শুধু আমার ও আমার পরিবারের একটি সম্মানের রুটি রুজির সংস্থান নিশ্চিত হবে'...

'কিন্তু খাজা! একটু মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমি শুধু আমার ও আমার পরিবারের লোকদের জীবিকা চাই না, পুরো মানবজাতির জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই। আমি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিছু ঔষধি গাছের শিকড় ও ভেষজ চিকিৎসার অনুপান তালাশ করছি, এর সঙ্গে অতি মূল্যবান কিছু জিনিসপত্রও দরকার আমার। এ ছাড়াও এতটুকু অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আমার প্রয়োজন যার দ্বারা আমার ঘরের লোকেরা দু'বেলা রুটির স্বাদ পায়।'

নেযামুল মুলক উমর খয়ামের স্তুপিকৃত পাণ্ডুলিপির একাংশে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। দেখা শেষ হলে তিনি উপলব্ধি করলেন, তার এই বন্ধুটি দর্শন, সাহিত্য, কলা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তো বটেই অন্যান্য বিষয়েও অসামান্য ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন করেছে। সে যদি সামান্য অর্থ সাহায্যও পায় তাহলে আগত অনাগত সব মানুষের কল্যাণের জন্য তার এই অধ্যাবসায় অনেক বড় অবদান রাখবে। উমর খয়ামকে তিনি তার মেহমানখানায় নিয়ে উঠালেন এবং তার দর্শন ও সাহিত্য চর্চা এবং গবেষণা কর্ম সুলতান আলিপ আরসালানকে দেখালেন। তারপর এর সীমাহীন গুরুত্বের কথাও তুলে ধরলেন।

সেলজুকি সুলতানদের কাছে বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত বিশেষ করে উমর খয়ামের মতো অসামান্য প্রতিভাধারী ও মনীষাদীপ্ত পণ্ডিতদের যথেষ্ট কদর ছিলো। সুলতান উমর খয়ামের জন্য বাৎসরিক বারশ মিছকাল (কয়েক লক্ষ) স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি নির্ধারণ করলেন। উমর খয়াম তার প্রথম বৃত্তির পয়সা নিয়ে নিশাপুর চলে গেলেন।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উমর খয়াম যখন সর্বাত্মক সহযোগিতা পেলেন তিনি তার গবেষণা কর্মে নিবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথম যে বইটি লিখলেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বইটি উৎসর্গ করলেন নেযামুল মুলকের নামে। তারপর তিনি তার অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সমন্বয়ে লিখলেন 'ইলমুলমুসাহাত ওয়াল মাকআবাত'। তার কলম বয়ে চললো তরঙ্গবাহিত অথৈ জলরাশির মতো। উমর খয়াম এভাবে ইরানসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এত জননন্দিত হয়ে উঠলেন যে, ইবনে সীনার সমমানের মনীষী বলে তাকে সবাই স্বীকার করলো।

নিশাপুর ছিলো খুরাসানের রাজধানী। সেখানে ছিলেন সুলতান মালিক শাহ। সুলতান মালিক শাহ জ্ঞানী ও পণ্ডিতজনদের অসামান্য মর্যাদার চোখে দেখতেন। উমর খয়ামের খ্যাতি যখন তার কানে এলো তিনি তাকে নিশাপুর নিয়ে এলেন এবং বর্ষপঞ্জি সংশোধনের দায়িত্ব দিলেন। উমর খয়াম অংক ও জ্যামিতি শাস্ত্রেও অনেক সূত্র আবিষ্কার করেন এবং প্রচলিত সূত্রের অনেক সংশোধনী আনেন।

★★★★

নেযামুল মুলকের সঙ্গে যখন উমর খয়ামের প্রথম সাক্ষাত হয় তখন আলাপ প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে হাসান ইবনে সবাহের কথাও উঠলো।

'জানো উমর সে কোথায় আছে?' – নেযামুল মুলক জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এতটুকুই জানি সে রায় চলে গিয়েছিলো' – উমর খয়াম বললেন– 'সে সেখানকারই লোক। তোমার হয়তো মনে আছে সে যেমন চালাক তেমন সাবধানী লোক ছিলো। তোমার মনে আছে কিনা জানি না। সে একবার এক ছাত্রের কিছু পয়সা চুরি করেছিলো এবং ধরাও পড়েছিলো। আমরা তার পক্ষে ওকালতি করে বলেছিলাম হাসান চোর হতে পারে না। অথচ সে আসলেই চুরি করেছিলো। তারপরও আমরা তাকে বন্ধু বলেই দেখতাম।'

'হ্যাঁ উমর! আমার মনে পড়েছে। তার মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু ছিলো যা আমাদের এত ভালো লাগতো যে, তাকে ছাড়া নিজেদের বৃথা মনে হতো।'

'এটা ছিলো আসলে তার মুখের ভাষার নৈপুণ্য' – উমর খয়াম বললেন– 'আমরাও তো কথা বলতাম। কিন্তু ও যখন বলতো তখন কেমন যেন মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করতো। সে এমনিতেও দারুণ সপ্রতিভ ছিলো। তার চোখেও এমন আকর্ষণের দৃষ্টি ছিলো যে, সে যদি কারো চোখে চোখ রেখে কথা বলতো তাহলে শ্রোতা নিঃসংকোচে তা মেনে নিতো।'

দুই বন্ধু হাসান ইবনে সবাহকে নিয়ে কথা বলতে বলতে অর্ধেক রাত পার করে দেন। তারপর তারা শয়নকক্ষে চলে যান। দু'তিন দিন পর উমর খয়ামও চলে যান।

চার পাঁচ দিন পর নেযামুল মুলককে খবর দেয়া হলো রায় থেকে এক লোক এসেছে। তার নাম বলেছে হাসান ইবনে সবাহ।

'হাসান ইবনে সবাহ!' – নেযামুল মুলকের আওয়াজ আবেগে কেঁপে গেলো। তিনি উঠতে উঠতে চললেন– 'তাকে চটজলদি ভেতরে নিয়ে এসো।'

হাসান ইবনে সবাহ ভেতরে এসে দেখলো নেযামুল মুলক তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। দু'জনে দু'জনকেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখা গেলো।

'যখন শুনলাম আমার দোস্ত ওযিরে আজম বনে গেছে খুশীতে আমি ফেটে পড়লাম' – হাসান ইবনে সবাহ বললো– 'শুনতেই পড়িমরি করে দৌড় লাগিয়েছি- আমার বাল্যকালের জিগরি দোস্তকে মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন দেখবো বলে।'

'তা তো দেখছোই। কিন্তু এই এতগুলো বছর ছিলে কোথায় তাই বলো। আর করছোই বা কি? তোমার জীবিকাই বা কি?'

'জীবিকার পথ আমার মাটি দিয়ে ঢাকা। অনেক ভাগ্য-পরীক্ষা দিয়েছি। মিসর পর্যন্ত গিয়েছি, কিন্তু ভাগ্য কখনো আমার সঙ্গ দেয়নি। কখনো রুজির সন্ধান পেয়েছি তারপর আবার সেই বেরোজগারি। তবে এক জায়গা থেকে আমাকে দারুণ জবাব দিয়েছে। বলেছে, তোমার শিক্ষার দণ্ড এত বেশি যে, ছোট কোন চাকরি তোমার জন্য পোষাবে না। এজন্য তোমার মন ব্যবসা বাণিজ্যও গ্রহণ করছে না।'

'হ্যাঁ হাসান! সে লোক বুদ্ধিমানের কথাই বলেছে। ইমাম মুওয়াফিকের কোন ছাত্র সাধারণ কোন নওকরীতে ঢুকতে পারে না এবং দোকানদারীও তাকে মানায় না। আমাদের বন্ধু উমর এসেছিলো। সে এখন উমর খয়াম। দর্শন, কাব্যসাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে সে এখন দারুণ কীর্তিমান। কিন্তু দু'পয়সা রোজগারের কোন উপায় ছিলো না তার।'

ও হ্যাঁ হ্যাঁ উমর! আমাদের দারুণ বন্ধু ছিলো। তার তো দার্শনিক আর কবি হওয়ারই কথা ছিলো।'

'সে আমাকে আমাদের বাল্যকালের একটি অঙ্গিকারনামার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে। আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমরা তিন বন্ধু মাদরাসার এক রাতে সেই অঙ্গিকারটি করেছিলাম।'

'তারপর তুমি কি ওর জন্যে কিছু করেছো?'

'হ্যাঁ হাসান! তা করেছি বৈকি। ওর জন্য আমি বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

'আমি তোমাকে সেই অঙ্গিকারনামার কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি। কিন্তু আমি কোন ভাতা-বৃত্তি চাই না। আমার শিক্ষা ও বংশগত মর্যাদার ভিত্তিতে কোন চাকরি চাই।'

আমি বন্ধুর প্রাপ্য অবশ্যই পূরণ করবো হাসান! বাল্যকালের সেই অঙ্গিকারনামাও বাস্তবায়ন করবো। তুমি সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরী হয়ে নাও। আগে আমি তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিই।'

আসলে এই ওয়াদা বা অঙ্গিকার তো ছিলো কলকাকলিতে মুখর তিন কিশোরের একটি গম্ভীর মুহূর্তের অনুবাদ। ছেলেবেলার অতি দুরন্তপনা ছাড়া এর আর কিসের গুরুত্বই বা ছিলো। কিন্তু নেযামুল মুলক ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন ও খোদাভীরু লোক। সুলতান চেগরা বেগ তার এই সৌজন্যবোধ দেখেই রাষ্ট্রের এত বড় পদে আসীন করেছিলেন এবং এর জোরেই তিনি সালতানাতের ওযিরে আজম হতে পেরেছিলেন। ছেলেবেলার সেই প্রতিশ্রুতিকে তিনি এতই গুরুত্ব দিলেন যে, হাসান ইবনে সবাহর শিক্ষা, যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার কথা তিনি সুলতানের কাছে এমনভাবে বর্ণনা করলেন যে, সুলতান দারুণ প্রভাবান্বিত হলেন।

নেযামুল মুলক হাসান ইবনে সবাহকে বললেন, তাকে তিনি সুলতানের কাছে নিয়ে যাবেন। সে যেন তার শিক্ষা ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দিয়ে সুলতানকে মুগ্ধ করে দেয়।

হাসান ইবনে সবাহ তো ছিলো কথার উস্তাদ। নেযামুল মুলক তাকে সুলতানের কাছে নিয়ে গেলে মুখের জাদুতে সে সুলতানকে বশ করে ফেললো। আর বাকী পথ তো নেযামুল মুলকই পরিষ্কার করে রেখেছিলেন।

'হাসান ইবনে সবাহকে আমি মহামান্য সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদা প্রদানের চেয়ে আরো নীচু পদের লোক ভাবতে পারছি না' – নেযামুল মুলক বললেন– 'আর মহামান্য সুলতানের বর্তমানে একজন উপদেষ্টারও প্রয়োজন।'

'আপনার আবেদন মঞ্জুর করা হলো' – সুলতান বললেন– 'আপনি তাকে পছন্দ মতো গড়ে নিন এবং সালতানাতের সমস্ত কার্যাদি ভালো করে বুঝিয়ে দিন। আপনার তত্ত্বাবধানে কিছু দিন ওকে আপনি রাখুন।'

হাসান ইবনে সবাহ যে পদ পেলো তা মন্ত্রীর পদমর্যাদার চেয়ে কম নয়। সে সেদিনই মালপত্র ও বৌবাচ্চা আনতে চলে গেলো রায়।

নেযামুল মুলক টের পেলেন না তিনি এক ইবলিসের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দিয়েছেন।

৩

হাসান ইবনে সবা কে ছিলো?

তার বাবার আদি বসতি ছিলো খোরাসানের তুস শহরে। বাবার নাম আলী ইবনে আহমদ। ভ্রান্তদল ইসমাঈলী মাযহাবের অনুসারী ছিলো। হাসানের জন্ম এই তুসেই। পরে তার বাবা রায় শহরে চলে যায়। রায় শহরের হাকিম বা প্রশাসক ছিলেন আবু মুসলিম রাজী। তার বাবা আলী ইবনে আহমদ আবু মুসলিম রাজী পর্যন্ত তার যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তার কাজ ছিলো আবু মুসলিম রাজীর তোষামোদি করা এবং মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো। সে চাইলে সমাজের নির্দোষ-নিরপরাধ ও সজ্জন লোকদের গ্রেফতার করাতে পারতো এবং অপরাধী, চোর-বাটপারদের নির্দোষ সাব্যস্ত করে ছাড়িয়ে নিতে পারতো।

রায় বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো। আলী ইবনে আহমদ প্রায়ই ভিনদেশী কোন ব্যবসায়ীকে ধোঁকা দিয়ে তার পণ্য কেড়ে নিতো বা তার টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিতো। এ কাজ সে এমন দক্ষতা ও প্রভাব খাটিয়ে করতো, আক্রান্ত ব্যক্তি তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস করতো না। লোকদের মধ্যে তার ব্যাপারে সে ছড়িয়ে রেখেছিলো সে হাকিম আবু মুসলিম রাজীর বিশেষ লোক।

আলী ইবনে আহমদের শঠতা ও প্রতারণার খবর লোকেরা কম জানতো না। সে দাস ব্যবসাও করতো। এমন হতো যে, একটি মেয়েকে অপহরণ করে লুকিয়ে টুকিয়ে বেচে ফেলতো। সে কোন সুন্দরী যুবতী মেয়ে বা যৌবনবতী কোন বিধবাকে সম্মানজনক কায়দায় এমন করে ফুসলিয়ে তার ঘরে নিয়ে আসতো যে, সেই মেয়ের ওপর জাদুর প্রভাব কাজ করতো। সদ্য তরুণী বা যুবতী মেয়েরা পরিণামের কথা না ভেবে তার জালে জড়িয়ে পড়তো। আলী ইবনে আহমদ চার পাঁচ দিন মেয়েটিকে ভোগ মজা লুটতো এবং তার খাবারের সঙ্গে এক ধরনের নেশা-জাতীয় জিনিস প্রয়োগ করে করতো। যে কয়দিন সে মেয়েটিকে ভোগ করতো সে কয়দিন ক্রেতা খুঁজতো। তারপর একদিন কোন পয়সাওয়ালা ক্রেতার হাতে তাকে সঁপে দিতো।

কোন বাড়িতে বা বাজারে দোকানদারদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে বা দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে ঝামেলা বাঁধলে সে বিচারক বনে গিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করতো।

লোকেরা জানতো এ লোক ধোঁকাবাজ-প্রতারক। তারপরও সামনে পড়লে তাকে সম্মান করতো, তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতো এবং সাহায্যও কামনা করতো। লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য সে তাদের অনেক সমস্যার সমাধানও করে দিতো। তার মধ্যে এত নির্লজ্জতা ছিলো যে, কোথাও থেকে যদি তাকে তাড়িয়ে দেয়া হতো তাহলে সে সেখান থেকে এক দরজা দিয়ে বের হয়ে আরেক দরজা দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যেতো এবং প্রতারণার অন্য কোন কলাকৌশল খাটিয়ে সে লোককে একহাত দেখে নিতো।

লোকেরা যে জানতো সে আবু মুসলিম রাজীর ঘনিষ্ঠ লোক – এটা ভুল ছিলো না। আবু মুসলিম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও কঠোর প্রকৃতির হাকিম ছিলেন। কিন্তু আলী ইবনে আহমদ তার ধোঁকার কারিশমা খাটিয়ে তার বন্ধুত্ব অর্জন করে নেয়। আবু মুসলিম রাজী ছিলেন সরল বিশ্বাসী আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাআত। আলী আহমদ ছিলো ইসমাঈলী। কিন্তু রাজীকে সে নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছিলো যে, সে আহলে সুন্নত। একবার আবু মুসলিম বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলেন, আলী ইবনে আহমদ সুন্নী নয় ইসমাঈলী। আবু মুসলিম তাকে ডেকে কৈফিয়ত চাইলে সে হাতে পবিত্র কুরআন নিয়ে শপথ করে যে, সে সুন্নী মুসলমান।

তার ছেলে হাসান ইবনে সবা কয়েক বছর ধরে এক ইসমাঈলী পণ্ডিত আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কাছে পড়তে যেতো। আবু মুসলিম একদিন তা জানতে পেরে আলীকে ডেকে পাঠালেন।

'কার ছেলে কোথায় পড়ে এবং কি পড়ে তাতে আমার কিছু যায় আসে না' – আবু মুসলিম বললেন– 'সন্তানদের জন্য পিতা মাতারা কি ফয়সালা করবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু তোমার ছেলের ব্যাপারে এজন্যই বলছি যে, তুমি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, অথচ তোমার ছেলে এক ইসমাঈলী শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করছে...কেন?...এটা কি তোমার ইসমাঈলী হওয়ার প্রমাণ নয়?'

'না হাকিম আবু মুসলিম!'– আলী ইবনে আহমদ বললো– 'এটা আমার অক্ষমতার প্রকাশ। আমি আমার ছেলেকে নিশাপুরের ইমাম মুওয়াফিকের কাছে পাঠাতে চাই; কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ করার মতো পয়সা আমার হাতে নেই।'

'ঠিক আছে, পয়সার ব্যবস্থা আমি করছি। সরকারের তহবিল থেকে পয়সার বন্দোবস্ত করে দেবো।'

আলী ইবনে আহমদ খুশীতে ফেটে পড়ার ভান করলো। যেন তার বিরাট বড় এক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সরকারি তহবিল থেকে সে পয়সা আদায় করে তার ছেলে হাসান ইবনে সবাকে নিশাপুরে ইমাম মুওয়াফিকের কাছে পাঠিয়ে দিলো। ইমাম মুওয়াফিক শক্ত আহলেস সুন্নত ওয়াল জামাআতের লোক ছিলেন এবং বাতিল ও মিথ্যা মতবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন।

হাসান ইবনে সবাহ তার বাবার ধূর্তামি ও প্রতারণা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালো করেই জানতো। বাবার এসব কর্মকাণ্ডে সে মুগ্ধ হয়ে শঠতা, ধূর্তামি ও প্রতারণার পথকেই তার অবলম্বনীয় নীতি বানিয়ে নেয়। সে তার বাপের খাছ কামরায় নজর কাড়া সুন্দরী মেয়েদেরও কম দেখেনি। এটাও সে জানতো যে তার বাবা প্রায়ই এ ধরনের মেয়েদের এনে এক ধরনের নেশা পান করিয়ে বশে নিয়ে এসে তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে। হাসান ইবনে সবা একদিন সেই নেশার বস্তুটি দেখতে পেয়ে সামান্য কিছু শরবতে

মিশিয়ে পান করে। একটু পর সে অনুভব করে দুনিয়ার সব কিছু রঙ্গিন পেজা তুলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। আহ কি সুন্দর-মোলায়েম দৃশ্য। যেন বাড়ির ঝি চাকরানী সবাই অসম্ভব সুন্দরী-রূপসী হয়ে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বাড়ির এক বুড়ি ঝি ছিলো। বুড়িও অপরূপা ষোড়ষী হয়ে তাকে যেন কাছে ডাকছে। অনেকক্ষণ সে এই ঘোরের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকে।

সে তার বাবার তোষামোদি ভাষা শিখে নিয়েছিলো। কৈশোরেই সে ভাষায় মুখের মধু ঢালতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। নিজের পিতাকে তার উপযুক্ত শিক্ষক মনে হতো। তার বাবাও বুঝতে পেরেছিলো তার ছেলের মধ্যে পিতার চিন্তাধারাই শিকড় গেড়ে বসছে। ছেলেকে এজন্য বাধা দিবে তো দূরের কথা সবসময় উৎসাহিত করতো। নিশাপুরে ইমাম মুওয়াফিকের কাছে পাঠানোর সময় ছেলেকে এজন্য কিছু উপদেশও দেয়।

'এটা ভুলে যাসনে বেটা!' – আলী ইবনে আহমদ ফিসফিসিয়ে তার ছেলেকে বলেছিলো– 'আমরা ইসমাঈলী আহলে সুন্নত নয়। ইসলামকে ধ্বংসের জন্যে ইসমাঈলীই যথেষ্ট। তুই আহলে সুন্নতের সবক নিবি কিন্তু থাকবি ইসমাঈলী হয়ে। এই মাদরাসা থেকে যারা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বের হয় তারা দেশ ও সমাজের উঁচু পদে উঠে যায়। এ ধরনের যোগ্য দু'একটি ছেলের সঙ্গে তুই বন্ধু পাতিয়ে নিস। ভবিষ্যতে এটা তোর কাজে আসবে।'

বাপ সম্ভবতঃ আঁচ করতে পারেনি তার ছেলে এই বয়সে তার চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর হয়ে গেছে। তার ছেলে মাদরাসায় গিয়ে খাজা হাসান তুসী ও উমর খয়ামের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেয়। তার দুর্বীন মোড়া চোখ দেখে নিয়েছিলো, পড়ালেখায় এরা যেমন তুখোড় ভবিষ্যতেও নিশ্চিত করে দেশের বড় কোন পদ বাগিয়ে নেবে।

তিন বন্ধু যে এক অঙ্গিকারনামার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলো এটা আসলে হাসান ইবনে সবার ধূর্ত মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো।

যদিও সেই অঙ্গিকারনামা থেকে উমর খয়ামও ফায়দা উঠিয়েছিলো, কিন্তু তা ছিলো এক সরলমনা বন্ধুর নির্দোষ দাবী নিয়ে উপস্থিতি। এটা তার প্রাপ্য অধিকারই ছিলো। উমর খয়ামের উদাহরণ উমর খয়ামই। এর দ্বিতীয় কোন উদাহরণ নেই। পৃথিবীতে আরেকজন উমর খয়াম আর আসেনি। কিন্তু হাসান ইবনে সবা এর থেকে যে ফায়দা উঠালো তা ছিলো এক ইবলিসী কীর্তি। এটা ছিলো তার প্রথম পদক্ষেপ। প্রথম সাক্ষাতে সে যে নিযামুল মুলককে বলেছিলো এতদিন সে রোজগার ছাড়া কাটিয়েছে সেটা ছিলো ডাহা মিথ্যা। সে এতদিন কিছু গোপন কর্মকাণ্ড নিয়ে মেতে ছিলো। ইসলামের নাম ব্যবহার করে সে এক ফেরকা (দল) বানানোর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে।

এজন্য সে মিসর গিয়েছিলো। মিসরে ছিলো উবায়দীদের শাসন। যাদেরকে প্রকাশ্যে ইসমাঈলী বলা হতো, কিন্তু তলে তলে তারা ছিলো বাতিনী। অর্থাৎ ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামেরই নাম ব্যবহার করে দলবাজি করা। হাসান ইবনে সবা মিসর থেকে রায় চলে আসে। কয়েকদিন পর মিসর থেকে উবায়দীদের

এক প্রতিনিধি দল তার কাছে আসে। কাজ শেষ করে প্রতিনিধিদল চলে যায়। তবে আবু মুসলিম রাজী তা জানতে পারেন এবং হাসানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও কিছুটা আঁচ করতে পারেন। আবু মুসলিম হাসানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। হাসান ইবনে সবা টের পেয়ে রায় থেকে পালিয়ে যায়।

নেযামুল মুলকের মানবিকতা, অনুগ্রহ ও চেষ্টা চরিত্রের কারণে সে যখন সুলতান মালিক শাহের উপদেষ্টার পদ পেলো তখন তার কুচক্রী মনোভাব শতগুণ ফুলে ফেঁপে উঠলো। রায়তে তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও স্ত্রী-সন্তানদের নিতে এলে আবু মুসলিম রাজী তার রাষ্ট্রীয় পদপ্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই তিনি তাকে আর না ঘাটানোরই সিদ্ধান্ত নেন।

হাসান ইবনে সবা রায় এসে তার বাবাকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পদপ্রাপ্তির খুশির সংবাদ শোনায়। তার বাবা তখন অন্তিম শয্যায়।

'এখন আমি শান্তিতে মরতে পারবো' – আলী ইবনে আহমদ বললো– 'আমি তোমাকে ঐ আসনেই দেখতে চেয়েছিলাম... এখন তোমার কাজ কি জানো?'

'জানি' – হাসান বললো– 'সর্বপ্রথম নেযামুল মুলককে তার চেয়ার থেকে উঠিয়ে মালে থেকে সরিয়ে দেয়া এবং ওযিরে আজমের পদ দখল করা।'

'সাবাশ বেটা! তুমি দরজায় ঢুকে পড়েছো। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কামরাটি দখল করাই বড় কাজ। ...মনে রেখো বেটা! পাপের শক্তি অনেক বড় শক্তি। এর চেয়েও বেশি শক্তি নারী ও মদের নেশায় রয়েছে। এই দুই জিনিসের বদৌলতে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী সম্রাটকেও তোমার পদতলে বসাতে পারবে।'

কথা বলতে বলতে আলী ইবনে আহমদ হঠাৎ নড়ে উঠলো এবং তার অপবিত্র দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলো। কিন্তু সে তার ইবলিসি ও শয়তানীর অশরীরী আত্মাটি তার ছেলের দেহে স্থানান্তর করে গেলো।

★ ★ ★ ★

হাসান ইবনে সবার আজ প্রায় বিশ একুশ বছর আগের কথা মনে পড়ছে। যখন তার বাবা তাকে ইমাম মুওয়াফিকের কাছে পাঠানোর আগে এক ইসমাঈলী পাণ্ডা আহমদ ইবনে আতাশের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো।

কোন মানুষ প্রথমে আপনা থেকেই পাপের পথে পা বাড়ায় না, অন্যের পাপ স্পর্শেই তাকে পাপাসক্ত করে এবং কোন মানুষ নিজে নিজেই খোদাভীরু ও আত্মিক পরিশুদ্ধি পায় না; পরিবেশ ও কিছু মানুষের সমন্বিত প্রভাবই তাকে পূর্ণ মানবরূপে নির্মাণ করে বা বিপথগামী করে ছাড়ে।

হাসান ইবনে সবার জীবনের ভিত্তি সেদিন থেকেই এক বিশেষ সাচে নির্মাণ শুরু হয় যেদিন তার বাবা তাকে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো।

আবদুল মালিক তার বাবাকে ভালো করেই চিনতো। যেমন এক দেহের দুই হাত একে অপরকে চেনে। আলী ইবনে আহমদের ধূর্ত স্বভাবের কথাও আবদুল মালিক জানতো। জ্যোতিষবিদ্যা ও জাদু বিদ্যায় আবদুল মালিক খুবই পারঙ্গম ছিলো।

'ইবনে আতাশ বুঝে নিও' – আলী ইবনে আহমদ আবদুল মালিকের সামনে বসতে বসতে বলেছিলো– 'আমার একটিই মাত্র ছেলে। আমি চাই না আমার মৃত্যুর পর কোন আঁধারে সে হারিয়ে যাক। আমি যতটুকু পরিচিত হয়েছি সে যেন এর চেয়েও অনেক বেশি পরিচিত হয়।'

'জীবনের এই একটা দিক তোমার সামনে থেকে দেখতে চেষ্টা করো আলী!' – ইবনে আঁতাশ বললো– 'তুমি তো এতটুকুই পরিচিত হয়েছো যে, এক হাকিমের সঙ্গে তোমার উঠাবসা আছে। কিন্তু এটা তৃপ্ত হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়।'

'ইবনে আতাশ! এটাও এক ধরনের পরিচিতি। আমি বলছি সে অনেক নাম করবে...ভালো অথবা মন্দ।'

'ঠিক আছে, ছেলেকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

আলী ইবনে আহমদ ছেলে হাসানকে ভেতরে নিয়ে গেলো এবং আবদুল মালিক ইবনে আতাশের সামনে বসিয়ে দিলো। হাসানের মাথায় ছোট একটি পাগড়ি বাধা ছিলো। আবদুল মালিক পাগড়িটি সরিয়ে তার মাথায় এমনভাবে হাত রাখলো যে, তার আঙ্গুলগুলো হাসানের কপাল জুড়ে ছড়ানো ছিলো। আস্তে আস্তে আঙ্গুলগুলো তার কপালে ফেরাতে লাগলো। তারপর হাসানের মুখটি তার দু'হাতের মাঝখানে রেখে ওপর করে ধরলো এবং হাসানের চোখে চোখ রেখে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এরপর হাসানের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলো। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই আবদুল মালিক তার মাথা এক ঝটকায় এমনভাবে পেছনে সরিয়ে নিলো যেন এই ছেলের হাত থেকে আচমকা সাপ বেরিয়ে এসেছে।

আবদুল মালিক এরপর একটি কাগজ কলম নিয়ে কয়েকটি বৃত্ত আঁকলো এবং প্রত্যেকটা বৃত্তে কিছু একটা লিখলো। আর থেমে থেমে হাসানের মুখের ওপর চোখ বুলালো এবং বিড়বিড় করে কি যেন বললো।

'যা বেটা তুই বাইরে গিয়ে বোস' – ইবনে আতাশ হাসানকে ছেড়ে দিয়ে বললো।

'যা বলার বলে ফেলো ইবনে আতাশ!' – আলী বললো– 'আমি জানি তুমি যা বলবে তা তোমার জ্ঞান আর গণনার নক্ষত্রই বলেছে।'

'তোমার স্ত্রীর পেট থেকে এক নবী জন্মেছে'।

'নবী?' – আলী হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'নবুওয়তের পথ তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'নবুওয়তের পথ বন্ধ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে' – ইবনে আতাশ বললো– 'আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে এই পথ বন্ধ হয়নি, কখনো বন্ধ হবেও না। এ পর্যন্ত তো কত লোকই মিথ্যা নবীর দাবী করেছে। তুমি সাফ ইবনে সয়াদের নবী হওয়ার কথা শোননি? সে ছিলো ইহুদী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

জীবদ্দশাতেই সে নবী দাবী করেছিলো এবং রাসূল (স) এর সঙ্গে তার সাক্ষাতও হয়েছিলো। রাসূল (স) একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার ওপর কি ওহী নাযিল হয়? সাফ ইবনে সয়াদ জবাব দেয়– আমার কাছে একজন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আসে।'

'সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর অর্থ কি?' – আলী জিজ্ঞেস করলো।

'অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এর অর্থ হলো আমার কাছে একজন ফেরেশতা এবং এক শয়তান আসে।

সে যা বলতে চাইতো তা হলো, ফেরেশতাও এবং শয়তানও ইংগিতে নিজেদের অদৃশ্য বার্তা তাকে জানিয়ে যেতো। আসলে ইবনে সায়াদ জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। এই বিদ্যার ভেদ আমার কাছেও আছে। আমিও জাদুকর। কিন্তু এই বিদ্যায় ইহুদীরা এতই পারদর্শী যে, তারা একে অনেক শক্তিশালী ভেদে রূপান্তরিত করেছে এবং এর মধ্যে শয়তানী মন্ত্র ভরে দিয়েছে। ওদের জাদু সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। ইবনে সয়াদও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো। সে বলতো তার কাছে এক ফেরেশতা আসে; যে তাকে খোদার পয়গাম দেয় এবং এক ইবলিস আসে, যে তাকে ভবিষ্যতের খবর দেয়।'

'তুমি আমার ছেলে সম্পর্কে বলছিলে' – হাসানের বাবা বললো– 'সে কোন ধরনের নবী হবে?'

'অন্যরা যেভাবে নবী বনেছে' – ইবনে আতাশ বললো– 'তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী মানো আর না মানো আমি কিন্তু এই হাদীস অস্বীকার করতে পারবো না যে– মুহাম্মদ (স) বলেছেন– 'মিথ্যা নবীর দাবীদাররা ক্রমাগত আসতেই থাকবে। তারা তোমাদের সামনে এমন এমন কথা বলবে যা তোমরা তো দূরের কথা তোমাদের বাপ দাদারাও শোনেনি। তাদের কাছ থেকে সতর্ক থেকো। আর তোমাদের ঈমান তাদের কাছ থেকে হেফাজতে রেখো। এরা তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও ফেতনা ফাসাদে জড়াবে'...। তুলাইহা আসাদী নবুওয়তের দাবী করেছিলো। মুসায়লামা কাযযাবের নাম তো তুমি শুনেছো। এরপর এক মহিলা– সাজ্জা বিনতে হারিসও নবুওয়তের দাবী করেছিলো...তারপর কি হলো? শোনা যায় সাফ ইবনে সয়াদ ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলো। তুলায়হা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। নবী দাবী করে সে যত কুখ্যাতি পেয়েছিলো এর চেয়ে অনেক বেশি প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির মালা পেয়েছিলো মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে।'

'তুমি যদি ভবিষ্যতের পর্দা উঠাতে পারো' – আলী ইবনে আহমদ চঞ্চল হয়ে বললো– 'তাহলে বলো আমার ছেলের ভবিষ্যত কি হবে? তার পরিণতি কোথায় তাকে নিয়ে যাবে?'

'মানুষকে যে কোন পরিণতিতে পৌছায় তার স্বভাব'। পরিণাম ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে। এটা নির্ভর করে তার কর্মের ওপর। আমি তোমার ছেলের চোখে প্রতিফলিত ছবি যদি ভুল না দেখে থাকি তাহলে সে এত শক্তির অধিকারী হবে যে, যার চোখে চোখ রেখে সে তাকাবে সে তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে এবং যে

মেয়ের দিকে সে গভীর চোখে তাকাবে সে মেয়ে নিজেকে বিনা শর্তে তার হাতে তুলে দিবে। কিন্তু এটা তার নববী শক্তি হবে না– হবে অকাট্য শয়তানী শক্তি।'

'এই শক্তি কি আমার ছেলের জন্য ভালো হবে?'

'তোমার স্বভাব কি তোমার জন্য ভালো নয়? ক্ষমতাধর এক হাকিম পর্যন্ত তোমার যোগাযোগ আছে। তোমার জানামতে এমন কে আছে যে তোমাকে মন থেকে ঘৃণা ছাড়া পছন্দ করে? কিন্তু এমন কে আছে যে তোমাকে দেখে সম্মানে ঝুঁকে পড়ে না? সাপকে ভালোবাসে এমন কে আছে? কিন্তু প্রত্যেকেই তো সাপকে ভয় পায়–সমীহ করে।

'তুমি কি ওর রাস্তা বদলে দিতে পারবে?' – আলী ইবনে আহমদ জিজ্ঞেস করলো– 'ওর মনে কি তুমি খোদাভীতি সৃষ্টি করতে পারবে?'

'দেখো, দুনিয়ার বাদশা খোদা। সবাই মানে এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন খোদা এবং একদিন তিনিই দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। সেদিন হবে কেয়ামত। কিন্তু খোদার বান্দাদের মনের শাসক হলো শয়তান। একে বলে শয়তানী শক্তি।'

ঠিক আছে, আমি বলতে চাই আমার ছেলে যেন দুনিয়ায় নাম করে।'

'হ্যাঁ, নাম তো করবেই। এমন নাম করা করবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী দুনিয়া তাকে স্মরণ করবে। কিন্তু তার সেই নামে উপাখ্যান লেখা হবে খুনের কালিতে। পাপ-পঙ্কিলতা আর দুনিয়ার সব নোংরামি এবং অশুভতার এক ভয়াল দৃষ্টান্ত হবে সেটা।'

'পুণ্য পবিত্রতায় এমন কী আছে ইবনে আতাশ!' – আলী ইবনে আহমদ সামান্য হেসে বললো, যে হাসিতে আনন্দের পরিবর্তে ছিলো তীব্র জিঘাংসা– 'ছেলেকে আমি তোমার শাগরিদির টেবিলে বসিয়ে গেলাম। ওকে এমন রাস্তা দেখিয়ে দাও যাতে সে তোমার মতো জাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সেরা পণ্ডিত হয়।'

আলী ইবনে আহমদ হাসানকে ইবনে আতাশের কাছে রেখে চলে গেলো।

কয়েকদিন পর আবদুল মালিক আলী ইবনে আহমদের ঘরে গিয়ে হাজির হলো। এদের দু'জনের তো প্রায়ই দেখা সাক্ষাত হতো। কিন্তু সে রাতে ইবনে আতাশ এক বিশেষ কারণে সেখানে গিয়েছিলো।

'ইবনে আহমদ!' – ইবনে আতাশ বললো– 'আমি তোমার ছেলেকে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই ছেলের মেধাগত যোগ্যতা তাকে অন্য পথে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমি এ কথাই বলতে এসেছি যে, তোমার ভ্রান্ত মতবাদের জন্য তোমার ছেলে অনেক বড় কাজে আসতে পারে। তুমি যদি সম্মতি জানাও তবে তাকে এই পথেই অগ্রসর করাবো এবং এ পথের ধ্যান জ্ঞান ও অনেক কারসাজি তাকে দান করবো যেটা তার জন্য অতি জরুরী।'

ছেলেকে নিজের মতোই কুচক্রী করে গড়তে চাইতো হাসানের বাবা। আবদুল মালিক তার মতবাদের শুধু ধর্মীয় গুরুই ছিলো না বরং এই নষ্ট মতবাদের প্রচার ও এই ফেরকাকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য মাটির তলদেশ থেকে জাল গুটিয়ে আনছিলো সে। তার এক ছেলে আহমদও বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হচ্ছিলো। আবদুল মালিকের

ছেলে হিসেবে তার নাম হওয়ার কথা ছিলো আহমদ ইবনে আবদুল মালিক। কিন্তু সে নিজেকে আহমদ ইবনে আতাশ বলতে অধিক পছন্দ করতো। আবদুল মালিক নিজের ফেরকার প্রচার ও অন্যান্য কাজ আগেই লাগিয়ে রেখেছিলো। হাসান ইবনে সবাকে তার ইসলাম বিধ্বংসী মিশনের জন্যই প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলো। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে এই ছেলের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার ঝলক দেখে দারুণ পুলকিত বোধ করে।

আবদুল মালিক হাসানকে জ্যোতির্বিদ্যা ও জাদুবিদ্যা শেখাতে শুরু করে দেয়। সে লক্ষ্য করলো এই ছেলে অতি দ্রুত এবং গভীর মনোনিবেশে সবকিছু শিখে যাচ্ছে। এটা ছিলো তার অতিরিক্ত শিক্ষা। আসলে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা দেয়াই ছিলো তার কাজ। কিন্তু দেখা গেলো ঐচ্ছিকটাই আসল শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ইবনে আতাশের কাছে হাসানের বেশি দিন থাকা হলো না। রায়ের হাকিম আবু মুসলিম যখন জানতে পারলেন আলী ইবনে আহমদের ছেলে পাক্কা ইসমাঈলী, ইবনে আতাশের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে তখন তার খটকা লাগলো। কারণ, আলী তাকে জোর দিয়ে বলেছিলো সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী। তাই একদিন তিনি আলীকে ডাকিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।

আলী ইবনে আহমদ মিথ্যা বললো যে, সে ইমাম মুওয়াফিকের কাছে তার ছেলেকে পাঠাতে চায় কিন্তু যথেষ্ট পয়সা তার কাছে নেই। আবু মুসলিম রাজী দয়াপরবশ হয়ে তার ছেলের জন্য সরকারি উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। আলী ইবনে আহমদ হাসানকে ইমাম মুওয়াফিকের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

হাসান ইবনে সবা ইতিমধ্যে ইমাম মুওয়াফিকের কাছ থেকে উচ্চ শিক্ষার পাঠ শেষ করে প্রায় বিশ একুশ বছর পর তার ছাত্রবেলার বন্ধু খাজা হাসান তুসীর কাছে মারু গিয়ে দেখা করে এবং জানায় এত বছর সে জীবিকার অভাবে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি। খাজা তুসী প্রধানমন্ত্রী হয়েছে শুনে তার অনুগ্রহভাজন হবে এই আশায় মারু এসেছে।

হাসান মিথ্যা বলেছিলো। এই বিশ একুশ বছরে সে অতি ভয়ংকর ও অসামান্য পৈশাচিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলো। শত শত নারীপুরুষকে সে তার এমন আত্মত্যাগী অনুসারী বানিয়েছিলো যারা তার অঙ্গুলি হেলনে নিজেদের প্রাণ লুটিয়ে দিতো তার পদতলে। কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো এসব?

ইমাম মুওয়াফিকের কাছে পাঠ শেষ করে নিশাপুর থেকে রায় পৌঁছেই সে তার প্রথম জীবনের দীক্ষাগুরু আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কাছে গেলো। ইবনে আতাশ তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরলো এবং অনেকক্ষণ বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখলো।

'আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো তুমি এমন সুদর্শন যুবক হয়েই ফিরে আসবে' – ইবনে আতাশ তাকে তার সামনে বসিয়ে বললো এবং তার বাহু হাসানের কাঁধের ওপর রেখে হাত দিয়ে কাধ মর্দন করতে করতে বললো– 'সেই কাঁচা দেহ এখন যৌবনের শক্তিমান রসে ভরপুর' – তারপর তার মাথায় দু'হাত রেখে বলতে লাগলো– 'তোমার মাথায় এখনো কিছু আছে, নাকি শেষ হয়ে গেছে তা আমি কি করে জানবো?'

'মান্যবর গুরু।' – হাসান বললো– 'মাথায় তো অনেক কিছুই ভরে নিয়ে এসেছি"…. এগুলো হলো এলেম বা বিদ্যা... বলতে পারেন মাথাভর্তি কতগুলো শব্দ বিদ্যার নামে ঠেসে ভরেছি। কিন্তু কিসের জানি তীব্র বাসনা ব্যাকুলতা হয়ে মন মস্তিষ্ককে স্থির থাকতে দিচ্ছে না।'

'তাহলে কি আরো জ্ঞান-বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছো?' – ইবনে আতাশ চিন্তামগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'না– সেটা কিছু একটা করার তীব্র বাসনা'–হাসান বললো– 'আমি কিছু একটা করতে চাই... উদরপূর্তির জন্য নয়... আমি যে কি চাই এই প্রশ্নের উত্তর নিজেকে নিজে দিতে পারছি না... আপনার শাগরিদির টেবিলে যখন বসেছি তখন আপনি বলেছেন মাযহাব বা ধর্ম কি আর মানুষের করণীয় কি। তারপর আপনি নক্ষত্রের গতিবিধি ও কক্ষপথ সম্পর্কে আমাকে আলো দান করেছেন এবং জাদুবিদ্যার রহস্যময়তার ভেদও আমার সামনে খুলে দিয়েছেন'–সে বলতে বলতে চুপ হয়ে গেলো এবং চঞ্চল হয়ে এদিক সেদিক উদভ্রান্তের মতো তাকাতে লাগলো যেন নিজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। খানিক পর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো– 'আপনিই বলুন মহামান্য আতালীক (গুরু)! আমি কি চাই...? আমার গন্তব্য কোথায়? কোথায় আমার আখেরি মনযিল?'

'তোমার গন্তব্য তোমার মনে–তোমার মস্তিষ্কে, তোমার মনকে খুঁজে বের করো।'

'এটা আপনাকেই করতে হবে' – হাসান বললো– 'হ্যাঁ... দু'তিনবার একটা কথা মনে উঁকি দিয়ে গেছে যেন আমি ফেরআউন হতে চাই।'

ইবনে আতাশ দারুণ মজা পেলো, হো হো করে হেসে উঠলো। হাসান হয়রান চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তোমার গন্তব্যের সন্ধান তুমি পেয়ে গেছো' – ইবনে আতাশ বললো– 'এখন তোমার অস্থিরতা দূর করা আমার কাজ। কিছু সময় লাগবে হাসান! পরিশ্রম, অনুশীলন, চর্চা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। সেটা আমিই করাবো। এমন এক শক্তির ভিত তোমার মধ্যে আছে যা সাধারণদের মধ্যে নেই। এই শক্তির ছটাই তোমাকে ব্যাকুল আর অস্থির করে রাখে। তুমি এর অনুগত কিন্তু আবার অপরিচিত। একে যদি জাগিয়ে না তোলো তাহলে একদিন তুমি নিজের হাতেই নিজের গলা টিপে ধরবে বা নিজ পিতামাতাকে হত্যা করবে এবং তোমার গর্দান কাটা যাবে জল্লাদের হাতে।

'হ্যাঁ গুরু! আপনার এই পর্দা উন্মুক্ত করার কারণে আমার মনের আঁধার দূর হয়ে সেখানে আলো ফুটেছে। আমি প্রায় এমনই অনুভব করতাম যে, আমি হত্যা করবো বা নিহত হয়ে যাবো।...আপনি কি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন না?'

'শুধু আমিই পারবো। আমাকে ছাড়া এমন কেউ নেই যে তোমাকে পথনির্দেশ করবে... কিন্তু হাসান! তোমার বাবা থেকে তোমার অনুমতি নিতে হবে'।

মহামান্য উস্তাদ! আমার কারোরই অনুমতির প্রয়োজন নেই। আমি এটা জানি আমি সেই উত্তাল তরঙ্গবাহিত নদী, যে আমার সামনে পড়বে সে খড়কুটার মতো ভেসে যাবে... এটাও তো ভেবে দেখুন, আমার বাপ আবার কোন রাজ্যের পূতঃপবিত্র সাধক পুরুষ! প্রতারণা আর শঠতা করেই তো তিনি নাম কামিয়েছেন। আমার স্বভাব তো তার সাচেই ঢেলে সাজানো। সুতরাং আমার যদি কারো ওপর ভরসা থাকে তা কেবল আপনার ওপরেই আছে।'

হাসান ইবনে সবার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মিত হবে এমন কোন আগ্রহ ইবনে আতাশের ছিলো না এবং এজন্য সে তার সব মনোযোগ ও কষ্ট-ক্লেশ হাসানের জন্য কেন্দ্রীভূত করবে এমন কোন পরিকল্পনাও তার ছিলো না। তার একমাত্র আগ্রহ ও মনোযোগ ছিলো তার ফেরকার প্রচার-প্রসারের প্রতি এবং এ জন্যে সবচেয়ে বড় বাধা ইসলাম ও তার কাণ্ডারীদের কলুষিত করার প্রতি।

ইসলাম আসলে তার সূচনা যুগের অনুসারীদের চরিত্রমাধুর্যের উদ্ভাসিত আলোয় বাঁধভাঙ্গা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। কিন্তু সে যুগের প্রভাদীপ্ত স্মৃতির পাপড়ি ক্রমেই শুকিয়ে আসছিলো এবং মিলিয়ে যাচ্ছিলো পঞ্চম শতাব্দীর পবিত্র মুহূর্তগুলো।

ইসলামের ভিত এসময়ই ফেরকাবাজীর অশুভ আঁচড়ে নড়ে উঠে ভীষণভাবে।

ইসলামকে যদি খাবারের বস্তু ধরা হয় তবে এ উপকরণ বিষমিশ্রিত করা হয়ে গিয়েছিলো।

ইসলামকে যদি ধরা হয় একটি আস্ত পোষাক তাহলে এর বুক পাশ, আচলম্বিত প্রান্তগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো। সংরক্ষিত ছিলো শুধু এর হাতাগুলো এবং হাতাগুলোতেও লালিত পালিত হচ্ছিলো বিষধর সাপ।

আবদুল মালিক ইবনে আতাশ ছিলো এসব সাপেরই বংশবদ। আরেকজন ছিলো হাসান ইবনে সবার বাবা আলী ইবনে আহমদ। যার একমাত্র ধর্ম ছিলো শঠতা ও পৈশাচিকতা। তার যদি কোন ধর্ম বিশ্বাস ছিলো সেটা ছিলো প্রতারণা।

হাসান ইবনে সবা ছিলো আলী ইবনে আহমদের ছেলে। এ হিসেবে তার নাম হওয়া উচিত ছিলো হাসান ইবনে আলী। কিন্তু হাসান–'হাসান ইবনে সবা' বলতে বেশি পছন্দ করতো। হাসানের প্রপিতামহের নাম ছিলো সবাহ। তার সম্পর্কে হাসান লোকমুখে যা শুনেছিলো, তা ছিলো প্রতারণা, ধূর্তামি, অশ্লীল মানসিকতার এক নোংরা চরিত্র। সমাজে সবাহ প্রথমে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাতারের লোকই ছিলেন। কিন্তু তিনি তার কুচক্রী ক্ষমতার জোরে তদানীন্তন বাদশাহ ও প্রভাবশালী হাকিমের দুয়ার পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিলেন। লোকেরা তার জঘন্য স্বভাবের কথা জেনেও তার সামনে পড়লে তাকে সম্মান না দেখিয়ে পারতো না। হাসানের কাছে তাই তার প্রপিতামহের স্বভাব ও খ্যাতির ধরন এত ভালো লাগলো যে, তার নাম হাসান ইবনে আলীর পরিবর্তে হাসান ইবনে সবা রাখলো।

যা হোক, আরেকবার সে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। তবে তার এবারের শিষ্যত্ব ছিলো পর্দার অন্তরালে। কারণ ইবনে আতাশ তাকে অত্যন্ত

গোপন মিশনের জন্য তৈরী করছিলো। ইবনে আতাশ তাকে বলতো, তার এবারের কাজ শহর বা গ্রামের বদ্ধ জীবনে সম্ভব হবে না। তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই জঙ্গল, জনহীন প্রান্তর ও বিভিন্ন গুহা-কন্দরে কাটবে।

হাসানের মা-বাবা যদি দেখতো, ইবনে আতাশ তাদের টগবগে যুবক ছেলেটিকে প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে কি করছে তাহলে তাকে এমন শিক্ষকের কাছ থেকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতো। ইবনে আতাশ তাকে একাধারে কয়েক ঘন্টা শুধু এক পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতো। ব্যথায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলেই কয়েক ঘা লাগিয়ে দিতো তাকে। দুই তিন দিন একাধারে অনাহারে রাখতো। তারপর মাত্র কয়েকটি ভুট্টার দানা খাবারের জন্য দিতো।

যে কোন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিজকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাকে এক অভিনব প্রশিক্ষণ দেয়। হাসানকে এজন্য চরম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। ইবনে আতাশ একদিন একটি নির্জন কামরায় অসম্ভব সুন্দরী এক মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তার সামনে হাসানকে বসিয়ে দেয়। হাসানের চোখ বরাবর সোজা এবং মেয়েটির পেছন দিকের দেয়ালে একটি কালো বৃত্ত এঁকে তাকে বলা হয় সে যেন তার দু'চোখের দৃষ্টি ঐ কালো বৃত্তটির ওপর স্থির রাখে এবং মুহূর্তের জন্যও মেয়েটির দিকে না তাকায়।

জাদুবিদ্যার প্রাজ্ঞ পণ্ডিতরা লিখেছেন, প্রশিক্ষণ ও অধ্যবসায়ের এই স্তরে এসে উতরে যাওয়া প্রায় অসম্ভবই। বিশেষ করে যৌবনের এই উষ্ণ বয়সে এই স্তরের সম্মুখীন হওয়াটাই অসম্ভব যন্ত্রণার। হাসান ইবনে সুবার মতো চরিত্রের যুবকের পক্ষে তো এ অবস্থা সহ্য করাও অকল্পনীয় ছিলো। ইবনে আতাশ পরিস্থিতি কঠিন থেকে আরো কঠিনতর করে দিলো এভাবে যে, হাসান দেয়ালের বৃত্তের দিকে যেই চোখ স্থির করতে গেলো মেয়েটি এসে একবার তার হাত ধরে টান দিলো, আরেকবার এসে উলঙ্গ দেহের যৌবনের খাঁজগুলো একে একে হাসানের দেহে ছুঁয়ে দিলো, আরেকবার উদ্ধত স্তনজোড়া হাসানের বুকে লাগিয়ে এক হাত হাসানের মাথায় রেখে দাঁড়ালো। এমন কয়েকবারই হলো। বাইরে থেকে কামরাটি ছিলো বন্ধ। বদ্ধ নির্জন কামরায় তখন যৌবনের আগুন নিয়ে হাসান আর বস্ত্রহীন অপরূপা এক নারীর নিটোল দেহবল্লরী।

আত্মনিয়ন্ত্রণের এই চর্চায় হাসানকে কয়েকবারই উতরাতে হলো। সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে যেমন মিহি সূতা গলে যায় হাসান তেমনি অসাধ্য সাধন করলো। হাসানের জানা ছিলো না সেই কামরার দরজার কড়ার পাশে ছোট একটি ছিদ্র করা হয়েছিলো। যেখান থেকে তার উস্তাদ তাকে পর্যবেক্ষণ করতো।

'সারা দুনিয়া জয়ের ক্ষমতা তোমার মধ্যে রয়েছে' – একদিন ইবনে আতাশ হাসানের প্রশংসা করতে গিয়ে বললো– 'নারীর মধ্যে এমন অমিত শক্তি আছে যে, সে পরাক্রমশালী বাদশার দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত সিংহাসন উল্টিয়ে তার পদতলে রাখতে পারে। জানিনা ইমাম মুওয়াফিক তোমাকে জুলিয়াস সিজারের সেই কাহিনীটি শুনিয়েছে কিনা। জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও যুদ্ধ শক্তিতে এক পরাক্রমশালী সম্রাট। সেকালে রোমই এমন যুদ্ধশক্তির অধিকারী ছিলো যার ভয়ে

সারা দুনিয়া কাঁপতো। জুলিয়াস সিজার মিসরে ফৌজি হামলা চালালেন। তখন মিসরের সম্রাজ্ঞী ছিলো কুলুপতরা। কুলুপতরা জানতে পারলো রোমীয়রা শহরের বাইরে পৌঁছে গেছে। কুলুপতরা জুলিয়াস সিজারের কাছে তার দূত পাঠালো যে, সে তার সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হতে চায়...

'জুলিয়াস সিজার লোকমুখে শুনেছিলো কুলুপতরার হাতে এমন কোন জাদু আছে যা হামলাকারী যে কোন বাদশাকেই গোলামে পরিণত করে। তাকে আরো জানানো হয়েছে, কুলুপতরার হাতে জাদু থাক বা না থাক, সে তার যৌবনে টইটুম্বুর নারী দেহের এমন কমনীয় জাদুর জাল বিস্তার করে যে, শত্রু সম্রাট যত বড় পাষাণ হৃদয়ের হোক না কেন তার সামনে গেলে বিগলিত মোম হয়ে যায়। এসব জনশ্রুতিতে আমল দিতে গিয়ে জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি সংকল্প করলেন, মিসর সম্রাজ্ঞীকে তখনই দেখবেন যখন রোমক ফৌজ শহরে ঢুকে মিসরীয় ফৌজের হাতিয়ার মাটিতে লুটিয়ে দেবে...

'জুলিয়াস সিজার শহর অবরোধের হুকুম দিয়ে দিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন। তার তাঁবু ছিলো বিরাট এক মহলের মতো। অবরোধ পূর্ণ হওয়ার দু'একদিন পর এক মিসরীয় প্রৌঢ় ব্যক্তি কাঁধে একটি গালিচা নিয়ে জুলিয়াস সিজারের তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। গালিচা গোল রুলের মতো পেচানো ছিলো। লোকটি দ্বাররক্ষীদের বললো, সে গালিচা প্রস্তুতকারী। আর এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সুদৃশ্য গালিচা, সম্রাটকে দেখাতে চায়। সম্রাট দেখে হয়তো পছন্দও করতে পারেন এবং কিনেও নিতে পারেন। তাহলে তার মতো এক দরিদ্রের বড় উপকার হয়...

দ্বাররক্ষীরা তাকে ধমকিয়ে ধাক্কিয়ে হঁটিয়ে দিতে চাইল, যাতে সম্রাটের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু লোকটি রেগে গিয়ে উঁচু গলায় বলতে লাগলো, তোমাদের সম্রাটকে এই গালিচা না দিয়ে যাচ্ছিনা এখান থেকে। যেতে দাও। যেতে দাও আমাকে। বাইরের হট্টগোল তাঁবুর ভেতরের জুলিয়াস সিজারের কানে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি সেখান থেকেই হুকুম দিলেন, যেই হোক তাকে ভেতরে আসতে দাও। রক্ষীরা তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো...

তাঁবুতে গিয়ে মিসরী লোকটি জুলিয়াস সিজারকে বললো, তিনি যেন একবার দয়া করে গালিচাটি দেখে নেন। এই গালিচা রোম সম্রাটের উপযোগী করেই বানানো হয়েছে। গালিচাটি প্রস্থে গোল করে পেচানো ছিলো। যখন সেটি খোলা হলো ভেতর থেকে কুলুপতরা বের হলো। অগ্নিশর্মায় জুলিয়াস সিজারের চেহারা লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু কুলুপতরা যখন তার মোহনীয় রূপের জাদু চাললো তখন রোমের পরাশক্তির অধিকারী সম্রাট যেন ভুলেই গেলেন রোম সাগরের উত্তাল তরঙ্গ চিরে কেন তিনি মিসর এসেছিলেন...

'তারপর কি হলো জানো হাসান? যে জুলিয়াস সিজার বীরদর্পে মিসর আক্রমণ করে জয় করতে এসেছিলেন সেই জুলিয়াস সিজার মিসরের রাজকীয় অতিথি হয়ে কুলুপতরার সঙ্গে শহরে প্রবেশ করলেন। অনেক দিন কুলুপতরার উষ্ণ আতিথেয়তা ভোগ করে জুলিয়াস সিজার তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রোমে ফিরে যান। তার সঙ্গের

জেনারেলরা রোমে এসে তাদের সঙ্গী জেনারেলদের মিসরে কি ঘটেছে তা জানায়। একদিন জুলিয়াস সিজার তার শাহী প্রাসাদে বসা ছিলেন। এমন সময় তাকে জরুরী ভাষায় জানানো হলো অমুক জায়গায় তাকে এখুনি এক দরকারে যেতে হবে। তিনি সেদিকে রওয়ানা দিলেন। মহলের কাছেরই একটি অট্টালিকায় তার যাওয়ার কথা ছিলো। অট্টালিকার প্রবেশদ্বারে তিনি পা দিতেই দশ বার জনের সশস্ত্র একটি দল তাকে ঘিরে ধরলো। বড় নির্মমভাবে তাকে সেখানে হত্যা করা হলো।'

'হ্যাঁ মহামান্য গুরু'! – হাসান বললো– 'আপনি যা বলতে চেয়েছেন আমি তা বুঝে গেছি। এই সবক আমি কোন দিন ভুলবো না।'

'কিন্তু হাসান! এর অর্থ এই নয় যে, নারীর সংস্পর্শ থেকে তোমাকে দূরে থাকতে হবে। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী যুবতীরা কমনীয় দেহসৌষ্ঠব নিয়ে তোমার সঙ্গে থাকবে। এরা হবে তোমার মোক্ষম অস্ত্র। তবে এখনই নয়। এখন আরেক কাজে তোমাকে পাঠাবো। যদি তুমি এই স্তর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারো তাহলে তোমার মধ্যে এমন শক্তির উন্মেষ ঘটবে যে, আকাশের দিকে তাকিয়ে যে নক্ষত্রের প্রতি ইশারা করবে সেটা তোমার কোলে এসে পড়বে।'

৪

ইবনে আতাশ এবার তাকে সাধনার সেই স্তরে উঠালো যাতে মৃত মানুষের বিভিন্ন স্থানের হাড় কবর থেকে উঠিয়ে জাদুকর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইবনে আতাশ তাকে একদিন অর্ধ রাতের পর বললো, সে যেন কবরস্থানে গিয়ে এমন কবর খুঁজে নেয় যা অত্যন্ত পুরোনো।

'পুরনো কবরের আলামত কি হবে?' – হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো।

'এমন কবরের দিকে লক্ষ্য রাখবে যেগুলো নিচের দিকে ধসে গেছে। এমন কবরও নজরে পড়বে যেগুলো পুরো নিচের দিকে ধসে গেছে। এগুলোতে মৃতের হাড়গোড় ছড়ানো ছিটানো দেখতে পাবে। এ ধরনের এক কবর থেকে মাথা এবং কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত উভয় বাহুর দুটি হাড়ও নিয়ে আসবে।'

হাসান কবরস্থানে চলে গেলো। রাতের অর্ধ প্রহর অতিক্রান্ত তখন। আকাশে ভরা জ্যোৎস্না। খোলা আকাশের নিচের উঁচু নিচু কবর সারিগুলো দেখাচ্ছিলো কতকগুলো রহস্যময় অবয়বের সমষ্টি। হাসান ধসে যাওয়া কবর খুঁজতে লাগলো। ইবনে আতাশ সঙ্গে করে তলোয়ার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলো তাকে।

কবরকে বলা হয় শহরে খমুশা বা নীরব জনতার আবাসভূমি। কিন্তু সেখানকার অবস্থা এমন ছিলো যে, মূল শহর যেখানে জীবিত মানুষের বসবাস সেখানেও সবসময় নীরব–নির্জন অবস্থা বিরাজ করতো। কিন্তু মৃতদের সেই আবাসভূমিতে মাঝে মধ্যে অচিন জগতের অন্তর কাঁপানো আওয়াজ শোনা যেতো। কবরস্থানের প্রায় সবটা জুড়েই সবুজের শীতল সমারোহ ছিলো। অসংখ্য চারাগাছ সেই সবুজের রং আরো গভীর করে তুলেছিলো। পালা করে কয়েকটি পেঁচা বিকট স্বরে ডেকে উঠছিলো। ঝিঁ ঝিঁ পোকা

আর ব্যাঙের একঘেয়েমি আওয়াজও আসছিলো অনবরত। হঠাৎ তার কানে পলায়নপর পায়ের আওয়াজ এলো। ভয়ে সে এদিক ওদিক তাকালো। একটি বিড়াল তীব্র বেগে দৌড়ে আসছিলো। বিড়ালটিকে ধাওয়া করে আসছিলো দুটি নেকড়ে। নেকড়ে দুটি তার পাশ দিয়ে চলে গেলো এবং সামনে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভয় পেলেও মন শক্ত করে সে তার কাজ চালিয়ে গেলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কবরগুলো দেখতে লাগলো, ধসে যাওয়া কোন কবর তার চোখে পড়ছিলো না। কিছু দূর গিয়ে কবরের মতো লম্বাটে খোলা একটি গর্ত চোখে পড়লো তার। এর চারপাশে নানান সাইজের কবর ছিলো। গর্তের পাশে গিয়ে নিচের দিকে তাকালো সে। তার কানে কুকুরের মতো গরগর আওয়াজ এলো। তারপর এক লাফে কবর থেকে দুটি জন্তু বেরিয়ে এলো। এবার সে চিনলো এ দুটি নেকড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তলোয়ার কোষমুক্ত করে দেহের সব শক্তি দিয়ে ঘুরাতে লাগলো। নেকড়েগুলো দিক বদল করে করে চারদিক থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করছিলো। বিদ্যুৎবেগে ঘূর্ণনরত তলোয়ার নেকড়ে দুটিকে কাছে ঘেষতে দিলো না। তলোয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে একবার সে পিছুতে পিছুতে গর্তের একেবারে কিনারায় গিয়ে পৌঁছলো। পেছনে ফিরে থাকার কারণে সে টের পেলো না। নেকড়ের নাগাল থেকে বাঁচার জন্য পিছাতে পিছাতে সে সোজা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তার এক পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেলো। তার চোখে পড়লো ছিন্নভিন্ন এক বিড়াল দেহ। এবার বুঝতে পারলো এটা সেই বিড়াল যাকে ধাওয়া করে নেকড়েগুলো দৌড়াচ্ছিলো। বিড়ালটি সম্ভবত এই কবরে পড়ে গিয়েছিলো বা লুকানোর জন্য এখানে নেমেছিলো। নেকড়েরা এখানেই তাকে পাকড়াও করে। হাসান যখন সেখানে পৌঁছে নেকড়ে দুটি বিড়াল খাচ্ছিলো।

নেকড়েগুলো ভাবলো এই লোক তাদের শিকার ছিনিয়ে নিতে এসেছে। একজন মানুষের এত বড় দুঃসাহস এ যেন তাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এজন্য কিছুক্ষণ আশ্চর্য চোখে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাসান সঙ্গে সঙ্গেই বিড়ালের পা ধরে বাইরে ছুঁড়ে দিলো। আর এক মুহূর্ত দেরী হলে নেকড়ের হাতে হাসানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। নেকড়েগুলো গরগর করতে করতে শিকার নিয়ে চলে গেলো। কিন্তু ভয়ের নখদন্ত হাসানকে চারদিক থেকে এমনভাবে চেপে ধরলো যে, তার সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগলো থর থর করে। একবার চিন্তা করলো কোনরকম উঠে ঝেড়ে দৌড় দেবে কি-না। কিন্তু তার গুরুর ভয়ে পালানোর ইচ্ছা চেপে রাখলো অতি কষ্টে।

কবর সম্পর্কে সে আগে ভীতিপ্রদ অনেক কাহিনী শুনেছিলো। অনেকে নাকি আল্লাহর এত প্রিয় বান্দা হয় যে, তারা মারা গেলে তাদের কবরকে কেউ অসম্মান করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আযাব নেমে আসে। এটা মনে আসতেই ভয় আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেলো তার। কিন্তু ইবনে আতাশ তাকে বলেছিলো নির্দেশিত হাড় যে কোন মূল্যেই হোক উদ্ধার করে আনতে হবে এবং ভয়কে দমিয়ে রাখতে হবে। হাসান তার পড়ে যাওয়া পাটি টেনে বের করলো। এটা আসলে একটা পুরনো কবর ছিলো।

সে দেখলো কবরের একটি চিহ্ন-পাথর নিচে পড়ে আছে। দু'হাতে মাটি উঠিয়ে বাইরে ফেলে ফেলে পাথরটি আলাদা করে রাখলো। চাঁদের আলোয় মৃতের কঙ্কাল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। হাসান কঙ্কাল থেকে মাথার খুপড়ি ও দু'বাহু থেকে দু'টি হাড় খসিয়ে নিলো। তখনই সব অন্ধকার হয়ে এলো। চাঁদের আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার ওপর থেকে ভেসে গেলো একটি কালো ছায়া। ঘাবড়ে গিয়ে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো কালো মেঘের পাহাড় এগিয়ে আসছে এবং নিকষ আঁধারের গর্ভে রাত হারিয়ে যাচ্ছে। হাসান খুপড়ি ও হাড়গুলো শক্ত করে ধরে তীব্র বেগে কবর থেকে বেরিয়ে এলো। হঠাৎ বিকট আওয়াজে বিদ্যুৎ চমকালো। কয়েক সেকেন্ড পর আবারো এত জোরে বজ্রপাত হলো যে, হাসানের মতো দুঃসাহসী যুবকও অসাড়ের মতো হয়ে গেলো। সবকিছু ছাপিয়ে তার কানে পৌঁছলো তার হৃদকম্পনের ঠক ঠক আওয়াজ।

সে এলাকায় হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আসা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ছিলো না। কিন্তু হাসানের মনের ঘোড়ায় এই ভয় সওয়ার হয়ে গেলো যে, এটা নিশ্চয় কোন বুযুর্গ সাধক পুরুষের কবর। যাকে অসম্মান করায় আকাশ থেকে বজ্রপাত আরম্ভ হয়েছে। তারপর আবার সেই কথা মনে হলো, এই খুপড়ি ও হাড় কবরে নিয়ে রেখে আসি। কিন্তু এবারেও এক ঝটকায় মনে এলো তার গুরুর কথা– যদি ভয় পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসো তাহলে তোমার এই সাধনা শেষ হতে যে কত বছর লাগবে তার কোন হিসাব নেই। বড় কষ্টে সে মনকে বশে আনলো।

আচমকা মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। শিলা পাথরের মতো বৃষ্টির ফোটাগুলো শরীরে বিঁধতে লাগলো। সে দৌড় লাগালো। এক জায়গায় গিয়ে সামনে তাকাতেই দেখলো, তিন চার পা দূরে এক কালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটির অবয়ব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো না। মনে হচ্ছিলো কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বিরাটকায় এক মূর্তি। তার পাগুলো সাধারণ মানুষের পায়ের চেয়ে কয়েকগুণ লম্বা মনে হচ্ছিলো। তার দু' কাঁধ থেকে নেমে যাওয়া হাত দুটি দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছিলো। যেন সামনে গেলেই হাসানকে বাঁধা দেবে। ছায়ামূর্তি মাথাটি গোল নয় অদ্ভুত লম্বাটে ছিলো। নীরব আগ্রাসী পাহাড়ের মতো সে দাঁড়িয়ে ছিলো।

হাসানের পা দুটি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। ভয়ের কাটা তাকে এমন করে খামচে ধরলো যেন একটি রোমশ শক্ত হাত তার বুকের শেষ বিন্দু রক্তও নিংড়ে নিতে আচড় বসাচ্ছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, খুপড়ি ও হাড়গুলো এই অশরীরী দানবের পায়ে রেখে দেবে। বারবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। সমস্ত অশরীরির আর্তনাদ হয়ে মুহুর্মুহু বজ্রপাত চরাচর কাঁপিয়ে তুলছিলো। বিদ্যুৎ চমক হাসানের চোখের দৃষ্টি প্রায় কেড়ে নিচ্ছিলো। বৃষ্টি ক্রমেই বেড়ে চলছিলো। মনে হচ্ছিলো বিশালকায় মূর্তিটি তার ডান ও বাম দিকে ছড়ানো হাতদুটি নড়াচ্ছিলো। আরেকবার মনে হলো অশরীরিটি বুঝি সামনে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ হাসানের পৌরুষ জেগে উঠলো। হয়তো এটা তার মৃত্যু থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা ছিলো। সামনে অগ্রসর হয়ে এক ঝটকায় তলোয়ার বের করে বিদ্যুৎবেগে

মূর্তিটির পেট বরাবর তলোয়ার চালালো। সে নিশ্চিত ছিলো, যে শক্তিতে সে তলোয়ার চালিয়েছে–তা এর পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যাবে। কিন্তু তলোয়ারের ফলাও তার পেটে ঢুকলো না। হাসান বিদ্যুৎবেগে তলোয়ার টেনে নিয়ে আরো দ্বিগুণ বেগে এবার তলোয়ার চালালো। কিন্তু তার হাত যেন শক্ত কিছুর সঙ্গে ঠুকে গেলো এবং তলোয়ার পেছনে ফিরে এলো। ছায়ামূর্তির হাতদুটি তেমনি ছড়িয়ে ছিলো। হাসান মূর্তিটির দু'এক পা মাত্র দূরে ছিলো। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকালো হাসান সামনে গিয়ে মূর্তিটিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলো। তখনই বুঝতে পারলো এটা শুকিয়ে যাওয়া এক মরা বৃক্ষ। আর এর দুটি ভাঙ্গা ডাল দুদিকে ছড়িয়ে আছে।

হাসান মৃতের খুপড়ি ও বাহুর হাড়গুলো আরো শক্ত করে ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো। কবরস্থান থেকে বের হতে হতে কয়েকবার হোঁচট খেলো, আছড়ে পড়লো। পায়ের হাঁটুর কয়েক জায়গা চটে গেলো। তবুও কোথাও থামলো না। কবরস্থান থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখন তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। এবার সে ছোটা বন্ধ করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। আবদুল মালিক ইবনে আতাশ তাকে বলে রেখেছিলো রাত যতই হোক সে তার অপেক্ষায় থাকবে।

হাসান তার ঘরে গিয়ে দেখলো ইবনে আতাশ জেগে বসে আছে। তার কাপড় থেকে পানি ঝরছিলো। পা থেকে কোমর পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি ছিলো। কিছুটা হিম শীতল বৃষ্টির কারণে আর কিছুটা ভয়ে কাঁপছিলো সে। সে অবস্থাতেই হাতের খুপড়ি ও হাড় দুটো ইবনে আতাশের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। ইবনে আতাশ তাকে পিঠ চাপড়ে সাবাশ সাবাশ বলে শুভেচ্ছা জানালো, তার কাপড় পাল্টে দিলো এবং জিজ্ঞেস করলো সে খুব বেশি ভয় পেয়েছে কিনা?

'কি পরিমাণ ভয় যে পেয়েছি তা এখন বলতে পারবো না' – হাসান জবাব দিয়ে একটু ভেবে বললো– গুরু! এটাও কি আমার প্রশিক্ষণের জন্য জরুরী?'

'হ্যাঁ, এতটুকু জরুরী, যতটুকু জরুরী দেহের জন্য পানি ও বাতাস'। এখন বলো কবর থেকে এগুলো কি করে বের করেছো?'

তার ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে হাসান সব বিস্তারিত শোনালো।

গুরু'! – ইবনে সবা বললো– 'আজ রাতে আমি এটা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি যে, আল্লাহর কোন বিশেষ বান্দার কবর ও তার দেহের সঙ্গে যদি কেউ এই ব্যবহার করে যেমন আজ আমি করেছি তাহলে তৎক্ষণাৎ আযাব নাযিল হয়ে যায়'– ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করলো– 'আমার ওপরও কি এমন আযাব গজব নাযিল হবে?'

না। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। একটা অতি গোপন কথা ছিলো – দেমাগে গেঁথে নাও। কবরে যখন তুমি পড়ে গেলে তখন দুটি নেকড়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মৃতের হাড়ে হাত লাগালে বিদ্যুৎ চমকে বজ্রপাত শুরু হলো। এ থেকে কি তুমি বুঝতে পারোনি মৃত মানুষের মধ্যেও অপার্থিব শক্তি আছে। তুমি কি কখনো বদ আত্মার কথা শোননি? যে শাস্ত্র তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি তা তোমার সঙ্গে অনেক রকমের আত্মার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেবে। এটা তোমাকে এ কথাও শিক্ষা দেবে যে, মৃতের

আত্মায় অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি ভর করে আসে। তা তোমার বশীকরণে চলে আসবে। তুমি তোমার কাজে তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এখন নয়। এ ক্ষমতা অর্জনের জন্য তোমাকে অনেক কিছুর সম্মুখীন হতে হবে। নিজের হাড়-গোড় শুকিয়ে যাবে এ পথে। তারপরই তুমি ভাসমান আত্মার শক্তি অর্জন করতে পারবে। জাহান্নামের আগুন অতিক্রম করে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।'

ইবনে আতাশ তাকে সদ্য আনা খুপড়ি ও হাড় সম্পর্কে একটি সবক দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলো।

৫

শহরের কাছ ঘেঁষে একটি স্রোতস্বিনী নদীর ধারা বইছে। পরদিন সকালে হাসান নদীর ধারে বেড়াতে গেলো। তার মাথায় সর্বক্ষণ গুরুর কথাগুলো ঘুরছিলো। গতরাতের ঝর বাদলার কারণে নদীতে বেশ স্রোত ছিলো এবং প্রায় চারদিকই কাদায় থিক থিক করছিলো। শহরের কোলাহল থেকে দূরে কোথাও বসে জাদুর পাঠ আত্মস্থ করার জন্যই এখানে আসা তার। বসার জন্য তাই কোন শুষ্ক জায়গা খুঁজতে থাকে।

সামান্য দূরেই অনায়াসে বসা যায় এমন একটি পাথর নজরে পড়লো। পশ্চিম দিগন্তে উষার জেগে উঠা সূর্যের দিকে মুখ করে বসে গেলো। তারপর চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো।

একটু পর সে ধীরে ধীরে চোখ খুললো। তার সামনে নতুন সূর্যের নরম আলোর আস্তরণ থাকার কথা ছিলো। কিন্তু সূর্যের নরম আলো আর তার দৃষ্টিপথের মাঝখানে ঝুলছিলো একটি রঙিন কাপড়। হাসান নিথর হয়ে গেলো। ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে ওপরের দিকে চোখ উঠালো। চোখে পড়লো রূপ-লাবণ্যের আভাদীপ্ত একটি রমণীয় চেহারা। এ ছিলো এক সদ্য তরুণীর মুখ। তার ঠোঁটে যেন ঝুলছিলো গোলাপের আধ ফোটা কলির স্মিত হাসি। মাত্র এক পা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো এই হুর সদৃশ মেয়েটি।

হাসান তার স্মৃতির দরজায় চাপ দিলো– এই মুখ কোথাও দেখেছে কিনা এর আগে। কোথায় দেখেছে?

তার এও মনে এলো এটা জাদুর তেলেসমাতি হতে পারে।

'চেনার চেষ্টা করছো?' – আওয়াজ নয়–গানের তরঙ্গ যেন।

হাসান মাথা দোলালো। হ্যাঁ সে চেনার চেষ্টা করছে।

'এত সময় তোমার সামনে বিবস্ত্র হয়ে বসে ছিলাম' – মেয়েটি হেসে বললো।

'উহ হু' – হাসানের মনে পড়লো– 'তুমিই... আচ্ছা! সত্যি কথা বলোতো...তুমি কি বাস্তবে আছো না আমার গুরুর তৈরী করা কল্পনা, যাকে বাস্তবের রূপ দিয়ে আমার মস্তিষ্কে তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন?'

'তাহলে ছুঁয়ে দেখো, চিমটি কেটে দেখো' – মেয়েটি তার দু'হাত হাসানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো – 'আমার হাত তোমার হাতে নিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করে দেখো আমি কল্পিত কিছু না জলজ্যান্ত একটি মেয়ে।'

হাসান সাথে করে তার হাতটি নিজের দুই হাতের মুষ্টিতে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো। প্রাণের উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভব করতে চেষ্টা করলো।

'তুমি কে?' – ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলো হাসান – 'তুমি কি? তুমি যদি জলজ্যান্ত একটি মেয়ে হও তাহলে কার মেয়ে তুমি? ...তুমি তো সম্ভ্রম লুটিয়ে দেয়া এক মেয়ে। এক নওজোয়ানের সামনে বদ্ধ কামরায় উলঙ্গ হয়ে বসেছিলে তুমি!'

'আমার আবরু পূতঃপবিত্রই আছে'– মেয়েটি বললো– 'আমি যদি এমনই হতাম যেমন তুমি বলছো তাহলে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের মতো এত বড় দরবেশ আমার প্রতি আস্থা রাখতেন না। আমার দিকে অনেক পুরুষ হাত বাড়িয়েছে। দুই লম্পট জায়গীরদার আমাকে ছিনিয়ে নিতে গলদঘর্ম হয়েছে। কারো হাতই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।'

'তোমার বাবা কে?'

'আমার বাবা মেষ চড়িয়ে খান' – সে একদিকে দেখিয়ে বললো– 'ঐ দেখো আমাদের বকরী।'

হাসান ঘাড় ফিরিয়ে বকরীগুলো দেখলো। কিন্তু তার সব মনোযোগ ছিলো মেয়েটার দিকে।

'আশ্চর্য! তুমি আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে কিভাবে বসে ছিলে?'

'যাকে আমি আমার পীর মুরশিদ মনে করি সেই মহান ব্যক্তি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি তার নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। তিনি বলেছিলেন, ছেলেটি যদি তোর দিকে হাত বাড়ায় আওয়াজ দিস। তিনি এও বলেছিলেন, দরজার কড়ার ফাঁক দিয়ে তিনি ভেতরে চোখ রাখবেন।'

'এখনও কি তুমি তার নির্দেশে আমার পরীক্ষা নিতে এসেছো?'

'না! আমার মনের নির্দেশে এখন এসেছি। তোমার জন্য এসেছি।... আমি তোমাকে এও বলে দিচ্ছি, আমি তোমার সঙ্গে আপাতত কোন দৈহিক লেনদেন করতে আসিনি। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করো তোমার হৃদয়ের ঘরে উঠিয়ে নাও। তারপর সেই ঘরে আমরা জীবনভর তপস্যা করবো... আরে তুমি তো কিছুই বলছোনা। কিছু একটা বলো।'

ভেজা ফুলের মতো এমন স্নিগ্ধ–সুন্দরী এক মেয়েকে হৃদয়ের গভীরে জায়গা দেবে না – হাসানের মতো এমন শক্ত পুরুষও একথা স্পষ্ট বলার সাহস করলো না। কিন্তু তার হৃদয়-মনের নিয়ন্ত্রণ ছিলো তার গুরু ইবনে আতাশের হাতে। সে অনুভব করলো তার মন নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। সে আরো আশংকা করছিলো এটা হয়তো এক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করলো।

সে পাথরের ওপর বসেছিলো। মেয়েটি মাটির ওপর বসে একটি হাত হাসানের এক উরুর ওপর রাখলো। আরেক উরুর উপর রাখলো তার চিবুক। মাথায় ছিলো তার একটি কালো উড়নী। কালো উড়নায় আবৃত তার শুভ্র-লালাভ চেহারা এবং এক গালের উপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়া কয়েকটি চুল মনে হচ্ছিলো রেশমের ওপর সোনার তার দিয়ে ঢেউ খেলানো কারুকাজ। হাসানের মতো এমন সুপুরুষ ইচ্ছে করলে তখনই মেয়েকে তার পদসেবায় নিয়ে নিতে পারতো।

'তোমার নাম তো জানা হলো না' – হাসান বললো।

'ফারাহ! পুরো নাম ফারহাত। ঘরের সবাই ফারহাত বলে। আমার বান্ধবীরা তাকে ফারহী বলে। তুমিও আমাকে ফারহী বলে ডেকো। আমার ভালো লাগবে।'

'আচ্ছা। একটা কথার জবাব দাও। এমন কি আমার মধ্যে দেখলে তুমি যে, বিত্তবান দুই জায়গীরদারকে ঠকিয়ে আমার কাছে এসেছো?'

'এটা আমার মনের ব্যাপার। জায়গীরদাররা আমার বাবাকে অনেক অর্থ সম্পদের লোভ দেখিয়েছিলো। কিন্তু আমার বাবা রাখালী করে বেড়ালেও তিনি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন লোক। এছাড়া আমার বাবা ইমামের সঙ্গে আগে কথা বলেছেন।'

'ইমাম আবার কে?'

যিনি তোমার গুরু তিনিই আমাদের ইমাম-নেতা-আবদুল মালিক ইবনে আতাশ...তিনি বাবাকে বলেছিলেন, এই মেয়েকে নষ্ট করো না। সম্পদের চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বড় কোন আমীরের হাতে একে তুলে দিয়ো না। এই মেয়ের জীবনের পথ অন্য কিছু...আমি প্রায়ই ইমামের ঘরে যাই। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, নিজের সতীত্ব সবসময় নিষ্কলুষ রাখবি। নিজের দেহ দিবি একমাত্র স্বামীকে...তোমাকেই আমি আমার স্বামী বানাতে চাই।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার মধ্যে তুমি এমন কি দেখলে?'

'আমি বলেছিলাম এটা আমার মনের কারবার। তোমার মধ্যে এমন পৌরুষ আছে যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি এত দীর্ঘ সময় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে তোমার সামনে বসে রইলাম এর মধ্যে একবার আমার দিকে তাকালে না পর্যন্ত। উহ ভাবাই যায় না। এর অর্থ হলো তুমি অসামান্য এক পুরুষ, যে হৃদয়ের প্রেম হৃদয় দিয়ে বোঝে।'

এক নিষ্পাপ এবং এক রাখালের মেয়ে ফারহী। সে কোন শিক্ষিত বা দর্শন জানা মেয়ে নয়, যে খুটিয়ে খুটিয়ে যাচাই করে দেখবে হাসানের কাছে কেন সে নিজেকে তুলে দিলো। সে তার ভালোবাসা ও মুগ্ধতা এমন সরল বিশ্বাসে-নির্ভার ভাষায় হাসানের কাছে ব্যক্ত করলো হাসান তার ভালোবাসার উত্তাপে গলে না গিয়ে পারলো না।

'ফারহী!' – হাসান বললো – 'আমার মন তুমি কেড়ে নিয়েছো। কিন্তু আমি আমার গুরুর সম্মতি না নিয়ে তোমায় কোন জবাব দিতে পারবো না।'

'কাল এখানে আসবে?' – ফারহীর চোখে কাকুতি।

'আসা যাবে।'

ফারহী তৃপ্ত মুখে ফিরে গেলো।

রাতের প্রথম প্রহর। হাসান তার উস্তাদ ইবনে আতাশের কাছে বসে ফারহীর সঙ্গে আজ যা ঘটলো তার বিবরণ দিচ্ছিলো। যেন কোন সংবাদ পাঠক সংবাদ দিচ্ছে তার শ্রোতাকে।

'তোমার জীবনে এমন একটি মেয়েরই আসার কথা ছিলো' – ইবনে আতাশ বললো – কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার বিয়ে হবে না। সে তোমাকে চায়, সবসময় চাইবে ভীষণভাবে। তাই উতলা হওয়ার দরকার নেই। ওর সামনে যদি ধন-সম্পদের স্তূপ রাখা হয় সে দু'হাতে তা সরিয়ে দেবে। সারা জীবন তোমারই একার থাকবে সে।'

'কিন্তু কোন শাহী জায়গীরদার যদি তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়!'

'না' – ইবনে আতাশ বললো – 'কেউ তাকে ছুঁতেও পারবে না। আমি তার চারপাশে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। যত প্রভাবশালী আর ক্ষমতাধর হাকীমই আসুক না কেন অসৎ উদ্দেশ্যে ফারহীকে যে ফাসাতে চাইবে সে উপুড়মুখ হয়ে মাটিতে ধসে যাবে।'

'আমি তো মনে করেছিলাম আপনি আমার পরীক্ষা নিতে ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন' – হাসান বললো।

'না – আমার পক্ষ থেকে এটা কোন পরীক্ষা ছিলো না। কিন্তু মাথায় এ কথাটা সবসময় রেখো হাসান! সুন্দরী নারী পুরুষের জন্য সবসময় এক মহাপরীক্ষা। এই সবক তোমাকে দিয়েছি আগে। ফারহীর মতো এমন মন পাগল করা সুন্দরী তোমার ওপর তার মাদকীয় জাল বিস্তার করে তোমার দেহের ছালও তুলে নিতে পারবে। সামনে তোমাকে শিখাবো অন্যকে ফাসানোর জন্য ষড়যন্ত্রের জালে নারীদের দাবার ঘুটির মতো কি করে ব্যবহার করতে হয়।'

'তাহলে কি ফারহীর সঙ্গে আমি এখন মেলামেশা করতে পারবো?'

'হ্যাঁ, তুমি এখন ওর সঙ্গে মিশতে পারবে। প্রেম বলো ভালোবাসা বলো এসবের দ্রবীভূত কথা তোমরা চালিয়ে যেতে পাররে। তোমার পরীক্ষা হয়ে যাবে, পাপ থেকে নিজের কেশাগ্রকেও কি তুমি বাঁচিয়ে রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছো কিনা।'

'আমাকে কি পূতঃপবিত্র পুণ্যবান সাধক বানাতে যাচ্ছেন?'

'না – এখন এ ধরনের প্রশ্ন মুখে এনো না। এখন আমি তোমার ভেতর-বাহির মজবুত পাহাড়ের মতো দৃঢ় করে দিচ্ছি। ...এখন ঘরে চলে যাও। আবারও বলছি, কাউকে যেন বলো না– আমি তোমাকে কী শিখাচ্ছি এবং কী দীক্ষা দিচ্ছি। ...আজ আর তোমার কোন ক্লাশ নিবো না। কয়েকজন লোক আসছে।'

হাসান ইবনে আতাশের ঘর থেকে বের হচ্ছিলো, দরজা দিয়ে চারজন লোক হাবেলীতে প্রবেশ করলো।

★ ★ ★ ★

ইবনে আতাশ এদের অপেক্ষাতেই ছিলো।

'এই কি সেই ছেলে, যাকে আপনি তৈরী করছেন?' – এক লোক জিজ্ঞেস করলো– 'আমরা ওকে বের হয়ে যেতে দেখলাম।'

'হ্যাঁ – এই সেই ছেলে।'

'আপনি কি মনে করেন সে আমাদের মিশন আর অভিযানের জন্য গড়ে উঠতে পারবে?' – সেই লোক জিজ্ঞেস করলো।

'আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে' – ইবনে আতাশ বললো– 'তোমাদেরকে আমি আগেও বলেছি এই যুবক – যার নাম হাসান ইবনে সবা– এর মধ্যে আমি এমন এক হিরন্ময় প্রতিভার সর্বগ্রাসী উন্মেষ দেখেছি যা তুলনাহীন– অতি দুর্লভ। খুব কম লোকের মধ্যেই এর আঁচ পাওয়া যায়। এমন যোগ্যতা ও প্রতিভাধারী লোক হয় আল্লাহর বড় আউলিয়া এবং হাজার হাজার মানুষের পীর মুরশিদ, না হয় মানুষের দেহবিশিষ্ট আস্ত একটা শয়তান। দু'ভাবেই সে মানুষের জনপ্রিয়তা পায়। আর জনপ্রিয়তাও এমন যে, তার অনুসারী বা ভক্তরা তার ইশারায় নাচে কিংবা তার অঙ্গুলি হেলনে জান পর্যন্ত দিয়ে দেয়।'

'এর রুখ কোন দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন?'

'এখনো আমি কিছু বলতে পারছি না' – ইবনে আতাশ জবাব দিলো– 'আমার আশংকা হলো, এর মধ্যে শয়তানী গুণাগুণ আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। সে যদি তার শয়তান মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত পথেও চলে তাহলে তার কার্যকারিতা আমাদেরকে সফল পথে নিয়ে যাবে। আমার কব্জাতেই থাকবে সে। তাকে এখন আমি শয়তানী পথের আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে তুলছি।'

'আচ্ছা, আমাদের প্রচারের কাজ কি আরো গতিশীল করা দরকার নয়?'

'প্রচার তো হচ্ছেই' – ইবনে আতাশ বললো– 'কিন্তু আমরা এ কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারছি না। কারণ হুকুমত এখন আহলে সুন্নতের এবং অধিকাংশ নাগরিকও নিষ্ঠাবান আহলে সুন্নতের। ধর্মের ব্যাপারে যারা কোন ষড়যন্ত্র ও শয়তানী বরদাশত করে না। আমি আগেও বলেছি, আমাদের প্রচারের কাজ গ্রামেগঞ্জে অধিক পরিমাণে হওয়া উচিত। ওখানে ধরা পড়ার আশংকা কম।'

'গ্রাম্য এলাকায় আমাদের দলের আদর্শ প্রচারের জন্য প্রচারক (মুবাল্লিগ) পাঠানো শুরু করে দিয়েছি' – আরেক লোক বললো।

'শুধু প্রচারই যথেষ্ট নয়' – ইবনে আতাশ বললো– 'হুকুমত-দেশ আমাদের হাতে নিয়ে নিতে হবে। হুকুমত হাতে এসে গেলে আমরা সুন্নীদের এবং সুন্নী মাযহাবকে খতম করে লোকদের বলতে পারবো আসল ইসলাম আমাদের কাছে আছে। যে ইসলামে পাপ পুণ্যের কোন ভেদাভেদ নেই... কিন্তু হুকুমত খুব সহজে হাতে আসবে না। মিসরের উবায়দীদের সহযোগিতা অর্জন করতে হবে আমাদের।'

'আমি একটি সন্দেহের মধ্যে আছি' – আরেকজন বললো– 'মিসরের প্রশাসন তো উবায়দী। কিন্তু আমি শুনেছি ওরা বাতেনী!'

'না'– ইবনে আতাশ বললো– 'ওরা পাক্কা ইসমাঈলী। ওরা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে। সেলজুকি সালতানাতের ওপর হামলার জন্য ওদেরকে আমি উস্কিয়ে তুলবো। তবে এর জন্য আমাদের লোকবল প্রস্তুত করাও জরুরী এবং এই প্রস্তুতির কাজ চলবে গোপনে। মিসরীয়দের হামলার জন্য রাজী করাতে এবং আমাদের লোকদের সশস্ত্র করে তাদের সঙ্গে লিয়াজো করতে– এবং এই প্রস্তুতির জন্য অনেক সময়ের দরকার।'

এই রায় শহরেরই হাকিম আবু মুসলিম রাজীর কাছে বসা ছিলেন দুই সালার। এছাড়া আরো দু'জন লোক বসা ছিলো। ওদেরকে ফৌজি মনে হচ্ছিলো না। এরা দু'জন প্রাদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যমের হাকিম ছিলেন। রায় শহরটি যদিও প্রথমে একটি বড় শহরই ছিলো কেবল। কিন্তু এটি দ্রুত সম্প্রসারণরত বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়াতে এর বিস্তৃতি খুব দ্রুত কয়েকগুণ বেড়ে যায় এবং রায় প্রদেশের মর্যাদা পায়।

...'তোমাদের এলাকার গুপ্তচরবৃত্তির কাজ আরো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালিয়ে যাও' – আবু মুসলিম রাজী বললেন– 'তোমাদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, প্রাদেশিক আকারের এই শহর জয় করে ইরানী অগ্নিপূজারীদের চিরতরে কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বীর সাহাবী হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা)। কিসরা সাম্রাজ্যের শবাধারে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হয়েছিলো এখানেই। ইসলামের প্রথম অভিযাত্রীরা এখানে ইসলামের অপ্রতিরোধ্য দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন। তারপরও তারা এতই সাদামাটা ছিলেম যে, তাদের পবিত্র কবরখানারও আজ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাদের পবিত্র দেহ এখানেই দাফন করা আছে। তাদের আত্মার সদা জাগ্রত চোখ আমাদেরকে দেখছে এবং ব্যাকুল হচ্ছেন এই ভেবে যে, রাসূল (স) এর উম্মতের আজ কি হলো যে, তারা শত দলে বিভক্ত...

'বন্ধুরা আমার! আমি কোন নতুন কথা বলছি না। সামান্য বুদ্ধির লোকেরাও এটা বুঝতে পারছে যে, মুসলিম জাতির মধ্যে যখন ঐক্য ছিলো হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র মুজাহিদ তদানীন্তন বিশ্বের বড় বড় দুই পরাশক্তি কায়সারে রোম ও কিসরায়ে ফারেসকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। অথচ আজ সেই জাতিই ফেরকাবাজিতে বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধের আশংকায় কম্পিত। এর ফায়দা পাচ্ছে ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্যের শত্রুরা।'

'মিসরের দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে' – এক গোয়েন্দা প্রধান বললেন– 'বলা হয় সেখানকার প্রশাসন ইসমাঈলী। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, তাদের সম্পর্ক ফেরকায়ে বাতিনিয়ার সঙ্গে এবং তারা ওপরে ওপরে ইসমাঈলীদের দুর্নাম করে। আশংকার ব্যাপার হলো, তারা ইসমাঈলীদের ধোঁকায় পড়ে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন' – আবু মুসলিম বললেন– 'আপনাদের প্রাপ্ত সকল গোয়েন্দা তথ্য আমার সামনেই রয়েছে। মিসরে আমাদের গোয়েন্দা-বৃত্তির কার্যক্রম খুবই সক্রিয় রাখতে হবে এবং এখানে এই শহরের প্রতিটি ঘরের প্রত্যেক সদস্যের ওপর নজর রাখতে হবে। ইসলামের একত্ববাদের শিক্ষাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। আর পবিত্র কুরআনের এই বাণীকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভিত্তির মৌলনীতি বানাতে হবে যে, রাসূল (স) এর সমস্ত উম্মত একটি সুদৃঢ় দলের মতো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শেষ নবী। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা খতম হয়ে গিয়েছে। এসব ফেরকা বা দলের উদ্ভব ঘটেছে আরো পরে। এখনো ঘটছে এবং ঘটবে ভবিষ্যতেও। নবীগণ নয়– এসব বানিয়েছে মূর্খের দলেরা। আমরা যাদের অনুসরণ ধরতে চাচ্ছি তারা আসলে ইসলামের বিপক্ষের দল। আসল ইসলাম তো সেটাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) রেখে গিয়েছেন... এখানে যদি কারো ব্যাপারে টের পাওয়া যায় যে, সে ফেরকাবাজির পালে হাওয়া দিচ্ছে আমাকে খবর দিও। তাকে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবো।'

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবদুল মালিক ইবনে আতাশ হাসান ইবনে সবাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছিলো।

হাসান দিন দিন দারুণ সুদর্শন যুবক হয়ে উঠছিলো। শঠতা, ধূর্তামি আর প্রতারণায় তো আগেই ষোলকলা পূর্ণ করেছিলো। ফারহীর সঙ্গে তার প্রতিদিনই দেখা হয়। ইবনে আতাশ ফারহীকেও তার মতো করে গড়ে তুলছিলো। এ কারণে ফারহী দিন দিন অসম্ভব সাহসী হয়ে উঠতে থাকে। তার পরিবারের সবাই ইবনে আতাশের শিষ্য বনে গিয়েছিলো। ফারহী তার প্রতিটি কথাই আকাশ থেকে অবতীর্ণ বাণী মনে করতো। ইবনে আতাশ তাকে অভয় দিচ্ছিলো, তার জীবন সঙ্গী হাসানই হবে।

আগে হাসানকে সবসময় যে একটা অনিশ্চিত ভয় তাড়া করতো সেটা অনেকটা কেটে গিয়েছিলো। ইবনে আতাশ তাকে আরো কয়েকবার গভীর রাতে কবরস্থানে পাঠিয়েছিলো। প্রতিবারই হাসানকে মৃতের বিভিন্ন অংশের হাড় ইত্যাদি আনতে হতো বা কবরস্থানে বসে শয়তানের নাম করে ধ্যানমগ্ন থাকতে হতো।

এক রাতে হাসান দুটি পুরনো কবরের সামনে বসে কোন মন্ত্র জপছিলো। সে রাতের আকাশও ছিলো চন্দ্রালোকিত। সে তার জপে ধ্যান-নিবিষ্ট ছিলো। তার কাছ থেকে ফুস ফুস আওয়াজ উঠলো। সে তার সমস্ত ধ্যান-মন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে পার্থিব সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলো যে, সে এই আওয়াজ শুনতেই পেলো না। দু'চোখ তার তখনো বন্ধ ছিলো।

মন্ত্র জপের নিয়ম অনুযায়ী সে তার চোখ খুললো এবং চমকে উঠলো। তার দু' পা দূরে এক কালনাগ ফণা তুলে 'ফুস ফুস' করছিলো। তার গুরু বলে দিয়েছিলো কবরস্থানে সাপ, বিচ্ছু থাকা স্বাভাবিক। কখনো সাপের সামনে পড়লে নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করে নিথর হয়ে যেতে হবে। এতে সাপ মনে করবে এটা প্রাণহীন কোন জিনিস। এর থেকে তার বিপদের কোন আশংকা নেই। সাপ চলে যাবে।

হাসান নাগটি দেখে পাথর মেরে তাড়ানোর চিন্তাটি ঝেড়ে ফেলে দিলো। পাথর হয়ে বসে রইলো। একটি আঙ্গুলও নড়ালো না। নাগ তার দিকে তাকিয়ে রইলো এবং তার ফণা প্রচণ্ড রাগে দু' দিকে দুলাতে লাগলো। হাসান কোষমুক্ত তলোয়ারটি তার সামনে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো। তলোয়ারের দিকে সে হাত বাড়ালো না। ভয় তাকে কাবু করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু সে বেহুঁশ না হয়ে সজাগ-সতর্ক থাকলো।

নাগ একটু আগে বাড়লো। হাসানের জন্য নিজেকে সামলে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। তার জন্য দুটি পথই খোলা ছিলো। একটা হলো, উঠে ঝেড়ে দৌড় দেয়া। আর না হয় এক ঝটকায় পুঁতে রাখা তলোয়ারটি নিয়ে সবেগে সাপের ওপর তা চালিয়ে দেয়া। তার এই চিন্তা শেষ হওয়ার আগেই সাপ ফণা লুটিয়ে পেছন ফিরে চলে গেলো। হাসান তার কাজ শেষ করে নির্ভয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

পরদিন সকালে হাসান ইবনে আতাশের কাছে গিয়ে জানালো কবরস্থানের বিশেষ আমল পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর গতকালের দেখা কালনাগের কথা জানালো। সাপ কিভাবে ফণা তুলে রেখেছিলো, কি করেছিলো এবং কেমন করে ফিরে গিয়েছিলো সব জানালো ইবনে আতাশকে।

'সাপ সাপকে পারতপক্ষে দংশন করে না' – ইবনে আতাশ বললো– 'আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো– আমি তোমাকে ঐ স্তরেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি তোমার গন্তব্যের অর্ধেক পথে পৌঁছে গিয়েছো। এখন বাকী পথ অন্য কেউ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমার উস্তাদী এখানেই শেষ।'

'তাহলে কি অন্য কোন গুরুর খোঁজে আমাকে যেতে হবে?' – হাসান জিজ্ঞেস করলো– 'না কি আপনিই আমাকে কারো কাছে পাঠাবেন?'

'এই প্রশ্নের উত্তর তুমি স্বপ্নে পাবে' – ইবনে আতাশ জবাব দিলো– 'গত রাতে যে আমলটি তোমার দ্বারা করিয়েছি সেটা সাধারণ কোন আমল নয়। কালনাগের ফণা তুলে আসা এবং ছোবল না দিয়ে বা দংশন না করে চলে যাওয়া এই আমলের সফলতার প্রমাণ। যদি তুমি পালিয়ে আসতে বা সাপটি দংশন করে বসতো তাহলে এর অর্থ হতো এটাই যে, তোমার সাধনার প্রক্রিয়া সঠিক হয়নি বা অন্য কোন কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই স্বপ্নে তুমি একটা কিছু দেখবে এবং সেটা হবে একটা রাস্তার চিত্র। যা অত্যন্ত বিপদসংকুলও হতে পারে আবার বিপদমুক্ত সহজও হতে পারে.....

...'আমার প্রার্থনা থাকবে, তুমি যেন বিপদসংকুল পথের চিত্র দেখতে পাও। দুঃখ-কষ্ট সয়েই সুখের নাগাল পেতে হয়। মানুষ যদি অনায়াসেই সম্পদের মালিক বনে

যেতো তাহলে সে বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে মারা পড়তো। রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে, অবিরাম পরিশ্রম করে, হাড়গোড় চূর্ণ করে এবং একটি একটি পয়সা জমিয়ে যে সম্পদ গড়ে তোলে মানুষ তা যত্ন করে ধরে রাখে। গোলাপ যদি কাঁটাবৃত না হতো তাহলে ফুলের আর কি দাম থাকতো .....

...'গত রাতের সাধনার প্রভাব তোমার মন-মস্তিষ্কে এমন আলোড়ন তোলে গেছে যে, এ কারণে একটি স্বপ্ন দেখবে তুমি। কোথাও তুমি যেতে থাকবে। রাস্তাটির চিত্র মাথায় ভালো করে গেঁথে নিয়ো। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা ও স্বপ্নেপ্রাপ্ত বিভিন্ন ইশারা-ইংগিতগুলো খাতার কাগজে টুকে রাখবে। স্বপ্নে হয়তো দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি উপত্যকা ও একটি পর্বতগুহা তোমার নজরে পড়তে পারে। সেটা মাথায় বদ্ধমূল করে নিয়ো।'

'মান্যবর উস্তাদ! এটা কি কোন খোদায়ী ইংগিত হবে?'

ইবনে আতাশ একবার মাথা ঝাঁকালো এবং কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। বোঝা যাচ্ছিলো এই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে রাজী নয়। তারপর মাথা উঠিয়ে তার শাগরিদের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

'এটা যদি কোন গোপন ভেদের কথা হয় তাহলে নাই বা বললেন গুরু!' – হাসান বললো।

'হ্যাঁ হাসান!' ইবনে আতাশ বললো– 'ব্যাপারটি গোপনীয়ই। তবে আমি চিন্তা করছি সে রহস্য তোমাকে বলে দিবো কি-না। যে কোন রহস্যভেদ তুমি তোমার বুকে ধরে রাখার উপযুক্ত হয়ে গেছো এখন...

'আজ পর্যন্ত যে দীক্ষা আমি তোমাকে দিয়েছি এবং যে সাধনা করিয়েছি এবং গত রাতের যে সাধনায় ছিলে তুমি, এসব কিছুই খোদার পথের সাধনা নয়, এসব শয়তানী বিদ্যা। এজন্য তোমার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেন তুমি কি আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতে পারছো না?'

'হ্যাঁ গুরু! আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম নিজের মধ্যে আমি এখন এমন প্রশান্তি অনুভব করছি যেন আমি শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছি। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করছি এমন এক শক্তি আমার অস্তিত্বে মিশে গেছে যা পাথুরে মরুর কলজেও ছিঁড়ে ফেলতে পারবে।'

'তাহলে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি' – ইবনে আতাশ বললো– 'তোমার আমি সহজাত স্বভাব গুণ এমনই পেয়েছি আমি যা এসব মন্ত্র-সাধনার মাধ্যমেই তোমাকে শান্তি আর শক্তি দিতে পারতো। এসবই শয়তানী কর্মকাণ্ড, ইসলামসহ সব ধর্মই যেগুলোকে পাপসিদ্ধ কাজ বলে সাব্যস্ত করেছে। ফেরআউনের যুগেও এই শয়তানী বিদ্যার চর্চা ছিলো। এরপর ইহুদীরা এই বিদ্যা তাদের নিজেদের করে নিয়ে এ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করে এতে কুখ্যাতি লাভ করে। একবার বলেছিলে তুমি ফেরআউন হতে চাও। তোমার মধ্যে আমি এই ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছি। এর দ্বারা তুমি সেই পর্বতগুহা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, যা স্বপ্নে তুমি দেখতে পাবে। সেখানে জ্ঞান ও দীক্ষার পূর্ণতা ঘটবে। এখন এটা নিয়ে চিন্তা করো না যে, এটা কি খোদায়ী বিদ্যা না শয়তানী বিদ্যা।'

তিন চার দিন পর হাসান একটি কাগজ নিয়ে দৌড়ে তার উস্তাদের কাছে হাজির হলো। কাগজটি সামনে রেখে বললো, গত রাতের স্বপ্নে আমি এই রাস্তাটি দেখেছি। রাস্তা যদি স্বপ্নে যেমন দেখেছি এমন হয় তাহলে অতি ভয়ংকর রাস্তা এটি। সে পর্যন্ত জীবিত পৌঁছাতো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

'জানি আমি'– ইবনে আতাশ বললো– 'যদি ভালোয় ভালোয় তুমি এই সফর শেষ করতে পারো তাহলে ধরে নাও সারা দুনিয়া তুমি জয় করে নিয়েছো। কাল যখন কানে ফজরের আযানের আওয়াজ পৌঁছবে তখনই রওয়ানা হয়ে যেও।

৬

পরদিন ভোরে যখন দিগন্ত রেখায় সূর্য লালিমার ছোপ লাগলো তখন শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে দুই ধাবমান অশ্বারোহীকে দেখা গেলো। একটার ওপর আরোহী ছিলো হাসান ইবনে সবা আরেকটার ওপর ফারহী। গতকাল ইবনে আতাশের কাছ থেকে ফিরে এসে যখন সে ফারহীর কাছে গেলো তখন ফারহীকে তার সফরের কথা সব খুলে বললো। ফারহী শুনতেই জিদ ধরলো সেও সঙ্গে যাবে। হাসান তাকে বাঁধা দেয়ার জন্য অনেক কিছুই বললো কিন্তু ফারহী কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত ছিলো না। সে তার পিছু পাগলের মতো লেগে রইলো।

'আমার জীবনের নিয়তি তো তোমার সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেছে'– ফারহী বললো– 'আমি এখানে রয়ে গেলে কোন জায়গীরদার বা আমীর-ওযিরের হাতে বিক্রি হয়ে যাবো। ইমাম আবদুল মালিক আর কয়দিন আমাকে আগলে রাখবেন। তুমি যে সফরে যাচ্ছো তা যে অতি ভয়ংকর এতে কোন সন্দেহ নেই। জীবিত ফিরতে পারবে কি না তা কে জানে? আমার বাঁচা মরা তো তোমার সঙ্গেই। তুমি যদি সঙ্গে করে আমাকে না নাও তোমার পেছন পেছন আমি অবশ্যই যাবো। এই শহরে থাকবো না আর আমি।'

বাধ্য হয়ে হাসানকে ফারহীর কথা মানতেই হলো। হাসান তো তার ঘরের লোকদের বলে কয়েই বের হলো। তার বাপ নিজেই ইবনে আতাশের শিষ্য বানিয়েছে তাকে। কিন্তু ফারহী তার ঘরের লোকদের কিছু না বলেই বের হলো। ঘরের সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখনই সে চুপি চুপি ঘর থেকে বের হয়ে এলো। ঘোড়াটি তার বড় ভাইয়ের। আঁধার থাকতে থাকতেই সে ঘর থেকে বেরিয়েছিলো। সে যেমন সুন্দরী ছিলো এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিলো সাহসী। শহর থেকে হাসান আধা ক্রোশ যেতে না যেতেই ফারহী তার সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

স্বপ্নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি দৃশ্যই হাসানের মনে গেঁথে গিয়েছিলো। অবশ্য চিত্র লেখা কাগজটাও সঙ্গে ছিলো। পথ যদি সোজা হতো ততক্ষণে ওরা আরো অনেক দূরে চলে যেতো। কিন্তু তাদের গন্তব্য পথে নিয়মিত কোন রাস্তা ছিলো না। কোথাও জঙ্গুলে রাস্তা, কোথাও বানজার এলাকা আবার কোথাও পাথুরে কঠিন ভূমির ওপর দিয়ে তাদের এগুতে হচ্ছিলো। কয়েক মাইল যাওয়ার পর অগভীর একটি নদী পড়লো পথে।

এর ওপর দিয়ে ঘোড়া সহজেই পার হয়ে গেলো। কিন্তু আরেকটু এগুতেই খরস্রোতা গভীর একটি নদীপথ আগলে দাঁড়ালো। হাসান স্বপ্নের চিত্র লেখা কাগজটি উঁচু করে ধরে ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলো। তীব্র স্রোত ঘোড়াদুটিকে নিজেদের পথে যেতে দিলো না। ভাসিয়ে তাদের পথ থেকে বেশ অনেকটা দূরে নিয়ে তীরে ফেললো।

হাসান মনে করতে চেষ্টা করলো স্বপ্নে যে নিশানা দেখেছে তা কোথায়! চিত্রিত কাগজেরও সাহায্য নিলো। সামনের এলাকাগুলো ছিলো জনশূন্য প্রান্তর। উঁচু উঁচু পাহাড়ি প্রান্তর ছিলো তৃণলতাশূন্য। ঐগুলোর কোনটা ছিলো এবড়ো খেবড়া কোনটা ছিলো চেপ্টা জমির মতো। কোথাও ভূমির রঙ ধূসর কোথাও আবার কয়লার মতো কালো– যেন এবড়ো খেবড়ো পিচঢালা পথ। হাসান দুই তৃণশূন্য প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলো। তার পেছনে ফারহী। পরস্পরে কথা না বলে পথের দিকেই তারা মনোযোগ স্থির রাখলো বেশি। একটু দূরে যাওয়ার পর একদিকে পথের মোড় পড়লো। হাসান যেদিকেই মোড় ঘুরতে চাইলো তাকে বাম দিকে ঘুরতে হলো। এর পর থেকে কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই কখনো বায়ে কখনো ডানে আঁকাবাঁকা এতগুলো মোড় ঘুরতে হলো যে, সে ভুলেই গেলো তার কোন দিকে যেতে হবে এবং এই ভুল-ভালা গোলক ধাঁধায় কি করে ঢুকেছিলো।

সূর্যের দিক সূত্রতায় ওরা দিক নির্ণয় করে চলতে লাগলো। কিন্তু বুঝা যাচ্ছিলো না ওরা কি সামনে চলছে না পিছিয়ে পড়ছে না কি এক জায়গাতেই ঘুরে মরছে! সূর্য তার প্রাত্যহিক ভ্রমণ শেষে আপন জগতে ফিরে যাচ্ছিলো। দিগন্ত রেখা থেকে তার দূরত্ব ছিলো সামান্যই। হাসান বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তাকে সেখান থেকে বের হওয়ার কথা ছিলো। ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো ওরা।

'মনে হচ্ছে তোমার স্বপ্নে দেখা রাস্তা ভুলে গেছো তুমি!' – ফারহী দুশ্চিন্তার গলায় বললো।

'স্বপ্নেও আমি এ ধরনের ভুল-ভালা গোলক ধাঁধায় ঘুরেছিলাম' – হাসান বললো– 'পথ পেয়ে যাবো'।

জনশূন্য প্রান্তরের গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে এমন একটি প্রান্তর দৃশ্যমান হলো যা ওপর থেকে সামনের দিকে নোয়ানো ছিলো। এটা ছিলো প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টিশৈলী। স্তম্ভবিহীন প্রকৃতির বিশাল এক অলিন্দ মনে হচ্ছিলো। সেখানে পৌঁছে হাসান ঘোড়া থামিয়ে ফারহীকে বললো, কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও।

ঘোড়া থেকে নেমে স্তম্ভবিহীন সেই বারান্দার নিচে বসে গেলো। ওপর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিলো কংক্রিটের ছাদের নিচে বসে আছে ওরা। এটা কোন গুহা ছিলো না। প্রান্তরটি ভেতর থেকে প্রসারিত হয়ে ছাদযুক্ত ছোট খাদের মতো হয়ে গিয়েছিলো। এর মেঝে জমিনের সমতল থেকে দেড় দুই গজ নিচে ছিলো। হাসান বসে পড়লেও ফারহী এর ভেতরের এবং ঢালুপথের মতো নেমে যাওয়া খাদের নিচের দৃশ্য দেখতে লাগলো। এর ভেতরে ঢোকার মুখে সে বলেছিলো, রাত কাটাতে হলে এখানে কাটানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হঠাৎ তার গলার চিৎকার শোনা গেলো।

হাসান তাড়াতাড়ি উঠে ফারহীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু আশে পাশে কিছুই দেখতে পেলো না।

নিচে দেখো হাসান!'

হাসান নিচে তাকিয়ে দেখলো, মানুষের দুটি কংকাল পড়ে আছে। তাদের জীবিতকালীন কাপড়গুলোর ছিন্নভিন্ন টুকরা এদিক ওদিক পড়ে আছে। হাড়গুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটা কংকাল নারীর আরেকটা পুরুষের। নারী দেহের কংকাল স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো। তার খুপড়ি ঘেঁষে দেখা গেলো গুচ্ছবিহীন লম্বা লম্বা কয়েকটা চুল। কবরে লাশ যেভাবে শোয়ানো থাকে কংকাল দুটি সে অবস্থায় ছিলো না।

হাসান লাফিয়ে নিচে নামলো। পুরুষের কংকালটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, এর দুই পাঁজরের মাঝখানে একটি খঞ্জর গাঁথা। দেখা গেলো খঞ্জরের আঘাতে পাঁজরের কিছু অংশ থেতলানো। দুই কংকালের মাঝখানে পড়ে আছে একটি তলোয়ার।

'আল্লাহই জানেন এরা কে ছিলো?' – ফারহী মন্তব্য করলো।

'আমাদের মতোই কেউ হবে' – হাসান বললো– 'কিন্তু এখানে অন্য কোন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। এই লোকটির বুকে হয়তো কেউ খঞ্জর মেরেছিলো। হতে পারে মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে ঐ তলোয়ার দিয়ে। এটাও হতে পারে যে, এরা আমাদের মতো এই গোলক ধাঁধায় ফেসে গিয়ে রাত এখানেই কাটাবে বলে রয়ে গিয়েছিলো। আমার মনে হয় এরপর এরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যায়। এদের কাছে পানিও ছিলো না। থাকলে পানির মশক বা কোন পাত্র ছিলো না।'

'হাসান!' – ফারহী বললো– 'আমি কখনো ভয় পাইনি। কিন্তু আমার মন এখন ভয়ে ছেয়ে যাচ্ছে। আসলে আমাদের এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না।'

'তাহলে আমাদের এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া উচিত' – হাসান বললো।

উভয়ে ঘোড়ায় চড়ে দুই প্রান্তরের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করলো। এই পাহাড়ি রাস্তা তাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলো যেখানে প্রান্তরের পথ পেছনে সরে গিয়ে খোলা ময়দানের দিকে প্রশস্ত হচ্ছিলো। তিন দিকের প্রান্তর ছিলো এক রকম এবং চতুর্দিকের প্রান্তরের মাঝখানে সামান্য রাস্তা বেরিয়ে এলো। হাসান আর ফারহী সে রাস্তায় ঘোড়া উঠালো।

দুই ঘোড়া চলছিলো পাশাপাশি। ঘোড়া চলতে চলতে এমন রাস্তায় পড়লো, যেখানে সংকীর্ণ হতে হতে রাস্তা একটি গলিমুখের আকার ধারণ করে। এদিকে এসে চলার মতো যথেষ্ট পরিসর থাকা সত্ত্বেও ঘোড়া দুটি নিজ থেকেই দাঁড়িয়ে গেলো। ব্যাপার কি! ঘোড়াগুলো প্রথমে অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে চাইলো। তারপর কাঁপতে শুরু করলো। তারা ঘোড়ার পেটে পা চালালো। লাগাম ধরে ঝাঁকি দিলো। কিন্তু ঘোড়ার কাঁপুনি বন্ধ হলো না। সামনে না বেড়ে ও দুটো ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলো।

ঐ যে দেখো ফারহী! ঘোড়া আর সামনে যাবে না।'

ফারহী চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো। তার সাত আট গজ দূরে হাসান যেমন কবরস্থানে দেখেছিলো তেমনি দুটি কালনাগ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার স্বভাব হলো তার পিঠে আরোহী থাকাবস্থায় যদি পথে সাপ বা হিংস্র কিছু দেখে তাহলে দাঁড়িয়ে পড়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে। আর আরোহী না থাকলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

নাগ তীব্র বেগে ঘোড়ার দিকে ছুটতে শুরু করলো, এর পেছন পেছন দ্বিতীয় নাগটি উদ্ধত ভঙ্গিতে এদিকেই আসতে লাগলো। ঘোড়া মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মুখ ঘুরিয়েই পেছন দিকে ছুটতে শুরু করলো। হাসান ফারহী দু'জনেই ঘোড়া বাগে আনতে অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু ঘোড়া বাগে আসতে চাচ্ছিলো না। হাসানের ঘোড়া আগে আগে ছুটছিলো এবং ঘন ঘন ডানে বায়ে মোড় ঘুরছিলো। হাসান তাই বার বার পেছন দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য রাখছিলো ফারহী কত দূরে রয়েছে।

ঘোড়া ছুটতে ছুটতে সেই ভুলভালা পথের মধ্যে ডানে বামে ঘুরতে শুরু করলো। হাসান এটা দেখে হয়রান হয়ে গেলো, তার ঘোড়া সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে যেখান দিয়ে তারা এই গোলকধাঁধায় ঢুকেছিলো। তারা তো তৃণশূন্য পাহাড়ি প্রান্তর ছাড়িয়ে খোলা ময়দানে গিয়ে পৌঁছেছিলো।

হাসান বড় কষ্টে ঘোড়াকে আয়ত্তে আনলো এবং এক জায়গায় দাঁড় করালো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ফারহীর ঘোড়া খুঁজতে লাগলো। একটু দূরে ফারহীর ঘোড়াটি দেখতে পেলো, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ফারহী ছিলো না। হাসান তার ঘোড়া ছুটিয়ে ফারহীর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। সে ফারহী ফারহী বলে চিৎকার করলো। অনেক ডাকাডাকি করলো। কিন্তু ফারহীর পক্ষ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেলো না। হাসান আস্তে আস্তে ভুলভালা বন্দরের দিকে চলতে শুরু করলো। সে ফারহীকে খুঁজতে যাচ্ছিলো।

হাসানের ভেতরের সব অনুভূতি যেন শুষে নিয়েছিলো কালনাগ দুটি। সে তার পৃথিবী, তার লালিত সংকল্প এবং নিজের গন্তব্যের কথা ভুলে গিয়েছিলো। তার ভেতরের নির্ভীক সত্তা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলো। সে ঐ গোলক ধাঁধার ভেতরেই বড় উঁচু আওয়াজে ফারহীকে ডাকতে ডাকতে মুখে ফেনা উঠিয়ে ফেললো। কিন্তু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে স্ববেগে প্রবাহিত বাতাসের তীব্র ঝটকানি আর শো শো শব্দ ছাড়া কোন জবাব মিললো না তার।

গোলক ধাঁধা থেকে যেখান দিয়ে সে বের হয়েছিলো সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকলো সে। অথচ এবার জায়গাটি এত অপরিচিত মনে হলো যেন এর আগে কখনো এ জায়গা দেখেনি। তার সামনের প্রান্তরের পাশ দিয়ে দু'দিকে দুটি রাস্তার আদল দেখলো সে। এর একটি ছিলো সরাসরি হাতের ডানে আরেকটি পেছন দিকে সরে বামে। এই দুই রাস্তা ও গোলক ধাঁধার মুখ এই তিন রাস্তার কোনটি দিয়ে যে সে বাইরে এসেছিলো সেটা ঠাহর করতে পারছিলো না।

তবে সুবিধা ছিলো। তার সামনের পাহাড়ের গড়ানো পাচালটি অনেকটা উঁচুতে থাকলেও ওপর দিকে একটি সহজ ঢাল সেখানে উঠে গিয়েছিলো। হাসান ফারহীর ঘোড়ার লাগাম ধরে পাহাড়ে উঠে গেলো। চারদিকে নজর বুলালো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত উঁচু-নিচু মরু ও পাহাড়ি প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না। এসব পাহাড়ি প্রান্তরের অনেকগুলো ছিলো ওপর থেকে চেপ্টা আবার কিছু এমন ছিলো যে ওগুলোর চূড়া এমন খাড়া ঢালের আকার ধারণ করেছিলো যে, দূর থেকে কোন মানুষের মূর্তির মতো দেখাচ্ছিলো। আরেকটির চূড়ার দিকে চেয়ে তো হাসান সেটাকে মন্দিরের মিনার বলে ভুল করতে যাচ্ছিলো। এর মাথার দিকে অবিশ্বাস্যভাবে বিশাল এক পাথর স্থাপিত ছিলো। যেন কোন মহিলা তার মাথার ওপর সুদৃশ্য মটকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এসব দৃশ্য অন্য এক পৃথিবীর ছবির মতো লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো নিদ্রামগ্ন কোন মুহূর্তের স্বপ্ন দেখা। এলাকাটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রলম্বিত হবে তিন চার মাইল।

'ফারহী!' – হাসান তার ফুসফুসের সব জোর একত্রিত করে চেঁচালো– 'কোথায় তুমি ফারহী ... ফারহী!' – কোন উত্তর নেই...চারদিকে অসহ্য নীরবতা।

'চলন্ত ঘোড়া থেকে কি পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে ও?' – এমন উঁচু আওয়াজে বললো যেন তার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এবং সে তার কাছ থেকে মন্তব্য শুনতে চাচ্ছে।

দু'টি ঘোড়াই তার সম্বল এখন। ফারহীর কাছে তার বড় দ্রুত পৌঁছা এবার জরুরী হয়ে পড়লো। ফারহীর ব্যাপারে তার মন হাজারো বিপদ-সম্ভাবনায় আরেকবার কেঁপে উঠলো। এজন্য চলার গতি বাড়িয়ে দিলো। ফারহী হয়তো এতক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, ধুঁকে ধুঁকে মরছে অথবা তার লুটানো দেহে সাপ দংশন করে ক্ষতবিক্ষত করে রেখে গেছে।

হঠাৎ তার গুরু ইবনে আতাশের একটা কথা মনে পড়লো–সফরে পথ ভুলে গেলে বা সহযাত্রী হারিয়ে গেলে কিংবা কোন জিনিস হারিয়ে গেলে কি করতে হবে। আশার ক্ষীণ একটা আলো তার চোখের সামনে দুলে উঠলো।

হাসান ঘোড়া থেকে নিচে নেমে এলো। একটি সমতল পাথর পেয়ে তার হাঁটু দাঁড় করিয়ে পায়ের পাতার ওপর বসলো এবং ছোট একটি পাথর উঠিয়ে নিলো। ধ্যান করার অনেক পদ্ধতি ইবনে আতাশ তাকে শিখিয়েছিলো। চোখ বন্ধ করে সে কয়েকবার লম্বা শ্বাস নিলো। খানিকপর চোখ খুললো এবং হাতের ছোট পাথরটি দিয়ে কয়েকটি অর্থহীন রেখার মতো নকশা বানালো। তারপর ওগুলোর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এবার এক একটা ঘরের ভেতর কি যেন আকিবুকি করলো এবং মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো। ঘোড়ায় চড়ে পর্বতসদৃশ প্রান্তর থেকে নিচের প্রান্তরে নেমে এলো। তারপর দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

৭

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। এই রাস্তাটি একটু সামনে গিয়ে একদিকে মোড় নিয়েছে। আরেকটু সামনে গিয়ে বৃত্তাকার একটি প্রাচীর প্রান্তপথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এর পাশ ঘেঁষে দুটি রাস্তা এঁকেবেঁকে দু' দিকে চলে গেছে। হাসান ঘোড়া থামিয়ে রাস্তা দুটি দেখলো। দু'চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে বসলো তারপর।

ডান দিক থেকে হঠাৎ একটি মৃদু শব্দ ভেসে এলো। চমকে উঠে সে চোখ খুলে এদিক ওদিক শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলো। চোখে পড়লো একটু দূরে একটি বেজি সন্ত্রস্ত চোখে তাকে দেখছে। হাসানও বেজিটির দিকে তাকিয়ে রইলো। বেজিটি তখনই ত্রস্ত পায়ে একদিকে দৌড়ে গেলো। যেদিকে বেজিটি দাঁড়িয়ে ছিলো হাসান সেদিকে ঘোড়াটি হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো বেজিটি কোন দিকে গিয়েছে।

তার সামনে পড়লো গিরিপথের মতো অতি সরু সামান্য দূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাস্তা। তবে সোজা নয়, প্রান্তরের চারদিক থেকে ঘুরানো পেঁচানো অতি রুক্ষ।

কিছুক্ষণ আগেও হাসান ফারহীর চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে 'ফারহী ফারহী' বলে চিৎকার করছিলো। কিন্তু এখন এমন নিশ্চিন্ত-ধীর গতিতে চলছে যেন ফারহীর খোঁজ সে পেয়ে গেছে বা ফারহীর চিন্তা তার মন থেকে দূর হয়ে গেছে। আসলে সে তখন পাহাড়ের ঢালুতে মসৃণ জায়গায় যে পাথরটিতে বসে ধ্যানমগ্ন ছিলো সেখানে সে জাদুর একটি আমল ক্রিয়া করেছিলো। এ থেকে ইংগিত পেয়ে যায় যেভাবেই হোক ফারহীকে সে পেয়ে যাবে। কিন্তু ফারহী কোথায় আছে এবং সে পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা কোনটি এমন কোন ইংগিত পায়নি। তবে এতটুকু অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলো যে, নানান ধরনের ইংগিত বা এ জাতীয় কিছু সে পাবে এবং সেটা বোঝার জন্য তার নিজের মাথা খাটাতে হবে।

হাসান ইবনে সবা যেমন এক ভয়ংকর চরিত্র হয়ে উঠেছিলো তেমনি জাদুবিদ্যায়ও সে চূড়ান্ত দক্ষতার সিঁড়িতে পা রাখছিলো।

এই সফরের পরই সে এই সিঁড়ি অতিক্রম করে। সফরের আগে তার প্রথম দীক্ষাগুরু ইবনে আতাশ যা শিখিয়েছিলো তাই ছিলো ওর পুঁজি। সে এর পূর্ণতার জন্যই যাচ্ছিলো।

সে তো যাচ্ছিলো কিন্তু এমন পাহাড়ি প্রান্তর ও গিরি-গুহায় ফাঁসানো পথ তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছিলো যে, কখনো কখনো তার ঘোর লেগে যাচ্ছিলো– এ কি জটিল কোন স্বপ্ন না অবচেতন মনের কল্পনা। তবুও তার পূর্ণ আশা ছিলো অদৃশ্য কিছু তাকে ঠিকই কোন ইংগিত দিবে।

অনেক সময় কেটে গেলো। এমন কিছুর কোন হদিসই তার চোখে ধরা পড়লো না। হঠাৎ তার ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করে ডেকে উঠলো এবং মাটিতে খুর দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। তার সঙ্গের ঘোড়াটিও একই আচরণ করতে লাগলো।

হাসান একটু ঘাবড়ে গিয়ে আশপাশে তাকিয়ে দেখলো। ঘোড়া কি আবার সাপ দেখেছে কিনা! না কোথাও সাপ বা জীবন্ত কিছু নেই। তার মনে হলো ভীতির কারণে ঘোড়া দুটি এই আচরণ করেনি, অন্য কোন কারণে এমন করেছে। হাসান বুঝতে পারলো ঘোড়াগুলো ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্তও।

এবার ওগুলো নিজেরাই নিজেদের পথ নির্বাচন করে চলতে লাগলো। হাসান লাগাম ধরে টানলো। মুখে ঘোড়াকে থামতে বললো, কিন্তু ঘোড়া না থেমে গতি আরো তেজ করে দিলো। ওর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা ফারহীর ঘোড়াটি আরো দ্রুত ছুটতে চাচ্ছিলো। হাসান কিছু একটা ভেবে নিয়ে লাগাম ঢিলে করে দিলো। বুঝা যাচ্ছিলো ঘোড়া কারো ইংগিতে চলছে এখন। হাসানেরও ঘোড়ার ওপর আস্থা ছিলো পুরোপুরি।

মাথা নিচু করে ঘোড়া ছুটতে লাগলো কখনো ডানে কখনো বামে।

আরোহীর ইশারা ছাড়াই সামনের মোড়ে ঘুরে গেলো ঘোড়া। হাসান এটা দেখে খুবই বিস্মিত হলো যে, সামনের প্রান্তরটি বেশ খোলামেলা-প্রশস্ত এবং মসৃণ ঘাসের গালিচা ও সবুজ বন-বৃক্ষে দারুণ সতেজ। যেন কোন মরূদ্যান নাকি পাহাড়ি উদ্যান।

ঘোড়াগুলো এবার উড়ে চললো। সবুজ গালিচার মাঝখানে হঠাৎ দলা হয়ে নিচে নেমে যাওয়া চোখ জুড়ানো একটি ঝর্ণার আদল দেখা গেলো। হ্যাঁ ঝর্ণাই। লম্বায় প্রায় পাঁচ-সাত গজ জায়গা জুড়ে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া নীলাভ আকাশের মতো টলটলে স্বচ্ছ পানি জমা হচ্ছে। পানি এতই স্বচ্ছ যে, এর তলার পানির তোড়ে মৃদু আন্দোলিত পাথরকণাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই পানি কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝা গেলো না মোটেও।

ঝর্ণার ধারে পৌঁছেই ঘোড়া অধীর হয়ে পানি পান করতে লাগলো। হাসান ঘোড়া থেকে নেমে দ্বিতীয় ঘোড়াটির লাগাম তার ঘোড়ার জিনের বাঁধন থেকে খুলে দিলো। সেটিও ভোঁস ভোঁস আওয়াজে পানি পান করতে লাগলো।

যে কোন প্রাণী বিশেষ করে ঘোড়া আর খচ্চর দূর থেকেই পানির গন্ধ টের পায়। তখন ঘোড়া বেলাগাম হয়ে জোর করে হলেও পানির ধারে পৌঁছে যায়।

ঘোড়াগুলোর পানি পান করা দেখে হাসানও প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করলো। ঝর্ণার ধারে হাঁটু ঠেকিয়ে শরীরটা ঝুঁকিয়ে অঞ্জলী ভরে সে পানি পান করতে লাগলো। একবার অঞ্জলী ভরে পানি নেয়ার সময় তার হাত দুটি থেমে গেলো। সে তার স্মরণশক্তির ওপর জোর দিলো।

তার সেই স্বপ্নের কথা মনে এলো যাতে সে এই সফরের পথ দেখেছিলো। তার স্মরণে এলো স্বপ্নে সে এই ঝর্ণাটি দেখেছিলো এবং এই ঝর্ণা থেকে আলোর ফোয়ারার মতো কি একটা যেন উঠেছিলো। অনেক চেষ্টা করেও এরপর কি ঘটেছিলো সেটা আর মনে করতে পারলো না। তবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো তার চলার পথ ভুল নয়।

সে আরেকবার যখন অঞ্জলী ভরে পানি উঠানোর জন্য পানিতে হাত নামাতে গেলো তার হাত আরেকবার থেমে গেলো এবং তার চোখ পানিতে আটকে গেলো।

পানির মধ্যে কোন মানুষের প্রতিবিম্ব আন্দোলিত হচ্ছিলো। পানি স্থির ছিলো না। তীরতীরে ঢেউ পাড়ে এসে ছলকে উঠছিলো। এজন্য লোকটির প্রতিবিম্ব মনে হচ্ছিল পানিতে সাঁতার কাটছে।

হাসান নির্বাক-অসাড় হয়ে গেলো। হাসান কোন ডরপুক যুবক ছিলো না। ওর কাছে একটি তলোয়ার ও একটি খঞ্জর ছিলো। ওর মন বলছিলো, এ কোন মুসাফির না, যে এখানে তৃষ্ণা নিবারণ করতে এসেছে।

সে ধীরে ধীরে মাথা উঠালো। তার বিশ-বাইশ পা দূরের এক টিলার চূড়ায় লম্বা পা ওয়ালা এক লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। গায়ে তার এ অঞ্চলের মানুষেরই পোশাক, মাথায় পোশাকের অংশের মতো পাগড়ি। পাগড়ির ওপর একটি কালো রুমাল ছড়ানো। রুমাল দিয়ে কাধ ও পিঠের কিছু অংশ আবৃত করা। মুখে কেঁচি দিয়ে ছাটা ছোট ছোট দাড়ি।

হাসান তার ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে আস্তে আস্তে বসা থেকে দাঁড়ালো। লোকটিও হাসানের দিকে অনড় চোখে তাকিয়ে রইলো। এর দেহে সামান্যতম নড়াচড়ারও আভাস ছিলো না। মূর্তির মতো স্পন্দনহীন। হাসানের সন্দেহ হলো কোন অশরীরি কি সশরীরে হাজির হয়েছে!

শেষ পর্যন্ত মূর্তিটি নড়ে উঠলো। আস্তে আস্তে পিছু হঁটতে লাগলো।

তার পেছন দিকে ডান ও বাম দিকে ভাগ হয়ে যাওয়া আরেকটি পথ দেখা গেলো। প্রকৃতি গিরিপ্রান্তরকে এমনভাবে কেটে দিয়েছে যে, দু'দিকে স্তম্ভের মতো দেয়াল রেখে একটি সরু গলিপথ সৃষ্টি হয়েছে। অনায়াসে যেখান দিয়ে ঘোড়া অতিক্রম করতে পারবে।

লোকটি উল্টা পায়ে চলতে চলতে গলিতে ঢুকে পড়লো। হাসান তার ঘোড়ার সঙ্গে ফারহীর ঘোড়ার লাগাম বেঁধে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলো এবং গলিতে ঢুকে পড়লো। সে অনুভব করছিলো, কিছু একটা তার ওপর ভর করছে। সেটাই এখন তাকে পরিচালিত করছে।

লোকটিকে গলির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। তার পেছন দিকে আরেকটি গিরিপ্রান্তর দেখা যাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো গলিপথ সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। লোকটি হঠাৎ তার বাম হাত বাম দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হাসান ইংগিত বুঝতে পারলো। সেদিকে গিয়ে হাসান বাম দিকে মোড় নিলো। সামনের আরেকটি মোড়ে লোকটিকে আবার দেখা গেলো। হাসান তার পেছন পেছন এমনভাবে যাচ্ছিলো যেন সে ঐ লোকের গৃহপালিত পশু বা সে তাকে সম্মোহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

এবার সে খোলামেলা প্রান্তরে পড়লো। তৃণশূন্য ধূসরতার পরিবর্তে সেখানে সবুজ স্নিগ্ধ অনেকগুলো টিলার মেলা দেখা গেলো। বুঝা গেলো ঝর্ণার পরিসিক্ত পরিবেশই এখানকার প্রকৃতিকে এমন অকৃপণ হাতে সবুজতা দান করেছে।

হাসান একটি টিলা ঘুরে এগোনোর সময় সামনের দৃশ্যপট দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো। এ দৃশ্য তার জন্য অকল্পনীয় ছিলো। ডানে বায়ে দু'দিকে বিস্তৃত মসৃণ চাতালের মতো তার সামনে ছিলো উঁচু একটি টিলা। এর চারপাশ আঁধ হাত উঁচু তাজা সবুজ ঘাসের লকলকে ডগা আর বনফুলের বিচিত্র সমাহারে সাজানো। মনে হচ্ছিলো কোন শিল্পীর নির্মাণশৈলী এটা। কিন্তু এর ওপরের বাঁকানো ছাদ ও দেয়ালের মজবুত আদল বলে দিচ্ছিলো এটা প্রকৃতিরই কোন অনবদ্য সৃষ্টি। এর ওপর দিয়ে ঝুলছিলো পাতাফুলের লতানো শত শত চারাগাছ। মরূদ্যানের অযাচিত সৌন্দর্যকেও যেন এটা হার মানাচ্ছিলো।

হাসান এর ভেতরে ঢুকলো। কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে আনা লোকটি এর বাইরে রয়ে গেলো। আরো ভেতরে গিয়ে হাসান দেখলো, এক স্থানে খেজুরের পাতায় তৈরী বিশাল এক চাটাই বিছানো রয়েছে। লম্বা খসখসে দাড়ির এক বৃদ্ধ এর ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় খরগোশের পশমের টুপি। টুপির ওপর দু' কাঁধ বিস্তৃত কালো একটি রুমাল। গায়ে তার একটি সবুজ আলখেল্লা। এই বেশভূষায় মনে হচ্ছিলো এ কোন ধর্মীয় বা দলের নেতা। তবে কোন্ দলের সঙ্গে এর সম্পর্ক সেটা বুঝা মুশকিল ছিলো।

বৃদ্ধের ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে হাসান দেখলো এর দু'পাশে তিনজন তিনজন করে লোক বসা। প্রত্যেকের মাথায় বিশেষ ধরনের পাগড়ি ও মাথার ওপর কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত কালো রুমাল।

যে লোকটি হাসানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো এখানে হঠাৎ সে উদয় হলো। বৃদ্ধ তাকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বললো। লোকটি আরেকটি চৌড়া টিলার আড়ালে চলে গেলো এবং একটু পরই সে টিলার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো, তার সঙ্গে তখন ল্যাংড়ে ল্যাংড়ে আসছিলো ফারহী।

ফারহীকে যদিও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো তবুও হাসান এটা ভেবে আরাম বোধ করলো যে, ফারহী জীবিত আছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তাকে ক্ষতবিক্ষত করছিলো এরা কারা? আর ফারহীই বা এদের কাছে কি করে এলো?

তবে এদেরকে কোন ডাকাত বা রাহাজানীর দল মনে হচ্ছিলো না। কারণ ডাকাতদের মাথায় কমপক্ষে পাগড়ি তো থাকে না। হাসানের মনে হলো এই বৃদ্ধ কোন দরবেশ। দরবেশের ইংগিতে ফারহী তার সামনে বসে গেলো।

দিনের সফর শেষে সূর্য দিগন্ত রেখার পেছনে গিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে খানিক আগে। আঁধার ঘনিয়ে এলো। সেখানে জ্বালানো হলো আলোক মশাল। মশালের উদ্ধত আলো নেচে নেচে টিলার গায়ে প্রেত নৃত্যের আবহ তৈরী করছিলো।

★ ★ ★ ★

ঃ 'হে নওজোয়ান! ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের সামনে বসতে কি অপছন্দ করছো? আমরা সবাই তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছি' – দরবেশ বললেন।

ঃ 'আমি এখনো কারো চেহারার ভাব পড়ার উপযুক্ত হইনি' – হাসান বললো– 'মনের গতি প্রকৃতি আমি চোখের আয়নায় দেখতে পাই না। আপনার মুখে যে জ্যোতির আভা খেলা করছে তা যদি আপনার অন্তরলোকেও থাকে তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দেবেন যে, আমার সফরসঙ্গিনী কি করে আপনাদের কাছে পৌঁছলো?'

'আগে তো ঘোড়া থেকে নামো। সব প্রশ্নের উত্তরই পাবে তুমি এবং তুমিও আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবে। .... এই মেয়ে তোমার সফরসঙ্গিনী আমাদের নয়। এসো এর সঙ্গে বসে পড়ো। এর সঙ্গেই তো ফিরে যাবে আবার।'

হাসান ঘোড়া থেকে নেমে জুতা খুলে চাটাইয়ের ওপর উঠে এলো। দরবেশ বাড়িয়ে দিলেন তার ডান হাত। হাসান দু' হাতে তার সাথে করমর্দন করলো। দরবেশের ইংগিতে সে ফারহীর পাশে বসে গেলো।

ফারহী ও হাসান দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক। কিন্তু ফারহীর চেহারায় ভীতির কোন ছাপ ছিলো না। আশ্চর্য! হাসানকে নিয়ে সে কোন উৎকণ্ঠার মধ্যেও ছিলো না! মুচকি হাসির কাঁপনে তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেলো। হাসানের চেহারায় যে অনিশ্চয়তার মলিনতা ছিলো সেটা সরে গিয়ে সেখানে নিশ্চয়তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়লো।

'তোমার নাম?'

'হাসান ইবনে সবা।'

'তোমার এই দুর্গম সফরের গন্তব্য কোথায়?' – দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন– 'কোথায় তোমার আখেরী মাঞ্জিল?'

'স্বপ্ন-নির্দেশিত সফরের গন্তব্য কি বর্ণনা করা যায়?' – হাসান বললো।

'আরে স্বপ্নাদিষ্ট কোন সফরের অস্তিত্ব আছে নাকি!' 'জাগরণে স্বপ্ন দেখো নাকি নিদ্রামগ্ন হয়ে স্বপ্ন দেখো তুমি?'

'ঘুমের ঘোরে যে স্বপ্ন দেখি জাগরণে তা সত্যি করতে চেষ্টা করি'–হাসান বললো।

'তুমি হয়তো জানো না নওজোয়ান!' 'ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন হয় মনের লালিত ইচ্ছা-আশংকা আর গোপন প্রবৃত্তির চিত্রায়িত প্রতিচ্ছবি। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যা বুলবুলির মতো ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়...আর জাগরণের ঘোর লাগা চোখের স্বপ্ন তো কোন ফেরারীর সফরের মতোই, যার কোন মঞ্জিল নেই।'

'দরবেশ বাবা!' – হাসান বললো– 'সস্তা ইচ্ছা আর প্রবৃত্তির পূজারী নই আমি, না আমি কখনো আমার মনকে কোন প্রবৃত্তি-চিন্তার খোরাক দিয়েছি।'

মনকে তাহলে তুমি কি খোরাক দাও?'

'সংকল্প' – হাসান দৃঢ়কণ্ঠে বললো– 'আমি আমার প্রতিটি ইচ্ছাকে সংকল্পের সুকঠিন আবরণে বাড়ন্ত করতে থাকি।'

'তোমার সফরেরও কিছু কথা শোনাও না নওজোয়ান!'

'এটা একটা স্বপ্ন' – হাসান বললো– 'স্বপ্নে যা দেখেছিলাম তা আমার সামনে এসে ধরা দিচ্ছিলো।'

'স্বপ্নে আমাদেরকেও দেখেছিলে?' – দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন– 'আমরাও তো তোমার সামনে ধরা দিয়েছি।'

'হ্যাঁ দরবেশ বাবা! দেখেছিলাম' – হাসান বললো– 'স্বচ্ছ জলের একটা ঝর্ণা দেখেছিলাম। এর মধ্যে একটা ছবির প্রতিফলন ঘটলো। ক্রমেই সেটা মানুষের রূপ নিলো। নীরব ইংগিত-নির্দেশ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। আর দেখেছিলাম, এক জায়গায় বসে থাকা সাতটি হরিণ।'

'হরিণগুলো কোথায়?'

'ছয়টি তো আমার সামনে বসা আছে' – হাসান জবাব দিলো– 'সপ্তমটি দাঁড়িয়ে আছে।'

'এর দ্বারা তুমি কি বুঝেছো?'

'এতটুকু যে, আমি সঠিক পথেই এগুচ্ছি।'

হাসান লক্ষ্য করলো, কথা বলছেন শুধু দরবেশই। আর অন্যরা চুপচাপ বসে আছো। দরবেশের চেহারা হাসিমাখা আর অন্যদের চেহারা প্রতিক্রিয়াহীন– নির্লিপ্ত। দরবেশ যখন কথা বলেন সবার চোখ তার দিকে থাকে। হাসান যখন কথা বলে সবার চোখ আবার হাসানের দিকে ঘুরে যায়।

'মান্যবর! আমি এখন ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো'? – হাসান ফারহীর দিকে ইংগিত করে দরবেশকে জিজ্ঞেস করলো।

'এই মেয়ের ওপর তো আমাদের কোন অধিকার নেই। তবে আমাদের ওপর তার কিছু হক ছিলো। আমরা তা শোধ করে নিয়েছি।'

হাসানের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠলো। কখনো সে ফারহীকে দেখছিলো কখনো দরবেশকে।

এই ফুলকে আমরা কঠিন পাথরের জগত থেকে উঠিয়ে এনেছি' – দরবেশ বললেন– 'জানি সে তোমার সফরসঙ্গিনী, তোমার সঙ্গেই তার পথ চলা। কিন্তু এটা অবশ্যই আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে যে, তুমি এই মেয়ের উপযুক্ত কিনা! ... পেরেশান হয়ো না বৎস! রাগকে নিয়ন্ত্রণ করো। আমাদের গোপন কথাটা বলেই ফেলি, আমরা জানি তুমি কোথায় যাচ্ছো? এমন দীর্ঘ-দুর্গম সফরে এমন সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গ পেলে পথ চলা যেমন সহজ হয়ে যায় দূরত্বও যেন অনেক কমে যায়। কিন্তু জীবন-সফরে যে মুসাফির নারীকে শুধু এতটুকুই মনে করে যে, এ এক মনোলোভা

দেহের খেলা তাহলে তার সহজ পথটুকুও কঠিন হয়ে যায়। যে কোন নারীকে তুমি কী চোখে দেখো সেটাই এখন আমার দেখার বিষয়।'

'আপনার ওপর এই মেয়ের যে হক ছিলো সেটা কি?' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'এই মেয়ে! তুমিই ওকে বলে দাওনা' – দরবেশ ফারহীকে বললেন।

'আমাদের ঘোড়াগুলো সাপের ভয়ে যখন পালাতে গেলো' – ফারহী হাসানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো– 'আমার ঘোড়া তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরেক দিকে ছুটে গেলো। আমি সামলে উঠার আগেই পড়ে গেলাম। পড়ে যাওয়ার আগের কথাই কেবল মনে আছে। হুঁশ ফেরার পর দেখলাম, এখানে পড়ে আছি আমি। এরা এমন করে আমার যত্ন নিলো যে, ভয়-ডর আর কিছুই রইলো না। পেরেশান ছিলাম শুধু তোমাকে নিয়েই। এরা বললো, তুমি এসে যাবে। তুমি তো ঠিকই এসেছো।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কি ওদেরকে বলে দিয়েছো?' – হাসান ফারহীকে জিজ্ঞেস করলো।

'না' – ফারহী বললো– 'এরা তো কতবার জিজ্ঞেস করেছে, আমি প্রতিবারই বলেছি, আমার সফরসঙ্গী নিজে যদি বলে বলুক আমি বলবো না। ওরা বললো, তাহলে এতটুকু বলো আমি জানি না। আমি বলেছি, আমি জানি, তবে বলবো না। ওরা ভয় দেখিয়ে বললো, তাহলে তোমার ইজ্জত লুটে তোমাকে মেরে ফেলবো। আমি বললাম তবুও আমি বলবো না। ওরা বললো, ঠিক আছে আমরা তোমার ইজ্জতের নিরাপত্তা দান করছি, তোমাকে তোমার ঘরে রেখে আসবো। আমি বললাম তবুও আমি মুখ খুলবো না... এরপর এই দরবেশ বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন সাবাস বেটি! আমরা তোমার পূজা করবো। তারা আমাকে এই বলে আশ্বাস দিলো, তোমার সঙ্গীকে আনার জন্য এক লোককে পাঠানো হয়েছে।'

'শুনেছো যুবক?' দরবেশ হাসানকে বললেন– 'এখন আমাদের দেখার বিষয় হলো তুমি এই মেয়ের দেহ চাও না তার মন!'

হাসানকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো সে লোকটিকে বৃদ্ধ কি যেন ইংগিত করলেন। দেখতে দেখতে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

লোকটি আবার মশালের আলোয় উদয় হলো। তার হাতে তখন মাটি দিয়ে বানানো তিনটি নারী মূর্তি দেখা গেলো। তিনটাই কোন অপরূপা নারীর প্রতিমা। প্রতিটি মূর্তিই দেড় ফুট উঁচু এবং উলঙ্গ। মূর্তিগুলোর সঙ্গে মাটির কয়েকটা মারবেলের মতো ঢেলাও দেখা গেলো।

'মূর্তি তিনটি ও মার্বেলগুলো ওর সামনে রেখে দাও' – দরবেশ হুকুম করলেন।

তার হুকুম পালিত হলো।

'যে কোন একটা মূর্তি উঠিয়ে নাও' – দরবেশ হাসানকে বললেন– 'তারপর এর ডান কানের ছিদ্র দিয়ে একটা মারবেল ছেড়ে দাও।'

হাসান একটা মূর্তি উঠিয়ে তার কানে মাটির একটা মারবেল ছেড়ে দিলো।

মার্বেলটি মূর্তির মুখ দিয়ে বের হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

'আরেকটা মূর্তি উঠিয়ে নাও' – দরবেশ বললেন– 'এবং আরেকটি ঢেলা এর কানে ঢুকিয়ে দাও।'

হাসান দ্বিতীয় মূর্তিটি উঠিয়ে নিলো। এবারের ঢেলাটি ছিলো গোল কংকরের মতো। হাসান সেটা মূর্তির কানে ঢুকিয়ে দিলো। ঢেলাটি এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে এলো।

'আরেকটা উঠিয়ে নাও। তারপর এই ঢেলাটি ওর কানে ঢুকিয়ে দাও।'

হাসান দ্বিতীয়টা রেখে তিন নম্বরটা উঠিয়ে এর কানে একটি গোল ঢেলা ঢুকিয়ে দিলো। ঢেলাটি এবার মূর্তির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'জোরে জোরে ঝাঁকি দাও। ঢেলাটি বের করতে হবে' – দরবেশ বললেন।

হাসান মূর্তিটি ঝাঁকালো, ওপর নিচ করলো, নাড়াতে লাগলো কিন্তু ঢেলাটি আর বের হলো না।

'এই মূর্তিটি বাদ। এটা ফেলে দাও। এ বদ বেটি আমাদের ঢেলাটি হজম করে ফেলেছে।'

হাসান মূর্তিটি রেখে দিলো।

'আচ্ছা মূর্তিগুলো দেখতে কি খুব সুন্দর না?' – দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন– এগুলোকে তোমার ভালো লাগেনি?'

'হ্যাঁ দেখতে খুব সুন্দর' ভালোও লেগেছে এগুলোকে। যে শিল্পী এর নির্মাতা সে-তো নারীর সব সৌন্দর্যই এই মূর্তিগুলির গায়ে চড়িয়ে দিয়েছে। এখন শুধু প্রাণসঞ্চারের কাজটাই বাকী রয়েছে।'

'আমি তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই। মূর্তি তিনটাই তো দেখতে একরকম। যে কোন একটা পছন্দ করে উঠিয়ে নাও।'

হাসান সেই তিন নম্বর মূর্তিটা নিলো যেটার কানে ঢেলা ঢুকানোর পর আর বাইরে বেরিয়ে আসেনি। দরবেশ সেটাকে বাতিল বলে মন্দ বলেছিলেন।

'আরে নওজোয়ান! তুমি তো এই কাজে তোমার বুদ্ধি খাটাওনি' – দরবেশ বললেন– 'না কি তুমি শোননি যে, আমি এই মূর্তিটির ব্যাপারে বলেছিলাম এটি আমার ঢেলা হজম করে ফেলেছে, একে ফেলে দাও'।

'আমি যদি মাথা ও বুদ্ধি না খাটাতাম তাহলে আপনার এই মূর্তিটিকে ছুঁয়েও দেখতাম না। ঐ দুটি থেকে যে কোন একটা তুলে নিতাম। কিন্তু আমার মন বলেছে এই মূর্তিটি উঠিয়ে নাও।'

'তোমার মন এর মধ্যে এমন কি রূপ দেখেছে?'

'প্রথমটার কানে ঢেলা ঢুকানোর পর সেটা অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে' – হাসান বলতে লাগলো– 'সম্মানিত দরবেশ বাবা! আপনি নিশ্চয় এমন মেয়েকে পছন্দ করবেন না যে তার বাপের উপদেশ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় ... বোন হিসেবে যেমন এরা জঘন্য বৌ হিসেবেও ... জঘন্য ...

'দ্বিতীয়টার কানে ঢেলা ঢুকানোর পর সেটা মুখ দিয়ে বের করে দিলো। এ ধরনের নারী তো আরো অনেক ভয়ংকর। সে ঘরের কোন গোপন কথাই তার মনে ধরে রাখতে পারবে না। কথা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক যার তার সামনে বলা শুরু করে দিবে। এ ধরনের মেয়ে নিজের ঘর তো বটেই নিজের সম্ভ্রমও সামান্য কথায় বিলিয়ে দিবে ...

'আর যেটাকে আপনি বাতিল করে দিয়েছেন-দামী তো আসলে সেটাই। যে সব গোপন রহস্য তার মনে কবর দিয়ে রাখতে পারবে সে। আমি এটাকে কত করে ঝাঁকিয়েছি, আঁছড়ে ফেলতে চেয়েছি, এর প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আন্দোলিত করেছি কিন্তু ঢেলাটি সে উগড়ে দিলো না। একে আপনি ভেঙ্গেচুড়ে এর অস্তিত্ব বিনাশ করে দিতে পারবেন তবুও এর ভেতর থেকে কিছুই বের করতে পারবেন না ....

'এই গুণটাই আপনি ফারহীর মধ্যে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনারা ছিলেন আটজন আর ও ছিলো একলা। আপনাদের এই শক্ত-সমর্থ আটজন পুরুষের ভয়ে কি সে বলে দিয়েছে আমরা কোত্থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি? আমি তো ওকে আমার জীবন পথের সফরসঙ্গী বানাবো।'

'সাবাস বেটা! খোদা তোমাকে এই বয়সেই যে বুদ্ধি-বিচক্ষণতা দিয়েছেন, সারা জীবন অভিজ্ঞতা অর্জন করে বার্ধক্যে পৌঁছেও কেউ এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না ... হ্যাঁ তুমি জন্মজাত বুদ্ধিধারী– এ কথা বলে দরবেশ তার এক লোককে বললেন– 'মূর্তি তিনটি যত্ন করে রেখে দাও। এর পরীক্ষায় শুধু এই একজনই পাশ করলো।'

এক লোক মূর্তি তিনটি উঠিয়ে মশালের আলোর বাইরে চলে গেলো।

'খাবার গরম করো' – দরবেশ নির্দেশ দিলেন– 'তাড়াতাড়ি দস্তরখান লাগাও...এরা দু'জন ক্ষুধার্ত।'

টিলা, পর্বত আর গিরিপ্রান্তরে বেষ্টিত এমন এক বিজন জায়গায় এত সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেয়ে হাসান ভারী আশ্চর্য হলো। এতো ক্ষুধার্ত ছিলো এরা দু'জন যে, গবগব করে খাবার খেয়ে গেলো।

খাওয়ার পর হাসানকে ডেকে দরবেশ তার কাছে বসালেন। অন্যরা সবাই ততক্ষণে যার যার জায়গায় চলে গিয়েছে। ফারহীর শোয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হলো। ফারহী গিয়ে শুয়ে পড়লো।

'হাসান'! – দরবেশ বললেন– 'তোমার নাম তো হাসান ইবনে আলী হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তুমি হাসান ইবনে সবাহ বলতেই বেশি পছন্দ করো।'

'আমার বাপ দাদাদের মধ্যে সবাহ হামিরী নামে এক লোক ছিলেন। আমার বাবা শয়তানী কর্মকাণ্ডে কম উস্তাদ লোক ছিলেন না। কিন্তু সবা-এর ব্যাপারে শুনেছি, তিনি অনেক খ্যাতি আর সম্মান পেয়েছিলেন। তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিলো, তিনি কারো

মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধতে দেননি যে, তিনি সব ধূর্ত-প্রতারক আর শয়তানের গুরু। এ কারণেই আমি ইবনে আলী না বলে ইবনে সবাহ হামিরী বলতে বেশি পছন্দ করি ... কিন্তু আমার নাম আপনি জানলেন কি করে?'

'শুধু নামই নয় হাসান! তোমার ব্যাপারে আমাকে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, তুমি যেখান থেকে আসছো এবং যেখানে তোমার গন্তব্য-সব। এর মাঝখানে আমি এক যোগসূত্র, একটা মাধ্যম বা পুল বলতে পারো ....'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, থামুন, থামুন' – দরবেশের কথার মাঝখানে হাসান চমকে গিয়ে বলে উঠলো– 'আমার মনে পড়েছে .... আমার গুরু আবদুল মালিক ইবনে আতাশ বলেছিলেন, স্বপ্নে একটি গুহা দেখা যাবে। সেই গুহায় আমার দীক্ষা পূর্ণ হবে। আমি আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন করে ডুবে ছিলাম যে, আমার স্বপ্নে দেখা সেই পর্বতগুহার কথা মনে রইলো না। সেই গুহার পরিবেশ মেঘাচ্ছন্নের মতো কেমন ঝাপসা ঝাপসা ছিলো। বুঝা যাচ্ছিলো এই আচ্ছন্নতার মধ্যে কি যেন একটা ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি যে বলেছিলাম, স্বপ্নে কতগুলো হরিণ দেখেছি, ওগুলো ঐ আচ্ছন্নতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো'.... হাসান চারদিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখলো এটাও তো এক বিশাল গুহা। আবারো চমকে উঠে বললো– 'মুহতারাম দরবেশ! এটা আমার স্বপ্নে দেখা গুহা নয়তো?'

'হ্যাঁ হাসান! এটাই সেই পর্বতগুহা। কিন্তু এখানে তোমার দীক্ষা পূর্ণ হবে না। এখান থেকে তুমি তোমার পথের আলো সংগ্রহ করবে। এর মাধ্যমে তোমার গন্তব্য, ভবিষ্যত এবং নিজের ব্যক্তিসত্তা দেখতে পাবে কী অসাধারণ! তারপর তুমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করবে আমি কে? এবং এখানে কি করছি?'

'এতো আমি জিজ্ঞেস করবো এবং করেই যাচ্ছি' – হাসান বললো।

'এর আগে কিছু জরুরী কথা শুনে নাও হাসান! আমি জানতাম তুমি আসবে। মাটির তল দিয়ে জাল বিস্তারের এক মিশন এটা আমাদের। এই মিশনকে আমরা মাটির ওপরেও ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছি। এখান থেকে সেসব এলাকা শুরু হয়েছে যেগুলো আমাদের দখল করতে হবে। সামনে অনেকগুলো কেল্লা বা দুর্গ আছে যেগুলোর কিছু ছোট, কিছু আছে বেশ ছোট আর কিছু আছে মোটামুটি বড়। এর মধ্যে এমন কিছু দুর্গ আছে যা কিছু আমীর উমারার ব্যক্তিগত-ভূমিস্বত্ব বনে গেছে। আমাদের দখল করতে হবে সেগুলোই'।

'কিন্তু কেল্লা বা দুর্গ জয় করার জন্য তো ফৌজের প্রয়োজন। ফৌজ পাবো কোত্থেকে আমরা' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'লোকদেরকেই আমরা ফৌজ বানিয়ে নেবো।'

'কিন্তু কিভাবে?'

দরবেশ তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো, তার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো।

★ ★ ★ ★

'এই সবকটাই তোমাকে আমি এখন দিতে চাচ্ছি' – দরবেশ বললো– 'তুমি আবদুল মালিক ইবনে আতাশের শাগরিদী শেষ করে এসেছো। এখন তোমাকে আরেকজনের শাগরিদী গ্রহণ করতে হবে। সে হলো আহমদ ইবনে গুতাশ। সামনে একটা দুর্গ আছে। এর নাম কেল্লা ইসফাহান। আহমদ ইবনে গুতাশ সেই কেল্লার গভর্ণর। সে তোমাকে জাদুবিদ্যার সেরা পণ্ডিত করে তুলবে....

'এখন যে কথাটা বলবো এর প্রতিটা শব্দ মন দিয়ে শুনবে এবং বুকে গেঁথে রাখবে। দু'টি শক্তির প্রাধান্যে মানবজাতি পথ চলে। অথবা একথা বলতে পারো, দুনিয়ার ওপর রাজত্ব চলছে দুই শক্তির। একটা হলো খোদার আরেকটা ইবলিসের। মানুষ খোদার নানান রূপের কথা কল্পনা করে তার পূজা করে। কেউ খোদা বানায় সূর্যকে, কেউ আগুনকে, সাপকে, আকাশের বিদ্যুৎকে– এমন আরো কতকিছুকে মানুষ খোদা বানাতে থাকে। ইসলাম এসে মানুষকে জানালো খোদা কি এবং কে! এটাও জানালো এই সূর্য-চন্দ্র, আকাশের বিদ্যুৎ-বজ্র, আগুন, পানি, সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি খোদা তো নয়ই; বরং খোদার সৃষ্টি। লোকেরা খোদার একত্ববাদ মেনে নিলো...।

'আমরাও খোদাকে মান্যকারী মুসলমান। কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধামতো আলাদা ফেরকা বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের মনগড়া দাবী হলো, সহীহ ইসলাম আমাদের কাছেই রয়েছে। কিন্তু আহলে সুন্নতওয়ালারা ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের মনে এমন করে এঁকে দিয়েছে যে, আমরা আর তাদের সেই নির্মল বিশ্বাস বদলাতে পারবো না। অন্য কোন পথ আমাদের বের করতে হবে।'

'এমন কিছুর কথা কি চিন্তা করেছেন'?

'হ্যাঁ, এটাই তো বলছি তোমাকে। কিন্তু এটা এমন কোন কৌশল নয় যে, পাথর উঠাও আর কারো মাথায় মেরে দাও। এখানে ব্যাপার হলো দৃষ্টিভঙ্গির। ব্যাপারটা শুধু তুমিই বুঝতে পারবে।'

'শুধু আমিই কেন'? – হাসান উৎসুক্য গলায় বললো– 'আমার দীক্ষা তো এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে, তারপর অভিজ্ঞতাও এখনো কিছু হয়নি।'

'তোমার কাছে সবকিছুই আছে। আমরা যা ভেবে চিন্তে রেখেছি আগে সেটা শুনে নাও। তারপর তুমি নিজেই অনুভব করবে যে, আরে এসব তো আগ থেকেই আমার মনের কথা ছিলো...। আসল কথা কি জানো হাসান! আহলে সুন্নতরা খোদার সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টানরাও খোদাকেই আদি-অন্ত বলে সাব্যস্ত করেছে এবং ঈসা (আ)-কে তারা খোদার পুত্র বলে মানে। আরো আছে ইহুদী-অগ্নি পূজারী। এরাও আরেকভাবে খোদাকে মানে। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় মুশকিল হলো, দেশের শাসনক্ষমতা এখন আহলে সুন্নতের হাতে।'

'আপনি হয়তো জানেন, আমাদের আবু মুসলিম রাজী এমন কট্টর আহলে সুন্নতপন্থী যে, সে আমার বাবাকে বলেছিলো, তুমি নিজেকে আহলে সুন্নত বলে পরিচয়

দাও অথচ নিজের ছেলেকে এক ইসমাঈলী নেতা আবদুল মালিক ইবনে আতাশের ক্লাশে ভর্তি করিয়েছো। কেন? ... আমার বাবা আবু মুসলিমের চক্ষুশূল হওয়ার কবল থেকে বাঁচার জন্য ইমাম মুওয়াফিকের মাদরাসায় আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি এটাও জানতে পেরেছি আবু মুসলিম তার এক গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে রেখেছে যারা প্রতিটি ঘরে ঘরে কান রাখে – কোথাও আহলে সুন্নতের পরিপন্থী কোন কথা তো হচ্ছে না!'

'হ্যাঁ হাসান! আবু মুসলিম রাজী গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছে। তার জানা নেই, আমরাও তার গুপ্তচর বাহিনীর পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছি। আমরা জানি সেলজুকি সালতানাতের হুকুমত আমাদের দুশমন। কিন্তু আমরা তাদের শিকড়সুদ্ধ ঝাঁঝরা না করে ছাড়বো না। মিসরের ওপর আমাদের আস্থা আছে। ওরা উবায়দী এবং আমাদের মতাদর্শের কাছাকাছি।'

'মুহতারাম দরবেশ! জানি না কেন আমার মনে এটা এসেছে যে, আমি মিসর যাবো এবং সেখান থেকে সেলজুকিদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করবো।'

দরবেশ চমকিত মুখে হেসে উঠলো। তারপর হাসানের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

'কেন মুহতারাম! কি হয়েছে?' – হাসান বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'আমি কি ভুল বকলাম?'

'না হাসান! তোমার যে মিসরের কথা মনে এসেছে এজন্য আমি বেশ আনন্দিত হয়েছি। আমি আরো খুশী হয়েছি এ কারণে যে, তোমার মনে এই চিন্তা এমনিই আসেনি বরং তোমার মধ্যে এক গোপন-নিগূঢ় শক্তি গড়ে উঠছে যা তোমাকে এসব ইংগিত দিয়ে যাচ্ছে। আমি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তোমার মধ্যে নবুওয়াতের নিদর্শনের কিছু ছাপ দেখা যাবে। তুমি নবী হও বা না হও কিন্তু এত খ্যাতি তুমি পাবে যা শুধু নবীরাই পেয়ে থাকেন। পরবর্তী প্রজন্ম এবং তাদেরও পরের প্রজন্ম তোমার নাম স্মরণ করে যাবে। তবে এটা জরুরী নয় যে, সসম্মানে এবং ভালোভাবে তোমার নাম স্মরণ করা হবে। যে-কোনভাবেই হোক মানুষ তোমাকে স্মরণ করবেই'।

তখন হেসে উঠেছিলো দরবেশ, এবার হেসে উঠলো হাসান।

'আমার কথা শুনে আপনি খুশী হয়েছিলেন, আমিও আপনার কথা শুনে খুশী হয়েছি। জানিনা কেন জানি মন্দের মধ্যেই আমি আনন্দ পাই বেশি।'

একথাই আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম। বলেছিলাম পৃথিবীর দুই শক্তি এক শক্তি হলো খোদার আরেকটা হলো ইবলিসের। খোদার নাম নিয়ে মানুষকে তাদের নির্মল বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয়া খুব সহজ কাজ হবে না। এই কাজকে আমরা এভাবে সহজ করবো যে, দ্বিতীয় শক্তিটা কাজে লাগাবো আমরা। অর্থাৎ ইবলিসী শক্তি....

'হাসান! মন্দের মধ্যে এক চুম্বকীয় শক্তি আছে, আছে আকর্ষণ, চুম্বকীয় স্বাদ এবং ঘোরতর নেশা। এই শক্তি নিহিত আছে তোমার দিল দেমাগে। মানুষের মনে আমরা মন্দের নেশা ধরিয়ে দেবো... তোমার সঙ্গে এই যে মেয়েটি আছে, এ তোমার কাজ আরো সহজ করে দেবে। এর সাথে জাদুবিদ্যার ব্যবহার তো চলবেই। তুমি যে আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছো এটা তো জাদুবিদ্যারই কারিশমা। তখন আমাদের এই বিদ্যার পূর্ণরূপ তোমাকে শিক্ষা দেবো আমরা....

'মানুষের মধ্যে খোদা জন্মগতভাবেই এই দুর্বলতা রেখেছেন যে, সে মন্দের দিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হয়। সে তো ইবলিসই ছিলো, যে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিলো... মানুষকে আমরা দুনিয়াতেই বেহেশত দেখিয়ে দেবো এবং এই কাজটা করবে তুমি'।

ঃ 'দরবেশ বাবা! আমার মনে হয় আর বেশি কথার দরকার নেই। আপনি যা বলছেন এবং বলতে চাচ্ছেন এসব আমার মনে আগ থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আচ্ছা এটা কি ভালো হয় না আপনি আমাকে আমার গন্তব্য পর্যন্ত পৌছে দেবেন যেখান থেকে আমি আমার অভিযান শুরু করতে পারবো!'

ঃ 'কাল সকালে তোমরা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। আর এই মেয়েকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।'

হাসান যেভাবে সেই গিরি-কন্দরের দরবেশের কাছে পৌছলো তা যদিও এক রহস্যময় গল্প মনে হয়, কিন্তু ফেরকায়ে বাতিনিয়া এভাবেই অত্যন্ত গোপনে মাটির নিচে সিঁদ কাটার মতো করে সারা দেশ জুড়ে ফুলে ফেঁপে উঠছিলো। সেলজুকিরা খাঁটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতপন্থী ছিলো। তাই ভিন্ন কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ বা ফেরকার অস্তিত্ব তারা মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে পারতো না। দেশের আনাচে কানাচে তাদের নিয়োজিত গোয়েন্দা-গুপ্তচররা সবসময়ই এদিকে নজর রাখতো। এজন্য ফেরকায়ে বাতিনিয়া মাটির নিচে ঘাঁপটি মেরে তাদের নেতা-পান্ডারা এত গোপনে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায় যে, সূঁচের ভেতরের খবর উদ্ধারকারী গোয়েন্দারাও তাদের এসব চক্রান্তের কিছুই জানতে পারছিলো না।

হাসান ইবনে সবার প্রথম দীক্ষাগুরু আবদুল মালিক ইবনে আতাশ ফেরকায়ে বাতিনীর সাধারণ কোন সদস্য ছিলো না বরং প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম ছিলো।

পরদিন সকালের সূর্য সবেমাত্র পূর্ব আকাশে উঁকি মারছিলো। এমন সময় চার অশ্বারোহী গিরি প্রান্তরের সেই গোলক-ধাঁধা থেকে বের হলো। তাদের রুখ খোরাসানের দিকে। হাসান, ফারহী, গিরিগুহার দরবেশ ও দরবেশের এক শিষ্য–এই চারজন চারটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলো।

সূর্য যখন আরো কিছুটা উঠে এলো আকাশে চার অশ্বারোহী তখন সবুজে ছাওয়া এক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠছিলো। এটা রীতিমতো রাস্তাই মনে হচ্ছিলো যেখান দিয়ে ঘোড়া বা গরুর গাড়ি অনায়াসেই চলতে পারবে। এখানে এসে দরবেশ তার ঘোড়া থামালো। অন্য তিনজনও তাদের ঘোড়া থামালো। তারপর দরবেশ তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো ফেলে আসা পথের দিকে।

'পেছনে ফিরে দেখো হাসান! ফারহী তুমিও' – দরবেশ বললেন।

হাসান আর ফারহী পেছন ফিরে তাকালো। তাদের চেহারার রং পাল্টে গেলো। পাহাড়ের এই উচ্চতা থেকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্ময়ে বাকহারা করে দেয়ার মতো দৃশ্য ওদের থমকে দিলো। যে পাহাড়ের চূড়ায় ওরা দাঁড়িয়ে ছিলো লকলকে কচি ঘাসের ডগা, বিচিত্র ফুল ও অসংখ্য ছোট ছোট বাড়ন্ত গাছে মুড়ানো ছিলো সেটা। পাহাড়ের আঁচল জুড়ে সবুজের প্রাচুর্য আব. দূরে ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ উঠা রূপালী নদীর গায়ে সূর্য যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

জাদুমুগ্ধ প্রকৃতির এ অংশটুকু দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিস্তৃত অনেকটা গোলাকারের গিরিপ্রান্তর প্রণালীর একটা ছিলো। প্রান্তরভাগের কোন কোনটা ছিলো এবড়ো থেবড়ো, কোন কোনটার চূড়া ধনুকের মতো বাঁকানো, কোন কোন চূড়া এমনভাবে ওপরের দিকে উঠে গেছে যেন মানুষের বিশাল বিশাল মূর্তি অনড় দাঁড়িয়ে আছে, অধিকাংশ চূড়াই এমন বৃত্তাকারের যেন এগুলো প্রকৃতির হাতে বড় কষ্টে সৃষ্টি। এসব পাহাড়-চূড়ার মাঝখান দিয়ে দূরে দণ্ডায়মান কয়েক সারি গাছে ছাওয়া এক টুকরো শ্যামল ভূমি দেখা যাচ্ছিলো। ওখানেই দরবেশের ডেরা। ধূসর, কালো, সবুজ বিচিত্র রঙে গন্ধে সাজানো এই পাহাড়ি প্রান্তরের সৌন্দর্যের ঘোর ওদেরকে ভয়ের গভীর জগতে যেন হাতছানি দিচ্ছিলো।

'হাসান! দেখে নাও। ফারহী প্রাণভরে দেখো। আমি আর আগে যাবো না। তোমাদের সাথে এ পর্যন্ত এসেছি শেষ একটি কথা বলার ছিলো বলে। কথাটি বলার মতো জায়গা এটিই। মনে রেখো... মানুষের জীবন সবুজ কচি ঘাস আর ফুলের কোমল পাপড়ির সাচে গড়ে না। কণ্টক-কঠিন অনেক পথ তার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ প্রায়ই এখানে এসে তার সাহস ধৈর্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সফল সেই হয় যে এই কাঁটায় মুড়ানো পথ দিয়ে হেঁটে যেতে পারে.....

'তোমার দীক্ষাগুরু আবদুল মালিক ইবনে আতাশ সোজা পথেও তোমাকে এখানে আনতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে তোমাকে এমন স্বপ্নের ঘোরে নিয়ে গেছেন যেখানে তোমার চোখে এই ভয়ংকর সুন্দরের জগৎ ভেসে উঠেছে। এভাবেই তুমি এই পাহাড়ি পথে আসতে পেরেছো। তোমরা পথ পাচ্ছিলে না। ঐ কালনাগ দুটি তোমাদেরকে তাড়িয়ে আবার সেখানে পৌঁছে দিয়েছে যেখান দিয়ে তোমরা এই পাহাড়ি এলাকায় ঢুকেছিলে। মানুষের জীবনেও এমন সময় বা অবস্থা আসে সে বুঝে উঠতে পারে না মুক্তির পথ কোনটি? নানান সংকট-বিপত্তির পাকতালে পড়ে সে পথ হারিয়ে ফেলে। যেমন তোমরা গোলক-ধাঁধায় পড়ে ছিলে.....

'ঐ গিরিপথের পথচলায় জীবনের দারুণ শিক্ষা রয়েছে। দেখো, কেমন ভয়ংকর এক জায়গা, কুদরত কী স্বচ্ছ জলের টলটলে ঝর্ণার উৎসারণ ঘটিয়েছে, আর মুসাফিরের জন্য কী চমৎকার আশ্রয়! এমন ঝর্ণার ধারে সেই পৌঁছতে পারে যে গিরি-কন্দরকে ভয় পায় না। হোঁচট খেতে খেতে পথের সন্ধান করে যায় এবং মিষ্টি ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছে যায়....

'অনেক দিন ধরে আমরা এখানেই আছি। আমরা জানতাম তোমরা আসছো। আমার লোকেরা তোমাদের ওপর চোখ রেখেছিলো। আগেই তো বলেছি, এই

মেয়েটিকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো আমার লোকেরাই। আমার লোকেরা কখনো এই গোলক-ধাঁধার ভেতর হারিয়ে যাবে না। আমার গুরু যখন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন আমি তখন তোমার চেয়ে অনেক ছোট। তিনি গোলক-ধাঁধার বাইরে থেকে গেলেন, আমার কব্জিতে একটি মোটা সুতা বেধে দিলেন। গুরুর হাতে ছিলো সেই সুতার বড় এক বাণ্ডিল। তিনি বললেন, আমি বাইরে বসে থাকবো,' তুমি ভেতরে যাবে। ভেতরে একটা ঝর্ণা আছে, সেখান থেকে এক ঘটি পানি নিয়ে আসো....

'তিনি আমাকে বললেন, রাস্তায় সুতা ছাড়তে ছাড়তে যাবে আর আমি বাইরে বসে সুতার বাণ্ডিল ঢিলা করতে থাকবো। যদি ক্লান্ত হয়ে যাও বা ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারো, ছেড়ে যাওয়া সুতার চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসবে। দেখো আবার সুতা যেন ছিঁড়ে না যায় তাহলে বাইরে বের হতে পারবে না.... আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। গুরু সুতা ছাড়তে লাগলেন....এই কাহিনী অনেক দীর্ঘ। ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছতে যে কী দশা হয়েছিলো সে অনেক কথা। হোঁচট খেতে খেতে পড়তে পড়তে পা দুটি অবশ হয়ে গেলো। চোখে অন্ধকার নেমে এলো। তবুও আমি সাহস হারালাম না। মনের জোরে পা চালাতে লাগলাম .....

'আস্তে আস্তে যেন আমি চেতনাশূন্য হতে লাগলাম। হারিয়ে যেতে লাগলাম গভীর অন্ধকারে। কতক্ষণ পর হুঁশ ফিরেছে বলতে পারবো না। চোখ খুলতেই বিস্ময়ে থ' খেয়ে গেলাম। দেখলাম ঝর্ণার ধারে পড়ে আছি আমি। কী আশ্চর্য। লাফিয়ে উঠলাম। হাতে যে মাটির ঘটিটা ছিলো সেটা ভেঙ্গে গেছে তখন। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় বোধ হয় সেটি পাথরে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিলো....

'কাপড় চোপড়সহই আমি ঝর্ণার পানিতে নেমে পড়লাম। এটা করলাম আমার গুরু যাতে নিশ্চিন্ত হন যে আমি ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। আপাদমস্তক সিক্ত হয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। পথ চেনার জন্য আমার ফেলে আসা সুতার চিহ্ন তো ছিলোই। সূর্যের শেষ লালিমা তখনো মিলিয়ে যায়নি ...

'আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার গুরুর সামনে। তাকে সব খুলে বললাম। আরো বললাম ঘটি ভেঙ্গে গেছে বলে ঝর্ণার পানিতে নেমে নিজেকে ভিজিয়ে নিয়েছি। গুরুর মুখে ছিলো তখন বিজয়ের হাসি....

'আমার গুরু আমাকে যে তালিম দিয়েছিলেন আমিও তোমাকে সেই তালিম দিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেছিলেন মানুষের জীবনের ঝর্ণা নিজে নিজে চলে এসে সামনে দাঁড়ায় না। মানুষকেই বহুপথ মাড়িয়ে ঝর্ণার ধারে পৌঁছতে হয়। জীবনের সুখঝর্ণা তাকেই স্বাগত জানায় যে তার সন্ধানে কাঁকর বিছানো উপত্যকা, সুখনো খটখটে ভয়ংকর গিরিপথের গোলক-ধাঁধা ও কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দেয় এবং তার অটুট পা স্খলিত হতে দেয় না....

'তোমার কব্জিতে যে সুতা বেঁধে দিয়েছিলাম এটাকে নিছক সুতাই মনে করো না। এটা মানুষে মানুষে বন্ধনের একটি প্রতীক। মানুষে মানুষে বন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। তুমি যখন একা তখন তুমি কিছুই নও। তুমি যখন একলা হয়ে যাবে তখন মনে

করবে তোমার অস্তিত্বই খতম হয়ে গেছে। সবসময় লক্ষ্য রেখো, সম্পর্কের এই সুতা কখনো যেন ছিঁড়ে না যায়। সুতাটি যদি ছিঁড়ে যেতো তোমার আমার সম্পর্কও টুটে যেতো এবং এই গোলক-ধাঁধা থেকে কখনই তুমি বের হতে পারতে না....

এটাই শেষ সবক, তোমার কাছে যা আমার পৌছানোর ছিলো। হাসান! দৃঢ়পদ থেকো। দুর্গ জয় করতে হবে তোমাকে সৈন্যবহর ছাড়াই। মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতাগুলো নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে হবে। মানুষের ওপর নেশা বিস্তার করো। সম্পদ আর নারী এই দুই জিনিস মানুষকে নেশায় পাগল করে তোলে। আরো কতো নেশার উপকরণ আছে। নেশার জিনিসের অভাব নেই হাসান! শয়তানী স্বভাব-গুণের মধ্যে বড় এক শক্তি আছে। তোমাকে একটা ভেদের কথা বলি, খুব কম লোকই আছে যারা নিজের ফরজ আমলগুলো খোদার ইবাদত মনে করে নামায রোযা পালন করে। সাধারণ লোকেরা তো নামায পড়ে শুধু পরকালে বেহেশত পাবে বলে, পরমা সুন্দরী হুরপরী আর মদীর সুরা উপভোগ করবে-যেখানে ভোগবিলাস ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না'....।

'ঐসব লোকদের আমি দুনিয়াতেই বেহেশত দেখাবো' – হাসান বললো দৃঢ় গলায়।

'জিন্দাবাদ হাসান! এখন রওয়ানা হয়ে যাও। আমি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি...আল বিদা'।

'আল বিদা'।

দু'দিন পথ চলার পর হাসান ইবনে সবা ফারহী ও পথ দেখিয়ে আনা লোকটিকে নিয়ে ইরানের যে কেল্লায় ঢুকলো সেটা ছিলো কেল্লা ইসফাহান। লোকে বলে একে কেল্লা শাহদর। সেলজুকি সুলতান মালিক শাহ এটা নির্মাণ করিয়েছেন এবং এখানকার আমীর নিযুক্ত করেন যাকির নামে এক লোককে। যাকির সেলজুকিদের মতোই খাঁটি মুসলমান এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

ভেতরে শহর গড়ে উঠার মতো কেল্লাটি এত বড় নয়। কেল্লার ভেতর যে আবাদী আছে তারা মূলতঃ সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত ঘরনার লোক। কেল্লার বাইরে যে গ্রাম রয়েছে তাতে বেশ কিছু বাতিনী থাকে। তবে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে চলে ওরা।

যাকির পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়। তার স্ত্রী দু'জন। দু'জনই চল্লিশোর্ধ। চলাফেরায় যাকির বিলাসী নন। নামায রোযার প্রতি বেশ মনোযোগী। কিন্তু স্বভাবজাত মানবীয় দুর্বলতা কোন মানুষের মধ্যে নেই!

একদিন তিনি সবুজ বন-বৃক্ষে ছাওয়া এক জঙ্গলে হরিণ শিকারে গেলেন। চারদিকের সবুজের বাহার দেখে তার মন উদাস হয়ে গেলো। বনের দু'পাশ দিয়ে স্বচ্ছ পানির বয়ে চলা দুই নদী যেন বনের গায়ে রুপার জরি লাগিয়ে দিয়েছে।

ঘোড়ায় চড়ে যাকির নদীর তীর ধরে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে যাচ্ছিলো তার দুই সঙ্গী ও চার দেহরক্ষী। ওদের থেকে যাকির কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। নদী একদিকে বাঁক নিয়েছে। বাকের আশেপাশে নানান জাতের গাছের ঝোপ। একেবারে কাছে দুটি গাছ পরস্পরের ঘন ডালে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেন কোন টিলার পাতাময় একটি গুহা। গাছ দুটিই অচেনা। গাছের ওপরের দিকের কাণ্ডে মোতিয়া ফুলের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ সুগন্ধি ফুল ঝুলে আছে। নিচে কঁচি ঘাসের গালিচা।

যাকির সেখানে গিয়ে ঘোড়া থামালেন। প্রথমে তার চেহারায় পেরেশানীর ভাব ফুটে উঠলো। তারপর সেটা মিলিয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

ছাউনির মতো ছড়িয়ে থাকা গাছের একটি শাখার নিচে ষোল সতের বছরের একটি মেয়ে বসা ছিলো তখন। মেয়েটির কোলে টুকটুকে একটি হরিণের বাচ্চা। হরিণের বাচ্চার মতোই মেয়েটির চোখ দুটি কালো, মোহিনী, কেমন নেশাতুর। চেহারা সুবাসিত ফুলের মতো হাসছে যেন। রেশম কোমল চুলের বেণী থেকে দু' তিনটা চুল তার লালাভ-শুভ্র মুখে যেন আদর দিচ্ছে।

'এই মেয়ে! বাচ্চাটি কোত্থেকে এনেছো?' – যাকির জিজ্ঞেস করলেন।

'জঙ্গলে অনেক দিন ধরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলো–হয়তো ওর মাকে খুঁজছিলো' – মেয়েটি একা একটি পুরুষের সামনে পড়ে মোটেও বিচলিত না হয়ে জবাব দিলো।

'দাঁড়িয়ে কথা বলো মেয়ে! আমীরে কেল্লার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও' – এক দেহরক্ষী কাছে এসে ধমকে উঠলো।

যাকির সেই দেহরক্ষীর দিকে রাগত চোখে তাকালেন।

'তোমরা সবাই এগিয়ে যাও। পুলের কাছে গিয়ে আমার অপেক্ষা করো'– যাকির তার সঙ্গী ও দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিলেন।

মেয়েটির চেহারা ভয়ে ছেয়ে গেলো। সে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো। যাকির ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েটির কাছে এসে হরিণের বাচ্চার দিকে হাত বাড়ালেন। সে বাচ্চাটি পেছনে সরিয়ে নিলো। ওর ঠোঁটে যে হাসির ঝিলিক ছিলো সেটা গায়েব হয়ে গেলো। হরিণ শাবকের চোখেও ভয়ের ছায়া পড়লো। যাকির তার বাড়ানো হাত পেছনে সরিয়ে নিলেন।

'ভয় পেলে কেন মেয়ে? ওই বদবখতটাই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এই হরিণের বাচ্চাটিকে এবং তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তাই এখানে ঘোড়া দাঁড় করিয়েছি। আমি যদিও আমীরে কেল্লা তাই বলে তোমার ওপর কোন হুকুম জারী করবো না।'

'হরিণের বাচ্চাটি আমি দেবো না।'

'এটি তোমার কাছ থেকে নেবোও না আমি' – যাকির তার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

'যিররী'।

'হরিণ শাবকটিকে বুঝি খুব ভালোবাসো?' – মেয়েটির জবাবের অপেক্ষা না করে যাকির নিজেই বললেন– 'আসলে ওর মুখটি এমন মায়া মায়া। যেই দেখবে তারই ভালো লাগবে।'

'না আমীর! এটা অবশ্যই দারুণ ফুটফুটে-মায়াকাড়া। কিন্তু ওকে আমার ভালো লাগছে অন্য কারণে। আপনাকে বলেছিলাম এটা মাতৃহীন হয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ওকে দেখে আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে, যখন আমিও জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলাম আর আমার মাকে খুঁজে ফিরছিলাম।'

যাকির মেয়েটির ব্যাপারে এমন ডুবে গেলেন যে, তার অজান্তেই মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে ওকে বসিয়ে দিলেন। নিজেও পাশে বসে পড়লেন। যিররী তার পাশ থেকে সরে গেলো না, চেষ্টাও করলো না।

'তারপর তোমার মাকে কোথায় পেলে?'

'মায়ের দেখা আজো পাইনি। আমার বয়স তখন তিন চার বছর হবে। ছোট একটি কাফেলার সঙ্গে আমরা যাচ্ছিলাম। আমার মা বাবা খুব গরীব ছিলেন। ওদের জীবন কেটেছে যাযাবরি করে পথে জঙ্গলে। খুব সামান্য যখন বুঝতে শিখলাম তখন আমাকে নিয়ে ওদেরকে পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরু-বিয়াবানে ঘুরতে ফিরতে দেখেছি, দেখেছি আজ এখানে ডেরা ফেলছে কাল ওখানে।'

'তুমি ওদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলে কিভাবে?'

'চারদিক কালো করে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। কাফেলার সবাই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থায় পড়ে দল-ছিন্ন হয়ে পড়লো। কয়েকটি ঘোড়া আর দু'তিনটি উট ছিলো। সবগুলো যে কোথায় গায়েব হয়ে গেলো! আমার ছিলো আরো চার ভাইবোন। কারো কোন চিহ্ন রইলো না কোথাও। যে যেদিকে পারলো ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলো। বাতাসের বেগ ক্রমেই এতো তীব্রতর হতে লাগলো যে, আমার পলকা দেহ বাতাসের কাছে যিম্মী হয়ে পড়লো। ঝড় আমাকে নিয়ে দাপাদাপি শুরু করলো। আমার জীবন তখন ঝড়ের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর....

'সেটা মনে হয় নদী ছিলো না নদীর জলোচ্ছ্বাস থেকে তৈরী পানির কোন তরঙ্গ ছিলো– আমাকে সেটা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। আমি চিৎকার করলাম, মাকে ডাকলাম, কিন্তু ঝড়ের গর্জন এতো তীক্ষ্ণ ছিলো আমার ডাক-চিৎকার সব মাটি হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো সেটা ভয়ংকর কোন স্বপ্ন। পুরো এখন বলতে পারবো না। এতটুকু ভালো মনে আছে, আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। দুটি হাত আমাকে পানি থেকে তুলে নিলো, তখন আমি চেতন-অচেতন এর মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এতটুকু খেয়াল আছে এক বৃদ্ধ আমাকে তার বুকে তুলে নিয়েছিলেন, আমি যেমন এই বাচ্চাটিকে নিজের কোলে উঠিয়ে রাখি। এ কারণে কয়েকদিন আগে যখন জঙ্গলে এই হরিণ শাবকটিকে দেখলাম তখন ওকে বুকে উঠিয়ে নিলাম। ওকে আমি আমার হাতে দুধপান করাই।'

'সেই লোকটিই কি তোমাকে পেলে পুষে বড় করেছে? নাকি তুমি তোমার পরিবারের খোঁজ পেয়েছিলে?'

'না আমীর! ওদেরকে কোথায় পাবো আমি? আমাকে সেই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ তার মেয়ের মতো করে লালন পালন করেছেন। এখন ওঁকেই আমি আমার বাবা আর তার স্ত্রীকে আমার মা মনে করি। ওঁদের কাছ থেকে আমি অনেক আদর সোহাগ পেয়েছি। এমন সুখের জীবন পেয়েছি... যেন এক শাহজাদী আমি।'

'কে তিনি?'

'আহমদ ইবনে শুতাশ। কেল্লার বাইরে থাকেন। ধর্মীয় নেতা এবং পাক্কা আহলে সুন্নত।'

যিররীর বলার ভঙ্গিটা এমন নির্দোষ সরল যে, যাকির এবার ওর মধ্যে যেন হারিয়ে গেলেন। তিনি যে একজন কেল্লাদার সেটা ভুলে গেলেন। যিররীর কঁচি রূপ, ওর জীবনের মায়াময় গল্পে যাকিরের মন আবেগে জেগে উঠলো। তিনি যিররীর সাথে এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করলেন যেন দু'জনে সমবয়সী নারী-পুরুষ। যিররীর মধ্যে এত সরলতা ছিলো যে, সে ছোট্ট কিশোরীর মতো যাকিরের সঙ্গে আচরণ করতে লাগলো।

যাকির হাত বাড়িয়ে একটি গাছ থেকে সুগন্ধী একটি ফুল ছিঁড়ে নিলেন।

'যিররী! এই ফুল আমার খুব পছন্দ। এটি তুমি নিয়ে নাও' – যাকির আবেগে বললেন।

যিররী ফুল নিলো এবং ছোট বাচ্চার মতো খিল খিল করে হাসতে লাগলো। তার হাসি থেকে যেন জলতরঙ্গের রিনি ঝিনি সঙ্গীত বেজে উঠলো।

'যিররী! বলো তো ফুলটি কি তুমি মন থেকে গ্রহণ করেছো?'

'কেন নয়? পছন্দের জিনিস কে না গ্রহণ করে?'

'তাহলে কি আমার ঘরে যেতে পছন্দ করবে?' – যাকির কিছুটা উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।'

'সেটা কেন?'

'আমি তোমাকে সবসময় আমার কাছে রাখবো। তোমাকে আমার জীবন-সাথী বানাতে চাই।'

'তাহলে আমি কেন যাবো? আপনি কেন আসবেন না?' – যিররী হাসতে হাসতে বললো।

'না যিররী! তুমি এতো ভালো যে, আমার কথা বুঝতে পারছো না। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে উঠাতে চাই আমি। ঐ ফুলের মতোই তোমাকে আমার প্রিয় মনে হচ্ছে।'

'ফুল তো কারো কাছে হেঁটে যায় না। ফুলপ্রেমিক নিজেই ফুলের কাছে হেঁটে যায় এবং কাঁটার আঘাত সয়ে ফুল ছিঁড়ে নেয়। আপনি যে আমাকে এই ফুলটি দিয়েছেন হাত বাড়িয়ে ফুলটি নিয়েছি। আপনি যদি কোন ফুলকে আপনার কাছে আসার হুকুম দেন তাহলে কি সে আপনার হুকুম মানবে?'

যাকির হো হো করে উঠলেন। হাসতে হাসতে যিররীকে বাহুর বেষ্টনীতে নিয়ে তার কাছে টেনে নিলেন। যিররী বাঁধা দিলো না।

'তুমি যেমন সুন্দরী তেমন বুদ্ধিমতিও। এখন তো আমি যেকোন মূল্যে তোমাকে অর্জন করবো।'

'আর আমি যেকোন মূল্যে আপনার কাছ থেকে পালাবো' – যিররী আগের মতোই খোশকণ্ঠে বললো।

'কেন কেন'?

'আমি কত রাজা বাদশার কাহিনী শুনেছি। আপনার মতো আমীররা তো বাদশার মতোই। রাজা বাদশারা আমার মতো মেয়েদের প্রতি এমন মুগ্ধ হয়ে সোনা রুপা দিয়ে ওজন করে নিজেদের হেরেমে ঢুকিয়ে নেয়। তারপর যখন আবার আরেকটি মেয়ের সন্ধান পায় তখন আগেরজনকে হেরেমের পোড়া ঘরে নিক্ষেপ করে। আমি বিক্রি হতে চাই না আমীরে কেল্লা! হ্যাঁ, তবে আপনার সিপাহীরা যদি জোরজবরদস্তি করে উঠিয়ে আমাকে আপনার মহলে পৌঁছে দেয় তাহলে আমি কিছুই করতে পারবো না। আমার বুড়ো বাপ আহমদ ইবনে গুতাশ চোখের পানি ফেলা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। একে তো তিনি বৃদ্ধ তারপর আলেমে দ্বীন। সম্ভবত তিনি তলোয়ারও চালাতে পারেন না।'

'না যিররী! আহমদ ইবনে গুতাশের মতো আমিও সুন্নী মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কি তুমি কখনও রাজা বাদশার প্রচলন দেখেছো? তা ছাড়া আমি তো এই দেশের শাসকও নই। সেলজুকি সুলতানের কর্মচারী আমি। হুকুমত হলো সুলতান মালিক শাহের। তিনিও নিজেকে বাদশাহ মনে করেন না। আমার কোন হেরেমও নেই। বিগত যৌবনা দুই স্ত্রী আছে আমার। ওরা তোমার দেখভাল করবে, তোমাকে দেখে খুশীও হবে ওরা।'

একের অধিক বিয়ের প্রচলনটা মূলত আরব সামর্থবান পুরুষদের মধ্যে বেশি। অনেক উচ্চ বংশীয় বিলাসী পরিবার– যারা ধর্মকর্ম থেকে দূরে– তাদের মধ্যে এই প্রচলন ছিলো যে, স্ত্রী তার সুন্দরী বান্ধবীকে এক আধ রাতের জন্য স্বামীকে উপহারস্বরূপ দিচ্ছে।

সেলজুকিরা তুর্কী। মুসলমান হওয়ার পর ধর্মীয় জীবনে ওরা নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে নেয়। নিয়ম করে নেয় কেউ অধিক স্ত্রী রাখতে চাইলে সর্বোচ্চ চার স্ত্রী রাখতে পারবে। হেরেম বা অন্দরমহলীয় নোংরা যৌনচর্চা আরবদের মতোই ওরা ঘৃণার চোখে দেখে।

যিররী যখন শুনলো যাকিরের স্ত্রী দু'জনই বিগত যৌবনা তখন তার এই ভাবনা হলো না যে, তারা দু'জন তার সতীন হবে।

'জোর করে তোমাকে নেবো না আমি। না সোনা রুপার পাল্লায় তোমাকে ওজন করাবো। ইসলামী আইনে তোমাকে বিয়ে করবো। সিদ্ধান্ত এখন তোমার হাতে।'

'তাহলে সেই গাছের কাছে যান যার ফুলটি ছিঁড়তে চাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ যিররী! তোমার কথা বুঝেছি আমি। আহমদ ইবনে গুতাশের সাথে আমি কথা বলবো। আরেকটি কথা তোমাকে বলে রাখছি, প্রথমে যদিও তোমার নিষ্পাপ সৌন্দর্য আমাকে আকৃষ্ট করেছিলো কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও।

আমি যে বলেছিলাম যেকোন মূল্যে তোমাকে আমার চাই তা বলেছিলাম আমি এই কেল্লার হাকিম বলে। তোমার মতো এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকলে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। প্রশাসনিক চিন্তা ভাবনায় তুমি সাহায্যও করতে পারবে।'

'আমার বাবার সাথে কথা বলুন – যিররী গম্ভীর গলায় বললো– 'আপনাকে আমি প্রত্যাখ্যান করিনি কিন্তু বলে দিচ্ছি আমি ধন চাইনা, প্রেম চাই ভালোবাসা চাই।'

যাকির যিররীর একটি হাত তার হাতে নিয়ে আলতো করে চাপ দিলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'যিররী! – যাকির গম্ভীর গলায় বললেন– 'রাজা-বাদশাদের মতো আমার চরিত্র হলে দিনার দিরহামের স্তূপ তোমার পায়ে এনে রাখতাম। কিন্তু না, ভালোবাসা দিয়ে আমি ভালোবাসা কিনতে চাই।'

যাকির ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। নদীর পুলের ধারে তার দেহরক্ষী ও সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিলো।

'একটা কথা মন দিয়ে শোন' – সবার উদ্দেশে যাকির বললেন– 'সামনে কোন হরিণ দেখলে আমাকে অবশ্যই বলবে সেটা হরিণী না হরিণ। কেউ যেন কোন হরিণীকে না মারে। কারণ তার কোন বাচ্চাও থাকতে পারে।'

৮

যাকির শিকার থেকে ফিরে এলেন। সেদিন একটি হরিণই শিকার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও আরো বড় শিকার তিনি সেদিন খেলে এসেছেন। সেই শিকার ছিলো আধফোটা ফুলের মতো নিষ্পাপ যিররী।

যিররী ওদের গ্রামের কথা বলেছিলো কেল্লা থেকে সামান্য দূরেই। সেখানে এসে যাকির ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। সঙ্গের একজনকে বললেন আহমদ ইবনে গুতাশ নামে এখানে একজন আলেম আছেন তাকে আমার সালাম পৌঁছে দাও।

লোকটি গ্রামের একটি গলির মতো রাস্তায় ঘোড়া নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটু পর ফিরে এলো। সঙ্গে এলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা আলখেল্লায় ঢাকা এক লোক। মাথায় তার সেলজুকি টুপি, টুপির ওপর কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত সাদা রুমাল। পোশাকের মতোই ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি। তাকে আসতে দেখেই যাকির ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন। দৌড়ে গিয়ে আগন্তুক পর্যন্ত পৌঁছলেন। ঝুঁকে তাকে সালাম করলেন। তারপর হাঁটু ছুয়ে করমর্দন করলেন।

'আহমদ ইবনে গুতাশ?'

'হ্যাঁ আমীরে কেল্লা! আমিই আহমদ ইবনে গুতাশ। আমার জন্য কোন হুকুম?'

'কোন হুকুম নয় শ্রদ্ধেয় আলেম! একটা অনুরোধ...আজ রাতের খাবার যদি আমার ওখানে খাওয়ার কথা বলি তাহলে কি পছন্দ করবেন আপনি?'

'কি সৌভাগ্য! অবশ্যই আসবো...মাগরিবের নামাযের পর।'

যাকির আরেকবার ঝুঁকে তার সঙ্গে করমর্দন করে ফিরে এলেন।

মাগরিবের নামাযের পর আহমদ ইবনে গুতাশ যাকিরের দস্তরখানায় উপস্থিত হলো। খাওয়ার ফাঁকে যাকির আহমদ ইবনে গুতাশকে অনুরোধের সুরে জানালেন, তিনি তার মেয়েকে বিয়ে করতে চান। যিররীর সঙ্গে কোথায় কিভাবে দেখা হয়েছে তাও জানালেন। আরো জানালেন যিররী তাকে বলেছে সে কিভাবে আহমদ ইবনে গুতাশের মেয়ে হয়েছে।

'আল্লাহ আমার দুআ কবুল করেছেন' – আহমদ ইবনে গুতাশ দু' হাত আকাশের দিকে তুলে বললো– 'ওকে এতটুকু শিশু থাকতে এক ঝড়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছি। বড় মমতা দিয়ে ওকে লালন পালন করেছি। আমার প্রার্থনা ছিলো ওর জীবন যেন যাযাবরের মতো ছন্নছাড়া না হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যত যেন হয় ওর। যদি আপনার উপযুক্ত মনে করেন ওকে তাহলে আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের আর কি হতে পারে।'

কয়েকদিন পর যিররী বধূ সেজে যাকিরের ঘরে গিয়ে উঠলো। যাকিরের দুই স্ত্রী বেশ যত্ন করে ওকে বরণ করে নিলো। যিররীর জন্য যাকির দু'জন খাদেমা নিযুক্ত করে দিলেন।

'আমার কোন খাদেমা চাকরাণীর প্রয়োজন নেই। আমি আমার কাজ নিজ হাতে করতে চাই। আমি দেখেছি রাতে আপনাকে এক খাদেমা দুধ দিয়ে যায়। কাল থেকে এই দুধ আমি নিজেই তৈরী করে আনবো। আমি জানি মধু মিশিয়ে আপনি দুধ পান করেন।'

পঞ্চাশ বছরের যাকির অভিভূত। তিনি ভাবেননি সতের বছরের এমন এক সুন্দরী মেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে রাতের দুধ তুমিই নিয়ে এসো।

আরো কয়েকদিন পর যিররী যাকিরকে বললো, যে মানুষটা মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন, সমস্ত আদর-ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন তাকে ছাড়া এখন সবকিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। যাকির আহমদ ইবনে গুতাশকে ডেকে এনে বললেন, সে যেন মাঝেমধ্যে এখানে এসে কিছু সময় থেকে যায়।

যাকিরের জীবন জুড়ে এখন শুধু যিররী আর যিররী। যাকিরের সামান্যতম সন্দেহও হলো না যে, আহমদ ইবনে গুতাশ চাইছেই যে করে হোক যাকিরের ঘরে যেন তার যাতায়াত অবাধ ও স্থায়ী হয়ে যায়। তখনই তো সে তার আসল কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবে। অনুমতি পাওয়ার পর পথ পরিষ্কার হয়ে গেলো। আহমদ সময় অসময়ে যাকিরের ঘরে গিয়ে হানা দিতে লাগলো।

আহমদ যে কট্টর বাতিনী পন্থী এবং ফেরকায়ে বাতিনীর ভয়ংকর এক লিডার যাকিরের এ সন্দেহ করার ক্ষমতাও ছিলো না। আহমদ তার মহল্লার মসজিদের খতীব ছিলো। সবাই জানতো সে আহলে সুন্নত।

যাকিরের ওপর একদিকে সদ্য যুবতী এক মেয়ে তার রূপের মায়াজাল বিস্তার করে তাকে তার হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয় অন্যদিকে আহমদ ইবনে গুতাশ তার

ফেরকার অন্তরালে থেকে তার মুখের জাদু চালাতে শুরু করে। যাকির এতে দারুণ প্রভাবান্বিত হন। এমনকি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার পরামর্শ নিতে শুরু করেন। যিররী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো। এ দিয়ে সে যাকিরকে সম্মোহন (হিপ্টোনিজম) করতে শুরু করে।

যিররীর হাতে যাকিরকে প্রতিদিন দুধ পান করানোর ব্যাপারও আহমদ ইবনে গুতাশের নির্দেশে হচ্ছিলো। দুধে প্রতিদিন এমন কিছু মেশানো হতো যার প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেতো না। ভেতর ভেতর সেটা কাজ করে যেতো। এতে কিছু নেশা উৎপাদক জিনিসও থাকতো। দুধ পান করার পর যাকিরের মেজায এমন ফুরফুরে হয়ে যেতো যে যিররীর সঙ্গে তিনি সমবয়সীদের মতো নানান খেলায়- হাস্যরসে মেতে উঠতেন।

একবার যাকিরের এক স্ত্রী দেখে ফেললো যিররী দুধে কি যেন মিশাচ্ছে। যিররীকে এটা জিজ্ঞেস করতেই সে দৃঢ় গলায় বললো, আমি কিছুই মিশাইনি। যাকিরের সেই স্ত্রী যাকিরকে সে কথা জানিয়ে বললো, যিররী বোধ হয় দুধে ক্ষতিকর কিছু মিশাচ্ছে। যিররীর বিরুদ্ধে প্রায় বুড়িয়ে যাওয়ার স্ত্রীর মুখে একথা শুনে যাকির তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তবে তার সেই স্ত্রীকে তালাক দিলেন না, মহলের এক অন্ধকার ঘরে নির্বাসন দিলেন এবং কয়েকদিনের জন্য তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সব সম্পর্ক শেষ করে দিলেন। আর যিররীকে করে নিলেন তার আরো কণ্ঠলগ্ন।

বেশি দিন নয়, তিন মাসের মাথায় যাকির শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। কিন্তু তার রোগটা কি বা তার কষ্টের ধরনটা কি তিনি তা বলতে পারতেন না। ডাক্তাররা সব ডাক্তারী বিদ্যা প্রয়োগ করেও তাকে উঠে বসার মতো উপযুক্ত করে তুলতে পারলেন না।

শয্যাপাশে আহমদ ইবনে গুতাশ ও যিররী সবসময় থাকতো। জীবন মরণের এই দোদুল্যমান অবস্থায় রোগীর পাশে যারা থাকে, আন্তরিকতার ভাব নিয়ে সেবা করে এবং তাকে সবসময় ভালো হয়ে যাবেন ভালো হয়ে যাবেন বলে অভয় দেয়, রোগীর চোখে তারা হয়ে যায় ফেরেশতা।

মাঝে মধ্যে আহমদ তার কাছে বসে বড় মধুর কণ্ঠে কুরআন পড়তো। যাকির এতে কিছুটা আরাম পেতেন।

যাকির একদিন প্রায় নিশ্চিত গলায় বললেন তিনি আর বাঁচবেন না। সময় বেশি নেই। তারপর সুলতান মালিক শাহের কাছে আহমদ ইবনে গুতাশের জ্ঞান-বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে চিঠি লিখে জানালেন, তার জীবনের সর্বশেষ বাসনা হলো আহমদ ইবনে গুতাশকে এই কেল্লার আমীর নিযুক্ত করা। শেষ পর্যন্ত যাকির তাকে সুন্নী-সাধু বলেই বিশ্বাস করে গেছেন। এর দু'চার দিন পরই তিনি চোখ বুজলেন।

সুলতান মালিক শাহের কাছে তার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে তিনি সর্বপ্রথম এই হুকুম জারী করেন যে, কেল্লা শাহদরের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশ।

সেলজুকিরা যখনই শুনতো অমুক লোক ইসমাঈলী বা বাতিনী সন্ত্রাসী তখনই তাকে কয়েদ করতো। এজন্য বাতিনীরা নিজেদেরকে সুন্নী বলে প্রকাশ করতো আর

গোপনে তাদের ধ্বংস কার্য চালিয়ে যেতো। সে কারণে অনেক বাতিনীকেই কয়েদ করা হয়েছিলো। আমীরে কেল্লা হওয়ার পর আহমদ প্রথম কাজ যেটা করলো সেটা হলো, সমস্ত বাতিনী কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়া। বাতিনীদের ওপর যেসব বিধিনিষেধ ছিলো তাও রহিত করে দেয়া হলো।

এর কয়েক দিন পর থেকে বিভিন্ন কাফেলা ও যাত্রীদলকে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের কবলে পড়তে শোনা যেতে লাগলো। ক্রমেই কাফেলা ডাকাতি বাড়তে লাগলো। এর দ্বারা বাতিনীরা তাদের মিশনের জন্য বড় ধরনের তহবিল গঠন করতে চাচ্ছিলো।

এই কেল্লা শাহদরেই হাসান ইবনে সবা ও ফারহী পৌঁছে। ওদেরকে আমীরে কেল্লার মহলে নিয়ে যাওয়া হয়। আহমদ খবর পেয়ে তখনই ওদেরকে অন্দর মহলে নিয়ে যেতে বলে।

'আরে নওজোয়ান!' – আহমদ তার বৈঠকখানায় হাসান ও ফারহীকে দেখে বলে– 'আমি তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। আজ বিশ্রাম করো। কাল সকালে তোমাকে জানানো হবে তোমার কি কাজ এবং এ পর্যন্ত কতটুকু কি হয়েছে।'

হাসান ঝুঁকে পড়ে ওকে সালাম করলো, তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো। এই নিরাপদ সুন্দর শান্তির দেশটিতে যে শয়তান নেমে এসেছে সুলতান মালিক শাহ তা বিলকুল টের পেলেন না।

৯

হাসান ইবনে সবা সেখানে পৌঁছে গেলো যেখানে তার জীবন সফরের সঙ্গী হলো ইবলিস।

হাসান তো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। স্রেফ একজন মানুষতো। সেলজুকি সালতানাতের এক প্রজা। যার পরিচয় অতি সাধারণ অখ্যাত লোক ছাড়া কিছুই নয়। সে কোন গোত্র সরদার নয়। তার কাছে কোন ফৌজও নেই, এমন দু'চারজন মানুষও তার নেই যারা তীরন্দাযি, তলোওয়ার চালনা ও অশ্বারোহী হিসেবে দক্ষ। সে নিজেও তো এসব কিছু নয়।

তার কাছে একটা শক্তিই আছে, তা হলো ইবলিসি–শয়তানী শক্তি।

হাসান জানতো মুসলমান এখন আর সেই মুসলমান নেই। এক সময়কার মুসলমান এমন ছিলো, পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যকে যারা পায়ে পিষ্ট করে সেখানে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করে। মুসলমানরা তখন যেদিকে রুখ করতো দুর্গের পর দুর্গ বিনা লড়াইয়ে তাদের পায়ে আছড়ে পড়তো। মুসলমানরা তখন ভূরাজ্য নয় মানুষের হৃদয়-রাজ্য জয় করতো। কিন্তু আজকের মুসলমানরা শয়তানী শক্তির কবলে বন্দী। কোথাও না কোথাও তাদের পাইকারী হত্যা চলছে। মুসলমানদের কব্জা করা এখন তো জলভাত।

কিন্তু হাসান এটা জানতো না মুসলমানরা নিহত থাকবে ঠিক তবে ইসলাম চিরঞ্জীব-সবসময় চিরঞ্জীব থাকবে। চেরাগদানেরতো সলতে জ্বলে তবে চেরাগদানটি উজ্জ্বল আলোয় ভাস্বর হয়ে থাকে।

দুনিয়ায় যদি একজন মুসলমানও জীবিত না থাকে, শুধু গর্ভস্ফীত কোন নারী কোন গিরি কন্দরে লুকিয়ে থাকে, তার গর্ভজাত সন্তানই ইসলামের অনির্বাণ মশাল বিশ্বময় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

হাসান মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলো। নবী বলে আত্মপ্রকাশ করার কথা অনেক আগ থেকেই সে তার মনে লালন করে আসছিলো।

তার মনে পড়লো ইসলামের প্রথম শতকের মিথ্যা নবীর দাবীদার সাজ্জাহ বিনতে হারিস তামীমার কথা। সে ছিলো বনু তামীম গোত্রের সরদার ঘরনার মহিলা। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বি। দজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী এলাকায় থাকতো। যেটাকে আলজাযীরা বলা হয়। যৌবনবতী রূপসী ছিলো সে। বনু তামীমে ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে যে ছিলো না এমন নয়। কিন্তু ওর দৈহিক রূপ অঙ্গভঙ্গি যেই দেখতো সেই জাদুমন্ত্রের মতো তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাইতো। ওর সব রূপ প্রকাশ পেতো সে যখন কথা বলতো। কথা বলার সময় তার হাত নাড়ানো, ঘনঘন চোখের পলক ফেলা, অন্তর্ভেদী চাহনি যে কারো হৃদয় তোলপাড় করে ছাড়তো।

কোন সাধক বা ইবাদতগুজার যখন তার সামনে এসে বসতো সে তাদের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলতো, সে সাজ্জাকে তার চেয়েও বড় সাধক ভাবতো এবং তার অনুরক্ত হয়ে উঠতো। কোন বিত্তশালী ওর কাছে আসলে এই মেয়েকে তার মতোই বিত্ত বৈভবের অধিকারী মনে করে তার সামনে অর্থ সম্পদের স্তুপ ফেলে যেতো। তবে তাকে সে তার দেহ স্পর্শ থেকে শতহস্ত দূরে রাখতো। তবুও সেই লোক তার ইশারায় নাচতে প্রস্তুত হয়ে যেতো।

আমীর হোক ফকীর হোক, ভালো লোক হোক মন্দ লোক হোক সাজ্জাকে সবাই নিজেদের প্রতি সহমর্মী ভাবতো।

সাজ্জা নাকি গণক ও জ্যোতিষ ছিলো। ভবিষ্যত বলতে পারতো। সেটা ছিলো আত্মপূজার যুগ। গণক-জ্যোতিষদের দেখলে মানুষ সিজদায় পড়ে যেতো। তাকে তার ভবিষ্যত জিজ্ঞেস করতো। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস–জ্যোতিষরা মন্দভাগ্য বদলে দিতে পারে।

সাজ্জার রূপের জাদু কথার জাদু তো ছিলোই, তারপর সে ছিলো কুমারী। বড় বড় জায়গীরদার বিখ্যাত সব ব্যবসায়ী – শত শত উটের পিঠে করে যাদের অর্থকড়ির আমদানী ঘটতো তারা সাজ্জার পানি প্রার্থনায় ব্যাকুল ছিলো। সাজ্জাও তার আঁচল বিছিয়ে রাখতো, কাউকে হতাশ করতো না।

এই ছিল সাজ্জা, যে পাথরকে গলিয়ে মোম করে নিতো। খ্রিষ্টান ধর্মের সে ছিলো অভূতপূর্ব এক নেত্রী। তবে এটা তার প্রকাশ্য রূপ। ভেতরে ভেতরে সে নিজেকে শয়তানীর এমন স্তরে নিয়ে গিয়েছিলো যেখানে পৌঁছে মানুষ পুরোপুরি ইবলিস হয়ে যায়। খোদ ইবলিসও তাকে নজরানা দেয়।

★★★★

রাসূলুল্লাহ (স) -এর ইন্তিকালের পর কিছু লোক মিথ্যা নবীর দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুখ্যাতি পায় মুসায়লামা। মুসায়লামা ইবনে কাবীর তার নাম হলেও নবী দাবী করায় সবাই তাকে ডাকতো মুসায়লামা কাযযাব বলে। কাযযাব মানে মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলতো এমন বিশ্বাস করে, লোকে সেটা মিথ্যা জেনেও শেষ পর্যন্ত তা অতি সত্যি কথা বলে বিশ্বাস করতে শুরু করতো।

মজার ব্যাপার হলো, সে যখন নবী দাবী করে বয়স তখন তার শতবর্ষের কাছাকাছি। এই বয়সেও তার দৈহিক ক্ষিপ্রতার কাছে ত্রিশ বছরের যুবকও হার মানতো। মেজাজ ছিলো তার শান্ত-ধীর। তার মুখের ওপর কেউ কটু কথা বললেও সহজে তা মেনে নিতো। মুখে তার হাসি লেগেই থাকতো। রাগতো না কখনো। শত্রুর সঙ্গেও এমন বিনয়-কোমলভাব নিয়ে কথা বলতো শত্রুও তার পক্ষে এসে যেতো।

এ কারণেই সে যখন নবী দাবী করে কেউ কেউ তার অনুসারী হয়ে যায়।

রাসূল (স) এর সময়েই সে নবী দাবী করে। তবে সে একথা বলেনি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল নয় বরং তার দাবী ছিলো নবীত্বের ব্যাপারে সেও সমান অংশীদার, তার ওপরও ওহী নাযিল হয়। রাসূল (স)-এর কাছে সে চিঠি পাঠায় যে, নবী হওয়ার ব্যাপারে সে তাঁর সঙ্গে সমান অংশীদার। তাই আরবের অর্ধেক তার আর অর্ধেক রাসূল (স) এর।

রাসূল (স)-এর কাছে এই চিঠি পৌছলে তিনি পত্রবাহককে বললেন- 'দূত বা পত্রবাহককে হত্যা করা যদি অবৈধ না হতো আমি তোমাকে হত্যা করতাম'। এটাই প্রথম পত্রবাহক ছিলো যাকে রাসূল (স) একথা বলেছিলেন। তারপর থেকে কোন পত্রবাহক বা দূত কোন খলীফার সামনে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হতো।

ক্রমেই মুসায়লামার অনুসারীদের সংখ্যা হাজারে পৌছতে লাগলো। তার মুখের নানান কথা আসমানী বাণী হিসেবে লিখে লিখে প্রচার হতে লাগলো। আর বলে বেড়াতে লাগলো এগুলো তার কাছে আসা আসমানী ওহী। রাসূল (স)-এর বিদায়ের পর পরই মুসায়লামা খোলা ময়দানে নেমে পড়লো। মুজিযা আর অলৌকিক কর্মকাণ্ডও দেখাতে শুরু করলো সে।

মজার ব্যাপার হলো, মুসায়লামা অলৌকিক বলে যা দেখাতো তাই উল্টো ফলতো। তবুও তার অনুগামী বাড়তে লাগলো। একবার এক মহিলা মুসায়লামার কাছে এসে বললো, তার খেজুর বাগানের গাছগুলোর সজীবতা হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কূপের মতো কয়েকটি ঝর্ণার উৎস আছে সেগুলোও শুকিয়ে যাচ্ছে।

'হে রাসূল' - মহিলা বললো- 'হাযমান অঞ্চলের খেজুর বাগান একবার শুকিয়ে গেলো, সেখানকার ঝর্ণাগুলোরও পানির ধারা বন্ধ হয়ে গেলো'। লোকেরা মুহাম্মদ (স) এর কাছে গিয়ে ঘটনা জানালে তিনি এক অঞ্জলী পানি মুখে নিয়ে ঝর্ণার উৎসমুখে কুলি

করে ফেলে দিলেন। দেখতে দেখতে ঝর্ণার মুখ ফেটে বানের মতো এমন করে পানি ছুটলো যে, বাগানটি একটি টলটলে পানির ঝিল হয়ে গেলো। শুকিয়ে প্রায় কাঠ হয়ে যাওয়া গাছগুলো সবুজে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।'

মুসায়লামা এটা শুনতেই উটে চড়ে মহিলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলো। সেই খেজুর বাগানে গিয়ে দেখলো সেখানকার কূপগুলোয় খুব সামান্যই পানি আছে। সে হুকুম দিলো এক কূপ থেকে সামান্য কিছু পানি নিয়ে এসো। পানি আনা হলো। মুসায়লামা মুখে পানি নিয়ে এক একটা কূপে একটু একটু করে পানি ফেলতে লাগলো। তার পানি ফেলা শেষ হলে দেখা গেলো, কূপগুলোতে যে সামান্য পানি ছিলো তাও শুকিয়ে গেছে। যে কয়টা গাছের পাতা তখনো সবুজ ছিলো সেগুলোও শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো। এরপর সেই বাগান মরুর পোড়া বাগানে পরিণত হলো।

নাহার নামে তার এক শিষ্য একদিন তাকে বললো, রাসূল (স) ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলেই মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। দেখা যেতো, তিনি যে বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন সে বাচ্চা কৈশোরে পৌছতে পৌছতেই দারুণ মেধাবী বা অভিজ্ঞ মুজাহিদ কিংবা অন্য কোন বিষয়ে বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

মুসায়লামা একথা শুনে আর দেরী করলো না। ঘরের বাইরে এসে তার গোত্র বনু হানিফার কয়েকটি বাচ্চা ডেকে আনলো। তাদের মাথায় ঘাড়ে মুখে থুতনিতে হাত বুলিয়ে দিলো। সেটা দেখার জন্য লোকজনের ভিড় জমে গেলো। সবাই হতভম্ভ হয়ে দেখলো, বাচ্চাগুলোর মাথার চুল ঝরে ঝরে পড়ছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাচ্চাগুলোর মাথা টাক হয়ে গেলো। ওদের মুখে চিবুকে হাত বুলিয়ে দেয়ার কারণে সবগুলো হয়ে গেলো তোতলা।

একজনের কাছে মুসায়লামা শুনলো, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া বা প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া কারো চোখে রাসূল (স) তার মুখের লালা লাগিয়ে দিলে তার চোখ নিঃরোগ হয়ে যেতো। দেখাদেখি মুসায়লামাও এক চোখের রোগীর চোখে তার লালা লাগিয়ে দিলো। লোকটির চোখে অন্ধকার নেমে এলো, সে অন্ধ হয়ে গেলো চিরদিনের জন্য।

এক মহিলা এসে অভিযোগ করলো তার হৃষ্টপুষ্ট বকরীটি প্রায় দুধ দেয়া ছেড়েই দিয়েছে। খুব সামান্যই দুধ দেয় এখন। মুসায়লামা বকরীটি নিয়ে আসতে বললে মহিলা নিয়ে এলো। মুসায়লামা প্রথমে বকরীর পিঠে পরে বকরীর স্তনে হাত বুলিয়ে দিলো। ফলে বকরীটি যে সামান্য সামান্য দুধ দিতো তাও শুকিয়ে স্তন এতটুকু হয়ে গেলো।

এক বিধবা এসে জানালো সে বিধবা। পুত্ররাই তার ভরসা ছিলো। কিন্তু প্রায় সবগুলো ছেলেই মরে গেছে। দুটি মাত্র জীবিত আছে। দুআ করুন ছেলে দুটি যেন জীবিত থাকে। মুসায়লামা কিছুক্ষণ ধ্যান করে থাকার ভান করে মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তোমার ছেলে দুটি দীর্ঘজীবী হবে। মহিলা খুশী মনে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো। বাড়িতে পৌছতেই সে সংবাদ পেলো, তার এক ছেলে কূয়ায় পড়ে মারা গেছে। সে রাতেই সর্বশেষ ছেলেটিও হঠাৎ ছটফট করতে লাগলো। কেন এমন করছে কিছুই জানা গেলো না। সকালের আগেই ছেলেটি মরে গেলো।

এই উল্টো ফলাফলগুলোও লোকে মুজিয়া বলতো। এর কারণ হলো মুসায়লামা এমন বিশ্বাসযোগ্য ভাষায় এসবের ব্যাখ্যা পেশ করতো, লোকে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতো।

দুষ্ট লোকদের মধ্যে মুসায়লামার শিষ্য রাসূল (স)-এর বিদায়ের পর এত বেড়ে গেলো যে, সে একটা ফৌজ তৈরী করে ফেললো। প্রথম খলীফা আবুবকর (রা) মুসায়লামার যুদ্ধশক্তির সংবাদ পেয়ে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। তিন সালারের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হলো। অবশেষে তার শোচনীয় পরাজয় ঘটলেও ইতিহাস বিখ্যাত সেই তিন জেনারেলের জন্য সে ভালো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কয়েক জায়গায় তো মনে হচ্ছিলো মুসায়লামাই বুঝি জিতে যাবে।

মুসায়লামার মিথ্যা নবী দাবীর কথা সাজ্জা শুনতে পেলো। রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর সাজ্জার মাথায় এলো, মুসায়লামা যদি এই বুড়ো বয়সে ভণ্ড নবী সেজে এত বড় ফৌজ দাঁড় করাতে পারে সে কেন নবী হতে পারবে না! নিজ রূপের জাদুর ব্যাপারে তার পূর্ণ আস্থা ছিলো। ভালো করেই সে জানতো, মানুষের মনে কত দ্রুত সে ঝড় তুলতে পারে।

এক সকালে সাজ্জা তার গোত্রের লোকদের ডেকে বললো, গত রাতে তাকে আসমানী বাণীর মাধ্যমে নবী করা হয়েছে। এই বলে সে একটা আসমানী বাণী শুনিয়ে দিলো। এর মাধ্যমে সে তার পূর্ব খ্রিষ্টধর্মও ত্যাগ করলো। লোকজন তো আগ থেকেই ওর জন্য জান-পাগল ছিলো। তারা তার এ কথায় প্রভাবান্বিত না হয়ে পারলো না। তার গোত্র সরদাররা আগ থেকেই তার পানিপ্রার্থী ছিলো। সেই সরদাররা সর্বপ্রথম তার হাতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো।

গোত্র সরদাররা যেদিকে যায় অন্যরাও সেদিকে যায়। তার গোত্রের সবাই তার দলে ভিড়ে গেলো। বনু তাগলিবের এক সরদার সাজ্জার শিষ্য হয়ে গেলে বাকীরাও তার পথ অনুসরণ করলো। বনু তামীমের এক সরদার ইবনে হুবায়রা সাজ্জার মুরিদ হয়ে গেলে পুরো বনু তামীম সাজ্জাকে নবী বলে মেনে নিলো। সাজ্জা এভাবে বিভিন্ন গোত্র সরদারদের হাত করতে লাগলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকটি গোত্র তাকে নবী মেনে নিলো।

বিশ্বাসগত দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর কিছু মুসলমানও ধর্মান্তরিত হয়ে সাজ্জার অনুসারী হয়ে গেলো। তারপর সাজ্জা মুসায়লামার মতো এক ফৌজ তৈরী করে মদীনায় হামলার সিদ্ধান্ত নিলো।

তার এক পরামর্শদাতা মালিক ইবনে নুমাইরা তাকে মদীনায় হামলা করতে নিষেধ করলো। পরামর্শ দিলো, যেসব গোত্র তাকে নবী বলে মানেনি তাদের ওপর হামলা করা হোক। সাজ্জা এভাবে গোত্রে গোত্রে ত্রাস সৃষ্টি করে গেলো।

আবুবকর (রা) সাজ্জাকে শায়েস্তা করার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে পাঠালেন। সাথে ছিলেন শুরাহবিল ইবনে হাসানা ও ইকরিমা (রা)। খালিদ (রা) এ সময় খবর পান, তাকে লড়তে হবে দুটি সংগঠিত ফৌজের বিরুদ্ধে। তাই দুশমনের রণশক্তি ও গতিবিধি জানার জন্য তিনি গুপ্তচর লাগিয়ে দিয়ে অভিযান কিছু দিনের জন্য মুলতুবী করে রাখেন।

এদিকে মুসায়লামা বুঝলো একা লড়তে গেলে সহজেই তার হার নিশ্চিত হয়ে যাবে, তাই সে সাজ্জার কাছে খবর পাঠালো, সে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। আসলে সে চাচ্ছিলো সাজ্জাকে তার দলে ভিড়িয়ে সাজ্জার নবীত্ব খতম করে দিতে।

সাজ্জা মুসায়লামাকে তার কাছে নিমন্ত্রণ করলো।

মুসায়লামা তার সঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও তীর-তলোয়ার চালনায় অতি দক্ষ চল্লিশ জন শিষ্য নিয়ে গেলো। সাজ্জার নানান গুণপনা ও তার জাদুকরী রূপের কাহিনী মুসায়লামা জানতো।

মুসায়লামা সাথে করে বিশাল এক বাহারী তাঁবুও নিয়ে নিলো। এর সঙ্গে রইলো শরাব-কাবাবের আয়োজন, রঙ বেরঙের ফানুস ও সর্বোচ্চ ভোগবিলাসের সবরকম ব্যবস্থা। তার সঙ্গে এক ধরনের সুগন্ধী নিয়ে গেলো। সেটা যে কারো চিন্তাশক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি ভোঁতা করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

এক খেজুর উদ্যানে সাজ্জা ও মুসায়লামার সাক্ষাত হলো। মুসায়লামা শুনেছিলো সাজ্জার মধ্যে এমন কিছু আছে যা পাথর গলিয়ে মোম বানিয়ে ফেলে। কিন্তু সে যখন সাজ্জার সামনে গেলো তখন সে মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো। সাজ্জার ব্যক্তিত্ব তার ধারণার চেয়ে আরো অনেক বেশি জাদুময়। খোলা ময়দানে এই জাদুকরিনীর মোকাবেলা করা সহজ কাজ নয়। এই আশংকা সে আগেই করেছিলো। এজন্য সে সাজ্জাকে প্রভাবান্বিত করার অন্যরকম সাজসজ্জা নিয়ে এসেছে। কুশল বিনিময়ের পর সে সাজ্জাকে বললো, তাঁবুতে চলো। সাজ্জার মতো মহিয়সী নারীর এখানে বসে কথা বলাটা মানায় না।

বয়স, অভিজ্ঞতা, চতুরতা সবই ছিলো মুসায়লামার। কথায় কথায় সে সাজ্জাকে এত ওপরে উঠালো যে, সাজ্জা তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো এবং উঠে মুসায়লামার তাঁবুতে চলে এলো। তাঁবুর ভেতরের বিচিত্র ধরনের আয়েশমত্ত বিলাস সামগ্রী দেখে তার মধ্যে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। সে অনুভব করলো, তার মাথার মধ্যে কেমন কোমল-নরম অনুভূতি হচ্ছে। এটা ছিলো সেই সুগন্ধির ক্রিয়া।

তাঁবুর ভেতর খাটে মেঝে সবখানে ছিলো তুলতুলে রেশমের বিছানা। সাজ্জাকে নিয়ে সে বিছানায় বসে পড়লো।

'তোমাকে এখানে আমি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে এনেছি'-মুসায়লামা সাজ্জাকে বললো।

'হে নবী! এই খিমায় এসে আমার কাছে অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে এখান থেকে বুঝি আমি বের হতে পারবো না...আপনার মহৎ উদ্দেশ্যটা কি বলবেন?' – সাজ্জা জিজ্ঞেস করলো।

'আমার একটা ইচ্ছা আছে' – এমনভাবে বললো মুসায়লামা যেন সে সাজ্জার খুব ভক্ত– 'আমি তোমার কথা শুনতে চাই। শুনেছি তোমার কথায় এমন মিষ্টি জাদু আছে, শুনলে দুশমনও তোমার পায়ে পড়ে মাথা ঠুকে'।

'আমি চাই আপনি কিছু বলুন।'

'তোমার সামনে আমি কি কথা বলতে পারবো?'

'তাজা কোন বাণী নাযিল হয়ে থাকলে শোনান।'

মুসায়লামা উঠে সাজ্জার শরীরের সঙ্গে শরীর লাগিয়ে বসলো। তারপর এমন এক অশ্লীল কথা শোনালো, সাজ্জার শরীর কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মুসায়লামা সুযোগ গ্রহণ করলো, সাজ্জার শরীরে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো।

মুসায়লামা সাজ্জার ঠোঁটে দেহ ভেজা হাসি ফুটে উঠতে দেখলো, যেটা একটু আগেও দেখা যায়নি। মুসায়লামা জানতো, রূপ যৌবনে ভরা সাজ্জার শরীর এখনো পুরুষের স্পর্শ পায়নি। নবী দাবী করার কারণে প্রকাশ্যে কোন পুরুষ তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখার কথা চিন্তাও করতো না। আর তার শিষ্যরা তার শরীর পবিত্র মনে করে পূজার যোগ্য মনে করে। তবুও তো সে একজন নারী। কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় উত্তেজনা তার অবশ্যই আছে। তার এক অশ্লীল কথায় সাজ্জার চেহারাতেই সেটা ফুটে উঠেছে।

মুসায়লামা তারপর আসমানী বাণীর নাম করে লেখার অযোগ্য এমন অকথ্য আর নষ্টামির কথা বলতে শুরু করলো যে, সাজ্জার শরীর এতে উত্তেজিত হতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সাজ্জার রূপের প্রশংসাও করলো এবং তাকে নবী হিসেবে মেনেও নিলো।

সেই চেতনা লোপকারী সুগন্ধি, তুলতুলে রেশমের স্পর্শ আর মুসায়লামার এসব কথা তাকে নবীর আসন থেকে সরিয়ে সাধারণ এক কামাতুর রূপসী নারীতে নিয়ে এলো। মুসায়লামা সাজ্জার লাল হয়ে যাওয়া চেহারা আর উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করলো। এই বয়সেও মুসায়লামার অঙ্গভঙ্গি কোন যুবকের মতোই দেখাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো তার শরীরের কোন অঙ্গেই বয়সের দীর্ঘ ছাপ ফেলতে পারেনি।

সাজ্জা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। মুসায়লামার একটি হাত তার দু'হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো।

'আমার একটা কথা শোন, চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি' – মুসায়লামা বললো।

'সেটা কেন? আমার শরীরটা কি আপনার এতই পছন্দ?'

'শরীরের কথা বলো না। নবীর সম্পর্ক শরীরের সাথে হয় না আত্মার সাথে হয়। আমি জানি তোমার দেহমন তৃষ্ণার্ত। কিন্তু আমার কথা হলো আমরা দু'জন নবী। আমাদের ফৌজ যদি আলাদা আলাদা মুসলমানদের মোকাবেলা করে, আমরা দু'জনেই হেরে যাবো। আর যদি আমরা এক হয়ে যাই সারা আরব আমরা দখল করে নিতে পারবো। শুধু মুসলমানরাই তো আমাদের নবীত্ব মানছে না। ওরাই আমাদেরকে খতম করতে চায়। এর প্রতিকার হলো, মুসলমানদেরকে আমরা খতম করে সারা আরব

দখল করে নেবো আর অন্যান্য রাজ্যে হামলা চালিয়ে দূরদূরান্ত পর্যন্ত আমাদের ধর্ম ছড়িয়ে দেবো।

একথা শুনে সাজ্জার ভেতরের শয়তানী তাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরলো। সাজ্জা নিজের সব দৈহিক মানসিক অস্ত্র মুসায়লামাকে সঁপে দিয়ে জানালো এখনই সে তাকে তার স্ত্রী করে নিক।

মুসায়লামার মতো সাজ্জাও সঙ্গে করে সমান সংখ্যক সশস্ত্র শিষ্য নিয়ে এসেছিলো। বিশাল তাঁবুর দু'দিকে দুই দল দাঁড়িয়ে ভাবছিলো, তাঁবুর ভেতরে দুই নবীর মধ্যে যে আলোচনাই হোক সে আলোচনা সফল হবে না ব্যর্থ হবে। কারণ এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না। এর পর হয়তো লড়তেও হতে পারে।

কিন্তু তাঁবুর ভেতর যে খেলা চলছিলো তারা তা জানবে কি করে বা কল্পনাও করবে কি করে। কোন ঘোষণা, প্রথাপালন এবং অনুষ্ঠান ছাড়াই সাজ্জা মুসায়লামার স্ত্রী বনে গেলো। তাঁবুর ভেতরেই চললো মধুসজ্জা। সাজ্জা তার দেহমন, নবীত্ব সবই মুসায়লামার কাছে সঁপে দিলো।

তিন দিন তিন রাত তারা তাঁবু থেকে বের হলো না। বাইরে থেকে শুধু মদ আর খাবারই তাঁবুতে পৌঁছতো। বাইরে দুই দলের সৈন্যরা ভালো মুসীবতে পড়লো, আরে হচ্ছেটা কি।

চতুর্থ দিন দু'জন তাঁবু থেকে বের হলো। সাজ্জা যখন তার লোকদের দেখলো লজ্জায় তার মুখ নুয়ে পড়লো।

মাথা নিচু করে সাজ্জা তার লোকদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলো। তার দলের উপরস্থ লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো আলোচনার ফলাফল কি দাঁড়ালো?

'আমি মুসায়লামার নবীত্ব মেনে নিয়েছি। তিনি সত্য নবী। তাই তাকে আমি বিয়ে করেছি। এখন নবী আমি না তিনি, তা মোটেও ধর্তব্যের ব্যাপার না।'

'বিয়ে তো হলো, কিন্তু বিয়ের মোহর কি দেয়া হলো?' – তাকে একজন জিজ্ঞেস করলো।

'উহ! মোহরের কথা তো আমার মনেই ছিলো না।'

এই জবাব দিয়ে সাজ্জা চোখ নামিয়ে নিলো লজ্জায়, অনুতাপে। তার নবীত্বের সেই তেজ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলো।

এক উপদেষ্টা তাকে পরামর্শ দিলো, কোন নারী কোন পুরুষকে বিবাহবন্ধনে নিজেকে সঁপে দেয়ার আগে একটা মোহর নির্ধারণ করে নেয়। তাই আপনি উনার কাছে গিয়ে মোহর নির্ধারণ করে আসুন।

মুসায়লামা যদি সাজ্জাকে তার স্ত্রী করে থাকতো তাহলে তো তাকে তার সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মুসায়লামা তাকে সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তার দলের কাছে পাঠিয়ে দিলো। সাজ্জার উপদেষ্টারা তাই সাজ্জার এই আচরণে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। তাকে বার বার বললো, মুসায়লামার কাছে গিয়ে যেন মোহর নিয়ে আসে।

মুসায়লামা সাজ্জাকে বিদায় করে দিয়ে খুব দ্রুত সে তার কেল্লায় পৌঁছলো।

'তোমরা সবাই সতর্ক থেকো' – মুসায়লামা তার কেল্লায় পৌঁছে তার ফৌজ ও লোকদের বললো– 'সাজ্জার সাথে আমি কি করেছি না করেছি তোমাদের তা বলেছি আমি। হয়তো এতে তার শিষ্য ও সঙ্গীরা ক্ষেপে উঠবে। এমন হলে তারা আমাদের ওপর অবশ্যই হামলা চালাবে। চিন্তা করে দেখো। ওদিকে মুসলিম বাহিনী আসছে আর এদিকে যদি সাজ্জার বাহিনী হামলা চালায় আমরা শেষ হয়ে যাবো। কেল্লার দরজা সবসময় বন্ধ করে রাখবে।'

কেল্লা খুব বড় ছিলো না। মুসায়লামার বাড়ি এত বিশাল ছিলো যে সেটাই একটা কেল্লার মতো ছিলো। কেল্লা বন্ধ করে দেয়া হলো।

পরদিন সাজ্জা সেই কেল্লার বাইরে এসে উপস্থিত হয়ে বললো, মুসায়লামাকে খবর দেয়া হোক তার স্ত্রী সাজ্জা এসেছে।

মুসায়লামা খবর পেয়ে ভয় পেয়ে গেলো। কারণ, সাজ্জার সঙ্গে এমন কোন কথা হয়নি যে, সে পরদিন এখানে চলে আসবে। সাজ্জার সঙ্গে যে কিছু সশস্ত্র লোকও আছে তাও তাকে জানানো হলো।

'দরজা খুলতে বলুন। ভেতরে আসবো আমি' – সাজ্জা উঁচু গলায় বললো।

'এখন তোমার ভেতরে আসা ঠিক হবে না। কেন এসেছো তাই বলো'?

'আমার মোহর নিতে। এত তাড়াহুড়া করে বিয়ে হয়েছে যে, মোহরের কথা আমার মনেই এলো না।'

'তাহলে শোন, মুহাম্মদ (স)-এর ওপর খোদা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। আমি এখন খোদার রাসূল। তোমার শিষ্য ও ফৌজের জন্য তোমার মোহরস্বরূপ ফজর ও এশা–এই দুই ওয়াক্তের নামায মাফ করে দিলাম। ফিরে গিয়ে ঘোষণা করিয়ে দাও তোমার মোহরস্বরূপ দুই নামায মাফ করা হয়েছে।'

সাজ্জা ফিরে চললো। তার দেহরক্ষিদের সঙ্গে শীস ইবনে রবী নামে এক ঘোষক ছিলো, সে কিছুটা অপমানিত হলো। সে বুঝে গেলো মুসায়লামা তাদের সঙ্গে বড় লজ্জাজনক আচরণ করেছে। সাজ্জার বিশেষ সঙ্গীদের একজন ছিলো আতা ইবনে হাজিব। সে অন্যদের বললো, এক মহিলা নবী নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ অন্যদের নবী পুরুষ হয়। তাদের এমন লজ্জায় পড়তে হয় না।

মুসায়লামা পরে সাজ্জাকে তার ইয়ামামা এলাকার বেশ কিছু জায়গা করদ এলাকা হিসেবে এক বছরের জন্য দান করে দিলো। কিন্তু মুসলমানরা তা ভোগ করার সুযোগ দিলো না তাদের। খালিদ (রা) তার ফৌজ নিয়ে পৌঁছে গেলেন। মুসায়লামার সাথে বিয়ের কারণে সাজ্জার ব্যক্তিত্ব তার শিষ্যদের মধ্যে খুব দ্রুত খতম হয়ে গেলো। তার অতি বিশ্বস্ত ভক্তরাও তাকে ছেড়ে চলে গেলো।

সাজ্জা যখন দেখলো তার কাছে লড়াইয়ের মতো তেমন শক্তি নেই, সে পালিয়ে বনু তাগলিবে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে গিয়ে সাজ্জা একেবারে নীরব হয়ে গেলো। এক নীরব-আটপৌঢ়ে জীবন যাপন শুরু করলো। তার সেই কথার জাদু রূপের ঝলক দুঃস্মৃতি হয়ে গেলো তার কাছে।

কেটে গেলো অনেক বছর। শুরু হলো আমীরে মুআবিয়া (রা) এর যুগ।

এক বছর সারা দেশে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ পড়লো। সাজ্জার গোত্র বনু তাগলিব অভাবের তাড়নায় বসরায় চলে গেলো। শরণার্থীদের প্রতি মুসলমানদের অমায়িক আচরণ ও খাদ্য বন্টনে বৈষম্যহীন নীতির প্রতি মুগ্ধ হয়ে পুরো বনু তাগলিব মুসলমান হয়ে গেলো। সাজ্জাও মুসলমান হলো। এরপর সাজ্জা বিশুদ্ধ মনে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী শুরু করে দিলো। তার ভেতরের সব শয়তানী মন্ত্রণা মহান রবের ইবাদতের স্নিগ্ধতায় ধুয়ে মুছে গিয়ে সে হয়ে উঠলো এক সাধ্বী মহিলা।

সাজ্জা যখন মারা গেলো বসরার গভর্ণর তখন সাহাবী সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)। তিনিই পড়ান তার জানাযার নামায।

সাজ্জার ওপর তো আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। তাই সে শুভ পরিণতি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু মুসায়লামার পরিণতি অন্যরকম হলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অতি ভয়ংকর এক যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলো। লড়াইয়ের শেষ দিকে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) যখন সৈন্য দিয়ে তার কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যান মুসায়লামা তখন দারুণ ক্ষিপ্রতায় বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে ঘোড়ায় চাপলো এবং বাইরে বেরিয়ে এলো।

লড়াই বাগান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। সে বাগানের দিকে গেলো। একটু অগ্রসর হতেই একটা বর্শা তার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো।

বর্শা মেরেছিলেন আরবের বিখ্যাত বীর ওয়াহশী (রা)। তার বর্শা নিক্ষেপের নিপুণতা প্রদর্শনের জন্য একবার এক নর্তকীর মাথায় একটা গোল খাড়া কড়া বাঁধা হলো, নর্তকী তার শরীর দুলিয়ে নাচতে লাগলো। ওয়াহশী দাঁড়িয়ে ছিলেন নর্তকীর চৌদ্দ পনের হাত দূরে। কিছুক্ষণ পর তিনি নৃত্যরত নর্তকীর মাথায় স্থাপিত কড়ার বৃত্ত লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন। কড়ার বৃত্ত গলে বর্শা বেরিয়ে গেলো, নর্তকী টেরও পেলো না। চলতে লাগলো তার নৃত্যের অবিরাম ছন্দ।

উহুদ যুদ্ধের সময় ওয়াহশী মুসলমান হননি। এই ওয়াহশীর বর্শার আঘাতেই হযরত হামযা (রা) শাহদাত বরণ করেন। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন ওয়াহশীও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে প্রমাণ করেন।

মুসায়লামার মতো ইসলামের এত বড় ভয়ংকর শত্রুর জাহান্নামে চালান সেই ওয়াহশীর হাতেই ঘটে। অবশ্য তাকে হত্যার ব্যাপারে মদীনার আরেক আনসারীও শরীক ছিলেন। ওয়াহশী (রা)-এর বর্শা খেয়ে মুসায়লামা ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তখনই সেই আনসারী এসে তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করেন। ওয়াহশী (রা) মুসায়লামার মাথাটি কেটে বর্শার ফলায় ঝুলিয়ে উঁচু করেন। তারপর ঘোষণা করেন – 'উহুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমি।'

তিনি বলতেন, হযরত হামযা (রা) এর হত্যার মনস্তাপ তাকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়াতো। মুসায়লামার হত্যার পর তাকে সেই মনস্তাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিয়েছে।

হাসান ইবনে সবার ভাবনায় এসব মিথ্যা নবীদের উত্থান পর্ব ছিলো। পতন পর্ব তার মনে উদয় হয়নি।

আসলে মানুষ যখন নিজের মধ্যে শয়তানের কর্মকাণ্ড লালন করে আল্লাহ তখন তার পরিণাম সম্পর্কে তাকে অসাবধান করে দেন। তাকে ধ্বংসের জন্য তিনি আকাশ থেকে ফেরেশতা পাঠান না, সে-ই তার পায়ে চলে ধ্বংসের পথে হেঁটে যায়।

কিন্তু কেউ এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

★★★★

'আমাদের মিসরের উবায়দীদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে। তবে যে করেই হোক আগে নিশ্চিত হতে হবে ওরা আমাদের সাহায্য করবে কি-না' – কেল্লা শাহদরে বসে আহমদ ইবনে গুতাশ হাসানকে বলছিলো।

'কেন করবে না? ওরা তো প্রায় আমাদের ফেরকারই লোক' – হাসান বললো।

'তবুও কিছু সন্দেহ থেকে যায়, ওরা ইসমাঈলী কি-না সেটা আগে পরখ করতে হবে। জানা গেছে ওপরে ওপরে ওরা ইসমাঈলী হলেও ভেতরে ভেতরে অন্যকোন মতবাদও তাদের আছে।

'এটা দেখতে হলে তো আমাকে মিসর যেতে হবে। আর মিসর আমি যাবোই।'

'হ্যাঁ হাসান! আমি তোমাকে মিসর পাঠাবো। আমাদের মিশন হলো আহলে সুন্নতের হুকুমত ধ্বংস করা। এজন্য সেলজুকিদের খতম করা ফরজ।'

'মান্যবর গুরু! উবায়দীদের ব্যাপারে আমি আসলে ভালো করে কিছু জানি না ..... ওদের শিকড় কোথায়?'

আহমদ ইবনে গুতাশ হাসানের কাছে উবায়দীদের পরিচয় তুলে ধরলো তার মতো করে।

মুসলমানদের ওপর যত বিনাশী ঝড় এসেছে তা এককভাবে রুখেছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। ক্রুসেডারদের রুখেছে, ইহুদী খ্রিস্টানদের রুখেছে। ইসলামকে তারা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো। তাদের ধ্বংসযজ্ঞের ধারা চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

এসব তো ইসলামের বাইরে থেকে আক্রমণ। কিন্তু মুসলমানদের ভেতর থেকে যেসব হামলা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিলো আহলে সুন্নত। এসব বাতিল পন্থীরা নিজেদের মুসলমান বললেও ওদের সব কর্মতৎপরতা ছিলো ইসলামকে বিকৃত করে অস্তিত্বহীন করে দেয়া। বিকৃতির এই অপবিত্র ধারা প্রতি যুগেই বেগবান হয়েছে।

এসব বিকৃত মুসলমানের দলই ছিলো উবায়দী ফেরকা। হিজরী তৃতীয় শতকে এদের উত্থান। এদের ধ্যান-ধারণা যদিও ইসমাঈলীদের থেকে নেয়া কিন্তু আসলে এরা ছিলো বাতিনী। এই দলের মাথা ছিলো শয়তানের মাথা। এদের সম্পর্কেই বোধ হয় আল্লাহ

তাআলা কুরআনে বলেছেন – 'শয়তান কাদের ওপর চড়াও হয় আমি কি তোমাদেরকে বলবো? সে তো যত মিথ্যাবাদী আর বদলোকদের ওপরেই চড়াও হয় (২৬ : ২২১)।'

উবায়দী ফেরকার প্রতিষ্ঠা উবায়দুল্লাহ। হিমস বা কুফার অধিবাসী ছিলো সে। তার বাবা মুহাম্মদ হাবীব গোত্রের সরদার গোছের লোক ছিলো। সে প্রায় বৃদ্ধ আর উবাইদুল্লাহ তখন পূর্ণ যুবক। সে উবাইদুল্লাহর মধ্যে এমন ইবলিসি আলামত দেখতে পেলো যা দিয়ে সে লোকজনকে শিষ্য বানানোর মতো ভণ্ডামী করতে পারবে। তার বাসনা-গোটা কয়েক এলাকায় হলেও তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মুহাম্মদ হাবীব একদিন ঘোষণা করলো তার ছেলে শেষ যুগের ইমাম মেহদী। তারপরের কাহিনী বেশ দীর্ঘ। বাপ-বেটা অনেক খেলতামাশা দেখিয়ে বেশ কিছু শিষ্য যোগাড় করলো। আর শিষ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই লাগলো।

২৭০ হিজরীতে উবাইদুল্লাহ নিজেকে ইমাম মাহদী বলে ঘোষণা করে ফেরকায়ে মাহদিয়া নামে তার দল গঠন করে। ২৭৮ হিঃ সনে সে হজ্জে যায়। সেখানে গিয়ে সে ইমাম মেহদী বলে এমন প্রোপাগান্ডা ছড়ায় যে, আরবের বনু কেনানার সবগুলো গোত্র তাকে ইমাম মেহদী বলে মেনে নেয়।

মুহাম্মদ হাবীব তার ছেলের মেহদী স্বীকৃতির জন্য প্রত্যেক এলাকার বড় বড় গোত্র সরদারদের সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে আর সোনা রুপার উপঢৌকনে ভরিয়ে দিলো। এভাবে তাদের ফেরকা যখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠলো গোপনে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিলো। নিহত হতে লাগলো সাধারণ মুসলমান আর আহলে সুন্নতের লোকেরা। যেখানেই উবায়দীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠলো সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা একেবারে গায়েব হয়ে গেলো।

ইবনে তাবাবা নামে সরদার গোছের এক লোক একদিন উবাইদুল্লার কাছে গেলো। উবাইদুল্লাহ তখন কিছু আমীর উমারা ও শিষ্যদের মাঝখানে বসা ছিলো।

'উবাইদুল্লাহ! আমি তোমাকে ইমাম মেহদী বলে মেনে নিবো। কিন্তু আগে বলো তোমার বংশপরিচয় বা তোমার জাতীয়তা কি?' –ইবনে তাবাবা জিজ্ঞেস করলো।

উবাইদুল্লাহ তার তলোয়ারের খাপ থেকে অর্ধেক তলোয়ার বের করে বললো –'এটা আমার বংশ, তারপর সে একটি থলি থেকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা বের করে তার শিষ্যদের ওপর বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে দিয়ে বললো –'আর এটা আমার জাতীয়তা।'

সবাই স্বর্ণমুদ্রাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইবনে তাবাবা মাথা নিচু করে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন।

বিভিন্ন এলাকায় উবাইদুল্লাহ ঘোষণা করালো, একজন লোক এক সঙ্গে আঠারোটি বিয়ে করতে পারবে। যেখানে ইসলাম অতি প্রয়োজনে মাত্র চারজন স্ত্রীর অনুমতি দিয়েছে। সে আরো প্রচলন করলো, দেশের শাসক শ্রেণী দলের নেতা এবং ফেরকা-প্রধানরা সব পাপ-তাপ থেকে পবিত্র। তাদের কোন ব্যাপারে কেউ নাক গলাতে পারবে না। তারা যদি কোন মেয়েকে বলে তুমি অমুকের স্ত্রী তাহলে তাকে অবশ্যই তার স্ত্রী বনে যেতে হবে।

এসব সুবিধাভোগী নিয়মনীতির কারণে উবাইদী ফেরকার লোকসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়তে লাগলো।

উবাইদুল্লার বাপ মুহাম্মদ হাবীব বড় এলাকা জুড়ে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক লোক খুঁজছিলো যে চতুর, বিচক্ষণ ও শঠতা-প্রতারণায় বেশ পাকা হাতের হবে। উবাইদুল্লার শিষ্যদের মধ্য থেকে আবু আবদুল্লাহ নামে এমন একজনকে সে খুঁজে বের করলো। তারপর তাকে নিজের মতো করে প্রশিক্ষণ দিলো।

আবু আবদুল্লাহ তার ভাই আবু আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার নানান কলাকৌশল ঠিক করে নিলো। ওদিকে উবাইদুল্লাহ রীতিমতো ফৌজ গড়ে তুলতে লাগলো। এক হজ্জের মৌসুমে আবু আবদুল্লা হজ্জে গেলো। সেখানে সে এমন অভিনয় করলো লোকেরা তাকে বিরাট পণ্ডিত বলে সম্মান করলো। সেখানে থেকে সে বড় সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে দেশে ফিরে এলো।

রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ওরা উত্তর আফ্রিকা বেছে নিলো। সেটা ছিলো বেদুইনদের এলাকা। বেদুইনরা অতি দুর্বল বিশ্বাসী ও যুদ্ধবাজ ছিলো। আবু আবদুল্লাহ ও আবু আব্বাস ধোঁকা দিয়ে বেদুইনদের হাত করে নিয়ে বিরাট এক ফৌজ বানিয়ে নিলো। এভাবে ওখানে ওদের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো।

সুযোগ বুঝে উবাইদুল্লাহ সেখানে চলে গেলো। আবু আবদুল্লাহ ও তার ভাইয়ের চেষ্টায় গড়ে উঠা রাজত্বে সে প্রভাব বিস্তার করে সেখানকার গভর্ণর বনে গেলো। দু'ভাই চলে গেলো তার বিরুদ্ধে। আবু আব্বাস এই সত্য ফাঁস করতে লাগলো যে, উবাইদুল্লাহ মেহদী নয়।

সেখানকার অশীতিপর বৃদ্ধ এক আলেম একদিন উবাইদুল্লাহকে বললো, সে যদি ইমাম মেহদী হয়ে থাকে তাহলে কোন মুজিযা দেখাক। উবাইদুল্লাহ তলোয়ার বের করে বৃদ্ধকে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেললো।

আবু আবদুল্লা ও আবু আব্বাস এবার উবাইদুল্লাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলো। এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে ছিলো স্থানীয় প্রতাপশালী লোক আবু যাকি এর ঘরে। সেখানে উবাইদুল্লার গুপ্তচরও ছিলো।

উবাইদুল্লা তা জানতে পেরে আবু যাকিকে তারাবিলিসের গভর্ণর করে পাঠিয়ে দিলো। তার সাথে গোপনে নিজের দু'জন লোকও পাঠালো। আবু যাকি তারাবিলিসের প্রাসাদে প্রথম রাতে যখন ঘুমুতে গেলো তার দেহরক্ষীদের একজন অতি গোপনে তার কামরায় ঢুকে পড়লো এবং তার মাথা শরীর থেকে পৃথক করে দিলো। মাথাটি পাঠিয়ে দেয়া হলো উবাইদুল্লার কাছে।

এভাবে হত্যা করা হলো আবু আবদুল্লা ও আবু আব্বাসকেও।

এরপর উবাইদুল্লা চারদিকে তার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য প্রচারণা শুরু করলো। কিন্তু এতে সাড়া দিলো কম লোকই। কোথাও কোথাও বিরোধিতাও শুরু হয়ে গেলো। উবাইদুল্লা হত্যার পথ বেছে নিলো। আহলে সুন্নতের আলেমদেরই সর্বপ্রথম হত্যা করা হলো। যে ঘরেই আহলে সুন্নতের কারো খোঁজ পাওয়া যেতো সে ঘরের নারী-শিশু বৃদ্ধ

সবাইকে হত্যা করা হতো। সে ঘর থেকে যে অর্থ সম্পদ পাওয়া যেতো তা তার শিষ্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। যে তার বেশি বেশি শিষ্য সংগ্রহ করে দিতো তাকে জায়গীর ও বিপুল সংখ্যক অলংকারাদি সে দান করতো।

কিছু দিন পর শক্তি সঞ্চয় করে উবাইদুল্লা মিসর আক্রমণ করলো। এক যুদ্ধেই সাত হাজার উবাইদী মারা পড়লো। কিন্তু উবাইদুল্লা দমে যাওয়ার পাত্র ছিলো না। একবার তার ফৌজে চরম মরগ দেখা গেলো। শয়ে শয়ে সৈন্য আর ঘোড়া মরতে লাগলো। উবাইদুল্লা কিছু দিনের জন্য মিসর বিজয় মুলতুবী রাখলো। অবশেষে ৩৫৬ হিঃ সে মিসর জয় করলো।

আহমদ ইবনে গুতাশ এই উবাইদীদের কাছেই হাসানকে পাঠাতে চাচ্ছিলো।

আহমদ ইবনে গুতাশ হাসান ইবনে সবাকে ফেরকায়ে উবাইদিয়ার ইতিহাস গুনিয়ে ফেরকায়ে কেরামতিয়ার কাহিনী শোনালো।

কেরামতি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলো আবু তাহের সুলায়মান কেরামতি। তার বাবা আবু সাঈদ জানাবী ৩০১ হিঃ তার এক খাদেমের হাতে নিহত হয়। আবু তাহের ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও তার বড় ভাই সাঈদের ওপর এমন অত্যাচার করতো যে, একসময় সাঈদ প্রায় পাগল হয়ে গেলো এবং শারীরিকভাবে হলো প্রায় পঙ্গু। আবু তাহের বাপের আসন দখল করলো।

পারিবারিকভাবে আবু তাহেরের বড় এক সাম্রাজ্য ছিলো। তায়েফ, বাহরাইন এবং হিজরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আবু তাহের তার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নবী দাবী করে বসলো। পরবর্তীতে ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, কেরামতিরা তাতারি ও উবাইদুল্লার চেয়ে ইসলামের জন্য অনেক বেশি ধ্বংসশীল ছিলো।

দশ বছর পর্যন্ত আবু তাহের তার নবীত্বের প্রচারণা চালালো এবং ফৌজও তৈরী করলো। এক রাতে সে এক হাজার সাতশ ফৌজ নিয়ে বসরা হামলা করতে গেলো। সঙ্গে করে লম্বা লম্বা কতগুলো সিঁড়ি নিয়ে গেলো। শহরের প্রাচীরের সঙ্গে সিঁড়িগুলো লাগিয়ে হামলাকারীরা ভেতরে ঢুকলো।

আচমকা হামলায় লোকজন পালাতে লাগলো। আবু তাহেরের হুকুমে শহরের দরজা খুলে দেয়া হলো। লোকেরা দরজার দিকে ছুটতে শুরু করলো। দরজাগুলোতে কেরামতিরা খোলা তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। পাইকারী দরে ওরা পলায়নরত পুরুষদের হত্যা করতে শুরু করলো। নারী আর শিশুদের বন্দী করতে লাগলো। সরকারি অর্থভাণ্ডারসহ সারা শহর লুটে নিলো ওরা। একরাতে বসরাকে খুনের দরিয়া বানিয়ে কেরামতিরা তাদের কেন্দ্রীয় শহর হিজরে চলে গেলো।

সে বছরই কেরামতিরা হাজিদের কাফেলা লুটতে শুরু করলো। কেরামতিরা শুধু লুটপাট করতো না, কাফেলার লোকদেরকে হত্যাও করতো। হজ্জ থেকে ফিরে আসা হাজীদেরও তারা লুটপাট করে। সে বছর হাজারখানেক হাজীকে তারা শহীদ করলো।

কেরামতিয়াদের শায়েস্তার জন্য তদানীন্তন খলীফা বিভিন্ন এলাকায় সৈন্যদল পাঠালেন। কিন্তু সবখানেই খলীফার লশকর কেরামতিয়াদের কাছে পরাস্ত হলো। খলীফা অনবরত সেনাসাহায্য পাঠালেন কিন্তু কেরামতিয়ারা এত তৎপর ও ক্ষিপ্র ছিলো যে, খলীফার লশকর কোথাও তাদের টিকিটিরও নাগাল পেলোনা। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা পাওয়া যেতো আবু তাহের তার সবই কেরামতিয়াদের মধ্যে বন্টন করে দিতো।

বিভিন্ন শহর থেকে যত যুবতী মেয়ে পাকড়াও করা হতো তাও সবার ভোগে দিয়ে দেয়া হতো। মদগাঁজা সেবন করতে পারতো ওরা খোলা ময়দানে। এজন্য কেরামতিয়ারা আবু তাহেরের ইশারায় যে কোন সময় জান দিতে প্রস্তুত থাকতো। নিজেদেরকে ওরা মুসলমান আর তাহেরকে বলতো নবী।

পরবর্তী খলীফাদের পার্থিব মোহ, ভোগবিলাস ও পরকাল বিমুখতার কারণে খেলাফতে রাশেদার সেই পবিত্রতা ও আত্মত্যাগী দৃঢ়তা ক্রমেই ম্লান হয়ে পড়ে। খেলাফতের ফৌজে খোলাফায়ে রাশেদীনের ফৌজের মতো সেই সচ্চরিত্রতা, শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, বিজয় স্পৃহা কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো। একটা সময় ছিলো যখন চল্লিশ হাজার মুজাহিদ দ্বিগুণ শক্তিধর সোয়ালক্ষ অগ্নিপূজক বাহিনীকে অতিসহজেই পরাস্ত করে। অথচ এখন খেলাফতের দশ হাজার সৈন্য মাত্র এক হাজার কেরামতিয়ার কাছেও পরাস্ত হচ্ছে।

★★★★

আবু তাহের হিজর শহরকে তার কেন্দ্রীয় রাজধানী বানিয়ে সেখানে আড়ম্বরপূর্ণ একটি মসজিদ নির্মাণ করায়। মসজিদের কাজ শেষ হলে আবু তাহের তা দেখতে এসে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলে —

'আমার কেরামতি ভায়েরা! ইসলামের আসল ধ্বজাধারী তোমরাই। ওরা মুসলমান না যারা কেরামতী নয় এবং যারা আমাকে নবী মানে না। খোদা আমাকে হুকুম দিয়েছেন এখন থেকে মক্কায় হজ্জ হবে না, এখানে হিজরে হজ্জ অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য জরুরী কাজ হলো, মক্কা থেকে 'হজরে আসওয়াদ' উঠিয়ে এনে এখানে স্থাপন করা।

এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো —

'তাহলে আমরা হজরে আসওয়াদ এখানে কি করে আনবো? আহলে সুন্নতরা তো সেই দুঃসাহসের সুযোগ আমাদেরকে দেবে না। তখন আমরা করণীয় কি করবো?'

আবু তাহের বললো, 'তোমাদের তলোয়ার কি তবে ভোঁতা হয়ে গেছে? আহলে সুন্নতীদের রক্তে কোন জায়গা আমরা ভাসাইনি? তোমরা কাবায় এসব অস্বীকারকারীদের রক্ত ঝরাতে পারবে না? এ বছর আমরা মক্কায় হজ্জের সময় গিয়ে কাবার এমন অবস্থা করবো এরপর আহলে সুন্নতরা আর কখনো মক্কার দিকে তাকাবে না।

৩১৭ হিজরীতে আবু তাহের মক্কাশরীফে গেলো। হাজীদের কেউ তখন কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলো, কেউ নামায পড়ছিলো। আবু তাহের হাতে তলোয়ার নিয়ে ঘোড়াসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করলো। তারপর শরাব আনিয়ে ঘোড়ায় বসে শরাব পান করলো। আবু তাহেরের শরাব পান করার সময় ঘোড়াটি হঠাৎ মসজিদে প্রস্রাব করে দিলো।

আবু তাহের তা দেখে হো হো করে হেসে উঠে বললো 'দেখলে তোমরা। আমার ঘোড়াও আমার ধর্ম বোঝে।'

মসজিদে যেসব মুসলমান ছিলো সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারপর যে যার মতো প্রতিবাদ শুরু করলো। হাজীরা দৌড়ে এলো। সবাই তখন ইহরাম পরিহিত থাকায় নিরস্ত্র ছিলো। আবু তাহেরের ইশারায় কেরামতিয়ারা হাজীদের পাইকারীভাবে হত্যা শুরু করলো। কাবার আঙ্গিনায় গিয়েও সে মানুষ হত্যা করতে লাগলো। তার হুকুমে কাবা শরীফের পবিত্র দরজা ভেঙ্গে উপড়ে ফেলা হলো।

'আমি খোদা'— আবু তাহের ঘোড়ায় থেকে ঘোষণা করলো – 'সমস্ত সৃষ্টির ওপর আমার বন্দেগী করা ফরজ। হে পাপীর দল! তোমাদের কুরআন বলেছে, যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। কোথায় সে নিরাপত্তা? যাকে ইচ্ছা তাকে আমি জীবিত রেখেছি, আর যাকে চেয়েছি খুনের দরিয়ায় তাকে গোসল করিয়েছি।'

এক হাজী সামনে বেড়ে আবু তাহেরের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, এই মিথ্যাবাদী! তুই তো এই আয়াতের ভুল অর্থ করেছিস। এর প্রকৃত অর্থ হলো যে মসজিদে হারামে ঢুকে পড়বে তাকে নিরাপত্তা দাও। তার ওপর হাত উঠিয়ো না।

সে হাজীর পেছন থেকে একটি তলোয়ার নড়ে উঠলো এবং তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো।

তখন মক্কার আমীর ছিলেন আবু মাহলাব। কেরামতিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ ফৌজ ছিলো না। তিনি তার সঙ্গে কিছু অস্ত্রসজ্জিত লোক নিয়ে আবু তাহেরের কাছে গেলেন। বললেন আবু তাহের হাজীদের হত্যা বন্ধ করো। আল্লাহর আযাবকে ভয় করো। না হয় এই দুনিয়াতেই এর শাস্তি তুমি পাবে।'

'একে আল্লাহর আযাব দেখিয়ে দাও' – আবু তাহের হুকুম করলো। একদল কেরামতী আবু মাহলাব ও তার সঙ্গীদের ওপর টুটে পড়লো। আবু মাহলাবের লোকেরা পা জমিয়ে লড়ে গেলেও সংখ্যায় ওদের তুলনায় একেবারে হাতে গোনা হওয়ায় সবাই শহীদ হয়ে গেলো অল্প সময়ের মধ্যেই।

কাবার ওপর থেকে 'মীযাব' বা স্বর্ণের যে নালাটি ছিলো তা খুলে আবু তাহেরের পায়ে যেন রাখা হয় এই হুকুম ঘোষিত হলো।

কাবায় চড়ে বসলো এক কেরামতি। ইতিহাস-উদ্ধৃত মুহাম্মদ ইবনে রবী নামে এক লোক তখন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে রবী আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনার সহনশীলতা ও ক্ষমা পরায়ণতার কোন অন্ত নেই, তাই বলে আপনার সুমহান জাত এই লোককেও ক্ষমা করে দেবে?' মুহাম্মদ ইবনে রবী পরে মুসলমানদের বলেছেন, যে কেরামতি কাবা শরীফে চড়েছিলো কিভাবে জানি হঠাৎ করে সে উপুড় মুখ হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে মরে গেলো।

আবু তাহের প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আরেক কেরামতিকে কাবা শরীফে চড়তে বললো। সে লোক প্রায় উঠেই গিয়েছিলো। হঠাৎ তার হাত ছুটে গিয়ে পড়ে মরে গেলো। আবু তাহের এবার আরো রেগে গিয়ে আরেক কেরামতিকে হুকুম দিলো। এই তৃতীয় কেরামতি এ হুকুম শুনতেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো এবং আচমকা দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

এবার আবু তাহেরের ওপর অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হলো। তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। কিছুক্ষণ সে কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হচ্ছিলো সে দ্বিধান্বিত। কিন্তু শয়তান তাকে এতই কাবু করে রেখেছিলো যে আচমকা সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। হুকুম দিলো কাবা শরীফের গিলাফটি যেন টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

কেরামতিরা গিলাফের ওপর হামলে পড়লো এবং তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে তা টুকরো টুকরো করে পুরো লশকরের মধ্যে বন্টন করে দিলো। কাবা শরীফের সমস্ত সম্পদ আবু তাহের নিয়ে নিলো। যেসব হাজী পাইকারী হত্যা থেকে বেঁচে গেলো ইমামের নেতৃত্ব ছাড়াই তারা হজ্জের ফরজ আদায় করলো।

আবু তাহের 'হজরে আসওয়াদ' তার রাজধানী হিজরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো। তখন ছিলো রাত। বেঁচে যাওয়া হাজীরা কোনভাবে জানতে পারলো আবু তাহের 'হজরে আসওয়াদ' ছিনতাই করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। রাতে রাতেই তারা এত ভারী একটি বিশাল পাথর সেখান থেকে উঠিয়ে মক্কার উপত্যকার নিম্ন অঞ্চলে নিয়ে লুকিয়ে ফেললো। সেখানে চারদিকেই কেরামতিরা সশস্ত্র প্রহরায় ছিলো। এর মধ্যে এত বড় ভারী একটি পাথর সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা অলৌকিক কাণ্ডই ছিলো।

পরদিন সকালে আবু তাহের হুকুম দিলো 'হজরে আসওয়াদ' উঠিয়ে নিয়ে এসো। তাকে জানানো হলো সেখানে পাথর নেই। সে বললো,

'এটা অত্যন্ত ভারী পাথর। আমাকে এটা বলো না যে, কোন মানুষ এটা সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।'

তাকে আবারও বলা হলো সেখানে পাথর নেই। সে এবার নিজে গিয়ে দেখলো সেখানে সত্যিই পাথর নেই। প্রচণ্ড রাগে পাথর খুঁজে বের করতে হুকুম দিলো সে। হাজীরা হজ্জ শেষে সেখান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিছু চলেও গিয়েছিলো। কেরামতিরা উপস্থিত হাজিদেরকে পাথর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। যারা জানিনা বলে অজ্ঞতা প্রকাশ করলো তাদের তারা হত্যা করলো।

খুঁজতে খুঁজতে তারা হজরে আসওয়াদ পেয়ে গেলো। আবু তাহের তখনই তা উটে সওয়ার করিয়ে হজরে আসওয়াদ পাঠিয়ে দেয়ার হুকুম করলো। এ ঘটনা ঘটে ৩১৭ হিজরীর যিল হজ্জ মাসের শনিবার দিন।

আবু তাহের 'যমযম' কূপও ধ্বংস করে দেয়।

এ সময়েই মিসরে উবাইদুল্লার উত্থান হয়। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো আবু তাহের কেরামতি উবাইদুল্লাকে ইমাম মেহদী বলে মেনে নেয়।

আবু তাহের হজরে আসওয়াদটি হিজরে নির্মিত তার মসজিদের দক্ষিণ পাশে স্থাপন করে উবাইদুল্লাকে এই বলে চিঠি লিখে যে আমি হুকুম দিয়ে দিয়েছি, জুমআর খুতবায় যেন আপনার নামও নেয়া হয়। এরপর সে মক্কায় কাবা শরীফে কেমন ধ্বংসক্রিয়া চালিয়েছে, আহলে সুন্নতের রক্তে কি করে মক্কার অলিগলি ভাসিয়ে দিয়েছে, খুব গর্ব করে তাও লিখে জানায়। এই চিঠিতে সে মুসলমান ও আহলে সুন্নতকে সন্ত্রাসী ও অপদস্থ জাতি বলে উল্লেখ করে।

তার আশা ছিলো চিঠি পেয়ে উবাইদুল্লা বেশ খুশি হবে। কিন্তু কাসেদ (পত্রদূত) যখন চিঠির জবাব নিয়ে এলো সে হতভম্ব হয়ে গেলো।

উবাইদুল্লা লিখলো তুমি চাচ্ছো তোমার এই নোংরা কাজের আমি প্রশংসা করবো? তুমি কাবা শরীফের অপদস্থ করেছো এবং এত পবিত্র এক স্থানে মুসলমানদের খুন ঝরিয়েছো। না জানি কোথা কোথা থেকে হাজীরা এসেছিলো, তাদেরকে হত্যা করেছো এবং হজরে আসওয়াদ উপড়ে নিয়ে এসেছো। এটাও চিন্তা করলে না হজরে আসওয়াদ আল্লাহর এক আমানত যা একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়েছিলো। উবায়দী জামাত তোমার ওপর কুফরীর ফতোয়া আরোপ করছে। তাই তোমাকে কোন পুরস্কার দিতে পারছিনা আমরা।

আবু তাহের চিঠি পড়ে ক্ষেপে গেলো এবং ঘোষণা করলো কোন কেরামতি যেন উবাইদুল্লাকে ইমাম মেহদী না বলে।

প্রায় দশ বছর– ৩১৭ হিঃ থেকে ৩২৭ হিঃ পর্যন্ত মক্কায় হজ্জব্রত পালিত হয়নি। কেরামতিয়াদের ভয়ে এবং সেখানে হজরে আসওয়াদ না থাকায় কেউ সে সময় হজ্জে যায়নি।

আবু আলী উমর নামে আবু তাহেরের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। আবু তাহেরকে আবু আলী একদিন বললো, 'ভেবে দেখো আবু তাহের! দশ বছর ধরে হজ্জ বন্ধ। এর কারণ তুমি জানো। শুধু তোমার অন্যায় অত্যাচারের কারণে মুসলমানরা হজ্জের ফরয আদায় করতে পারছে না। এ কারণে তোমার দলের সাধারণ লোকেরাও ক্ষুব্ধ। আমার মতে হাজীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করো আর তাদের কুরবানীর জন্য আনা প্রত্যেক উটের ব্যাপারে পাঁচ দীনার করে ট্যাক্স নির্ধারণ করো।'

এই প্রস্তাব আবু তাহেরের বেশ পছন্দ হলো। কাসেদের মাধ্যমে সবখানে সে ঘোষণা করালো আগামী থেকে এত দীনারের বিনিময়ে সবাই নিরাপদে হজ্জ করতে পারবে।

ইবনে খালদুন লিখেছেন, খলীফার পররাষ্ট্র সচিব মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুতও আবু তাহেরকে লিখেছিলো, হাজীদের ওপর তোমার জুলুম অত্যাচার বন্ধ করো। হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দাও। আর যেসব এলাকা এখন তোমার দখলে রয়েছে তা তোমারই থাকবে। এ ব্যাপার খেলাফত তোমাদেরকে শত্রু মনে করবে না।

এর জবাবে আবু তাহের নিশ্চয়তা দিলো, ভবিষ্যতে কেরামতিরা কারো হজ্জ আদায়ে বিঘ্ন ঘটাবে না কিন্তু হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলো আবু তাহের। সে ভেবেছিলো হজরে আসওয়াদের আকর্ষণে লোকেরা আস্তে আস্তে তার হিজর শহরেই হজ্জ করতে আসবে। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে একজন মুসলমানও সেমুখো হয়নি।

খলীফা মুকতাদির বিল্লা আবু তাহেরকে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দিতে বলেন। আবু তাহের তা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

এরপর খলীফা মুতী বিল্লা যখন ৩০ হাজার দীনার আবু তাহেরকে দেয়। সে হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেয়।

৩৩৯ হিঃ ১০ মুহররম মঙ্গলবার দিন শাব্বীর ইবনে হুসাইন কেরামতি নামে আবু তাহেরের এক লোক হজরে আসওয়াদ নিয়ে মক্কায় পৌছে। সেদিনই সেটা স্বস্থানে রেখে দেয়া হয়। খলীফা এর আশে পাশে প্রায় ১৪ কেজি রুপা গালিয়ে বেষ্টনী তুলে দেয়। চার দিন কম একাধারে বাইশ বছর আবু তাহের কেরামতির কাছে হজরে আসওয়াদ দখলভুক্ত থাকে।

মক্কা থেকে হিজরে হজরে আসওয়াদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চল্লিশটি উট মারা যায়। অথচ হিজর থেকে মক্কায় আনার সময় একটি উটই হজরে আসওয়াদ বয়ে নিয়ে আসে এবং সে উটটি আবার সুস্থ দেহেই হিজর ফিরে যায়। অথচ পাথরের ওজন যা ছিলো এখনো তাই আছে। উটটিও তেমন অস্বাভাবিক ধরনের বিশালকায় ও শক্তিশালী ছিলো না।

আল্লাহ তাআলা আবু তাহেরের জীবনরশি অনেক দীর্ঘ করেছিলেন। হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেয়ার পর এই রশি খাটো হতে থাকে। ওদিকে হজরে আসওয়াদ মক্কায় পৌছে এদিকে আবু তাহের ভয়াবহ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এরোগে সে দীর্ঘ দিন ভুগে। যেই তাকে দেখতে যেতো কানে হাত রেখে সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে আসতো।

কিছু কিছু কেরামতি এ অবস্থা দেখে তাওবা করে আহলে সুন্নতে ফিরে আসে। দিন রাত তার মুখ দিয়ে গা চমকানো মরণ চিৎকার বেরোতো। অনেক দূরেও তার দেহের দুর্গন্ধে টেকা যেতো না। একদিন সে এভাবে তার নাপাক দুর্গন্ধময় শরীর রেখে দুনিয়া ত্যাগ করে।

পাকিস্তানের মুলতানে কেরামতিরা তাদের ঘাঁটি বানিয়েছিলো। সুলতান মাহমুদ গজনবী হিন্দুস্তান হামলার সময় জানতে পারেন মুলতান কেরামতিয়াদের দখলে। কেরামতিয়ারাও তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। একজন সিপাহীর মতো সারা দিন লড়াই করেন তিনি। তার তলোয়ার এত শত শত কেরামতির রক্ত ঝরায় যে, দিন শেষে বোঝার উপায় ছিলো না কোনটা তলোয়ার আর কোনটা তার হাত। মুলতানের প্রতিটি রাস্তা অলি গলি প্লাবনের মতো রক্তবন্যায় ভেসে যায়।

কেরামতিরা আহলে সুন্নতের যে রক্ত ঝরিয়ে ছিলো সুলতান মাহমুদ তার চরম প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কেরামতিদের শিকড় উপড়ে ফেলেছিলেন তিনি।

১০

'কিন্তু হাসান' – আহমদ ইবনে গুতাশ হাসানকে কেল্লা শাহদরে বসে উবাইদী আর কেরামতিদের কাহিনী শুনিয়ে বললো – 'লোকে আড়ালে বলে, আহমদ বড় প্রতারক। প্রতারণা করে এই কেল্লার আমীর হয়েছে। আমি বলি কি, তোমার মধ্যে যা আছে আমার মধ্যে তা নেই। তুমি সেই হাতে গোনা লোকদের একজন যাদেরকে খোদা বিশেষ শক্তি দিয়ে পাঠান। তোমাকে উবাইদুল্লার কথা শুনিয়েছি। তার বাপ তেমন ক্ষমতাধর ছিলো না। অথচ সে মিসরের সম্রাট হয়েছে। এখনো মিসর উবাইদীদের দখলে। আবু তাহের কেরামতি ছিলো এক বেকুব। সে তার বুদ্ধির সীমালংঘন করেছিলো।'

'মান্যবর গুরু! আমি জানি আমার মধ্যে অতি মানবীয় কিছু আছে। তাই আমার একজন পথপ্রদর্শক প্রয়োজন যাতে জানতে পারি এই শক্তিটা কী আর কীভাবে এটা ব্যবহার করবো।'

'সে শক্তি তুমি সঙ্গে নিয়ে এসেছো।'

'হ্যাঁ, আমি তো জানি তা আমার মধ্যে আছে।'

'না হাসান! আমি তোমার সেই শক্তির কথা বলছি না, তোমার সঙ্গে আসা মেয়েটির কথা বলছি আমি। কি যেন নাম .... ফারাহ .... তুমি কি বুঝতে পারছো না এই মেয়ে ছাড়া তুমি এক পাও চলতে পারবে না?

'হ্যাঁ গুরু! আমি এই মেয়ে ছাড়া থাকতে পারবো না।'

'লোকে বলে, পুরুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নারী। এটা ভুল নয়। সুন্দরী নারী অনেক বড় শক্তি, তীব্র এক নেশা। নারীর কমনীয়তা পাষাণ পাথর রাজার সিংহাসনও উল্টে দেয়। এই শক্তিকে তুমি ব্যবহার করো। সাজ্জা ও মুসায়লামার কাহিনী তোমাকে শুনিয়েছি আমি। সাজ্জা এত বড় লশকর কি করে বানালো? গোত্র সরদারদের কিভাবে তার শিষ্য বানালো তার রূপ দিয়ে। রূপের নেশা ধরিয়ে সে হাজার হাজার পুরুষকে মাত করেছিলো।'

'কিন্তু সে তো এক পুরুষের কাছে ফেঁসে গেলো!' – হাসান মুচকি হেসে বললো।

'না হাসান! মুসায়লামা যে ওকে স্ত্রী বানিয়ে তার তাঁবুতে রেখেছিলো সেটা ছিলো চরম ভুল। ভেবে দেখো এরপর থেকেই মুসায়লামার পতন শুরু হয়। যে শক্তি তুমি নিয়ে এসেছো তা থেকে কিভাবে তুমি বাচঁতে পারবে এবং কি করে ওকে ব্যবহার করবে সেটা তোমাকে শেখাবো আমি।'

'জাদু বিদ্যারও কিছু শেখাবেন আমাকে?'

'সেটা তো শেখাবোই। তবে মনে রেখো হাসান! জাদু ছাড়াও আরো গোপন কিছু বিষয় আছে, সেগুলোর একটাতেও যদি তুমি অভিজ্ঞ হতে পারো তাহলে দুনিয়ায় মুজিযা নামিয়ে দিতে পারবে। নির্ভর করতে হবে একমাত্র ভেতরের শক্তির ওপর। নিজের ভেতরকে জাগাও। তখন দেখো মুজিযা কি করে হয়। তবে আমাদের আরো কিছু শক্তিরও দরকার'।

এর আগে ইবনে আতাশ ও পাহাড়ি জঙ্গলের দরবেশ যা বলেছিলো আহমদ ইবনে গুতাশ হাসানকে সে কথাই বললো। শেষে বললো,

'এ অঞ্চলের ছোট ছোট যে কেল্লাগুলো আছে তা দখল করতে হবে। তোমাকে আরো কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করতে হবে। যে কোনভাবে হোক সেলজুকিদের প্রশাসনে ঢুকে যাও। কোন এক পদ সেখানে নিশ্চয় পেয়ে যাবে। তারপর বেছে বেছে আমীর উমারা ও হাকিমদের নিজের দলে ভিড়াও আর সেলজুকিদের শিকড় কাটতে থাকো।'

সে রাতেই আহমদ ইবনে গুতাশ হাসান ও ফারাহকে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করলো। লোকদের কিভাবে দলে ভিড়াতে হবে তাও সে শেখালো। এসবে ফারাহ মনে হয় সংকোচ করছিলো।

'শোন মেয়ে।' – ইবনে গুতাশ ফারাহকে বললো – 'কোন পুরুষদের খেলনা হতে দেবো না তোমাকে। ভেবে দেখো, অসংখ্য মানুষ গাছে ঝুলন্ত একটি ফুলের ঘ্রাণ নিলেও তার সজীবতা শেষ হয় না। কিন্তু ডালি থেকে ফুলটি বিচ্ছিন্ন হলেই বিবর্ণ হয়ে তা শুকিয়ে যায়। সে ফুলই তোমাকে বানাবো আমি। কিন্তু তোমাকে ডালি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া ফুল হতে দেবো না। সে ফুল তো মরে যায়, পাপড়ি ঝরে ঝরে দলে মলে যায়। কিভাবে তুমি ডালিতে ঝুলে থাকবে, তোমার ঘ্রাণ সজীবতা কি করে অম্লান থাকবে তা তোমাকে শেখাবো আমি'।

কোন দালান ধসাতে হলে বা ভাঙতে হলে ওপর থেকে ভাঙা যায় না। সময় লাগে। দালানের চূড়া থেকে যদি দু'একটি ইট কেউ খসায় সে পাকড়াও হবে নির্ঘাত। দালানের গোড়ায় পানি ঢালতে হয়। তখন গোটা দালানটাই টুকরো ইটের স্তূপে পরিণত হয়।

ইসলামের পবিত্র সৌধ ধ্বংসের এই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে হাতিয়ারের চেয়ে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন বেশি। এর দ্বারা মানুষ ও মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেনা যায়। আহমদ ইবনে গুতাশ এজন্য বিভিন্ন কাফেলা লুটতে শুরু করে।

এ অঞ্চলে ইসলাম আসার পর কাফেলা লুটপাট প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। লুটেরা ছিনতাইকারীর অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গিয়ে ছিলো। একা একাও লোকে মুদ্রার থলি নিয়ে মরু বিয়াবান পাড়ি দিতো নির্ভয়ে। সেলজুকিরা এ ব্যাপারে আরো কঠোর ছিলো। কিন্তু সেলজুকি সুলতান মালিক শাহের আমলে হঠাৎ করেই কোথেকে জানি লুটেরা দলের উদয় হলো।

একদিন আহমদ ইবনে গুতাশের কাছে হাসান বসা ছিলো। দারোয়ান এসে এক লোকের আগমন বার্তা জানালো। আহমদ চমকে উঠে দারোয়ানকে বললো, তাড়াতাড়ি ভেতরে পাঠাও ওকে।

'খোশ আমদেদ! এসো ভাই! বসার আগে শোনাও কোন সুসংবাদ এনেছো কি না?' – আহমদ আনন্দিত গলায় জানতে চাইলো।

'অনেক বড় সুসংবাদ আছে। বড় এক কাফেলা আসছে। যতই এগুচ্ছে এর লোক সংখ্যাও বাড়ছে– আগন্তুক বললো।

'আর মাল-দৌলতও বাড়ছে' – হাসান খুশী গলায় বললো।

লোকটি জানালো, কাফেলা এখন শাহদরের পথ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। সেটি উপত্যকা ও জঙ্গলে ঘেরা এলাকা। এর আগে শাহদর থেকে অনেক দূরের এলাকায় কাফেলা লুট করা হয়েছিলো এজন্য কারো সামান্যতমও সন্দেহ হলো না যে, আহমদের লোকেরাই লুটেরা এবং লুট করা সব মালামাল আহমদেরই হাতে সে পৌঁছায়।

'আচ্ছা বলতে পারো কাফেলার সঙ্গে কি কি আছে?' – আহমদ জিজ্ঞেস করলো।

'কেন নয়? ঐ কাফেলার সঙ্গে আমি দুই মঞ্জিল সফর করেছি। নিজ চোখে সব দেখেছি এবং কাফেলার লোকদের কাছ থেকেও কিছু শুনেছি।'

'হ্যাঁ, তোমার মতো লোক আমাদের দরকার। কি দেখে এসেছো এখন তাই বলো' হাসান বললো।

'ব্যবসায়িই বেশি। বড় বড় কিছু আমীরও আছে। বাইশটি কি তেইশটি উটে করে তাদের মালগুলো যাচ্ছে।'

'কি মাল?'

'কাপড়, চামড়া, সোনা রুপা, অলংকার, তরি তরকারি আর ওদের কয়েকটি পরিবার'।

'তাহলে যুবতী মেয়েও আছে?' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'বেশি নয়। সাত আটটি বেশ সুন্দরী–কমবয়সী। পঁচিশটির মতো কিশোর বয়সী।

'এটা তো আরো বেশি ভালো সংবাদ। নিজ হাতে গড়তে পারি এমন মেয়েই তো আমরা চাই'– আহমদ বললো।

'একটা চিন্তার কথা,' কয়েকটি কাফেলা লুট করার পরও এসব ব্যবসায়িরা কোন সাহসে এত মালামাল ও এত বড় কাফেলা নিয়ে আসছে? ওরা হয়তো ভেবেছে কিছু দিনের জন্য লুটপাট বন্ধ, তাই লুটেরারা অন্যকোন এলাকায় চলে গেছে' – হাসান মন্তব্য করলো।

'আমার ধারণা ভিন্ন'– সে লোকটি বললো– 'কাফেলায় যারাই শরীক হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে সঙ্গে বর্শা তলোয়ার থাকতে হবে এবং লড়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। কাফেলা যেখানেই তাঁবু ফেলেছে দেখেছি কিছু নৌজোয়ান ছাউনির আশে পাশে পাহারা দিচ্ছে। নৌজোয়ানের সংখ্যাই কাফেলাতে বেশি।'

'অর্থাৎ কাফেলার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আছে। তাই আমাদের অনেক লোক দরকার, সতর্কতাও প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ এটা চিন্তার বিষয়' – আহমদ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো।

'আমরা ঐ কাফেলাকে মুহাফেজ দেবো' – হাসান একথা বলে সে লোকটিকে বললো– 'তুমি আমার এখানে কিছুক্ষণ বসো – আর গুরু! এটা পেরেশানীর কোন বিষয় নয়।'

লোকটি জানালো, কাফেলার লোকসংখ্যা হাজার খানেক। আর যে এলাকা দিয়েই কাফেলা যায় সেখান থেকেই কিছুনা কিছু লোক কাফেলায় শরীক হয়।

'এর কারণ হলো অনেক দিন পর লোকেরা এমন একটা কাফেলা দেখে এর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে' – আহমদ বললো।

'এই কাফেলা যেন আপন মনযিলে পৌছতে না পারে' – হাসান বললো।

'এজন্যই তো আমি এত দূর থেকে এসেছি। বলুন কি করতে হবে আমাকে। আমাকে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হতে হবে' – লোকটি বললো।

আহমদ ইবনে গুতাশ ও হাসান তাকে দিকনির্দেশনা দিতে শুরু করলো। এর একটু পর লোকটি গোপনে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেলো। শহর থেকে কিছু দূরে গিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে টিলা জঙ্গলের মধ্যে গায়েব হয়ে গেলো।

লোকটি চলে যাওয়ার পরপরই আহমদ ইবনে গুতাশ তার দুই বিশেষ সঙ্গীকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলো। লোক দু'জন খুব দ্রুত প্রথমে শাহদরের কিছু লোকের সাথে দেখা করে গ্রামে চলে গেলো।

সে দিন সূর্যাস্তের পর প্রায় পঞ্চাশজন ঘোড়-সওয়ারের একটা দল একত্রিত হলো শাহদর থেকে সাত আট মাইল দূরে। আহমদের কথামত তারা একজন নেতা নিযুক্ত করে সেই কাফেলার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। তাদের সামনে ব্যবধান ছিলো দুই আড়াই দিনের।

কাফেলার লোকসংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। কাফেলায় ছিলো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, অসংখ্য উট। ব্যবসায়ীদেরও ঘরোয়া মালপত্র চার পাঁচটি গরু ও ঘোড়ার গাড়িতে বহন করা হচ্ছিলো। আধিকাংশ লোকই ঘোড়-সওয়ার ছিলো।

এক সকালে কোন এক ছাউনি থেকে মাত্র সামান্য পথ অতিক্রম করেছে কাফেলা, এ সময় কাফেলার সামনের লোকেরা থেমে দাঁড়ালো।

'ডাকাত! ডাকাত! হুশিয়ার নৌজোয়ানরা! সামনে ডাকাত' – কাফেলার সামনে থেকে ঘোষণা হলো।

কাফেলার লোক-সারির দৈর্ঘ্য মাইলখানেকের চেয়েও বেশি ছিলো। কয়েকবার ঘোষণার পর কাফেলার যুবকরা সবাই তলোয়ার বর্শা নিয়ে পুরো কাফেলা নিজেদের বেষ্টনীতে নিয়ে নিলো। কয়েক জনের কাছে তীর ধনুকও ছিলো। আবার ঘোষণা হলো, 'শিশু ও নারীদের কাফেলার মাঝখানে রাখো। কিছু লোক মেয়েদের সঙ্গে থাকো।'

একদিক থেকে প্রায় পঞ্চাশজন ঘোড়-সওয়ারের কাফেলা শান্তভাবে আসছিলো। ওদের কাছে তীর-তলোয়ার থাকলেও তলোয়ারগুলো কোষবদ্ধ ছিলো। বর্শা ও কুঠারও দেখা যাচ্ছিলো কারো কারো কাছে। তারা কাছাকাছি চলে এলে সামনের দুই সওয়ার আত্মসর্পণের মতো করে দু'হাত ওপরে তুলে এগিয়ে এসে বললো .....

'আমরা বন্ধু! শত্রু মনে করবেন না আমাদের।

'তাহলে ওখানেই দাঁড়িয়ে যাও' – কাফেলার এক লোক বললো– 'শুধু একজন কাছে এসে বলো কি চাও তোমরা। আমাদের তীরন্দায, বর্শাধারী ও তলোয়ার ওয়ালাদের দেখে নাও। তোমরা এতই অল্প যে সামান্য সময়ের মধ্যেই নিজেদের খুনে ডুবে যাবে।

সেই ঘোড়সওয়ার হাতের ইশারায় সঙ্গীদের সেখানেই থেমে যেতে বললো। সব সওয়ার সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলো।

'এখন বলো কি চাও তোমরা?'

'ভয় নেই, আমরা পেশাদার লোক, আমাদের পেশা হলো আমীর লোকদের হেফাজত করা। এত বড় কাফেলার বিরুদ্ধে লড়ার মতো দুঃসাহস আমাদের নেই। আমরা এই কাফেলার খবর পেয়ে জানতে পেরেছি আশে পাশে কোথাও লুটেরারা ঘাপটি মেরে আছে। তাই আমাদের সঙ্গীদের একত্র করে বললাম, ঐ কাফেলার হেফাজত করে কিছু হালাল রুজি কামাই করে নিই। আপনাদের সফরের পথও তো অনেক বাকী। কাফেলার ওপর যেকোন সময় হামলা হতে পারে। আমাদের অনুরোধ আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন আমাদের। রাতেও পাহারা দেবো আমরা–সেই সওয়ারটি বললো।

'আমাদের সঙ্গে কত লোক দেখেছো? নিজেদের হেফাজত কি এরা নিজেরা করতে পারবে না?'

'না! এখানে আমাদের মতো একজনকেও লড়াকু ও শক্ত মনে হচ্ছে না। এটা কি জানে না লুটেরারা লড়তে এবং মরতে দারুণ অভিজ্ঞ? আপনাদের এরা যখন সঙ্গীদের দেহ রক্তাক্ত দেখবে ভয়ে পালিয়ে যাবে সব–- আপনাদের মুহাফেজ হিসেবে আমাদের নিয়ে নেন। বেশি চাই না আমরা। যা দেবেন তাই নেবো। আপনাদের সঙ্গে বড়

আমীররা আছেন। ওদের যুবতী মেয়ে এবং ছোট ছোট বাচ্চাও আছে। সবাই মিলে এতখানি পারিশ্রমিক তো দিতে পারবেন যা দিয়ে আমাদের বাল-বাচ্চারা কয়েকদিন শুকনো রুটি খেয়ে বাঁচতে পারবে।'

'আরেকটি কথা শুনুন'! আরেক সওয়ার বললো – 'আপনারা যদি আমাদের হালাল রুজির ব্যবস্থা না করেন তাহলে হয়তো একদিন আমরাও লুটপাট শুরু করে দেবো।'

'রুজির মালিক খোদা' – কাফেলা থেকে আরেকজন এগিয়ে এসে বললো – 'শোনো ভাই! খোদা হয়তো ওদের রুজির দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। না জানি এরা কতদূর থেকে আমাদের আশায় এসেছে। হালাল রুজির আশায়ই এসেছে ওরা। ওদের নিরাশ করো না। পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে নাও ওদের।'

নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাফেলার মুহাফিজ করে ওদের নিয়ে নেয়া হলো। তারপর কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। সেই পঞ্চাশ মুহাফিজ কাফেলার চারদিকে ভাগভাগ হয়ে প্রহরায় নিযুক্ত হয়ে গেলো। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিলো ওরা খেটে খাওয়া লোক, পেশাদার মুহাফিজ।

কাফেলা প্রথম ছাউনি ফেললে ওদের অনেকেই রাতভর দু'জন দু'জন করে ছাউনির চারদিক পাহারা দিলো। কাফেলার লোকেরা ওদের প্রতি আশ্বস্ত হলো। পরের রাতেও ওরা এভাবে পালা করে পাহারা দিলো।

তৃতীয় ছাউনি ফেলার পর কাফেলার সঙ্গে আরো দেড় দু'শ যাত্রী শামিল হলো।

পরের দিন কাফেলা একটি নদী ভেজা সবুজাভ পাহাড়ি এলাকা পেয়ে সন্ধ্যায় ছাউনি ফেললো। বিরামহীন পথচলার কারণে লোকজন ভীষণ পরিশ্রান্ত ছিলো। সবাই খাওয়ার পর শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লো।

মুহাফিজরা প্রতি রাতের মতো পাহারায় লেগে গেলো। অর্ধরাতের পর ছাউনির অনেক দূর থেকে পেচার ডাক ভেসে এলো। জবাবে ছাউনির কাছ থেকে কেউ পেচার ডাক ডেকে উঠলো। এসময় পঞ্চাশ ষাটটি ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের দিক থেকে ছাউনির দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। সেই পঞ্চাশ মুহাফিজের যারা পাহারা দিচ্ছিলো তারা যখন আগন্তুক সওয়ারদের দেখলো তাদের ঘুমন্ত সঙ্গীদের আস্তে আস্তে জাগিয়ে দিলো। মুহাফিজরা ও আগন্তুক সওয়াররা সবাই একত্রিত হয়ে সশস্ত্র হয়ে নিলো। মুহাফিজরা ওদেরকে জানালো কাফেলার কোথায় কোথায় আমীর ব্যবসায়ী এবং যুবতী মেয়েরা আছে।

কাফেলার কেউ টেরও পেলো না ওরা যাদেরকে মুহাফিজ হিসেবে রেখেছে তারা হাসান ইবনে সবা ও আহমদ ইবনে গুতাশের সংগঠিত ডাকাত দলের এক অংশ।

একটু পরেই ঘুমন্ত লোকদের পাইকারী হত্যা শুরু হয়ে গেলো। কেউ ঘুমেই নিহত হলো। কেউ কেউ জেগে উঠে প্রতিরোধের চিন্তা করতে করতেই ওদের তলোয়ারের নিচে বলি হলো।

লুটেরাদের আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যুবতী মেয়ে ও শিশুদের জীবিত ধরে আনতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই কাফেলার ছাউনিস্থল লাশের স্তূপে ভরে গেলো।

লুটেরারা মালামাল একত্রিত করতে শুরু করলো। সব মাল একত্রিত করে উটের ওপর ও গরু এবং ঘোড়ার গাড়িতে তুলতে লাগলো। যুবতী মেয়ে ও শিশু-কিশোরদের এক দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। ওদেরকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিলো লুটেরারা। একটু পর ওরা সব নিয়ে পাহাড় সারির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভোরের আলো ফুটে উঠলো এর কিছুক্ষণ পর। উজালা আকাশ দেখলো তার নিচের ঐ বিষণ্ণ ময়দানে ক্ষত-বিক্ষত লাশের পর লাশ পড়ে আছে হায়েনার খাদ্য হওয়ার অপেক্ষায়। লাশ ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিলো না।

কাছের এক টিলায় এক বৃদ্ধ শায়িত ছিলো। আস্তে আস্তে মাথা উঠিয়ে তিনি ময়দানের দিকে তাকালেন। এত দীর্ঘ বয়সে এমন নিষ্ঠুরতা আর কখনো তিনি দেখেননি।

কাফেলার একদিক থেকে যখন পাইকারি হত্যা শুরু হয় তিনি ছাউনির আরেক দিক থেকে কোন ক্রমে বেরিয়ে আসেন এবং এই টিলার উঁচু ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। রাতভর তিনি তার সফরসঙ্গী, নারী ও শিশুদের মরণ আর্তনাদ শুনেছেন। শোয়া থেকে উঠে টিলা থেকে নামলেন তিনি। ধীরে ধীরে হেঁটে লাশগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। তার কাছে এসব ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছিলো। তিনি খুঁজছিলেন তার গোত্রের লোকদের লাশ। কে কোথায় পড়ে আছে তার কোন হদিস ছিলো না। তার চোখ পড়লো কয়েক মাসের একটি শিশুর লাশের ওপর। তার চোখ এই প্রথম চিক চিক করে উঠলো। বহু কষ্টে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি। এক দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটি উট চার দিকের এই খুনে বিভীষিকা থেকে নির্বিকার হয়ে ঘাস খাচ্ছে।

বৃদ্ধ আকাশের দিকে তাকালেন। যেন আকাশের মালিককে খুঁজছেন তিনি। হঠাৎ কি মনে হতেই এক দৌড়ে উটের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তার লাগাম ধরে সেখানেই বসিয়ে দিলেন। এক দিকে তার হাওদা পড়ে থাকতে দেখে উঠিয়ে উটের পিঠে রাখলেন। তারপর বাচ্চাটির রক্তাক্ত লাশ নিয়ে উটে সওয়ার হয়ে গেলেন।

তার উটের রুখ ছিলো মারু।

সুলতান মালিক শাহ অন্যান্য বাদশাদের মতো ছিলেন না। তবুও তিনি যেখানে থাকতেন, তা মহলের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। একদিন তিনি তার সভাষদদের বললেন – 'আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, কাফেলা লুট করার ব্যাপারটা মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে .....

'আমরা তো কাউকে পাকড়াও করতে পারিনি। আসলে পাকড়াওকারী ও সাজাদানকারী তো আল্লাহ। তিনিই আমাকে সাহায্য করেছেন। মারুর কাফেলারা এখন নিরাপদ।'

এসময় দারোয়ান এসে জানালো, এক বৃদ্ধ তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বৃদ্ধ কোত্থেকে এসেছে, কি চায় এগুলো সে জিজ্ঞেস করেছে কিনা? দারোয়ান জানালো, তার অবস্থা ভালো নয়। মনে হয় দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছে। এজন্য কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সঙ্গে তার রক্তাক্ত এক বাচ্চার লাশ।

'লাশ? ছোট বাচ্চার লাশ?' – মালিক শাহ চমকে উঠে বললেন – 'তাকে জলদি ভেতরে পাঠাও।'

বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাকাসে মুখে ভেতরে ঢুকলেন। সুলতান তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন –

'মহামান্য বুযুর্গ! কোন বিপদ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে?'

'মহামান্য সুলতান! এক বাচ্চার লাশ নিয়ে এসেছি' বৃদ্ধ বললেন – 'এটা আপনার বাচ্চা' – বৃদ্ধ সুলতানের পায়ের সামনে লাশ রেখে দিলেন – উটে করে তিন দিন তিন রাত সফর করেছি। না উটটি কিছু খেয়েছে না আমি .... এটা আল্লাহর আমানত ছিলো, সেলর্জুকি সুলতান যার খেয়ানত করেছেন ...... দেখে নিন সুলতান! নিষ্পাপ এই বাচ্চাটিকে দেখে নিন। এই অবোধ বাচ্চা, মরার সময় তার এই অনুভূতিও হয়নি যে, তার মার নিরাপদ কোল থেকে মৃত্যু তার কোলে তুলে নিচ্ছে।

সুলতান লোকদের ডেকে বাচ্চাকে গোসল দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন।

'হে বুযুর্গ! এই বাচ্চাটি কার এবং কে একে হত্যা করেছে? – অভিযোগ অনুযোগের আগে এটা বলে ফেললে কি ভালো হয় না'?

'এটা আমার কোন এক সফরসঙ্গীর বাচ্চা। কে তার মা বাপ তা আমি জানিনা। তারা কে ছিলো, কাত্থেকে এসে কোথায় যাচ্ছিলো তা আর কোন দিন জানতে পারবো না। কাফেলার ওপর ডাকাতরা হামলা করে সব ইতিহাস মুছে দিয়েছে।'

বৃদ্ধ পুরো ঘটনা শোনালেন। সুলতান রাগে ফেটে পড়লেন। উঠে ক্ষুব্ধ পায়ে কামরায় পায়চারী করতে লাগলেন।

'কয়েক বছর আগে কাফেলার ওপর হামলা শুরু হয়েছিলো' – বৃদ্ধ বললেন – 'তারপর সেই হামলা বন্ধ হয়ে গেলো। এর কারণ এই নয় যে, আপনি ডাকাতদের শায়েস্তার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বরং লোকেরা সফরই বন্ধ করে দেয়। দুর্ভাগ্য আমাদের, আপন মঞ্জিলে নিরাপদে পৌঁছতে পারবো এই ভাবনায় আমরা বের হয়েছিলাম।

'এই বাচ্চার লাশ এখানে কেন নিয়ে এসেছেন?' – সুলতান থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'সুলতানকে এটা দেখানোর জন্য যে, রাজাদের পাপের সাজা পায় প্রজারা। আমি আহলে সুন্নাতের সমর্থক। আমার পরিণাম নিয়ে ভীত না আমি। খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা বলবো আমি, যাদের কালে মুসলমান অমুসলমান সবার জানমাল এবং ইযযত নিরাপদ ছিলো। তারা প্রজা ও প্রজা-সন্তানদের আল্লাহর আমানত মনে করতেন। বাচ্চার লাশ আমি এজন্য এনেছি, এর নিষ্পলক স্থির চোখে যেন সুলতান তার পাপের প্রতিবিম্ব দেখে নেন।'

'হ্যাঁ দেখেছি আমার বুযুর্গ! ঐ ডাকাতদের আমরা পাকড়াও করবোই।'

'আমাদের কাফেলার সব যুবতী মেয়ে ও শিশু কিশোরদের ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। বড় বড় আমীর উমারাদের ঘরে ওদের বিক্রি করা হবে। রাসূল (স)-এর উম্মতের সন্তানদের ওরা নর্তকী আর শয্যাসঙ্গিনী বানাবে। সারা জীবন ওরা তাদের সুলতানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সুলতানের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া উচিত। সেই কাফেলার মৃত আত্মাদের এই পয়গামই আমি নিয়ে এসেছি।'

সুলতান বৃদ্ধের কথার ধরনে মোটেও ক্ষুব্ধ হলেন না। বিষণ্ন গলায় হুকুম দিলেন বৃদ্ধকে যেন সসম্মানে রাষ্ট্রীয় মেহমানখানায় রাখা হয়।

মালিক শাহ সেদিনই সিপাহসালার ও মারু শহরের কতোয়ালকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন –

'এটা নিশ্চয় বড় কোন সুসংগঠিত দলের কাজ। গোয়েন্দাবৃত্তি ছাড়া এর সন্ধান পাবে না তোমরা। এসব ছোট ছোট কেল্লার আমীরদের ওপরও আমার সন্দেহ আছে। ওদের সঙ্গে আমাদের বিনয়ী আচরণ করা উচিত, না হয় ওরা স্বঘোষিত রাজা বনে যাবে। এজন্য ওদের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাতে চাইনা, না হয় ওরা বিদ্রোহী হয়ে যাবে।

'মহামান্য সুলতান? – সিপাহসালার বললেন – 'কেল্লা শাহদরের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশকে আমার সন্দেহ। সে কোন অপতৎপরতা চালাচ্ছে মনে হয়। শাহদরে অন্য কেল্লার তুলনায় আবাদী একটু বেশি। সেখান থেকে আহমদ সহজে ফৌজ সংগ্রহ করতে পারবে।

'কিছু গুণাগুণ দেখেই তাকে আমি শাহদরের আমীর বানিয়ে ছিলাম। সবাই জানে সে আহলে সুন্নত। যখন সে বক্তৃতা দেয় কাফেরের পাথর মনও গলে যায়। তাছাড়া তার পূর্বের আমীর যাকিরও তার ব্যাপারে অসিয়ত করে গিয়েছিলো' –সুলতান বললেন।

'গোস্তাখি মাফ সুলতানে মুহতারাম' – কতোয়াল বললেন – 'কোন বক্তার কথায় মুগ্ধ হওয়া আর সেই বক্তার মনের গোপন অভিসন্ধি জানা ভিন্ন কথা। আর এটা এমন বিষয় যা জানা খুবই জরুরী। বিভিন্নভাবে আমি জানতে পেরেছি শাহদরে ইসমাঈলিরা একত্রিত হচ্ছে।'

'এই সন্দেহ অন্য কারণেও দৃঢ় হচ্ছে' – সিপাহসালার বললেন – 'আহমদ কেল্লার আমীর হয়েই সুন্নীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কাজ করার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ইসমাঈলিদের মুক্ত করে দেয়। কিন্তু আমরা তাকে এখন কিছু বলতে পারছি না, কারণ এরপর তিন বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এখন আমাদের উচিত অত্যন্ত বিচক্ষণ,তৎপর ক্ষিপ্র ও যে-কোন কথার গভীরে পৌঁছার মতো তীক্ষ্ণ মেধার কোন গুপ্তচরকে শাহদরে পাঠানো। তবে তাকে উঁচু স্তরের লোক হতে হবে যাতে কেল্লাদারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।'

'তোমাদের কাছে কি এমন কেউ আছে'? – সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার কাছে এমন দু'জন ছেলে আছে' কতোয়াল বললেন – 'আপনি হুকুম দিলে ওদের মধ্যে যে বেশি উপযুক্ত তাকে শাহদর পাঠিয়ে দেবো। অবশ্য এর আগে তাকে কিছু দিন প্রশিক্ষণও দেবো।'

'পাঠিয়ে দাও তাকে। ফৌজ পাঠাতে হলেও আমি আপত্তি করবো না। আমি আমার নিজের অপমান বরদাশত করবো, কিন্তু আমার ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি শব্দও বরদাশত করবো না।'

কতোয়াল যার কথা বলেছিলো সে হলো ইয়াহইয়া ইবনে হাদী। প্রায় ত্রিশ বছরের সুদর্শন এক যুবক। লম্বা ঋজু ভঙ্গি এবং মেদহীন সুগঠিত দেহাবয়বের কারণে প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা করা যায়। ইরাকী বংশোদ্ভূত হলেও এখন সে তুর্কী। তীরন্দাযি, তলোয়ার চালনা ও শাহসওয়ারীতে আশে পাশে তার সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কতোয়াল আট দশদিন তাকে নিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন। শাহদর পাঠানোর এক দিন আগে কতোয়াল তাকে বলেন –

'ইবনুল-হাদী! তুমি তো জেনেছো, শাহদর যাচ্ছো তুমি গোয়েন্দাবৃত্তি করতে। আমি আশা করছি সফল হয়ে ফিরবে তুমি। তবুও আরেকবার শুনে নাও, আমাদের আশংকা হলো আহমদ গোপনে নাশকতামূলক কোন কাজে লিপ্ত। এমনও হতে পারে ইসমাঈলি ও বিদ্রোহীরা তাকে খেলাচ্ছে। এমন না হলেও তুমি বের করবে সালতানাতের বিরুদ্ধে তার গোপন কোন অভিসন্ধি আছে কিনা।'

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো কিভাবে?' – ইয়াহইয়া জিজ্ঞেস করলো।

'সিনান তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। সে-ই এ কাজ করবে, আল্লাহর হাতে তোমাকে সোপর্দ করছি।

পরদিন ভোরে ইয়াহইয়া ও সিনান শাহদর রওয়ানা হয়ে গেলো।

১১

কাফেলা লুটের প্রায় আট-দশ দিন পর আহমদ লুট করা মালামালগুলো পায়। একদিন হাসান ইবনে সবা মুচকি হেসে আহমদকে বললো।

'মুহতারাম উস্তাদ! আচ্ছা এত ধন-সম্পদ আর এতগুলো সুন্দরী মেয়ে আর কোন কাফেলা থেকে আপনি পেয়েছেন?'

'না হাসান! এতদিনের সব লুট করা মাল একত্রিত করা হলেও এই এক কাফেলা থেকে লুট করা মালের সমান হবে না' – একথা বলে আহমদ থেমে গেলো, হাসানের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললো – 'কেন হাসান! আজ যেন তোমাকে বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ গুরু! এসব মালের কারণে খুশী না, আমি খুশী এজন্য যে ডাকাতির ব্যাপারে আমার বলে দেয়া পদ্ধতি সফল হয়েছে। এখন এই সফলতা উপলক্ষে উৎসব করা উচিত। আর এই উৎসবে শহর ও শহরের আশে পাশের লোকদের নিমন্ত্রণ করা হবে।'

'লোকদের খাওয়াবে না কি? নাচগান এসবও হবে? যাই করো আগে ভাবতে হবে, এই উৎসবের উপলক্ষ সম্পর্কে লোকদের কি বলবে'?

'বলার দরকার কি? উৎসব তো আমরা করতেই পারি। ঘোষণা করা হবে, দু'দিন ব্যাপী ঘোড়দৌড়, নেযাবাদী, তীরন্দাযী, তলোয়ার চালনা, মল্লযুদ্ধ এসবের প্রতিযোগিতা হবে এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে ... এতে আমাদের উৎসবও হবে শহরবাসীও খুশী হয়ে যাবে। কারণ এদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রাখাটা জরুরী। তবে লোকদের সামনে আমার চেহারা উন্মুক্ত করবো না, আবৃত রাখবো পরে আমি অন্য রূপে আত্ম প্রকাশ করবো। সবার মনোরঞ্জনের জন্য এই উৎসব খুবই জরুরী।'

এই প্রস্তাবে আহমদ বেশ খুশী হলো। তখনই শহর ও শহরের আশে পাশে নিজস্ব লোকদের দিয়ে উৎসবের ঘোষণা দেয়া হলো। ঘোষণায় দারুণ কাজ হলো। উৎসবের একদিন আগে থেকেই লোকেরা শাহদর পৌঁছতে লাগলো। শহরের আশে পাশে অসংখ্য তাঁবুর এক গ্রাম গড়ে উঠলো। আসতে লাগলো অসংখ্য উট আর ঘোড়ার পাল। হাসান শাহদরের মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের এই ভীড় দেখে তার গুরু আহমদকে বললো–

'এরাই সেই খোদার সৃষ্টি যাদেরকে আমাদের শিষ্য বানাতে হবে। এটা কি সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয় হাসান? এটা সহজ না হলেও অসম্ভবকে আমাদের সম্ভব করে দেখাতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা সেলজুকি প্রশাসন। আমরা সংখ্যায় অল্প। মানুষের হৃদয় আমাদের কব্জা করতে হবে। তুমি আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। মানুষের এই ভীড় দেখে এখন বুঝতে পারছি তোমার এই বুদ্ধি কতটা মূল্যবান।'

'আসলে মানুষের মন বিনোদন প্রিয়। বাস্তবতা তার কাছে বড় অপ্রিয়। সে মনের ও শরীরের স্বাদ চায়। আপনি আমার গুরু আমার সূর্য। আপনার সামনে সামান্য একটি প্রদীপদানি ছাড়া আমি কিছুই না। আপনার সেই সবক আমার মনে আছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সে ঐ দুর্বল বাসনার গোলাম। এই ভীড়ে বড় বড় আমীররাও আছে, যাদের দুর্বলতা হলো ক্ষমতা আর খ্যাতির লোভ। আর দরিদ্ররা এমন খোদাকে খোঁজে যিনি তাদের আমীর বানানোর শক্তি রাখেন।'

'এই খোদা তাদেরকে আমরা দেবো। আমাদের ফেরকায়ে বাতিনায় ওদেরকে ভেড়াতে হবে।'

পরদিন সকালে বিশাল এক ময়দানে কয়েক হাজার লোক জড়ো হলো। ময়দানের এক পাশে প্রতিযোগিদের বসানো হলো সুশৃঙ্খল রূপে। ওখানে কোন দর্শকদের যাওয়া বারণ করে দেয়া হলো।

উঁচু সমতল এক জায়গায় আহমদ ইবনে গুতাশের জন্য সুসজ্জিত এক সামিয়ানা টানানো হলো। এর নিচে স্থাপিত হলো রাজকীয় কুরসী। চার পাশে রঙিন ঝলমলে

পোশাকে সান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ দুটি নাকারা বেজে উঠলো। ময়দানের এক পাশ থেকে আহমদ ইবনে গুতাশ শাহী মেহমানদের নিয়ে রাজকীয় চালে আসতে লাগলো। তার সঙ্গে ছিলো ধবধবে সাদা পোশাক গায়ে এবং সাদা রুমালে অর্ধ চেহারা আবৃত এক লোক। এতে কাছ থেকেও তার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না। এ হলো হাসান ইবনে সবা। আহমদ হাসান থেকে কয়েক কদম দূরত্ব বজায় রেখে এমন বিনীত ভঙ্গিতে চলছিলো, মনে হচ্ছিলো এখানে সবচেয়ে সম্মানিত লোক হাসানই।

সামিয়ানার নিচের মঞ্চে উঠে সবাই যার যার কুরসীতে বসে গেলো। আহমদ তার আসন থেকে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে উঁচু গলায় বললো –

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য প্রত্যেকেরই মুজাহিদ হওয়া জরুরী। জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। আমি দেখতে চাই আমাদের মধ্যে কারা দুশমনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলতে সক্ষম। এজন্যই এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে'।

তারপর সে হাত উঁচু করে ইংগিত করতেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। প্রথম ঘোড়-দৌড় শুরু হলো। দর্শকরা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে এবং বিভিন্নভাবে মুগ্ধতা প্রকাশ করলো। এরপর ঘোড়-সওয়ারদের ম্যাজিক দেখানোর প্রতিযোগিতা হলো। তারপর ময়দানে নামলো উট-সওয়াররা। এসব শেষ হওয়ার পর ঘোষণা এলো, এখন তীরন্দাযদের প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চারটি লোক দেড় দু'শ কবুতর ভর্তি বিরাট এক খাঁচা নিয়ে এলো ময়দানে। বাইরে থেকে খাঁচার ভেতরে দেখা যাচ্ছিলো কবুতরের পাখা ঝাপ্টানি। একজন ঘোষণা করলো, একটি করে কবুতর ছাড়া হবে আর একজন করে তীরন্দাযকে তীর ছুঁড়ে কবুতরটিকে ফেলতে হবে। এক তীরন্দায একবারে না পারলে তিনবার তীর ছুঁড়তে পারবে। তবে যে প্রথম তীরেই কবুতরকে নিশানা বানাতে পারবে সে প্রথম পুরস্কার পাবে।

প্রায় শ'খানেক তীরন্দায এক দিকে অপেক্ষা করছিলো। এক তীরন্দায এগিয়ে এলো। খাঁচা থেকে একটি কবুতর উড়িয়ে দেয়া হলো। তীরন্দায উড়ন্ত কবুতরকে লক্ষ্য করে তীর চালালো। কবুতর একদিকে সরে গেলো। নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এভাবে তিনবারই তার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আরেক তীরন্দায ময়দানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। আরেকটি কবুতর বের করা হলো, কিন্তু সেও ব্যর্থ হলো। এভাবে দশ বারজন তীরন্দায বীর দর্পে এগিয়ে এলো এবং ব্যর্থ হয়ে নতমুখে ফিরে গেলো।

আরেক তীরন্দায এলো। আরেকটি কবুতর ছোড়া হলো। কিন্তু তারও তিনটা তীর বেকার গেলো, কবুতর সারা ময়দানে একবার চক্কর দিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে ওপর দিকে উড়ে যেতে লাগলো। দর্শকরাও সেই কবুতরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মঞ্চের সামনের দিকে যেসব দর্শক ছিলো হঠাৎ সে দর্শকসারি থেকে একটি তীর উড়ে গিয়ে কবুতরের পেট ভেদ করে গেলো। কবুতরটি ছটফট করতে করতে নিচের দিকে আসতে লাগলো। দর্শকদের মধ্যে স্তব্ধতা নেমে এলো। যেন কবুতরের ছটফটানিতে তাদের ভেতরও ছটফটানি শুরু হবে এখনি।

'কে? কে এই তীরন্দায? সামনে এসো, খোদার কসম! একে আমার সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে যাবো'– আহমদ বসা থেকে উঠে বিস্ময়ে বলে উঠলো।

দশর্কদের ভেতর থেকে এক ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এলো। হাতে তার ধনুক, পিঠে তূনীর বাঁধা।

'কি নাম তোমার? এসেছো কোত্থেকে? না কি শাহদরেই থাকো'?

'আমার নাম ইয়াহইয়া ইবনে হাদী! অনেক দূর থেকে এসেছি। লোকদের এত ভীড় দেখে এখানে ঢুকেছিলাম। অনুমতি পেলে চলন্ত ঘোড়া থেকে তীরন্দাযী প্রদর্শন করবো আমি। কথা দিচ্ছি না তবে চেষ্টা করবো আপনাদের আনন্দ দিতে।'

'অবশ্যই অবশ্যই।'

ইয়াহইয়া কবুতরের খাঁচা ওয়ালা একজনকে বললো, সে ঘোড়দৌড় শুরু করলে যেন একটি কবুতর ছেড়ে দেয়া হয়। ময়দানের এক দিকে গিয়ে সে ঘোড়া ছুটালে একটি কবুতর উড়িয়ে দেয়া হলো। ইয়াহইয়া ছুটন্ত ঘোড়া থেকে কবুতরের দিকে তীর ছুঁড়ে দিলো। কবুতরের একটি পালক কেটে তীরটি আরো ওপরের দিকে চলে গেলো এবং হেলে দুলে কবুতরটি নিচে এসে পড়লো।

'কি দেখছি! এ কি দেখছি! তোমাকে আমি যেতে দেবো না। শাহদরই তোমার মঞ্জিল' – আহমদ গলা ফাটিয়ে বললো।

'একটি খালি উট ময়দানে ছেড়ে দেয়া হোক' – ইয়াহইয়া চলন্ত ঘোড়ায় থেকে উঁচু আওয়াজে বললো।

একটি বিশালকায় উট তিন চারজন পেছন থেকে দৌড়িয়ে ময়দানে নিয়ে গেলো। ইয়াহইয়া ঘোড়া ঘুরিয়ে উটের পাশে নিয়ে এসে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো। ঘোড়াকে ছুটতে দেখে উটও তার গতি তীব্র করে দিলো। উটের পিঠে হাওদা বসানো ছিলো। ইয়াহইয়া রেকাবি থেকে পা বের করে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উটের পিঠে চলে এলো এবং উটের লাগাম ধরে ফেললো। ঘোড়া দূরে সরে গিয়েছিলো। ইয়াহইয়া এবার উটকে ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলো। পরমুহূর্তেই উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে এসে চড়ে বসলো। এরপর ঘোড়া ঘুরিয়ে দর্শক সারির সামনে গিয়ে নেমে পড়লো।

প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার দু'দিন আগে ইয়াহইয়া শাহদর পৌছে। তার মিশন কিভাবে শুরু করা যায় এনিয়ে ভাবতে থাকে। তারপর এই প্রতিযোগিতা উৎসব শুরু হলে সেও দর্শক হয়ে এখানে আসে। তীরন্দাযদের একের পর এক তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখে নিজের জায়গায় বসেই তীর ছুঁড়ে দেয়। আহমদ ইবনে গুতাশেরও নজর কাড়তে সফল হয়। আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঘোড়ার এই ভেল্কিও দেখিয়ে দেয়।

★ ★ ★ ★

এরপর যত তীরন্দাযই এলো কেউ কোন কবুতরের পালক পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারলো না। হাসান নিচু স্বরে আহমদকে বললো,

'ঐ শাহসওয়ারকে তো সাধারণ কোন যুবক মনে হচ্ছে না'।

'তাহলে তো ওকে আমার এখানে রেখে দিতে হবে। এধরনের যুবকই আমাদের দরকার' – আহমদ বললো। 'জিজ্ঞেস করা হোক, মুসলমনাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কোন্ ফেরকার কে জানে?'

আহমদ এক চাপরাশিকে দিয়ে ইয়াহইয়াকে ডাকিয়ে এনে তার পাশে বসালো। ময়দানে আরো হরেক রকমের খেলার প্রতিযোগিতা হচ্ছিলো সেদিকে তার কোন নজর ছিলো না। ইয়াহইয়ার সাথে কথা বলতে সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো সে কোথায় যাচ্ছে।

'কোথায় আমার মঞ্জিল আমি জানি না, হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি' – ইয়াহইয়া বললো।

'আচ্ছা পরিষ্কার করে কিছু বলবে না তুমি? তোমার কথা আমার বেশ ভালো লাগছে। আমার কাছে কয়েকদিন মেহমান হতে কি তোমার আপত্তি আছে'? – আহমদ জিজ্ঞেস করলো।

'থাকবো কয়েক দিন এখানে। যদি আমার মনের শান্তি মেলে এখানে এই শহরকেই তাহলে আমার ঠিকানা বানাবো। কিন্তু আমাকে এখানে রেখে কি করবেন আপনি?'

'আমি চাই লোকদের তুমি তীরন্দাযী শিখিয়ে এখানকার জন্য এক মুহাফিজ বাহিনী তৈরী করে দাও। প্রত্যেক মুহাফিজকে শাহসওয়ার করে গড়ে তোল।'

'আপনি কি ফৌজ তৈরী করতে চাচ্ছেন?' – ইয়াহইয়া সতর্ক গলায় এটা জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু সে তখনো টের পায়নি তার সামনে কত বড় ঘাঘু বসে আছে।

'ফৌজ? ফৌজ বানাবো কি করে আমি? আমি তো এখানকার আমীর মাত্র। ফৌজ তৈরী করা সুলতানের কাজ। আমি কেবল এখানকার লোকদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে চাই। তুমি দেখেছো এখানকার কারোই নিশানা ঠিক না। ঘোড়-সওয়ারীতে যথেষ্ট অভিজ্ঞও কেউ নেই। যদি একটি বাহিনীর আকারে লোকদের তৈরী করি আমি তাহলে সময়ে তা সুলতানেরও কাজে আসবে। তুমি নিশ্চয় আহলে সুন্নতের?'

'আমি মুসলমান। কিন্তু নানান আকীদা ও ফেরকার জটপাকানিতে ফেঁসে গেছি। চিন্তা করতে করতে পাগল হয়ে যাচ্ছি– কোন আকীদা খোদার অবতীর্ণ আর কোনটা মানুষের বানানো। কখনো বলি ইসমাঈলিরা সঠিক কখনো বলি আহলে সুন্নত সঠিক, আমি তো রণাঙ্গনের লড়াকু ছিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে এসব প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে আমাকে পথহারা মুসাফির বানিয়ে দিয়েছে। মন আমার বড় অস্থির।

আহমদ হাসানের অর্ধ আবৃত মুখের দিকে তাকালো। চোখে চোখে হাসান কি যেন বললো। আহমদ বললো,

'আমরা তোমাকে হারিয়ে যেতে দেবো না। আল্লাহ তাআলা এই মহান বুযুর্গকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি পরম অনুগ্রহ করেছেন। তার কাছে আমার দরখাস্ত হলো, তিনি যেন তোমাকে তার ছাত্রের মর্যাদা দিয়ে তোমার মনের সব দ্বিধা দূর করে দেন। আশা করি তোমার মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে।'

'হে পথহারা মুসাফির!' – হাসান গম্ভীর গলায় বললো – 'রণাঙ্গনের বীর! তোমাকে ধর্মীয় পাণ্ডিত্য শেখার ঝামেলায় ফেলবো না। আমার কাছে সামান্য সময় রেখে তোমাকে পথের রৌশনী দেবো। তুমি শান্তি ফিরে পাবে।'

দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিলো ইবনে গুতাশ ঘোষণা দিলো, প্রতিযোগিতার বাকীটা কাল সকালে অনুষ্ঠিত হবে। আজ যারা বিজয়ী হয়েছে প্রতিযোগিতা শেষে তাদের পুরস্কার দেয়া হবে।

আহমদ ইবনে গুতাশ উঠে দাঁড়ালো। শাহী মেহমানসহ অন্যরাও একে একে উঠে সবাই চলে গেলো। আহমদ ইয়াহইয়াকে তার ঘরে নিয়ে গেলো। পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর তাকে দস্তরখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। খাওয়ার ফাকে আহমদ ও ইয়াহইয়ার মধ্যে কথা হলো অনেক। ইয়াহইয়া কথায় কথায় জানালো, সে তার গোত্রের সরদার বংশের ছেলে। তার ব্যক্তি প্রতিপত্তিতে শুধু তার গোত্রই নয় অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও তাকে সমীহ করে। খাবারের কিছুক্ষণ পর আহমদ ইয়াহইয়াকে বললো।

'তোমাকে আজ বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তোমার জন্য এখানেই একটা কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতের খাবার ওখানেই পৌছে যাবে। আজ বিশ্রাম করো। কাল কথা হবে।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। অনবরত সফরে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আরেকটা কথা, আমার চাকর আমার সঙ্গেই আছে। তার জন্য থাকবার একটা' ....

'হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যাবে।'

ইয়াহইয়া যাকে চাকর বানালো সে হলো সিনান। সিনান তার সঙ্গে এসেছে মারুর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। এক চাপরাশিকে ডেকে ইয়াহইয়াকে তার কামরায় পৌছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ইয়াহইয়া কামরায় পৌছে ভেতরের সাজসজ্জা দেখে তাজ্জব বনে গেলো। সে দারুণ খুশি ছিলো ঠিক জায়গায় পৌছেছে বলে এবং কয়েক দিনের মধ্যে তার মিশন শেষ করতে পারবে বলে।

'এখন বলো হাসান!' ইয়াহইয়াকে পাঠিয়ে দিয়ে আহমদ বললো – 'তোমার কি মনে হয়? আমরা তো ওকে দিয়ে কিছু তীরন্দায আর শাহসওয়ার বানিয়ে নিতে পারবো। 'কেল্লা আল মাওত' পর্যন্ত যতগুলো কেল্লা আছে তা আমাদের দখল করতে হবে। লড়াই করেই আমাদের নিতে হবে এসব কেল্লা। এজন্য অল্প সংখ্যক হলেও আমাদের জানবায ফৌজ প্রয়োজন। একে বুদ্ধিধরই মনে হয়। সে নিজ এলাকার সরদার শ্রেণীর লোক হওয়ায় কয়েক গোত্রের ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আমাদের মতো করে একে গড়ে নিলে বড় কাজে আসবে সে।'

'হ্যাঁ গুরু! ওকে কাজের লোকই মনে হয়। তবে নজর রাখতে হবে সে বিশ্বস্ত কি-না। এমন যে না হয় যে, তাকে আমাদের গোপন সব কিছু বলে দিলাম। পরে একদিন সে গায়েব হয়ে গেলো। খুব সতর্ক থাকতে হবে।'

★ ★ ★ ★

যে গোয়েন্দা হয়ে এলো তাকে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু হয়ে গেলো। পরদিন সকালে নাস্তার পর এক চাপরাশি এসে তাকে হাসান ইবনে সবার কাছে নিয়ে গেলো।

'এখন বলো ইয়াহইয়া! তোমার মনে কিসের দ্বন্দ্ব, কিসের অস্থিরতা' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'আমি কি আল্লাহর নির্দেশিত সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর আছি? আমার আকীদা কি সঠিক?'

'আসল প্রশ্ন এটা নয় ইয়াহইয়া! আসল প্রশ্ন সেটা যা তোমার মনে ছটফট করছে, তোমাকে অস্থির করে তুলছে। সেটা হলো খোদার কি অস্তিত্ব আছে? থাকলে তিনি কোথায়? খোদা যদি দৃশ্যমান না হন তাহলে এই আকীদা আর এই রাস্তা কি করে সঠিক হবে?'

হাসান ইয়াহইয়ার চোখে চোখ রেখে এমন করে কথা বলছিলো যেন পাথরি ঝর্ণায় জলতরঙ্গের শব্দ ভেসে আসছে। ইয়াহইয়ার মনে এ ধরনের কোন প্রশ্নই ছিলো না। সে আশা করেছিলো, এরা ইসমাঈলি হলে তার প্রশ্ন শুনে ইসমাঈলি ধ্যান-ধারণা তার ভেতর ঢুকাতে শুরু করবে। কিন্তু অবস্থা এমন হয়ে গেলো, যেন দুশমন তাকে হামলা করে নিরস্ত্র করে ফেলেছে। অথচ হাসান এখন মাত্র তার কথা শুরু করেছে।

'মানুষের নজরে যা পড়ে তা খোদা নয়' – হাসান বলে গেলো – 'দৃষ্টিমান খোদা একজন নয়, কয়েকজন, মানুষ এসব খোদা স্বহস্তে বানিয়েছে। কেউ পাথর কেটে খোদার রূপ দিয়েছে, কেউ খোদাকে বানিয়েছে নারীরূপে। কেউ সাপ, কেউ বাঘ ইত্যাদিকে খোদার রূপ কল্পনা করেছে। আসল কথা হলো খোদা মানুষের সৃষ্টি নয়, মানুষ খোদার সৃষ্টি। মানুষের সব কিছুই খোদার নিয়ন্ত্রিত। তুমি যে এখানে পৌঁছেছো এটাই সরল পথ। সব দ্বিধা তোমার এখান থেকেই দূর হয়ে যাবে। তবে এটা একদিনের ব্যাপার নয়। তুমি নিজেকে আমার কাছে সোপর্দ করে দাও। পূর্ণ মানুষ সেই হয় যে নিজেকে কোন পীর মুরশিদের কাছে সোপর্দ করে দেয়।'

'হযরত! আমাকে আপনার মুরিদ বানিয়ে নিন' – হাসান আওয়াজে আবেগ ঢেলে বললো।

'দীনের তাবলিগ করা আমার জন্য ফরজ। তুমি বলেছিলে রণাঙ্গনের বীর তুমি। খোদা তোমাকে আপন মঞ্জিলে পৌঁছে দিয়েছেন। তোমার মতোই এখানকার লোকদেরকে তোমার তীরন্দায আর শাহসওয়ার বানাতে হবে। তৈরী করতে হবে ওদেরকে কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য। খোদার কাছে তোমার মর্যাদা আমার চেয়ে উঁচু। এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা করো না।'

ইয়াহইয়ার সঙ্গী সিনানের থাকার ব্যবস্থা করা হলো অন্যখানে। সিনানকে ইয়াহইয়া ভালো করে বলে দিয়েছে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে যেন এমন জবাব দেয় যে, লোকেরা তাকে আহমক বা পাগল ভেবে কেটে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর ইয়াহইয়াকে ইবনে গুতাশ ডেকে নিয়ে গেলো। তার কাছে তখন চারটি মেয়ে বসা ছিলো। রূপের প্রতিযোগিতায় কারো চেয়ে কেউ যেন কম নয়। আহমদ ইয়াহইয়াকে বসিয়ে বললো,

'ইয়াহইয়া! তোমার সৌভাগ্য, এত বড় একজন আলেম তোমাকে তার ছাত্র বানিয়ে নিয়েছেন। আর তিনি তোমাকে এখানে থেকে তীরন্দাযী ও শাহসওয়ারী শেখাতে বলেছেন। তিনি তো কারো সঙ্গেই কথা বলেন না, খোদার জপে ডুবে থাকেন আর তার সঙ্গে কথা বলেন।'

'হ্যাঁ তিনি যা বলবেন তাই করবো আমি। যাদেরকে আমার শেখাতে হবে তাদেরকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন।'

'এই মেয়েদেরকে দিয়ে বিসমিল্লা করো, এরা আমার খান্দানের মেয়ে। তোমার কাছ থেকে শিখে এরা অন্য মেয়েদেরকেও শেখাবে। প্রথমে তীরন্দাযী পরে ঘোড় সওয়ারীর প্রশিক্ষণ দেবো। এজন্য তোমাকে নিয়মিত সম্মানিও দেবো।'

'আজ থেকেই আমি কাজ শুরু করে দেবো। তবে তীরন্দাযীর জন্য আড়াল দেয়া জায়গা দরকার। যাতে ছুটন্ত তীরে লোকেরা যখমী না হয়ে পড়ে।'

ধনুক, তীর, তুনীর ও নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা হলো অল্প সময়ের মধ্যেই। ইয়াহইয়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলো। প্রথম ওদেরকে ধনুক টানা ও বাহু সোজা করার নিয়ম শেখালো সে। আর তাদেরকে বলে দিলো, বাহু যে-কোনভাবেই হোক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাহু ও হাতের কোন অংশই তীর ছোঁড়ায় কাঁপতে পারবে না।'

ওদিকে ময়দানে দ্বিতীয় দিনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। হাসান ও আমহদ চলে গেলো ওখানে। সেদিন দর্শকসংখ্যা আরো দ্বিগুণ হলো। এজন্য দু'জনেই দারুণ খুশী। তবে প্রতিযোগিতার দিকে তাদের কোন আগ্রহ ছিলো না। তাদের মিশন নিয়ে তারা কথা বলতে লাগলো।

ঐ চার মেয়ে যারা তীরন্দাযী শিখছিলো ওদের মধ্যে হাসানের সঙ্গে আসা ফারহী এবং যাকিরকে বিষ প্রয়োগে হত্যাকারী যিররীও ছিলো। যিররীর তো অসাধারণ রূপ ছিলোই, তারপর আহমদ ওকে এমন করে গড়ে তোলে যে, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ বা ঘাঘুরাও তার কাছে এসে মোহিত না হয়ে পারবে না।

যিররী তার গুরুর কাছ থেকে প্রতারণার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। এ বিশ্বাস তার ভেতরে গেঁথে যায় যে, নারীর রূপ পুরুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। আহমদ তার ভেতরের সব আবেগ অনুভূতি ধ্বংস করে দেয়। সে জানতো, নারী হোক পুরুষ হোক আবেগকে মূল্য দিলে সে কোন কাজেরই থাকে না। এজন্য আহমদ ইবনে গুতাশ তাকে অনেকবার বলেছে।

'মনে রেখো যিররী। তুমি এমন এক রূপের ফাঁদ পেতে থাকবে যাতে বিষধর নাগ এবং হিংস্র প্রাণীও এসে তোমার গোলাম বনে যাবে। তার কাছে তুমি এমন ছলনার জাল হয়ে যাও যে, সে একেই রূপের আগুন বলে আঁকড়ে ধরবে। তাকে

বুঝিয়ে দিবে খোদার পরে সেই তোমার বড় প্রেমিক। তাকে ছাড়া তোমার প্রতিটি মুহূর্তই মৃত। এভাবে রূপ আর যৌবনের জাল তার ওপর বিছিয়ে তার চামড়ার নিচ থেকে রক্ত শুষে নাও।'

এই সবক ওকে কথাতেই নয় হাতে-কলমেও শিক্ষা দিয়েছে আহমদ ইবনে গুতাশ। তার আশে পাশে বয়সে একটু বড় আরো তিন চারজন মেয়ে ছিলো। তারা যিররিকে আলোতে জ্বলে উঠা দুর্লভ পাথর বা হীরা বানিয়ে দিয়েছিলো। একদিন তাকে কারুকাজে সাজানো একটি হীরা দেখিয়ে বলা হলো, আচ্ছা 'যিররী! তুমি যে এই হীরাটুকু দেখছো, তা দেখে কি তোমার সাধ জাগছে না যে, এটা তোমার গলা বা আঙ্গুলের রূপ ফুটিয়ে তুলুক?

'কেন নয়'?

'এর দাম শুনলে তুমি জ্ঞান হারাবে। এমন এক একটি হীরার জন্য কত বাদশার সিংহাসন উল্টে গেছে। কিন্তু এই জিনিসটিই যদি তুমি মুখে পুরে নাও সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। তোমাকে এই হীরাই হতে হবে। যত যুদ্ধবাজ আর পরাক্রমশালী বাদশাই তোমাকে দেখুক তোমাকে পাওয়ার জন্য সে তার রাজত্ব পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু যখনই তোমাকে মুখে পুরতে চাইবে তখন যেন সে আর জীবিত না থাকে।'

যিররী সেই হীরার বিষ দিয়েই যাকিরকে শিকার করে এবং পরকালে পাঠিয়ে দেয়। এরপর থেকেই যিররী অন্য শিকারের অপেক্ষায়।

কিন্তু যখন ইয়াহইয়াকে দেখলো সে, তার ভেতর কেমন এক দোলা অনুভব করলো। তার অদম্য ইচ্ছা হলো, ইয়াহইয়ার কাছে বসতে ওকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে। সে বুঝতে পারলো না কেমন করে তার ভেতর কী এক ভালো লাগার ঝড় উঠছে।

ইয়াহইয়া দারুণ কৌতুকবাজ ছিলো। হাসি তার মুখে লেগেই থাকতো। কারো কাছে শক্ত কথা শুনলেও হাসতে হাসতে সেটা উড়িয়ে দিতো। এজন্য ঐ চারটি মেয়ে তাকে দারুণ পছন্দ করতে শুরু করে। যেকোন ছুতোয় ওরা ওর সঙ্গে গল্প জমিয়ে বসতো। সেও এদেরকে খুশী রাখতে চেষ্টা করতো। কিন্তু যিররীর আচরণ ছিলো অন্যরকম। সে সবার থেকে একটু দূরে বসে ইয়াহইয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতো, চোখা-চোখি হলেই চোখ সরিয়ে নিতো। ইয়াহইয়াকে দেখলেই তার আসলে জীবনের কথা ভুলে যেতো। চিন্তা করে কূল পেতো না তার কি হয়েছে।

ইয়াহইয়া তীরন্দাযী শেখানোর সময় মেয়েদের হাতে ধনুক দিয়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়াতো তারপর পেছন থেকে মেয়েদের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধনুক ধরা হাত সোজা করে দিতো। এতে মেয়েদের পিঠ ইয়াহইয়ার বুকের সঙ্গে লেগে যেতো। মেয়েরা গভীর মনোযোগ রাখতো তীরন্দাযীর দিকে। একজন পুরুষের সঙ্গে যে দেহ স্পর্শ হচ্ছে সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপই করতো না। কিন্তু যিররীর পেছনে গেলেই ইয়াহইয়ার বুকের সঙ্গে যিররী তার পিঠ চেপে ধরতো। ইয়াহইয়াও যেন সেটা বুঝতে পারতো।

★ ★ ★ ★

সেদিন রাতে ইয়াহইয়া একটু আগেই শুতে যাচ্ছিলো। তখনই দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দ হলো। সে দরজা খুলে চমকে উঠলো। বাইরে তখন যিররী দাঁড়িয়ে এক ডানাকাটা পরীর মতো। ভেতরে এসে যিররী ইতস্তত করে বললো,

'আমি কি একটু বসতে পারি ইয়াহইয়া! বসলে তুমি মনে কিছু করবে নাতো?'

'কেন? মনে কিছু না থাকলে মনে করার কি আছে' – ইয়াহইয়া গভীর চোখে যিররীর দিকে তাকিয়ে বললো – 'তোমাকে যেন কেমন গম্ভীর মনে হচ্ছে। তুমি তো অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ।'

'আমার একটু কাছে এসে বসবে?' – যিররী মুখ গম্ভীর রেখেই বললো।

ইয়াহইয়া কিছু না বলে যিররীর গা ঘেঁষে বসলো। যিররী কোন সংকোচ ছাড়াই ইয়াহইয়ার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে ধরে রাখলো। কিছু বললো না ইয়াহইয়া। নির্বিকার রইলো।

'তুমি ঠিকই বলেছো ইয়াহইয়া' – যিররী ইয়াহইয়ার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো– 'আমার মনের যে অবস্থা তাই আমার চেহারায় ধরা দিয়েছে। কখনো আমি এত গম্ভীর ছিলাম না। আমি মনে করতাম দুনিয়াতে বুঝি হেসে খেলে বেড়ানোর জন্যই এসেছি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার সব উলট পালট হয়ে গেলো। মনে চায় শুধু তোমার সঙ্গে বসি, দুটো কথা বলি। তুমি কি টের পাওনি আমার হাতে ধনুক দিয়ে পেছন থেকে যখন আমার হাত সোজা করতে যাও তোমার সঙ্গে লেগে থাকি আমি। ইচ্ছে করেই আমি ধনুক ডান বাম করে বা উপর নিচ করে তোমাকে আমার কাছ থেকে দূর সরতে দেই না।'

ইয়াহইয়া একটু হেসে যিররীর ধরা হাতটি তার হাতে নিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগলো। হঠাৎ ইয়াহইয়ার মনে হলো যিররী শুধু তার নিজের কথাই নয় তার মনের কথাও বলেছে।

'তুমি কি আমার অস্থিরতায় একটু স্বস্তি দিতে পারবে? তুমি কি আমার হৃদয়ের ডাক ফিরিয়ে দেবে?

'শোন যিররী! তুমি এখানকার শাহযাদী, আমি এক মুসাফির, যে জানে না তার মঞ্জিল কোথায়? এই ভালোবাসা যদি আমাদের কাছে কোন ত্যাগ দাবী করে তুমি তো তখন কিছুই করতে পারবে না। আমি তো প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেবো।'

'তুমি দেখে নিও সেটা, তখন তুমি যেখানেই যেতে বলবে আমি চলে যাবো তোমার সঙ্গে।'

'তোমাকে দেখে আমার ভেতরও কিন্তু নড়ে উঠেছিলো। কিন্তু আমি নীরব থাকি। আমার মনের কথা আজ বলে দিয়েছো তুমি। শুধু মনে রেখো এই সম্পর্ক যেন আমাদের দেহে স্পর্শ না করে।'

'হ্যাঁ, আমি এজন্যই বলেছি আমার হৃদয় তোমাকে ডেকেছে। আমি কিন্তু ঘন ঘন এসে তোমাকে পেরেশান করবো।'

'আর আমি এর অপেক্ষায় থাকবো।'

যিররী চলে গেলো।

তীরন্দাযী শিখতে গিয়ে শেখাতে গিয়ে দুজনের মনই ভালোবাসার তীরে বিদ্ধ হলো। কিন্তু এই তীর বিনিময়ের কথা অন্য মেয়েদের অজানা রইলো না। ওরা আহমদ গুতাশকে ব্যাপারটি জানালো। আহমদ কিছুটা চিন্তিত হলো। আহমদ জানতো না ইয়াহইয়াও এসব গোপন করতে চায় না। মেয়েরা যখন তার কাছে এসে এসব বলছিলো ইয়াহইয়া তখন হাসানের কাছে বসা। সে তার মনের কথা হাসানের কাছে খুলে বলছিলো।

ইয়াহইয়া হাসানকে ভয় পেতো না তবে সমীহ ও শ্রদ্ধা করতো। এই সমীহের মধ্যে এমন আত্মসমর্পণ ছিলো যেন হাসান তাকে হিপ্টোজম করেছে। তার কথা শুনে ইয়াহইয়া প্রথম দিনই বিশ্বাস করে নিয়েছিলো সে অনেক উঁচু স্তরের মুসলমান, যার মর্যাদা নবীদের পরেই।

ইয়াহইয়া একদিন হাসানের সামনে নতজানু হয়ে বসে বললো,

'হযরত! কি হয়েছে জানিনা। কি করে জানি আপনাদের যিররীর সঙ্গে আমার .... আমরা দু'জনই দু'জনকে চাই। নির্জনে বসে আমরা কত কথা বলি। আচ্ছা এটা কি আমার মনের কালিমা? না আমি তার মোহে পড়েছি?

'যদি এই ভালোবাসা দেহের না হয়ে আত্মার হয় তাহলে অবশ্যই তা পবিত্র।'

'হ্যাঁ, এটা আমাদের আত্মার ব্যাপার'।

'তাহলে ঠিক আছে।'

ওদিকে আহমদ যিররীকে ডেকে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে যিররীও কিছু লুকালো না। বললো,

'ওকে আমার ভালো লাগে। আমার সঙ্গে তার নারী-পুরুষের কোন সম্পর্ক নয়?'

'হ্যাঁ, তুমি যা বলতে চাচ্ছো আমি বুঝে গেছি। কিন্তু যে ভালোবাসা দায়িত্ব থেকে হঁটিয়ে দেয় সেটা আমার কাছে পাপ।'

'দায়িত্ব থেকে আমি হঁটিনি। যেখানে আপনি আমার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখবেন যে শাস্তি ইচ্ছা হয় তখন দেবেন আমাকে।'

'শাস্তির কথা হয়তো তুমি এমনিই বলেছো। কিন্তু তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় এই শাস্তি কী?'

'আমি জানি আমাকে কতল করা হবে।'

'কতলই নয় তোমাকে সেই কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হবে যেখানকার কয়েদীরা বহুবছর ধরে সেখানে থেকে হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওরা তোমাকে খুবলে খাবে। তারপর

সেই কালো কুঠরীতে বন্দী করা হবে যেখানে বিষধর সাপ বিচ্ছুতে ভরা। ভুলে যেয়ো না। অন্যকে ফাঁসাতে হবে তোমার, নিজে ফেসে নষ্ট হয়ো না তুমি।'

সে রাতে আহমদ ও হাসান যিররীকে নিয়ে আলোচনায় বসলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো, হাসান ওকে জাদু দিয়ে বশীভূত করবে। একটু পর যিররীকে হাসান তার কামরায় ডেকে নিলো। যিররী যখন সেখান থেকে বের হলো তার চোখ মুখ তখন অন্যরকম ছিলো।

★ ★ ★ ★

দিন দিন ওদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো। ইয়াহইয়া মেয়েদের তীরন্দাযীর প্রশিক্ষণ শেষ করে ঘোড়দৌড় শুরু করালো।

শহরের লোকেরা দেখতো প্রতিদিন সকালে একজন পুরুষ চারজন মেয়ে ঘোড় সওয়ার হয়ে জঙ্গলের দিকে যায়, অর্ধদিন পর আবার ফিরে আসে।

ইয়াহইয়া প্রায়ই যিররীকে কাছে ডেকে অন্য মেয়েদের দূরে গিয়ে ঘুরে আসতে বলতো, মেয়েরা এ সবকিছুই আহমদকে জানাতো।

ওদিকে মারুতে সুলতান মালিক শাহ আর কতোয়াল প্রতিদিন ইয়াহইয়ার পয়গামের অপেক্ষায় দিন শেষ করতো হতাশা নিয়ে। ইয়াহইয়া শাহদর কেন এসেছিলো তার যে আবার ফিরে যেতে হবে তা যেন সে ভুলেই গিয়েছিলো। সে সিনানকে প্রতি দিনই বলতো, এখনো ওদের কোন খবর পাইনি, কয়েকদিন পর পেয়ে যাবো।

যিররী হঠাৎই যেন ইয়াহইয়ার প্রতি দিওয়ানা হয়ে উঠলো। ইয়াহইয়াকে বলতে লাগলো, তার আর সহ্য হচ্ছে না। ইয়াহইয়া যেন তাকে নিয়ে কোথাও চলে যায়। কয়েকবারই ইয়াহইয়াকে যিররী জিজ্ঞেস করেছে, সে কোত্থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে। কিন্তু ইয়াহইয়া প্রেম ভালোবাসার কথা বলে অন্যদিকে নিয়ে গেছে তার কথা।

এক রাতে যিররী তার কাপড়ে লুকিয়ে একটি বোতল নিয়ে ইয়াহইয়ার কামরায় এলো।

'তোমার জন্য আজ দারুণ মজার শরবত নিয়ে এসেছি। এটা শুধু আহমদ ইবনে গুতাশই পান করেন। আর কেউ না। আমি জানি এর মধ্যে মধু ও দূরদেশের অচিন এক ফুলের রস মেশানো আছে। তার বিবিরা বলেছেন এই শরবত তিনি অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এনেছেন। যে এ শরবত পান করবে সে দু'শ বছর জীবিত থাকলেও বৃদ্ধ হবে না। তোমার জন্য লুকিয়ে নিয়ে এসেছি এটা। পিয়ে দেখো।'

ইয়াহইয়া বোতলটি মুখে লাগিয়ে আস্তে আস্তে শরবত গলায় ঢালতে লাগলো। যিররী তখন এমন গলে যাওয়া গলায় প্রেমভালোবাসার কথা বলতে লাগলো যেন ইয়াহইয়ার ভালোবাসায় তাকে চরম নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। শরবত পান করার পর ইয়াহইয়ার মনে হলো সে বদলে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ার রাজত্ব যেন তার হাতে এসেছে। যিররী সেটা বুঝতে পেরে বললো,

'আমাদের শেষ পরিণতি কি হবে ইয়াহইয়া! তুমি এভাবেই ভালোবাসার খেলা খেলে যাবে? কোথা থেকে এসেছো তাও তো বলো না তুমি। ঠিক আছে যেখানে থেকে এসে থাকো আমাকে নিয়ে এখান থেকে পালাও জলদি। আজকের রাতই আমাদের এখানকার শেষ রাত। পুরুষের পোশাক পরে আমি বের হয়ে যাবো।'

ইয়াহইয়া হো হো করে হেসে যিররীকে জড়িয়ে ধরলো। এমন আচরণ সে আর কখনো করেনি। যিররী অভিমানের গলায় বললো কেন বলছো না কোত্থেকে এসেছো তুমি?

'এখন তোমাকে বলা যায় যিররী! তোমার ওপর আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে। এখানে আমি একটি দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। এখনো তা পালন করতে পারিনি। এতে তোমার সহযোগিতা দরকার।

'তাহলে বলছোনা কেন? কতবার যে বলেছি দরকার হলে তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেবো আমি।'

'আমি মারু থেকে সুলতান মালিক শার গোয়েন্দা হয়ে এসেছি। সন্দেহ করা হচ্ছে আহমদ ইবনে গুতাশ ইসমাঈলী। শাহদর ইসমাঈলীদের ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে। আমি জানতে এসেছি এটা কি সত্যি না শুধুই সন্দেহ।'

'জানা গেছে কিছু'?

'না এখনো সন্দেহের মধ্যেই আছি আমি, আহমদ ইসমাঈলী না আহলে সুন্নত এখনো নিশ্চিত নই আমি। তার সঙ্গে যিনি আছেন তিনি তো বিরাট বড় আলেম। তার কথায় আমি ইসমাঈলী কোন আকীদা পাইনি। আবার এদেরকে কখনো নামায পড়তেও দেখিনি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি শহরবাসীদের মধ্যে ইসমাঈলীই বেশি।'

'তোমার সঙ্গের সিনানও নিশ্চয় গুপ্তচর।'

'হ্যাঁ ওকে আমি দু'তিন দিন পর এখানকার সব খবর দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।'

'ইয়াহইয়া! যিররী তার দু'হাতে ইয়াহইয়ার মুখটি আলতো স্পর্শ করে বললো – 'আমার অনুরোধটি রাখো, মারু ফিরে যেয়ো না, এখানেও থেকো না। চলো ইরান চলে যাই আমরা। যেখানেই যাবে তুমি সেখানকার হাকিমকে তুমি হাত করতে পারবে। তোমার মতো এমন তীরন্দায শাহসওয়ার কোথায় আছে। ধর্ম বা ফেরকা নিয়ে থেকো না আর'।

'আমার একটি কথা ভালো করে শুনে রাখো যিররী! আমার মনে যে তোমার ভালোবাসা আছে সেখানে কোন ভান নেই। আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা তুমিই। কিন্তু ভালোবাসার কারণে দায়িত্বকে বলি দেবো না আমি।'

'যদি আমি অন্য কারো সঙ্গে চলে যাই?'

'তাহলে আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবো। আমার দায়িত্ব থেকে আমি সরে দাঁড়াবো না। সেলজুকিরা হাজার হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই ইসলামী সালতানাত গড়ে তুলেছে। ইসলামে কোন ফেরকাবাজী নেই। যে মুসলমান বললে সে রাসূল (স) এর উম্মত, আর যদি সে তাঁর সুন্নত থেকে দূরে সরে যায় সে রাসূল (স) এর উম্মতই নয়।

সেলজুকিরা তাঁর সুন্নতের অনুরাগী। যারা রাসূল (স) -এর সুন্নতের সত্যিকার অনুরাগী তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। আল্লাহর দীনের সত্যিকার অনুসারী তারা। আমি রাসূল (স)-এর গোলাম আর সেলজুকিদের অন্ন-কৃতজ্ঞ কর্মচারী। আমার ভালোবাসা সত্যিই যদি তোমার মনে স্থান দিয়ে থাকো তবে আমার দায়িত্ব পালনে আমাকে সাহায্য করো। ওদের আসল রূপ আমাকে জানিয়ে দাও।'

'কাল। আগামীকাল এসময় তুমি সব জানতে পারবে এবং তুমি তোমার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পাবে' – যিররী একথা বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

ইয়াহইয়ার মনে তখন এক যুদ্ধ জয়ীর আনন্দ। কাল তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর সে মূল্যবান এক তথ্য ও অতি রূপবান এক মেয়েকে মুক্তি করে আপন ঠিকানায় ফিরে যাবে, এই ভেবে সে দারুণ উৎফুল্ল ছিলো।

যিররী তার কামরায় ঢুকেই খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বুক ফেটে তার কান্না বেরিয়ে এলো। ফুলে ফুলে সে কাঁদতে লাগলো। ছলনার জালে জড়াতে এসে নিজেই ইয়াহইয়ার প্রেমের জালে ধরা পড়ে যায় সে। কিন্তু এর চারদিকেই যে বিষম কাঁটার প্রাচীর। অসংখ্য চোরা চোখ যে বিষের ছুরি বসিয়ে দিতে উদ্যত তাদের ভালোবাসার নরম বুকে।

আহমদ ও হাসান যিররীর এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে বুঝতে পারলো ওর মধ্যে এখনো মানবীয় সত্তা জীবিত। তার মধ্যে এখনো সেই নারী রয়ে গেছে যে পুরুষের ভালোবাসায় তৃষ্ণার্ত হয়। এজন্য তারা শংকিত হলো। তাদের আরেকটা আশংকা ছিলো, হাসান প্রতিদিন এক বুযুর্গ আলেমের বেশ ধরে ইয়াহইয়াকে নিজের কাছে বসিয়েও সে কে, কি তার পরিচয় কিছুই উদ্ধার করতে পারছিলো না। তবে সে নিশ্চিত করে বলতো, এই যুবক সন্দেহযুক্ত। এখন হাসান যখন জানতে পারলো, যিররী ইয়াহইয়ার ব্যাপারে প্রায় দিওয়ানা হয়ে গেছে সে যিররীকে ডাকিয়ে এনে অল্প সময়ের মধ্যেই জাদুর সাহায্যে তাকে সম্মোহন করে ফেললো। তার এত দিনের শয়তানী শিক্ষার কুপ্রভাব তার মাথায় আবার চেপে বসলো।

'তুমি আজ তার কাছ থেকে বের করবে সে কে, আর কেন সে এখানে এসেছে' – হাসান যিররীকে নির্দেশ দিলো।

'হ্যাঁ, আমি এ তথ্য উদ্ধার করবো সে কে আর কেন এখানে এসেছে' – যিররীর ভেতর থেকে যেন জড়ানো গলায় কে বলে উঠলো।

'ঐ শরবত সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ ঐ শরবত নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।'

ঐ শরবতই আজ যিররী ইয়াহইয়াকে পান করিয়ে এসেছে। এতে মধু ছিলো সত্যি, কিন্তু কোন ফুলের রস ছিলো না, ছিলো বুদ্ধিবশীভূত করার এক ধরনের হিরোইন। হাসান ইবনে সবা বিশেষ কায়দায় এই শরবত তৈরী করতো।

শরবতের প্রভাব ইয়াহইয়াকে যতই কাবু করুক আচমকা তার ভেতর জেগে উঠলো সে আহলে সুন্নত। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে বুঝলো না, সে তার দায়িত্বের কথা বলতে গিয়ে যিররীর দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছে। যিররী সব শুনে ইয়াহইয়ার কামরা থেকে বের হওয়ার সময় এই সংকল্প নিয়ে বের হলো, ইয়াহইয়া যদি তার দায়িত্বের ব্যাপারে এত আত্মত্যাগী হয় তাহলে আমি কেন আত্মত্যাগী হতে পারবো না?

রাতভর কেঁদে বুক ভাসালো। তার ভেতরটা যেন দু'অংশে ভাগ হয়ে পরস্পরের শত্রু হয়ে গেলো, ভালোবাসা আর দায়িত্ব এবং তার শিক্ষা– এ তিনটাই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামালো তাকে।

সকাল হতেই যিররী আহমদ ও হাসানের কাছে গিয়ে ইয়াহইয়া ও তার সঙ্গী সিনানের সব কিছু জানিয়ে দিলো। কথা শেষ করে যিররী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। তার চোখে অশ্রুর বান ডাকলো। হাসানের ইশারায় ওকে তার কামরায় পৌঁছে দিলো একজন।

কিছুক্ষণ পর প্রতিদিনের মতো এক খাদেম ইয়াহইয়ার কামরায় নাস্তা নিয়ে গেলো। সঙ্গে রুটিন মাফিক মধু মেশানো দুধ ছিলো। একই নাস্তা সিনানের কামরায়ও পাঠানো হলো। দু'জনে দুই কামরায় বসে দুধে মুখ দিলো। গলায় দুধ নামতেই দু'জনে গোঙাতে গোঙাতে ঢলে পড়লো। আর উঠলো না।

'এদিকে আসো .... যিররীকে দেখে যাও .... –এক খাদেমা চিৎকার করতে করতে যিররীর কামরা থেকে দৌড়ে বের হলো।

আহমদ ও হাসান দৌড়ে যিররীর কামরায় গিয়ে দেখলো, একটি তলোয়ার যিররীর পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে, তার প্রাণটা তখনো দেহে ঝুলে ছিলো।

'কে এমন করলো যিররী?'–আহমদ পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি নিজেই। ইয়াহইয়া আর সিনানকে ...... আমি হত্যা করিয়েছি ...... আমার ভালোবাসাকে .... হত্যা করেছি আমি .... তাই আমি আমাকে শাস্তি দিয়েছি ....' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে এ কথাগুলো বলেই থেমে গেলো যিররী।

ইয়াহইয়া আর সিনানের লাশ বস্তায় ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হলো।

'আমাদের এখন অন্য খেলা খেলতে হবে' – হাসান বললো – 'সুলতানের মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। উবায়দীদের সাহায্যের জন্য আমাকে মিসর যেতে হবে।'

'না হাসান! আগে আরো দু'তিনটি কেল্লা আমাদের দখল করতে হবে। তারপর চেষ্টা করতে হবে সুলতানের হুকুমতে যেন তোমার বড় কোন পদ মিলে যায়। তখনই সালতানাতের বুনিয়াদ কমজোর করা যাবে।'

১২

সুলতান মালিক শাহ্ মারুতে তার সিপাহসালার ও কতোয়ালকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। মালিক শাহ্ বললেন,

'দুই মাস হয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদ উঠলো, ওরা কোন খবরই দিলো না। ওর সঙ্গে তো আরেক জনও ছিলো।'

'হ্যাঁ সিনান! ওরা দু'জনেই আমার বিশ্বস্ত। মাটির নিচ থেকেও ওরা কথা বের করে আনবে' – কতোয়াল বললেন।

'ইয়াহইয়ার তো একবার সিনানকে পাঠানো উচিত ছিলো। ধরা পড়ে গেলো নাকি?'

'তাহলে আরেকজন পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়' – সিপাহসালার বললেন।

'দু'চার দিন আরো দেখে নাও' – মালিক শাহ্ বললেন।

এ সময় দারোয়ান এসে জানালো শাহ্দর থেকে এক লোক এসেছে। মালিক শাহ্ তাকে তখনই ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির ছাপ নিয়ে এক প্রৌঢ় ভেতরে এলো। মালিক শাহ্ ইসলামী রীতি অনুযায়ী তাকে বসালো, ফল পানীয় ইত্যাদি এনে তার সামনে পরিবেশন করতে বললো। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলো কে সে এবং কেন এসেছে? লোকটি বললো,

'আপনাদের ইয়াহইয়া নামের এক লোক শাহ্দর গিয়েছিলো। সে আমার বন্ধু। সঙ্গে সিনান নামে আরেকজনকেও পাঠিয়েছিলেন আপনারা।'

'তার কি কোন খবর এনেছো? জলদি বলো' – কতোয়াল ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'পেরেশান হবেন না। ইয়াহইয়া অনেক কষ্ট করে তার কাজ উদ্ধার করেছে, সে ও তার সঙ্গী আমার ঘরে উঠেছে। তাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি।

'সেখানকার খবর কি?' – মালিক শাহ্ জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি ইয়াহইয়াকে পাঠিয়েছিলেন – আহমদ ইবনে গুতাশ ইসমাঈলী ও শাহ্দর ইসমাঈলীদের ঘাঁটি– এই সন্দেহে, আপনার এই সন্দেহ ঠিক নয়। আহমদ ইবনে গুতাশ ইসমাঈলীদের মোটেও পছন্দ করে না।'

'সে শাহ্দরের আমীর হয়েই ঐ সব ইসমাঈলীদের মুক্ত করে দেয় যারা আহলে সুন্নতের কারো জীবিত থাকাটা হারাম মনে করতো, এটা কি ভুল নয়? মরহুম যাকির কি ওদেরকে এ অপরাধেই কয়েদ করেনি?'

'সুলতানে মুহতারাম! এটা ঠিক। তবে ওসব বন্দীদের মুক্তির সময় আহমদ ইবনে গুতাশ বলেছিলো, ওদেরকে নিরপরাধ মনে করে মুক্তি দেয়া হচ্ছে না, বরং নাশকতামূলক চিন্তা ভাবনা দূর করে প্রকৃত আহলে সুন্নত হওয়ার জন্য তাদেরকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আসলে আহমদ ইবনে গুতাশ ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহনশীল মনোভাব দেখাচ্ছে। এর ফলও পাচ্ছি আমরা। ইসমাঈলীদের মধ্যে আহমদ গুপ্তচর ছেড়ে রেখেছে।

'আর এই যে, কাফেলা লুট করা হচ্ছে এতে কি আহমদের হাত নেই?'

'আহমদ আলেমে দীন সুলতানে মুহতারাম! আপনিও তাকে আলেম বলেই জানেন। কাফেলা তো শাহদর থেকে অনেক দূরে লুট করা হয়েছে। ইসমাঈলীরা এটা ছড়িয়েছে যে, আহমদের লোকেরাই কাফেলা লুট করে, এমন তিন ইসমাঈলীকে বন্দী-ও করা হয়েছে।'

'ইয়াহইয়া কোথায়? সিনানকে পাঠালো না কেন সে'? - সিপাহসালার জিজ্ঞেস করলেন – 'তোমাকে পাঠালো কেন সে? সন্দেহ যখন দূর হয়ে গেছে সে কেন ওখানে রয়ে গেলো?'

'আমাদের সন্দেহ ছিলো আহমদ পর্দার আড়ালে ইসমাঈলীদের লালন পালন করছে কি-না। এজন্য আমি ও ইয়াহইয়া আহমদের মহল পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করেছি। সেখানকার দুই মেয়েকে হাত করে সব জেনেছি। অনেক সময় লেগেছে। যা হোক আমাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। আপনাকে এই সংবাদ দেয়ার জন্য ইয়াহইয়া আমাকে পাঠিয়েছে। আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি। শাহদরের ব্যাপারে এখন নিশ্চিন্ত থাকুন। আহমদ আপনার জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠলে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি সেখানে আহলে সুন্নতের সংখ্যাই বেশি।

'আচ্ছা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু ইয়াহইয়া সিনানকে পাঠালো না কেন? কাজ শেষ হয়ে গেলে সে কেন আসলো না?' – মালিক শাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'সে এক জায়গার ইংগিত পায় যে সেখানে কাফেলার লুটেরাদের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা কিছুদিন আগে এক কাফেলা লুটে সবাইকে হত্যা করে দেয়। ওখানেই গেছে সে। আমি ওকে অনেক বাঁধা দিয়েছি, শুনেনি আমার কথা সে। সিনানকে সঙ্গে করে সে চলে গেলো। একটি যুবতী মেয়েও তার সঙ্গে গিয়েছে। ইয়াহইয়া কিন্তু সে মেয়ের কথা বলেনি আমাকে। আমার মনে হয় সে কোন জালে ফেঁসে গেছে। ঐ মেয়েকে কেন সঙ্গে নিয়েছে বুঝতে পারছি না আমি।'

'এটা আহমদের ষড়যন্ত্র নয়তো?' কতোয়াল জিজ্ঞেস করলেন।

'না, না। আমি নিশ্চিত আহমদের কোন সম্পর্ক নেই এর সঙ্গে। শেষের দিকে ইয়াহইয়া আমাকে এড়িয়ে চলতো।'

'সে গেছে কোথায় তা কি জানো?' – সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'না সুলতানে মুহতারাম! জানতে পারলে তো লুকিয়ে আমি তাকে অনুসরণ করতাম।'

'কবে নাগাদ ফিরবে সে?' – সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'জানিনা, আমাদের দুআ করা উচিত সে যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে। এখন কি আমাকে যাওয়ার এজাযত দিচ্ছেন? আপনি বলুন আর না বলুন শাহদরে আমি আপনার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করবো।'

'হ্যাঁ তুমি যেতে পারো। আমাদের জন্য কাজ করলে অবশ্যই এর বিনিময় পাবে।'

'না সুলতানে মুহতারাম! কোন বিনিময় নয়, আমার কর্তব্য হিসেবেই করবো এ কাজ আমি।'

★★★★

'আচ্ছা ঐ দু'জনকে তো আমরা খতম করলাম' – শাহদর থেকে আগত লোকটিকে মারুতে পাঠানোর আগে আহমদ হাসানকে বলছিলো – 'আমার মনে হয় এখানে সেলজুকিদের আরো গুপ্তচর আছে। ওদের খোঁজ লাগাতে হবে। আমাদের গোয়েন্দাদের বলে দিতে হবে শহরে অপরিচিত কাউকে দেখলেই তার পিছু নিয়ে এখানে আসার কারণ জেনে নেয়।'

আর 'সেলজুকিদের বিভ্রান্ত করতে হবে' – হাসান বললো – 'আমরা মারুতে এক লোক পাঠাবো যে মালিক শাহের কাছে ইয়াহইয়ার পয়গাম নিয়ে যাবে। কি বলতে হবে সেটা আমি শিখিয়ে দেবো। অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক লোক হতে হবে।'

'আমি তোমাকে এক লোক দেবো। এখন বলো কি পয়গাম দেয়া হবে?'

হাসান ইবনে সবা এই পয়গামের সবটা শোনালো।

'জিন্দাবাদ! তুমি এখন নবী দাবী করতে পারবে হাসান! একথা তো আমার মাথায়ও আসেনি।'

'না গুরু! আপনি আমার পীর মুরশিদ। আপনার ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি আমি। এ বুদ্ধিটা মাথায় এজন্য এসেছে যে এতে সেলজুকিরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, শাহদরে সবাই তাদের অনুগত। তাদের বিরুদ্ধে এখানে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না। ঐ দুই গুপ্তচরের ব্যাপারে সুলতানের এই সন্দেহ হবে না যে ওদেরকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। পয়গাম পেয়ে তিনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন ওরা শাহদরে নেই। অন্যত্র চলে গেছে।'

আহমদ তখনই এক লোককে ডাকিয়ে আনলো। হাসান তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলো এবং তার কাছ থেকে আবার সব শুনলো। কয়েক জায়গায় সংশোধন করে দিলো। লোকটির মধ্যে সাহস ও চতুরতা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট হলো। পরদিন সকালে তাকে পাঠিয়ে দিলো মারু।

লোকটি একদিন সুলতান মালিক শাহকে হাসানের বানানো পয়গাম দিয়ে ফিরে এলো।

'সেখানে কি করে এলে আবিদীন?' – আহমদ জিজ্ঞেস করলো।

'তাই যা আপনি চেয়ে ছিলেন' – আবিদীন বললো – 'সেখানে আপনি থাকলে এই পয়গাম আপনিও বিশ্বাস করতেন। সুলতান মালিক শাহের কাছে এক সিপাহসালার ও কতোয়াল বসা ছিলো। আমি নিশ্চিত ওরাও আমাদের পয়গাম সত্য মনে বিশ্বাস করেছে।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছো আবিদীন!' – হাসান বললো – 'ওরা আমাদের মিথ্যাকে সত্য মনে না করলে তুমি এখন এখানে থাকতে না, মারুর কয়েদখানায় থাকতে বা তোমার ধড় তোমার দেহ থেকে পৃথক থাকতো।'

হাসান আহমদের দিকে তাকালো। আহমদ ইংগিত বুঝে গেলো, সে উঠে অন্য কামরায় চলে গেলো। ফিরে এলো যখন তার হাতে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দেখা গেলো। আবিদীনকে সেটা দিয়ে দিলো। আবিদীন মাথা ঝুঁকিয়ে সেটা নিলো। আহমদ তাকে বললো,

'এখন আরেকটি কাজ আছে আবিদীন! এখানে সেলজুকিদের আরো গুপ্তচর থাকতে পারে। ওদের খুঁজে বের করো। অপরিচিত বা সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই ছায়ার মতো একজনকে তার পেছনে লাগিয়ে দাও। এ ব্যাপারে আমি আরো ব্যবস্থা নেবো।'

'গুরু! আপনার ব্যবস্থা আপনি নিন। আমার ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি। এমন জাল বিছাবো, সন্দেহজনক কেউ এ থেকে বের হতে পারবে না। ঐ দুই গোয়েন্দা আমার চোখ খুলে দিয়েছে।'

★★★★

'এখন বলো হাসান!' – আবিদীন চলে যাওয়ার পর আহমদ হাসানকে বললো – 'এখন এ অবস্থায় কিভাবে নিরাপত্তা অবলম্বন করা উচিত?'

'আমাদের কাছে তো কোন ফৌজ নেই যারা আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আপনি ভালো মনে করলে আমি বলবো, এসব এলাকায় আমাদের ছড়িয়ে পড়া উচিত। প্রচারের ধারা তীব্রতর করতে হবে। আরেকটি কথা, আমাদের মেয়েদের মধ্যে এখনো জযবা রয়েছে। ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরী। তবে এরচেয়ে জরুরী প্রচার। লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকেই ফৌজ বানাবো।'

'লোকদের কি বলে দলে ভেড়াবে?'

'তাদের সামনে আমাদের ফেরকার কথা তুলে ধরবো। তাদেরকে বলবো, অন্যসব ফেরকা বাতিল-ভেজাল।'

'নবীগণও কিন্তু এভাবেই শুরু করেছিলো। তাদের কথা কেউ শুনেনি। আমাদের এমন কোন রাস্তা বের করতে হবে যাতে মানুষের মনে দখল প্রতিষ্ঠা করা যায়।'

'আপনার কাছে এমন কোন রাস্তা আছে?'

'হ্যাঁ হাসান! তুমিই সেই সশরীরি রাস্তা। তোমার মধ্যে সে জিনিস আছে যা কোন মানুষকে বশীভূত করতে পারে'।

'হ্যাঁ গুরু! এতো আমিও জানি আমার মধ্যে এমন শক্তি আছে অন্য কারো মধ্যে যা নেই। আমি অনুভব করতে পারি সৎপথের লোককেও যে কোন পথে নিয়ে যেতে পারবো আমি।'

'তোমার এই শক্তিকে আরো ধার দেয়া উচিত। সব ধর্ম মানুষকে মন্দ আর অজ্ঞতা থেকে হঁটে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। এ কারণেই যে কোন ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করতে মানুষ বিলম্ব করে। কারণ মন্দের মধ্যে দারুণ আকর্ষণ আছে। খোদা মানুষের মধ্যে এমন দুর্বলতা রেখেছেন যে, সে আকর্ষণের বস্তু ও ভোগকে অত্যন্ত পছন্দ করে।'

'কিন্তু গুরু! আমার সেই গুরু ইবনে আতাশ বলেছিলেন মানুষের মধ্যে এই দুর্বলতা খোদা নয়, ইবলিস সৃষ্টি করেছে। মানুষের দুর্ভাগ্য হলো তার মধ্যে সবসময় চলতে থাকে ভালো মন্দের সংঘর্ষ।

‘এটাও ঠিক। আমার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে মন্দের বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য মনে রেখো– সেটা হলো প্রত্যেক মানুষই বেহেশত বা স্বর্গ চায়। কিন্তু মরতে চায় না কেউ। তার জন্য দরকার হলো দুনিয়াতেই তাকে বেহেশত দেখিয়ে দেয়া। তারপর দেখো এরা কিভাবে তোমাকে নবী বলে মেনে নেয়।’

‘ওদেরকে আমি দুনিয়াতেই বেহেশত দেখাতে পারবো। এই বেহেশত আমার কল্পনায় আছে। সবাইকে আমি সেটা দেখাবো। মানুষকে যদি আমি ভুল বুঝে না থাকি তাহলে আমার মত হলো মানুষ রহস্যের পেছনে সবচেয়ে বেশি ছুটে। সরাসরি তার সামনে কোন কিছু রাখা হলে সে সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে গ্রহণ করে না। সেটাই যদি রহস্যময় করে তার সামনে রাখা হয় সে লুফে নেয়। এর আবরণ খুলতে চেষ্টা করে। তারপর যে মূল জিনিসটা বেরিয়ে আসে সেটা সাধারণ হলেও দুর্লভ ভেবে বুকে জড়িয়ে নেয়। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার পদ্ধতি ব্যবহার করবো।’

‘হ্যাঁ হাসান! তুমি তোমার মতো ময়দানে নামো। আমি এই কেল্লার আমির। যতই চরম পদক্ষেপ নাও না কেন আমার কাছে যে সাহায্যই চাইবে আমি দেবো। জেনে রেখো মানুষ খোদার কথা না মেনে শয়তানের কথা মেনে নেয়। সে নিষিদ্ধ বৃক্ষকে বেশি পছন্দ করে। তোমাকে জাদুর শক্তিত দিয়েছি। তুমি কারো চোখে চোখ রেখে কথা বললে সে বশীভূত হয়ে যাবে। তোমাকে গণক বিদ্যাও শিখিয়েছি। নক্ষত্রের আবর্তন দেখে তুমি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে যে, তোমার পরবর্তী কদম তুমি সামনে বাড়াবে না পিছু হটাবে।’

শাহদর থেকে বারো চৌদ্দ ক্রোশ দূরে মনোরম এক জায়গা আছে। এর চার পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়, উঁচু টিলা, আকাশ ছোয়া অচিন বৃক্ষের সারি-সব মিলিয়ে সবুজের এক সাজানো মঞ্চ। যেন প্রকৃতির নিজ হাতের নিপুণ শৈলী। কিছু কিছু পাহাড় আর টিলার ওপর বিশাল বিশাল ঝাড় গাছও রয়েছে। আরো আছে স্বচ্ছ পানির বহতা নদী। গাছের পাতায় মর্মর ধ্বনি সৃষ্টিকারী মিষ্টি হাওয়ার বয়ে যাওয়া, দূর থেকে ভেসে আসা নদীর জলতরঙ্গ এখানকার পথচারীদের জাদুময় করে তোলে।

কিছু দিন থেকে সে এলাকার লোকদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো, টিলার ওপরের একটি ওক গাছ থেকে কখনো কখনো তারা জ্বলে উঠে। সেটা জ্বলে আবার নিভে যায়। এই খবর শাহদরসহ আশে পাশের সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো।

খবরটি চারদিক এত মাতিয়ে তুললো যে, দলে দলে লোক এসে সেখানে জড়ো হতে লাগলো। তারা জ্বলে উঠার দৃশ্য দেখার জন্য লোকেরা তিন চারদিনও অপেক্ষা করলো। তারা জ্বলে উঠার দৃশ্য দেখে কারো মধ্যে ভয় কারো মধ্যে ভক্তির ছাপ দেখা গেলো। কেউ বললো এটা কোন নবী আগমনের লক্ষণ। অধিকাংশের ধারণায় এটা অশুভ কোন কিছু নয়।

কিছুদিন পর তারা জ্বলার আগে প্রথমে নাকারা তারপর শানাই বাজতে লাগলো। এরপর ওক গাছের ঘন ঝোপ থেকে তারা জ্বলে উঠতে শুরু করলো।

কারো এতটুকু সাহস হতো না এগিয়ে গিয়ে দেখবে এটা কিসের আলো। দিনে লোকেরা এসব গাছ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতো। এলাকার বড়রা লোকদের সাবধান করে দিলো–ওদিকে যেয়ো না, ওটা জিনদের ব্যাপারও হতে পারে আবার খোদায়ী ইশারাও হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, জিনেরা অসন্তুষ্ট হয়ে সারা এলাকা ধ্বংস করে দিলো বা খোদার গজব পড়লো আমাদের ওপর।

আরো কিছুদিন পর লোকদের ভিড়ের মধ্যে রেশমের সবুজ আলখেল্লা পরা কিছু লোককে দেখা গেলো। তাদের হাতে তসবিহ আর তাদের ঠোঁট সবসময় নড়তে দেখা যেতো, ভাবভঙ্গিতে বড় আলেম মনে হতো ওদের। এক এক করে ওরা লোকদের ভিড়ে মিশে গেলো।

'মহান খোদা এই এলাকা তার নেয়ামতরাজিতে ভরিয়ে তুলবেন।'

'খোদার পক্ষ থেকে কোন মহাপুরুষ এখানে অবতরণ করবেন।'

'হযরত ঈসা (আ)ও হতে পারেন তিনি। মূসা (আ)ও হতে পারেন। রাসূল (স)ও হতে পারেন।'

'খোদার কোন নবী না হলে তাঁর দূত হবেন নিশ্চয়।'

'রাত জেগে অপেক্ষা করো, তারা জ্বলতে দেখলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ো।'

'শুধু চমকের দিকেই তাকিয়ে থেকো না, এটা খোদার দূতের জন্য অপমানকর হবে।'

এ ধরনের সতর্কতা ও কল্পবাণী সবুজ আলখেল্লাধারীরা লোকদের ভিড়ে ভিড়ে গিয়ে ছড়াতে লাগলো। ওদের বলার ধরন এত বিনয়ী গম্ভীর যে, লোকেরা এতে দারুণ প্রভাবান্বিত হতে লাগলো।

এক অন্ধকার রাতে নাকারা বেজে উঠলো। লোকেরা ওক ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। নাকারা বাজতে লাগলো। কিন্তু তারা চমকালো না।

'উঁচু আওয়াজে কালেমায়ে তায়্যিবা পড়ো'–সবুজ আলখেল্লাধারী এক লোক বললো।

সেখানে হাজারখানেক মানুষের ভিড়। মুসলমানই বেশি এর মধ্যে। বাকী ইহুদী খ্রিস্টানসহ অন্য ধর্মের লোকেরাও আছে। মুসলমানরা কালেমা পড়তে লাগলো। অন্যরা যার যার মতো একটা কিছু জপতে লাগলো।

'সিজদায় লুটিয়ে পড়ো'–আরেকটি আওয়াজ উঠলো–মুসলমান অমুসলমান সবাই সিজদায় চলে গেলো।

'হে খোদায়ে ইযযত! ওরা সবাই তোমার গুনাগার অক্ষম বান্দা। ওদের মাফ করে দাও। আর আমাদের খোদায়ী তাজাল্লী দেখাও'– আলখেল্লাধারী একজন বলে উঠলো।

চারদিক নীরব হয়ে গেলো। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু সবার উত্তেজিত বুকের ধড়ফড়ানির আওয়াজ যেন প্রত্যেকের কানে তালা লাগিয়ে দিলো। প্রত্যেকের বুক এত জোরে কাঁপতে লাগলো যেন তা পাঁজর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে।

'উঠো দেখো'–গুরুগম্ভীর স্বর ভেসে এলো।

লোকেরা মাথা উঠিয়ে দেখলো ওক ঝাড়ের ওদিকে তিন ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থে একটি আলোর পিণ্ড ওপর থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে। আলোটি প্রথমে গাছের ওপর ভেসে বেড়ালো। দূর থেকে ঐ ওক ঝাড়টি বিরাট আলোকিত সামিয়ানার মতো মনে হতে লাগলো। আলোটি এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যখন ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো তখন সেটা একজন মানুষের আকৃতিতে দৃশ্যমান হলো। লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে আবৃত। মনে হচ্ছিলো সাদা কাপড়ে পাঠানো কোন লাশ। আলোটি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুরতে লাগলো। ভালো করে তাকিয়ে বুঝা গেলো লোকটি সাদা আলখেল্লা পরে আছে। তার মাথায় সাদা পাগড়ি। লোকটি তার দু'হাত বাহুসমেত হঠাৎ দুদিকে ছড়িয়ে দিলো। পরমুহূর্তে অন্ধকার নেমে এলো। লোকটি অদৃশ হয়ে গেলো।

দর্শকদের মধ্যে শ্রদ্ধা-ভীতি আরো বেড়ে গেলো। আগের চেয়ে আরো ব্যাকুল হয়ে তারা বলতে লাগলো, কেউ যেন ওদেরকে বলে দেয় তিনি কে আর এসব কি?

সে রাতে আলখেল্লাধারীরাও গায়েব হয়ে গেলো। পরের রাতে ওদেরকে আবার সেখানে দেখা গেলো। লোকেরা ওদের ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো এসব কী হচ্ছে?

'শুধু একজনই এর সঠিক অর্থ বলতে পারবেন, কিন্তু তাকে এখানে আনা বেশ কঠিন'–এক আলখেল্লাধারী বললো।

'উনি কে আমাদের বলো, যেখানেই থাকুক তাকে আমরা যেকোন মূল্যে নিয়ে আসবো'–জটলা থেকে একজন বললো।

'তিনি শাহদরের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশ। তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী যে, গায়েবের পর্দাও উঠাতে পারেন।

'আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে চলো'–সবাই বলে উঠলো।

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো, তিনি যদি তোমাদেরকে সব রহস্য বলে দেন, তার কথা সবার মানতে হবে কিন্তু'–এক আলখেল্লাধারী বললো।

'তিনি কি মানতে বলবেন?'

'তোমাদের জানের কুরবানী চাইবেন না তিনি। প্রথমে তিনি দেখবেন, যে অলৌকিক হাস্তীকে দেখা গিয়েছিলো তিনি কে ছিলেন, তিনি কি আবার দেখা দেবেন কি দেবেন না? তারপর তিনি বলবেন, লোকদের এখন কি করতে হবে!

'আমরা তার কাছে যাবো'–সমমেত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

★★★★

ঐ এলাকার এক পাশে কয়েক ঘর মিলিয়ে ছোট একটি বসতি আছে। ওখানে বেশির ভাগ খ্রিস্টান আর দু'তিন ঘর ইহুদী থাকে। এখানকার লোকেরাও তারা চমকানোর দৃশ্য দেখতে যায়। ইহুদীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ পুরোহিত আছেন আর খ্রিস্টানদের মধ্যে আছেন এক বৃদ্ধ পাদ্রী। দু'জনে একদিন নক্ষত্র চমকানো নিয়ে আলোচনায় বসলেন। ইহুদী পুরোহিত পাদ্রীকে পেরেশান হয়ে বললেন,

'পেরেশানীর বিষয় ফাদার। এই ধোঁকাবাজরা মানুষের আকীদা বিশ্বাস ধ্বংস করার জন্য কি শুরু করেছে! নবীদের আগমন তো এভাবে হয় না, না সাধারণ কাউকে খোদা এভাবে তার নূর দেখান। খোদা তার নূরের ঝলক দেখিয়েছিলেন মূসা (আ)কে কূহে তূরে। তাও শুধু একবার। সেটা আমরা আপনারা মুসলমানরা সবাই মানে।'

'হ্যাঁ রব্বী (পুরোহিত)! চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয় এটা মুসলমানদের এক নাটক। আর এই নাটক এজন্যই দেখানো হচ্ছে যাতে ইসলামের নড়বড়ে ইমারতটি শক্ত করে দাঁড় করানো যায়। আপনি তো দেখছেন ইসলামের কত ফেরকার উদয় হয়েছে।'

'আমি গভীর চোখে দেখছি। আমার মতে মুসলমানদের আরেক ফেরকা তৈরি হচ্ছে। এমন হলে আমরা আমাদের লোকজনকে মুসলমানদের ঐ ফেরকায় ঢুকিয়ে দেবো। যাতে এই ফেরকা ফুলে ফেঁপে ইসলামকে আরো দুর্বল করে দেয়। আমাদের লোকেরা মৌলভী আর খতীবের বেশে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে কুরআন হাদীসের বানোয়াট ব্যাখ্যা দিয়ে এই ফেরকার পক্ষে মসজিদে মসজিদে ওয়াজ করবে। তবে দেখতে হবে এই ধাপ্পাবাজীর কৌশলটা কি!'

'এটা মুসলমানদেরই এক অংশের কাজ এজন্য বলছি, যে রাতে আলোর মধ্যে সেই সাদা পোশাকধারীকে দেখা গেলো সে রাতে সবুজ আলখেল্লাধারীরা কালেমা তায়্যেবা আর সেজদার ঘোষণা দিয়েছিলো। কালেমা সেজদা তো মুসলমানদের কাজ। মানুষ তো আবেগে অন্ধ। এজন্য এরা এসব ধাপ্পাবাজীকে খোদার মুজিযা ভেবে নেয়। এতে মুসলমানরা বিপথে গেলে আমাদের কোন সমস্যা নেই।'

'বরং আমাদের খুশী হওয়া উচিত। তবে আমাদের লোকদের যেন বিপথগামী না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'কিন্তু কি করা যাবে! আমি দু'একজন সাহসী জোয়ান দিতে পারবো। যারা ঐসব পাহাড়ের একটায় গিয়ে দেখে আসবে ঐ আলোর উৎস কি-কোন হাতের কারসাজী না অলৌকিক কিছু'–পাদ্রী বললো।

'আমি নিজে গিয়ে তারার চমক দেখেছি। সেটা কোন চেরাগ বা শিখার আলো নয়। ঐ আলো তো সাদা, চমকও আছে তাতে। হঠাৎ নিভে আবার জ্বলে উঠে। আগুনের শিখা দিয়ে এই কারসাজী সম্ভব নয়। আপনি একজন এবং আমি একজন লোক তৈরি করি। আর এটা কোন গোপন কথা নয় যে, ইসলামের ধ্বংসের জন্য সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। আপনার লোকের ব্যাপারে

বলতে পারছি না; কিন্তু আমার লোকের ব্যাপারে বলতে পারি সে আমার হুকুমে জান দিয়ে দেবে'–ইহুদী পুরোহিত বললো।

'তাহলে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

'আজ রাতে আপনার লোককে নিয়ে আমার কাছে চলে আসুন।'

★ ★ ★ ★

রাতে হাজারেরও বেশি লোক তারার চমক দেখার অপেক্ষায় জড়ো হয়েছিলো। তখন দুজন যুবক ইহুদী রব্বীর ঘরে রব্বী আর পাদ্রীর কথা শুনছিলো। ঐ দুই যুবকেরও বিশ্বাস এটা আকাশের নক্ষত্র যা ওক ঝাড়ে এসে অবতরণ করে।

'আকাশের নক্ষত্র মাটিতে নামে না'–ইহুদী রব্বী বললো'–যদি বলো এটা খোদায়ী নূরের ঝলক তাহলে কি মূসা (আ) আবার দুনিয়ায় এসেছেন? না ঈসা (আ) এসেছেন? বার বার খোদার নূর দেখানোর কি প্রয়োজন পড়লো? নাকি এখানকার লোকেরা খোদাকে ভুলে গিয়ে অন্য কারো ইবাদত করছে? এখানকার মুসলমান খ্রিস্টান ইহুদী যে যার মতো ধর্ম পালন করছে। শোন মন দিয়ে, যে পাহাড়ের ওপর এই আলো জ্বলে ওঠে এর আশে পাশের পাহাড়ে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসবে। সেখানে যদি আমাদের ধারণামতো কিছু দেখো চুপচাপ চলে আসবে ...।

'এটা আমাদের ব্যক্তি কাজ নয়। ধর্মীয় কর্তব্যবোধ। এর দ্বারা নতুন কোন ফেরকা মাথাচাড়া দিচ্ছে। লোকেরা খুব দ্রুত এর প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। আর এ অবস্থা চলতে থাকলে ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মের জন্য তা বড় ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেবে। আর যদি মুসলমানদের কোন ফেরকা হয় আমরা এর পেছনে হাওয়া দেবো আরো বেশি করে। এখন তোমাদের দায়িত্ব সঠিক খবর নিয়ে আসা'–পাদ্রী বললেন।

'আমরা কাল সূর্যাস্তের একটু আগে রওয়ানা হয়ে যাবো'–ইহুদী যুবক বললো।

'জায়গাটি খুব কাছে নয়। আবার আমরা সোজা পথেও যেতে পারবো না। না হয় সেটা খুব দূরে ছিলো না। পায়দল যেতে হবে। ঘোড়া নিলে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ আমাদেরকে বিপদে ফেলে দেবে' – খ্রিষ্টান যুবক বললো।

'কাজ রাতে রাতেই হয়ে যাবে আমি এমন ওয়াদা করছি না। দু'তিন রাতেও হয়তো আমরা ফিরে আসতে পারবো না' – ইহুদীটি বললো।

'এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তোমরা চেষ্টা করবে অক্ষত ফিরে আসতে। যাতে আমরা এর একটা ব্যবস্থা করতে পারি' – রব্বী বললো। 'এখন তোমরা যাও। পানির কোন সমস্যা হবে না পথে। সঙ্গে খেজুর নিয়ে যেয়ো।'

বাইরে এসে দুই যুবক ঠিক করে নিলো যাওয়ার সময় কোথায় তারা দেখা করবে। ইহুদীটি তার ঘরে না গিয়ে অন্য আরেকটি ঘরের দিকে গেলো। সেখানে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে খেলাধুলা করছিলো। একটি ছেলেকে সে জিজ্ঞেস করলো তার বোন মিরা কোথায়? ছেলেটি জানালো মিরা একটু আগে বকরী নিয়ে মাঠে গেছে।

মাঠটি লোকালয় থেকে দূরে বেশ নির্জন জায়গায়। এর পূর্ব পাশে ছোট একটি নদী। নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ছোট একটি ঘন ঝাড়। মিরার সঙ্গে সে এখানে এসে দেখা করে। ইহুদী সে দিকেই যাচ্ছিলো। দূর থেকে মিরা ওকে দেখে ফেললো। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো ইহুদীকে। একজন আরেকজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ আটকে রইলো, কেউ দেখবে সেই ভয় ছিলো না ওদের। ওদের পরস্পরের কথা সবাই জানে। কদিন পরই ওদের বিয়ে হবে। এছাড়াও এসব ব্যাপারে ইহুদীরা আড়ালের ধার ধারে না। এজন্য কাউকে 'বেহায়া' বলতে হলে 'ইহুদী' বললেই চলে। পরস্পরের সঙ্গে এভাবে লেপ্টে থেকেই হেঁচড়ে হেঁচড়ে নারী পুরুষের দুটি দেহ নদীর তীরে গিয়ে বসলো।

'আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি মিরা'

'কি বলছো ইসহাক! কোথায় যাচ্ছো?' – মিরা চমকে উঠে ইসহাকের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে পড়লো।

'গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে।'

'গুরুত্বপূর্ণ না-কি বিপজ্জনক কাজ?'

'হতে পারে বিপজ্জনক। আবার এত সহজও হতে পারে যে, কালও ফিরে আসতে পারি। ঐ যে আমরা তারার চমকানো দেখেছি কয়েকবার। সেটা কি তা দেখতে যাচ্ছি আমি। আমার সঙ্গে যাচ্ছে আসির নামে এক খ্রিস্টান।'

ইসহাক মিরাকে সব খুলে বললো। মিরা বললো,

'যদি এসব জিনদের ব্যাপার হয় বা আরো ভয়ংকর কিছু হয় কি করবে তখন?'

'আমরা তো হামলা করতে যাবো না। শুধু আসল ব্যাপারটা দেখে আসবো।'

'তোমাকে একা যেতে দেবো না আমি। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে'।

'পাগলামি করো না মিরা। তোমার তো কোন কাজ নেই ওখানে। দু তিন দিন পর ফিরে আসবো আমি।'

'আমাকে না নিলে তুমিও যাবে না' – মিরা কেঁদে ফেললো – 'পাগলামি নয়, আমার ভয় করছে' – মিরা ইসহাকের গলা জড়িয়ে ধরলো – 'যেয়োনা ইসহাক! গেলে আমাকে নিয়ে চলো।'

মিরার চাপাচাপিতে ইসহাক নিরুপায় হয়ে বললো! ঠিক আছে রব্বী অনুমতি দিলে নিয়ে যাবো।

'ইসহাক তার কর্তব্য করতে যাচ্ছে' – রব্বী বললেন – 'আর তুমি তো ভালোবাসার আবেগকে আশ্রয় করছো। কর্তব্য মানুষকে শুধু সামনের দিকেই অগ্রসর করে। কিন্তু ভালোবাসা পায়ের শিকল বনে যায়। না মিরা! ওর সঙ্গে যেয়োনা তুমি, দু'তিন দিনের মধ্যে সে ফিরে আসবে।'

'আমি জানি সে ওখানে কেন যাচ্ছে, সেখানে আমার প্রয়োজন পড়বে ওর' – মিরা বললো।

'নাদান মেয়ে! এ কাজ পুরুষের, কোন মেয়ের নয়।'

মিরা হেসে ফেললো। রব্বী আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। মিরা বললো,

'যে কাজ আমি পারবো তা ইসহাক ও আসির পারবে না, সেখানে যে ওরা যাবে মারাও তো যেতে পারে। সেখানকার কারসাজি যদি মানুষের হয় তাহলে আমি একা এগিয়ে যাবো। আমার মতো সুন্দরী মেয়ে দেখলে ওরা এমন করে দৌড়ে আসবে যেন পাখি দানা দেখে জালে এসে ফেঁসে যায়। তারপর ইসহাকরা গিয়ে পাকড়াও করবে বা শুধু দেখে আসবে আসল ব্যাপার কি?'

'ওরা তোমাকে ধরে ফেলবে, তারপর তোমার সঙ্গে ওরা কি আচরণ করবে তা কি জানো তুমি?' – রব্বী বললো।

'জানি রব্বী! কিছু ত্যাগ তো করতেই হবে। তবে ওদেরকে ধোঁকা দিয়ে আমি ওখান থেকে চলে আসবো। যে উদ্দেশ্যে আপনি ওদেরকে পাঠাচ্ছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি। এটা আমাদের ইহুদী জাতির স্বার্থ। আর আপনি যদি আবেগের কথা বলেন রব্বী! তবে আমি ইসহাককে ছাড়বো না। আমাকে যেতে না দিলে ইসহাককে যেতে দেবো না আমি। তার মৃত্যু হলে আমিও তার সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নেবো।'

'ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার আবেগের পরিবর্তে কর্তব্যকে প্রাধান্য দিতে পারো তাহলে ইসহাকের সঙ্গে যাও। তুমি কিন্তু ওদের সফলতা ব্যর্থতা দু'টার কারণই হতে পারো। আবেগকে দমিয়ে রেখে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও তাহলে সফল হয়ে ফিরতে পারবে।'

মিরার বাবা জানতে পেরে দৌড়ে রব্বীর কাছে এলে রব্বী তাকে বুঝিয়ে বললে সে শান্ত হয়ে ফিরে গেলো।

সূর্যাস্তের সময় ইসহাক, আসির ও মিরা পৃথক পৃথকভাবে গ্রাম থেকে বের হলো। গায়ে কিছু মুসলমান থাকায় ওদের এ ব্যাপারটা গোপন রাখা জরুরী ছিলো। আসার সময় তিনজনই খঞ্জর নিয়ে নিলো। ইসহাক ও আসির তলোয়ারও নিয়ে নিলো। পথ সামান্য হলেও ঘুরপথে যেতে হচ্ছিলো।

ওরা দূর থেকেই দেখলো লোকেরা রহস্যময় আলো ও তারা চমকানোর দৃশ্য দেখার জন্য জড়ো হচ্ছে। পাহাড়ের ওক ঝাড়ের যেখানে ব্যাপারটা ঘটে ওদের গন্তব্য সেখানেই। পথ খুবই কম। কিন্তু ওদের পাহাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে।

ওরা ওদের গায়ের পাশের নদীতে পৌঁছে গেলো। নদী ছোট হলেও পাহাড়ের ঢালে হওয়াতে গভীর ও খরস্রোতা। তিনজনেই নদীতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করলো। কনকনে ঠাণ্ডা পানি আর স্রোতের তীব্র টান ওদেরকে বেশ বেগ পাইয়ে দিলো। সামান্য ব্যবধানও ওদের মনে হতে লাগলো কয়েক ক্রোশ দূর।

বেশ কষ্টে ওপারে পৌঁছে তিনজনই কাপড় খুলে ভেজা কাপড় নিংড়ে নিলো। রাতের শীতল হাওয়া ওদের ভেজা শরীরে লাগতেই ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো ওরা। দুই যৌবনোদ্যত পুরুষের সামনে পুরুষ্টু শরীর নিয়ে নিরাভরণ হতে মিরার মোটেও সংকোচ হলো না।

তিনজনেই কাপড় নিংড়ে পরে নিলো। তারপর লাফিয়ে শরীর গরম করতে শুরু করলো। কিন্তু পুরুষের সমান উষ্ণতা তো নারীর দেহে নেই। মিরা অনুভব করলো সমস্ত শরীর তার অসাড় হয়ে আসছে। ইসহাক ও আসির দু'জনের মাঝখানে ওকে দাঁড় করিয়ে পায়ের গোড়ালি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সমস্ত শরীর মেসেজ করতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর মিরা হাঁটার মতো শক্তি ফিরে পেলো।

নদীর তীর ঘেঁষে ওরা পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছলো। ওদের যেতে হবে পাহাড়ের অন্যপাশে। যেদিকের চূড়ায় ওক ঝাড় রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওদের শরীরে উষ্ণতা ফিরে এলো। এদিকটায় ওরা আগে কখনো আসেনি। সবুজ মসৃণ চমৎকার পাহাড়ি পথ দেখে ওরা এতক্ষণে স্বস্তি অনুভব করলো। কিন্তু সামনে গিয়ে বুঝলো, এ অঞ্চল তার সবুজ সুন্দরের মধ্যে অসুন্দরও কম রাখেনি। দুই পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছে ওদের মনে হলো অন্য জগতে এসেছে ওরা। ওদের সামনে তিনটি পাহাড় প্রাচীন কোন দুর্গের কালো স্যাঁত স্যাঁতে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানো। পাহাড়ের নিচের দিকে ময়লা পানির ডোবা। এখান দিয়েই এক-দেড়জনের চলার মতো কাদাময় পথ দিয়ে ওদের যেতে হবে। কিন্তু এটা কি মূলপথে নিয়ে যাবে না পানিতে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে ওদের জানা ছিলো না। সোজা রাস্তা হলো, একমাত্র পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে ওপারে যাওয়া। কিন্তু এতে নির্ঘাত ওরা ধরা পড়ে যাবে।

ওরা এদিক দিয়েই এগোলো। মিরা একেবারে পেছনে। একটু যাওয়ার পর ওদের পেছনে পানিতে কি একটা যেন নড়ে উঠলো। পাত্তা দিলো না ওরা। হঠাৎ মিরার চিৎকার শোনা গেলো। ওরা পেছনে তাকিয়ে দেখলো মিরার এক পা গিরা পর্যন্ত এক কুমিরের মুখে। কুমির মিরাকে পানিতে টেনে নিতে যাচ্ছে। মিরা পাহাড়ের গায়ের একটা পাথর আঁকড়ে ধরে মরণ চিৎকার করছে। ইসহাক ও আসির প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে গেলো। পরে ওদের মনে পড়লো কুমিরকে কাঁবু করা যায়। কুমিরের মাথা ও পিঠ বর্শা তলোয়ার কোন কিছু দিয়েই যখম করা যায় না। কুমিরের পেটের চামড়া এতই নাজুক যে সামান্য খঞ্জরও পেটে ঢুকে যায়। আবার মুখের ভেতর বর্শা মেরে বা চোখে তলোয়ার মেরেও কুমিরকে কাঁবু করা যায়।

ইসহাক ও আসির দ্রুত তলোয়ার কোষমুক্ত করলো। ইসহাক অন্ধকারেই অনুমান করে কুমিরের চোখে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। আসির দারুণ দুঃসাহস দেখালো। সে পানিতে নেমে গেলো। হাঁটু পানির বেশি ছিলো না ওখানে। আসির সন্তর্পণে কুমিরের কাছে গিয়ে নিচ দিয়ে শরীরের সমস্ত জোর একত্রিত করে তলোয়ারটি বর্শার মতো মারলো কুমিরের পেটে। কুমিরের মুখ দিয়ে ভয়ংকর চিৎকার বেরিয়ে এলো। মিরার পা কুমিরের মুখ থেকে আলগা হয়ে গেলো, মিরা এক ঝটকায় পা সরিয়ে নিলো। কুমিরটি পুরো পানিতে আলোড়ন তুলে ছটফট করতে লাগলো। কুমিরের দাঁত গোলাকার হয়। এজন্য কুমির দাঁত দিয়ে শুধু শক্ত করে ধরতে পারে। কামড়ে বড় ধরনের যখম করতে পারে না। এজন্য মিরার পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। ইসহাক ও আসির মিরাকে টেনে তুলেই দৌড় শুরু করলো। সামনে ওরা রাস্তা পেয়ে গেলো।

অনেক দূরে গিয়ে ইসহাক মিরার পা খুলে দেখলো। রক্তে পায়ের গিরা থেকে নিয়ে পাতা পর্যন্ত চটচটে হয়ে গেছে। দেখা গেলো কুমিরের দাঁত একেবারে চামড়া কেটে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইসহাক তার মাথায় বাঁধা কাপড়টি ছিঁড়ে মিরার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলো। ব্যথায় মিরা ককিয়ে উঠলো। কিন্তু পট্টিবাধা হতেই ওরা চলতে শুরু করলো। মিরা মুখ বিকৃত করে বললো,

'আমার কথাটি তোমরা শোন ভাই! লক্ষণ ভালো মনে হচ্ছে না। আমার মন বলছে এখান থেকে ফিরে যেতে।'

'পাগল হয়েছো মিরা! এ পর্যন্ত এসে আমরা ফিরে যাবো?' – ইসহাক বললো।

'রব্বী আর ফাদার আমাদের বুযদিল ও মিথ্যাবাদী বলবে। এখানে কোথাও লুকিয়ে বসে থাকো। আমরা কাজ শেষ করে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো' – আসির বললো।

'না' – মিরা ভীত গলায় বললো এখানে একলা থাকতে পারবো না আমি। এত ভয় আমি কখনো পাইনি।

'আসলে ঐ কুমিরটা তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। মন থেকে ভয় তাড়াও।'

'তোমাকে কি করে বিশ্বাস করাবো এটা আমার মনের ভয় না। এমনিই যদি আমরা ঘুরতে আসতাম আর কুমির ধরতো এতো ভয় পেতাম না আমি। কোন অদৃশ্য ইংগিতে যেন কুমিরটা আমাকে ধরে ছিলো– এখান থেকে চলে যাও। সামনে কিন্তু মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে।'

'ভাই ইসহাক! সময় নষ্ট করো না। তুমি এই মেয়ের কথা শুনলে রব্বী আর ফাদারকে কি জবাব দেবে তুমি?' – আসির বললো–'তুমি তো জানো আমাদের প্রতি ওঁদের ভরসা কতটুকু।'

'শোন মিরা! রব্বীকে তুমি যা বলেছিলে তা ভুলো না। আমাদের সাহায্য করবে বলেছিলে তুমি। বলে ছিলে, এসব মানুষের কোন ব্যাপার হলে তোমার রূপের ফাঁদে ফেলাব ওদের। একারণেই রব্বী তোমাকে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, তুমি আমাদের পায়ের শিকল বনে যাবে। তুমি এখন তাই করছো, দায়িত্ব পালন করেই যেতে হবে তোমাকে' – ইসহাক বললো।

'পরিষ্কার দেখছি আমি ইসহাক! এখান থেকে তুমি জীবিত ফিরে যেতে পারবে না।'

দু জনে খুবই বিরক্ত হলো। ইসহাক মিরার হাত ধরে উঠিয়ে বললো চলো, বিরক্ত করো না।'

মিরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দিলো। ওদেরও চলার গতি ধীর হয়ে এলো। দু'দিকে দুই পাহাড় রেখে ওরা এগুতে লাগলো। দুই পাহাড়ের মাঝখানে আসার পর ওদের চোখে কিসের যেন আলো লাগলো। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো এটা আগুন। যতই এগুতে লাগলো আলো ততই বাড়তে লাগলো। একটু পর কয়েকজন লোকের গলা পাওয়া গেলো। ওরা ঠিক করলো পেছনের পাহাড়ে চড়ে একটু ওপর থেকে দেখলেই বুঝা যাবে আগুনের উৎস কোথায়।

পেছনের পাহাড়ে চড়তে গিয়ে দেখলো বেশ অদ্ভুত নিসর্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ পাহাড়। পাহাড়ের কোথাও একেবারে নেড়া–মসৃণ প্রান্তর। কোথাও সবুজের ঘাসি আবরণ। একটি নেড়া ঢালে উঠার সময় এসে ইসহাকের পা ফস্কে গিয়ে সে একেবারে পাহাড়ের নিচে ঠোকর খেতে খেতে গড়িয়ে গেলো। মিরাও তার পেছনে যেতে উদ্যত হলে আসির তার হাত ধরে থামালো। বললো,

'এখানেই থাকো, পা ফস্কে তুমিও পড়ে যাবে। সে তো পুরুষ। সহ্যশক্তি আছে। আর তুমি তো আগ থেকেই যখমী।'

ওপর থেকে দেখা গেলো ইসহাক উঠিয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যথাট্যাথাকে কোন পাত্তা না দিয়ে হাচড়ে পাচড়ে ওপরে উঠে আসছে। ইসহাক ওপরে পৌছতেই মিরা বললো, এটা দ্বিতীয় অশুভ লক্ষণ এবং আমাদের না যাওয়ার প্রতি আসমানী ইশারা। ইসহাক যেন তার কথা শুনতেই পায়নি এমন ভাব করে। ছয় পায়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করলো।

আজ তিন-চার দিন ধরে তারার চমক ও সাদা রৌশনীর ঝলক দেখা যাচ্ছে না। এজন্য পাহাড় থেকে কিছু দূরে অন্য দিনের তুলনায় দ্বিগুণ মানুষের ভিড় দেখা গেলো। আজ সবার আশা পূর্ণ হলো। হঠাৎ নাকারা বেজে উঠলো। কিন্তু একটু পরই ধীরে ধীরে তার আওয়াজ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। একটু পর আবার অনেকগুলো সানাই বেজে উঠলো। কেমন এক সম্মোহনী সুরে বিশাল ভিড়ের মধ্যে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। যে, কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। রাতের অন্ধকার কাজল-কালির মতো। হঠাৎ কয়েকটি কণ্ঠ বলে উঠলো 'ঐ যে চমকেছে'। লোকেরা, কালেমায়ে তায়্যিবা পড়তে শুরু করলো। চারদিকে শ্রদ্ধা-বিগলিত কণ্ঠের গুঞ্জন উঠলো।

তারার চমক মিলিয়ে গেলো এবং সেদিনের মতো ওক ঝাড়ের ওপর স্পষ্ট আলোর শুভ্র স্তর দুলে উঠলো। সেদিনের মতই আলোর ভেতর থেকে শুভ্র পোশাকধারী এক লোক দু'হাত এমনভাবে প্রসারিত করে বেরিয়ে এলো যেন দুআ করছে। সবুজ পোশাকধারীরা ভিড়ের মধ্য থেকে বলতে লাগলো– 'সিজদায় চলে যাও সবাই। আমাদের মুক্তিদাতা নাযিল হয়েছে।' কিছু লোক প্রথমেই সিজদায় চলে গিয়েছিলো, এবার বাকীরাও সিজদায় পড়ে গেলো।

লোকেরা সিজদা থেকে উঠে যখন সামনের দিকে তাকালো সেখানে কোন তারার চমক দেখলো না শুধু রহস্যময় সেই শুভ্র পোষাকধারীকে দেখলো। উঁচু একটি আওয়াজ ভিড় পর্যন্ত পৌছলো, 'খোদার দূতের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যে তোমাদের সামনে এসে যাবেন তিনি। খোদার শুকরিয়া আদায় করো সবাই।'

★ ★ ★ ★

ওদিকে তারা চমকানোর আগের ঘটনা। ইসহাক, আসির ও মিরা ওক ঝাড়ওয়ালা পাহাড়ের পেছনের পাহাড়ে চলতে চলতে উল্টোদিকের পাহাড়ের এক দিকের ঢালুতে পৌছেই চমকে উঠলো। ঢালের গায়ে বিরাট এক গুহা। কিন্তু এখন ওটা কাঠ-খড়ি ও লাকড়ির স্তূপ দিয়ে ঠাসা এক অগ্নিকুণ্ড। গুহাটি পাহাড়ের ঢালে হওয়ায় আগুনের শিখা গুহার ছাদ পর্যন্তই পৌছছিলো। পাহাড়ের অন্যপাশে যেখানে লোকদের ভিড় সেদিকে শিখার এক বিন্দু ছায়াও পৌছছিলো না।

দুই পাহাড়ের ব্যবধান ছিলো ষাট-সত্তর গজ। এখান থেকে ইসহাকরা দেখলো গুহার একটু দূরে পাঁচ ছয়জন লোক। একজন লোক আগুনে লাকড়ি ফেলছে। গুহার আরেক দিকে বেলচার চকচকে একটা পাত দেখা গেলো। ইসহাকরা দুটি গাছের আড়ালে বসে সব দেখছিলো। দুই পাহাড়ের ব্যবধান সামান্যই ছিলো। এজন্য ওরা ঐ পাহাড়ের প্রতিটি মানুষের নড়াচড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো।

দুই লোক সেই চকচকে পাতটি আগুনের শিখার সামনে নিয়ে ওপর নিচ করে ঘুরালো। ফ্লাড লাইটের আলোর মতো তার প্রতি-চমক সোজা পেছনের পাহাড়ের ঐ দুটি গাছের ওপর গিয়ে পড়লো যেখানে ইসহাকরা লুকিয়ে ছিলো। তীব্র আলোতে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। ওরা তিনজনই সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়লো। চমকানো পাতটি রেখে দেয়া হলো। সাদা পোশাকে আবৃত কোত্থেকে জানি এক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সাদা পোশাকধারী বললো, 'এসো ভাই! ওপরে কে যাবে?'

এক লোক আয়নার মতো একটা কিছু নিয়ে এগিয়ে এলো। লোকটি একবার আয়নাটি আগুনের শিখা বরাবর ধরতেই পাহাড়ের এদিকের ঢালে গিয়ে এর প্রতিবিম্ব পড়লো।

লোকটি এবার আয়না উঠিয়ে পাহাড়ের চূড়ার সেই ওক ঝাড়ের দিকে উঠে গেলো। এখন সে অন্ধকারে। গুহার আগুনের আলো সে পর্যন্ত পৌছছিলো না। ইসহাকরা অনুমান করলো লোকটি একটি গাছে উঠে গেছে। একটু পর গাছের মধ্যে পলকের জন্য আলোর চমকানি দেখলো। ইসহাক আসিরকে বললো, 'গাছে কি হচ্ছে জানো?'

'তোমাদের রব্বীর সন্দেহ ভুল নয়'–আসির বললো–'ওখানে কি হচ্ছে জানি আমি। ঐ গুহার ঢালের আগুনের শিখা নিশ্চয় গাছের উচ্চতা থেকে দেখা যায়। ঐ শিখার দিকে লোকটি আয়না ধরলেই পাহাড়ের সামনের দিকের প্রতীক্ষিত লোকেরা এর চমক দেখতে পাবে।'

'দেখো কী ভীষণ আগুন'–ইসহাক বললো– 'পাহাড়ের চূড়ায় এ আগুন জ্বালানো হলে সারা এলাকা আলোকিত হয়ে যেতো। এখন বলো তোমরা যে তারার চমকানি দেখতে সেটা আসলে কী? অতি সহজ বিষয়। এসব ধুরন্ধর কিছু মানুষের কাজ।'

'কিন্তু এরা কে সেটা জানা যাবে কি করে?'–মিরার প্রশ্ন।

'আমরা তিনজন নয় দু'জন। মিরাকে ধরো না'–ইসহাক বললো– 'ওরা পাঁচ ছয় জন।'

'থামো ইসহাক! ঐ লোক গাছ থেকে নেমে আসছে। সাদা পোশাকওয়ালা ওপরে যাচ্ছে।'

'এখন কি হবে আমি বলছি'–ইসহাক বললো– একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াবে। আর তার ওপর ঐ চকচকে পাতের প্রতিবিম্বের আলো ফেলা হবে। লোকেরা ধরে নিবে কোন পয়গম্বর আত্মপ্রকাশ করেছেন।'

তাই হলো। আগুনের গুহার দিক থেকে পাতের প্রতিবিম্ব কয়েকবার ঘুরানো হলো। তারপর সাদা পোশাকধারীর ওপর স্থির হলো। ওদিকে ভিড় থেকে কালেমায়ে তায়্যিবার গুঞ্জন উঠলো। একটু পর সেই পাতের চমকানি সরে গেলো। সব অন্ধকার হয়ে গেলো, এক লোক উঁচু থেকে ঘোষণা করলো–

'খোদার দূত আত্মপ্রকাশ করেছেন।'

'তিন চারদিন পর তিনি তোমাদের সামনে আসবেন।'

'খোদার পয়গাম নিয়ে আসবেন।'

'খোদার শুকরিয়া আদায় করো সবাই।'

★★★★

'যা দেখেছি আমরা রব্বী ও ফাদারকে তা বলবো। কি করবেন উনারা জানি না। আমি পরামর্শ দেবো, আমরা তিনজন যেমন এখানে পৌঁছেছি কাল সন্ধ্যায় এমন করে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে ঐ পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবো। এরপর সুযোগ বুঝেই ওদেরকে পাকড়াও করে তখনই লোকদেরকে ঐ পাহাড়ে নিয়ে এসে দেখাবো যে, দেখো এই শয়তানরা কি করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে– আমি নিশ্চিত এরা মুসলমান' –ইসহাক বললো।

ইসহাক কথা বলছিলো। ঐ পাহাড়ের গুহার আগুনের শিখার আলোতে এদিক ফর্সা হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ নারী কণ্ঠের ভয়ংকর এক চিৎকার শুনলো ওরা। ইসহাক ও আসির ঘাবড়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলো, যে গাছের ডালে মিরা লুকিয়ে ছিলো তার ওপরের ডাল থেকে একটি সাপ মিরার বাহু পেঁচিয়ে ধরছে। সাপ মিরার বাহুতে বোধহয় ছোবলও মেরেছে। ইসহাক এক ঝটকায় তলোয়ার বের করে সাপকে দু'টুকরো করে ফেললো। মিরা তার বাহু চেপে বসে পড়লো আর অদ্ভুত গলায় চিৎকার করতে লাগলো।

আসির ও ইসহাক বসে পড়ে কোথায় সাপে কেটেছে তা খুঁজতে লাগলো। সাপের ভয়ে মিরার চিৎকার ওদেরকে এত বেখেয়াল করে দিলো যে, ওরা লক্ষ্য করলো না ঐ পাহাড় থেকে সাদা পোশাকওয়ালাসহ পাঁচ ছয়টি লোকের চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ ওরা তখন অজান্তেই গাছের আড়াল থেকে সরে গেছে। মিরার শরীর এমনভাবে মোচড়াচ্ছিলো যে, পাহাড়ের নিচের ঢালে গড়িয়ে পড়লো। ইসহাক আসির দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলো।

'ওকে ওঠাও ইসহাক! দু'জনে মিলে ওকে উঠিয়ে এখান থেকে দ্রুত সরে পড়ি।'

'এতো পথেই মারা যাবে। ঠিক আছে, মরে গেলে একে ঐ কুমিরের ডোবায় ফেলে দেবো।'

ওরা দু'জনে মিরাকে উঠাচ্ছিলো। পেছন থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলো ওরা। পেছন ফিরে তাকাতেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার যোগাড় হলো ওদের। ছয় সাত জনের ঘেরাওয়ের মধ্যে তখন ওরা। এর মধ্যে সাদা পোশাকওয়ালাও আছে। সবার কাছেই খোলা তলোয়ার আর বর্শা রয়েছে। এক লোক ওদের খঞ্জর আর তলোয়ারগুলো নিয়ে নিলো।

'এদেরকে ওপরে নিয়ে চলো। মেয়েটিকে দরকার নেই। এখন কয়েক মুহূর্তের মেহমান মাত্র সে। সাপে কাটতে দেখেছি আমি। এখানকার সাপ কাউকে কামড়ালে জীবিত থাকতে দেয় না তাকে'–সাদা পোশাকওয়ালা বললো।

'আমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারো না তোমরা?' – ইসহাক অনুনয় করলো।

'আমরা এত আহমক হলে ঐ পাহাড়ের নিচে এতগুলো মানুষকে নবীর আত্মপ্রকাশের দৃশ্য দেখাতে পারতাম না। আর যাদের কাছে আমাদের এত মূল্যবান তথ্য রয়েছে তাদেরকে কি করে ছাড়বো'–সাদা পোশাকধারী বললো।

'আমরা আপনাদের দলে ভিড়ে যাবো। যা বলবেন তাই শুনবো আমরা'–আসির বললো।

'তোমরা কে? ধর্ম কি তোমাদের? সত্যি বললে হয়তো ছেড়ে দিতেও পারি।'

'আমার নাম ইসহাক। আমি ইহুদী।'

'আমার নাম আসির। আমি খ্রিষ্টান।'

'এখানে কেন এসেছিলে? এটা বলো না ঐ মেয়েকে নিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছিলে। এখানে কেউ আসতে পারে না। একদিকে কুমির রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। অন্য দিকে এলাকাটি এত ভয়ংকর কাদাময়, কেউ এখানে আসে না।'

ইসহাক সত্যি কথা সব বলে দিলো। কেন এখানে এসেছে। আর এই মেয়ে কিভাবে ওদের সঙ্গে এসেছে।

'তোমাদের রব্বী আর পাদ্রীকে আমরা একটা শিক্ষা দেবো। এখন ইহুদীদের জাদু চলবে না। এখন চলবে হাসান ইবনে সবার জাদু'–সাদা পোশাকধারী হাসান ইবনে সবা বললো।

ইসহাক ও আসিরকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। তখনো ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ওরা হাতজোড় করছিলো। কথা বলতে বলতে ওদেরকে আগুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসানের ইশারায় হঠাৎ ইসহাক ও আসিরকে চার-পাঁচজন লোক ধরে আগুনে ফেলে দিলো। এত গভীর গুহা থেকে ওদের আর্তনাদও পৌঁছলো না ওপর পর্যন্ত। ওদের দেহ কয়লার সঙ্গে মিশে গেছে এটা নিশ্চিত হওয়ার পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হলো বড় বড় মটকা থেকে পানি ঢেলে।

পরদিন সকালে হাসান ও আহমদ ইবনে গুতাশ রাতের ঘটনা নিয়ে কথা বলছিলো।

'এটা সেই জাদুর প্রতিক্রিয়া তোমার হাতে আমি যা করিয়েছিলাম'–আহমদ ইবনে গুতাশ বললো– 'ঐ জাদুতে আমি এমন শক্তি দিয়ে দিলাম যে, এর ক্রিয়ায় তোমার পর্যন্ত কেউ অক্ষত পৌঁছতে পারবে না। পৌঁছলেও তুমি ইশারা পেয়ে যাবে।'

'গুরু! ঐ রব্বী আর পাদ্রীর বসতি কোন্‌টা সেটা জেনে নিয়েছি আমি। ওদেরকে গায়েব করে দিলেই ভালো হবে। নইলে এরা কাঁটা হয়ে জ্বালাতন করবে আমাদের। তবে স্বস্তির বিষয় হলো এরা সেলজুকি গোয়েন্দা ছিলো না'।

'হ্যাঁ হাসান! আমাদের মিশনটাই এরকম যে, কাউকে সামান্য সন্দেহ হলেই তাকে গায়েব করে দেয়া জরুরী। আমি দেখতে চাই তুমি কি উপায়ে ঐ দুটোকে গায়েব করো।'

'আমি দেখিয়ে দেবো। আপনার শাগরিদীর কারণে ঐ বসতির বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত এমন করে লাপাত্তা করে দিতে পারবো যেন দুনিয়াতে ওরা আসেইনি।'

'এখন মন দিয়ে দুটি কথা শোন। এই মিশন শতভাগেরও বেশি সফল। এখন লোকদের সামনে যেতে হবে তোমার। ঐ হাজারখানেক লোক তোমার মুরিদ হয়ে গেছে। এখন নিশ্চিত করে বলতে পারি সামনের কেল্লা দুটি আমাদের। আর লোকদের সামনে কিভাবে যাবে সেটা বলে দিবো তোমাকে...পরের কথা হলো, মাথায় এটা রেখো, জাদুটোনার ওপর সবসময় ভরসা করো না। নিজের বুদ্ধির ওপরও নির্ভর হতে হবে। এখন কোন মূসা (আ) নেই যে, সামেরীকে শায়েস্তা করবেন। কোন মূসা আসবেনও না। তবে সব অবস্থায় জাদু তোমার কাজে আসবে না। তখন বুদ্ধির জাদু চালাবে....

'তুমি তো দেখেছো আমার ঐ কথাটা কি দারুণভাবে ফলে গেছে– মানুষকে মন্দ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে তোমার সঙ্গে সেই আচরণই করবে যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গে করা হয়েছে। মন্দ আর পাপের ব্যবহার এমনভাবে করবে মানুষের চোখে যেন সেটা এমন অলৌকিক হয়ে ধরা দেয় যে, সবাই সিজদায় পড়ে যেতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার লোককে তুমি তোমার সামনে সিজদা করতে দেখেছো। আমি নবী নই হাসান! কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, মানুষ আস্তে আস্তে জাদুকরদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তাদের সব সমস্যার সমাধানের জন্য জাদুকরের কাছে যাবে তারা। জাদু দিয়ে একে অন্যের ক্ষতি করবে। কিছু লোক জাদুর নামে ধোঁকাবাজি করে মানুষকে লুট করবে... আচ্ছা এসব কথা পরে হবে। তুমি ঐ ইহুদী রব্বী ও খ্রিষ্টান পাদ্রীর ব্যবস্থা করো।

এর দু'দিন পর কৌশলে বৃদ্ধ রব্বী ও পাদ্রীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে সেই কুমিরের ডোবায় ফেলে দেয়া হলো।

১৩

যে বসতিতে ইহুদী রব্বী ও খ্রিষ্টান পাদ্রীর বাড়ি ছিলো সেখানকার প্রত্যেকেই ঘুরে ফিরে এই প্রশ্ন করছিলো,

'রব্বী কোথায় গেলেন?'

'ফাদার কোথায় গেলেন?

'ইসহাক ও আসির কোথায়?'

'মিরা কোথায়?'

রব্বী ও ফাদারের লাপাত্তা হয়ে যাওয়া তাদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা ছিলো না। তাই কেউ তা মেনে নিতে পারছিলো না। এক সকালে সবুজ পোশাক ও সবুজ পাগড়ি মাথায় পাগলের মতো এক লোককে সে বস্তিতে দেখা গেলো। গুরুগম্ভীর গলায় 'হক হক' বলে পাড়া মাতিয়ে তুলছিলো সে। ঘাড় অবধি তার বাবরি, বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, রক্তের পিণ্ডের মতো টকটকে লাল চোখ আর মুখ দিয়ে অনবরত বের হওয়া 'হক হক' শব্দ লোকদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে তার কাছে নিয়ে এলো। তাকে ঘিরে মানুষের জটলা তৈরী হলো। হঠাৎ সে তার ডান হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে বললো,

'কিছুই থাকবে না। সব হারিয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। নাম নিশানাও মিটে যাবে.... ওই যে রৌশনী দেখায়... হক হক।'

লোকদের চোখে মুখে এবার কৌতূহল তীব্র হলো। পাগলের গলাও বেড়ে গেলো।

বুড়ো এক লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো,

'আরে এসবের মতলব বুঝিয়ে দেবে না?'

'যে বুঝবে না সেও থাকবে না'—পাগল রহস্যভরা আওয়াজে বললো।

'আরে তুমি এখানে বসছো না কেন?' বুড়ো বললো।

'আমরা বুঝতে চাই'—আরেকজন বললো।

'বসো বেটা বসো, তোমার খেদমত করতে দাও আমাদেরকে'—বুড়ো বললো।

পাগল মাটিতেই বসে পড়ে সবাইকে ইংগিতে বসতে বললো। সবাই বসে গেলো ওখানে।

পাগল আকাশের দিকে মুখ করে চিৎকার করলো—

'হক হু হক হু'। যে মানবে না সে হারিয়ে যাবে।'

'কার কথা বলছো, কে হারিয়ে যাবে?'—বুড়ো জিজ্ঞেস করলো।

'তোদের পিতারাও হারিয়ে গেছে বাচ্চারাও হারিয়ে গেছে'—পাগল খেক খেক করে হাসতে হাসতে বললো।

'তুমি কি আমাদের পাদ্রীর কথা বলছো?'—এক খ্রিষ্টান জিজ্ঞেস করলো।

পাগল আকাশের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো।

'তাহলে কি আমাদের পাদ্রীর কথা বলছো?'—এক ইহুদী জিজ্ঞেস করলো।

পাগল নিশ্চুপ।

'আমার বেটা ইসহাকের দিকে ইংগিত করছো?'—এক লোক ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'নাকি আমার আসিরের কথা বলছো'—আরেক লোক ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার মেয়ে মিরা'....পেছন থেকে এক মহিলা কেঁদে উঠলো।

'ওরা মানতো না—তোমাদের বাপ দু'জনও মানতো না...সব হারিয়ে গেছে'—পাগল রাগত কণ্ঠে চাবিয়ে চাবিয়ে বললো।

'কি মানতো না?'–বুড়ো জিজ্ঞেস করলো।

'ঐ যে আলোর মধ্যে আলো হয়ে এসেছে। ওরা খোদার প্রেরিত সেই আলোকেও মানতো না।'

এক ঝটকায় উঠিয়ে দাঁড়িয়ে 'হক হু হক হু' বলতে বলতে পাগল হঠাৎ হাঁটা দিলো।

'তিনি আসছেন। তিনি অবতরণ করছেন। না মানলে গায়েব হয়ে যাবে' পাগল হাঁটতে হাঁটতে বলছিলো।

লোকেরা সামনের একটি নদী পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলো। নদীতে পৌছে পাগল নদীর ওপর দিয়েই হাঁটা দিলো। বুক পর্যন্ত গভীর পানিতে পৌঁছেও সে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে নদী পার হলো। ওপার থেকে শতশত বিহ্বল চোখ তাকে দেখছিলো। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত কেউ পাগলের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। পাগল অদৃশ্য হয়ে গেলে সেই বুড়ো বললো,

'রব্বী ও ফাদার বলতেন, ঐ আলোর চমকানি টমকানি ভুয়া। আমি বলবো ওরা এর শাস্তি পেয়েছেন।'

'ইসহাক ও মিরার কথা তো সবাই জানো। ইসহাক আমাকে বলে গিয়েছিলো, ওকে ও আসিরকে রব্বী ও ফাদার নির্দেশ দিয়েছেন, যে পাহাড়ে ঐ আলো চমকায় ও সাদা পোশাকের যে হাস্তি দেখা দেন এর পেছনের পাহাড়ে গিয়ে আসল ঘটনা দেখে আসতে। মিরাও ওদের সঙ্গে গিয়েছিলো'–এক যুবক বললো।

'ঐ পাহাড়ের পেছনে? কখনো ঐ পাহাড়ের পেছনে কেউ গিয়েছে বলে শুনেছো তোমরা? গেলেও ফিরে আসতে দেখেনি কেউ। সেটা মৃত্যুর উপত্যকা। কয়েক জায়গায় ওঁত পেতে আছে মানুষখেকো কুমির। গাছে মাঠে পানিতে সবখানে বিষধর সাপ'–এক প্রৌঢ় বললো।

'এখন বুঝতে পারছি। ঐ আলো আর ঐ সাদা পোশাকের হাস্তি মানুষ নন। মানুষ হলে তো সেখানে কখনো যেতে পারতো না'–আরেক বুড়ো বললো।

'হ্যাঁ এটা আমি মানছি সেটা মানুষ নয়। তবে শুনেছো কিনা জানি না, কোন সাপের বয়স শত বর্ষ হলে সে সাপ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়। এটা সেই সাপ। ঐ সাদা পোশাকে তিনি আসলে শিশ নাগ'–আরেক লোক বললো।

লোকেরা তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যার মধ্যে সমর্থনও ছিলো আবার অজানা ভীতিও ছিলো।

'লোকে বলে ইনি আরেক নবী। উনাকে তো শুধু আমরাই দেখছি না। হাজারো লোক দেখেছে। সবাই তাকে সিজদা করে। সেখানে অনেক সুফী দরবেশকেও দেখছি। তারাও সিজদায় চলে যান। মেনে নাও কোন নতুন পয়গাম আসছে। কেউ এর বিরুদ্ধে যেওনা। তাহলে পুরো বসতিই ধ্বংস হয়ে যাবে'–প্রৌঢ় বললো।

★★★★

এই প্রতিক্রিয়া সেই এলাকার সবার ছিলো। হাঁটে-ঘাটে, গ্রামে-শহরে সবখানে একই আলোচনা। সবার মধ্যে নতুন কিছু দেখার প্রতীক্ষা। দেখতে দেখতে সেই পাহাড়ের সামনের বিশাল ময়দানে হাজারো তাঁবুর বসতি গড়ে উঠলো। শত শত লোক খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে লাগলো।

এক সকালে লোকেরা জেগে দেখলো, পাহাড়ের আঁচলের ধারের টিলায় পালঙ্কের মতো খোশনোমা গালিচা দিয়ে সুসজ্জিত একটি আসন রাখা। টিলাটি দারুণ সবুজে ছাওয়া। আসনের ডানে বায়ে এবং পেছনে ফল ফুল আর লতানো গাছে সুদৃশ্য ছাদ। আসনের ওপর কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না।

সবাই ওদিকেই চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর টিলার পেছন দিক থেকে শাহী দূতের পোশাকে এক লোক উঠে এলো। তার এক হাতে বর্শা আরেক হাতে সবুজ পতাকা। দূতবেশী লোকটি আসনের সামনে এসে লোকদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তারপর ঝাণ্ডাটি টিলার ওপর পুঁতে ফেললো।

'মহাসত্য নিয়ে তিনি আসছেন'–দূতবেশী লোকটি উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করলো– 'তোমাদের সৌভাগ্য তিনি তোমাদের সামনে আসছেন। তাকে দেখলেই সবাই সিজদায় পড়ে যাবে। বিভিন্ন কবীলার সরদাররা সামনে এসে বসুন। সরদার গোত্রীয় লোকেরাও সামনে আসুন।'

বেশ কিছু লোক সামনে গিয়ে বসলো।

পাহাড়ের দিক থেকে তীব্র বাতাস বইছিলো। একটু পর সাধারণ পোশাকে টিলার ওপর ছয়জন লোককে দেখা গেলো। প্রত্যেকের হাতে দেখা গেলো ছোট পাত্রের মতো একটা করে ডেগ। এরা বাতাসের উল্টো দিকে চলে গেলো। সামান্য সামান্য ব্যবধানে ডেগগুলো রাখলো। লোকদের নজর থেকে অনেক দূরে রাখা হলো ওগুলো। এরপর সেগুলোতে আগুন দেয়া হলো। ধোয়া উঠতে লাগলো প্রতিটি ডেগ থেকে। বাতাসের বেগ ভিড়ের দিকে থাকায় সেদিকেই ধোয়া যেতে লাগলো কুণ্ডলী পাকিয়ে।

'নাযিল হচ্ছে খোদার রহমত'–সে লোকটি বললো।

তখন সবাই ধোয়া থেকে কেমন নেশা নেশা এক সুগন্ধি অনুভব করলো। কারো নাক কখনো এমন ঘ্রাণ পায়নি।

হঠাৎ নাকারা আর দু'তিনটি সানাই বেজে উঠলো মরুর মাদক সুর ছড়িয়ে। সবাই দেখলো আসনের পেছন থেকে এক শাহানা কুরসী উঠে আসছে। কুরসীর ওপর আরবী পোশাকে আবৃত এক লোক বসা। চারজন লোক কাঁধে করে কুরসীটি সেই পালঙ্ক সদৃশ আসনের ওপর নামালো।

'সিজদা! সিজদা'– কারো কণ্ঠ গর্জে উঠলো।

কুরসীর ওপর বসা লোকটি হাসান ইবনে সবা। নিপুণ হাতে ছাটা দাড়ি তার গোধুম বর্ণ চেহারায় দারুণ মানিয়েছে। তার পৌরুষের কান্তিময় দেহাবয়ব, মায়াময় চোখের আকর্ষণে আকর্ষিত না হয়ে পারবে না কেউ। মুখের ঝুলন্ত হাসিটি চেহারার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। সিজদাবনত ভিড়ের দিকে তার চোখ গেলো। আরো প্রশস্ত হলো ঝুলন্ত হাসিটি। সে ইংগিতে লোকদেরকে সিজদা থেকে উঠতে নির্দেশ দিলো।

'আল্লাহু আকবার'!–আরেকবার গর্জন উঠলো।

লোকেরা সিজদা থেকে মাথা উঠালো। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদী খ্রিষ্টানসহ আরো অন্য ধর্মের লোকেরাও ছিলো। প্রতীক্ষিত হাস্তিকে এক নজর দেখার জন্য সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যে অনাশান্বিত এক তৃপ্তি অনুভব করলো। বের হয়ে গেলো তাদের মনের সব শংকা। ভারমুক্ত-হালকা মনে হলো প্রত্যেককে। আবেগ ভালোবাসার ঝড় উঠলো যেন সবার মধ্যে। গুরুগম্ভীর কিন্তু জাদুময় কণ্ঠে হাসান বললো,

'আমি তোমাদেরই একজন। আমার আত্মা সেই নূর থেকে তৈরী যা তোমরা ঐ পাহাড়ের ওপর দেখেছো। খোদা আমাকে তার দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন। তোমাদের জন্য খোদার পয়গাম নিয়ে এসেছি। তবে পয়গাম শোনানোর সময় আসেনি এখনো। তবে এখন এতটুকু বলতে পারি, খোদার পবিত্র ইচ্ছা হলো এই জমিনে তার বান্দার হুকুমত কায়েম করা। যেমন তিনি ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন মানুষের বাদশাহী খতম করতে চান। আল্লাহর সন্তুষ্টি এখন এর মধ্যে যে, ফসলের পূর্ণ অধিকার তারই যে জমিনে হাল চালায় ও বীজ ফেলে। খোদা তার পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমরা কি নিজেদের মতোই অন্যান্য মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হতে চাও না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা মুক্ত হতে চাই'–সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ উঠলো।

'কিন্তু এ কাজ সহজ নয়। তোমাদের একত্রিত হয়ে আমাকে অনুসরণ করতে হবে।'

'আপনার অনুসরণ আমরা অবশ্যই করবো।'

'মনে রেখো, তোমরা আমার সঙ্গে নয় এই অঙ্গীকার খোদার সঙ্গে করছো। যিনি আমাকে দূত বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ওয়াদার বরখেলাপ করলে তোমাদের ওপর খোদার গজব নেমে আসবে। আর ওয়াদা পূরণ করলে দুনিয়াতেই তোমরা দেখতে পাবে বেহেশত।'

'খোদাকে আমরা অসন্তুষ্ট করবো না।'

এরপর হাসান তার সম্মোহনী বক্তৃতার জাদু চালালো। সেই রহস্যময় ধোয়ার সুগন্ধিতে লোকজন আগ থেকে মোহাবিষ্ট ছিলো। তারপর হাসানের এই বক্তৃতা শুনে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা জাদুর ক্রিয়ার মতো পুরোপুরি সম্মোহিত হয়ে গেলো।

বক্তৃতা শেষ করে হাসান সর্দারদের টিলার ওপর আসার নির্দেশ দিলো। বারো চৌদ্দজনের সম্ভ্রান্ত একটা দল হাসান ইবনে সবার সামনে গিয়ে রুকূর মতো ঝুঁকে

পড়লো। প্রত্যেকের চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো হাসান। তার চোখের জাদুতে ওদেরকে আরেকবার সম্মোহিত করলো। হাসানের এই জাদুর সামনে এরা এত মোহিত হয়ে পড়লো যে, হাসান নিঃশ্বাস নিলে এরাও নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। হাসান মুখ নাড়ালে ওরাও মুখ নাড়াচ্ছিলো। এবার হাসান বললো–

'তোমরা এই সমবেত লোকদের সরদার। এরা ঘোড়া বা ভেড়ার পাল। ওদেরকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তোমাদের জন্য ও খোদার মাখলুকের জন্য সুখের জীবন নিয়ে এসেছি আমি। আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় যত ধর্ম এসেছে তারা মানুষকে নানান বাধ্যবাধকতা দিয়েছে। সুখ স্বাচ্ছন্দ কোন ধর্মই দিতে পারেনি। আসল ধর্ম একমাত্র ইসলাম। কিন্তু ইসলামও তোমাদের কাছে আসল আবেদন নিয়ে পৌছেনি। তোমাদেরকে আমি এই মহান ধর্মের সঠিক রূপ দেখাবো। তোমাদের শুধু নিজ নিজ গোত্রের লাগাম নিজ হাতে রেখে সে পথে নিয়ে যেতে হবে যে পথের দিশা দিয়ে খোদা আমাকে জমিনে পাঠিয়েছেন।'

হাসান ইবনে সবা ইসমাঈলি ফেরকার প্রচার শুরু করে দিলো এবং কৌশলে ওদেরকে দলে ভিড়িয়ে নিলো।

'এখন তোমাদের কাছে আমার প্রচারক দল পৌছে যাবে। তোমাদের ফরজ কাজ হলো মুবাল্লিগদের সাহায্য করা এবং লোকদেরকে আমাদের পথে ঐক্যবদ্ধ করা...তোমরা কি করবে এ কাজ?'

'অবশ্যই হে মহান হাস্তি! আমরা করবোই এ কাজ!'–প্রায় বৃদ্ধ এক সরদার বললো।

'আপনার হুকুমে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

'আমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

এই বার তেরজন সরদারের এই আওয়াজ যে গভীর বুক থেকে এসেছে হাসানের তা বুঝতে এক লহমাও লাগলো না। হাসানের প্রথমবারের এই উদ্যোগ কোন বাধা ছাড়াই সফল হলো।

পরদিন বেশ কিছু প্রচারক বিভিন্ন বসতিতে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

বিভিন্ন এলাকার লোকেরা অনুরোধ করতে লাগলো হাসান ইবনে সবা যেন তাদের এলাকায় যায়। তার যিয়ারতের সুযোগ দেয় এবং খোদার কথা শুনিয়ে আসে। হাসান এক এলাকায় সেই প্রথম দিনের জাঁকজমক নিয়ে যায়। দূরদূরান্ত পর্যন্ত তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা তাকে নিয়ে ছড়াতে থাকে মনগড়া নানান কল্পকাহিনী।

এরপর হাসান ও আহমদ কেল্লা দখলের দিকে মন দিলো।

শাহদরের পরের কেল্লা হলো কেল্লা খালজান। কেল্লা খালজানের আমিরের নাম সালেহ নুমাইরী। বয়স প্রায় চল্লিশ। অনেক দিন ধরেই শুনে আসছে সে তার পাশের এলাকায় এক লোকের আত্মপ্রকাশ হয়েছে এবং তারা চমকানো ইত্যাদির খবরও শুনেছে সে। খালজানের লোকেরাও এ খবর শুনেছে। কিছু লোক হাসানের দর্শনে এসেছিলো। ফিরে গিয়ে তারা লোকদেরকে হাসানের ব্যাপারে মুখরোচক অনেক কথা

শোনায়। তারা ব্যাকুল হয়ে উঠলো হাসানকে এক নজর দেখার জন্য। দলে দলে লোক বের হয়ে গেলো হাসানের দর্শনে।

সালেহ নুমাইরী তার উপদেষ্টা পরিষদকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতে লাগলো এসব কি হচ্ছে।

'এসব কি শুনছি আমি? শহরের বাচ্চা বুড়ো সবাই তার নাম নিচ্ছে। তিনি নাকি আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। তার আত্মায় নক্ষত্রের কিরণ আছে!'-সালেহ জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ মান্যবর! আপনি সঠিক খবরই পেয়েছেন। কেউ বলে, তিনি দুনিয়ার নয় আকাশের কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন'-এক উপদেষ্টা বললো।

'আমি শুনেছি তার প্রচারক দল সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। দু'-তিনজন প্রচারক এখানেও আসছে'-আরেকজন বললো।

'খেয়াল রেখো, ঐ প্রচারকরা এখানে এলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। কেউ যেন ওদেরকে তাদের ঘরে স্থান না দেয়। ঘোষণা করে দাও, আমীরে কেল্লার সঙ্গে সাক্ষাত ছাড়া কোন মুবাল্লিগ যেন কারো সাথে কথা না বলে।'

'হুকুম পালন করা হবে। আমাদেরও ঐ মুবাল্লিগদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত। এরা কোন ধর্ম-বিশ্বাসের কথা বলে আগে সেটা দেখতে হবে'- সেই উপদেষ্টা বললো।

'মুসলমানদেরই নতুন কোন ফেরকা হবে এটা। কঠিন করে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, নতুন কোন ফেরকার মাথাচাড়া দেয়ার অনুমতি নেই। ছোট ছোট ফেরকায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা এবং ইসলামী সাম্রাজ্যও ক্ষমতাধরদের হাতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। তোমরা জানো আহলে সুন্নাতে বিশ্বাসী আমি। আমার গর্ব হয় যে, সেলজুকিরা ইসলামের পতনশীল ইমারতটি সমুন্নত করেছে। তাই এই দেশে কেউ সুন্নী বা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে ইসমাঈলিরা আড়ালে থেকে তাদের ফেরকার তাবলিগ করছে। এটাকে রুখা আমাদের জন্য ফরজ।'

'অবশ্যই, ইসলামের সত্যরূপ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমরা উৎসর্গিত। আমাদের দুর্বলতা হলো আমাদের কাছে ফৌজ নেই'-এক উপদেষ্টা বললো।

'ফৌজ আমরা পালবো কি করে? বেতনই বা দেবো কোত্থেকে? কারো সঙ্গে তো লড়াইয়ের দরকার নেই আমাদের। কেউ হামলা করলে সেলজুকিরা সাহায্য নিয়ে পৌঁছে যাবে। আর এটাও মাথায় রেখো, মিথ্যা ও ভ্রান্ত কোন ফেরকাকে তলোয়ার দিয়ে রুখা যায় না। মিথ্যা প্রচারের জবাব সত্য প্রচার দিয়ে দিতে হয়। সবাই সত্যকে অবলম্বন করলে দু'একজন মিথ্যাবাদীর মুখোশ এমনিই বের হয়ে যায়। আচ্ছা মুবাল্লিগরা আসলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

পরদিন সালেহ নুমাইরীর কাছে দুই মুবাল্লিগকে আনা হলো। ওদের বেশভূষা বেশ অভিজাত। সালেহ দু'জনকে খুব সম্মান করে বসালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কার কথা প্রচার করতে এসেছে তারা।

'তিনি হাসান ইবনে সবা-ইসলামের এক ঝাণ্ডা তিনি' এক মুবাল্লিগ বললো।

'তিনি কি নবী দাবী করেছেন?'

'না, আল্লাহর দূত হয়ে এসেছেন। প্রথমে তিনি এক তারকার মাধ্যমে তার আবির্ভাব বার্তা জানিয়েছেন। এরপর অমুক পাহাড়ের ওক ঝাড়ের ওপর এক রৌশনী হয়ে তিনি এই জমিনে অবতরণ করেছেন।'

'তাহলে শুনে রাখো। যে এলাকায় ঐ খোদার দূত এসেছেন সে এলাকা আমার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এক আহলে সুন্নতের অনুসারী হিসেবে খোদার ঐ দূতকে আমি রুখার সবরকম চেষ্টা করবো। এ মুহূর্তে আমার নির্দেশ হলো, যেভাবে এ শহরে ঢুকেছিলে সেভাবেই শহর থেকে বেরিয়ে যাও। কোন নবী বা কোন আসমানী দূত কখনো ওক ঝাড়ের ওপর অবতরণ করেননি। রাসূলুল্লহ (স) পর্যন্ত নবীত্বের ধারাবাহিকতার সমাপ্ত ঘটেছে। যদি বলো ঐ লোক বিশিষ্ট আলেম, বুযুর্গ তাহলে আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাবো।'

'আমীরে কেল্লা! সামান্য সময়ের জন্যও যদি একবার তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হয় আপনার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। আমরা তার পয়গামে মুগ্ধ হয়েই এসেছি এখানে। তিনিও আহলে সুন্নতের একজন। তার সঙ্গে সাক্ষাত হলেই আপনি ধরতে পারবেন তিনি কি সঠিক পথে আছেন না বেঠিক পথে।'

'এটাও হতে পারে, আপনার মতো এত বড় জ্ঞানী মানুষ যদি তার সঙ্গে কথা বলেন আমরাও তার আসল রূপ জানতে পারবো। হয়তো আমরাও ভুলের মধ্যে আছি'–দ্বিতীয় মুবাল্লিগ বললো।

'তিনি কি এখানে আসবেন?'

'সম্ভবত না, আমরা গিয়ে আপনার কথা বলে দেখি তিনি আসবেন না আপনি যাবেন। আপনাকে সেখানে যেতে বলা হলে আপনি কি যাবেন?

'হ্যাঁ আমি যাবো।'

দুই মুবাল্লিগ চলে গেলো।

দুই মুবাল্লিগের কাছে সালেহ-নুমাইরীর কথা শুনে হাসান বললো,

'আমিই তার কাছে যাবো।'

'সালেহকে আমি কিছুটা চিনি। অতি কঠিন লোক। কট্টর আহলে সুন্নত। তাকে মানাতে কষ্টই হবে'–পাশে বসা আহমদ ইবনে গুতাশ বললো।

'গুরু! আপনি কি বলছেন! আপনার কি ধারণা আমি তার কঠিন দৃঢ়তাকে ভাঙ্গতে পারবো না?'

'তোমাকে হতাশ করছি না। আমি বলতে চাচ্ছি, সে একটি পাথর। কৌশলে যাকে ভাঙ্গতে হবে।'

'হ্যাঁ আপনি ওর কথা আমাকে বলে ভালো করেছেন। আমাদের ঐ লোক নয়, আমাদের দরকার তার কেল্লা। আশা করছি কেল্লা খালজান ও এই শহরের পুরোটাই আপনার পকেটে ভরে দেবো।'

'কোথায় দেখা করবে ওর সঙ্গে?'

'এখানে নয়, তার ওখানে যাবো আমি। ঐ ঝর্ণার ধারে ওর সঙ্গে সাক্ষাত করবো।'

স্বচ্ছ জলের কয়েকটি ঝর্ণা, ঝর্ণার ধারে বেড়ে উঠা সবুজ ঘাসের গালিচা এবং চারপাশ ঘিরে থাকা ঝিল দিয়ে এলাকাটি সাজানো। সামান্য সামান্য ব্যবধানে ছোট বড় কতরকমের গাছ অলস ভঙ্গিতে সবুজের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক মৌ মৌ করছে জঙ্গলী ফুলের নেশা ধরানো অচিন সৌরভে। এখানে এসে হাসান আহমদকে জানিয়ে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলো। তারপর খাবার দাবারের আয়োজন করা হলো।

সে জায়গাটি খালজান থেকে তিন মাইল দূরে। অত্যন্ত জাঁকজমক নিয়ে হাসান এখানে তাঁবু গাড়ে। সালেহ নুমাইরীর জন্যও চারদিক রেশমের দেয়াল ঘেরা শাহী তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়। একটি টিলার ওপাশে বাবুর্চিখানা বসানো হয়। হাসান আহমদ ইবনে গুতাশ ছাড়াও আরো কয়েকজন নিয়ে আসে এখানে। এদেরকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের রোল দেয়া হয়। দু'জন সাজে বিশিষ্ট আলেম, দু'জন তার শিষ্য, আরো কিছু এমন লোক যারা সবসময় হাসান ইবনে সবার সান্নিধ্যে থাকাটাকে তাদের জীবনের ব্রত হিসেবে দেখে। তিনটি মেয়েও সঙ্গে রাখে হাসান। এর মধ্যে তার প্রাণপ্রিয় ফারাহও ছিলো।

হাসান সেই দুই মুবাল্লিগকে সালেহের নামে পয়গাম পাঠায় যে, আপনাকে এরা আমার গরিব তাঁবুখানায় নিয়ে আসবে। দু'তিন দিনের জন্য আমার এখানে আপনার পবিত্র পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

পরদিন সন্ধ্যায় চারজন মুহাফিজ নিয়ে সেই দুই মুবাল্লিগের সঙ্গে হাসানের তাঁবুতে এলো। হাসান এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। সালেহ ঝর্ণার কাছে আসতেই মেয়ে তিনটি ছোট ছোট ঝুড়ি থেকে ফুল নিয়ে তার ওপর ফুল ছিটাতে লাগলো।

'না, না। আমি এত বড় লোক নই। নিষ্পাপ ফুল মাড়ানোর পাপে আমাকে দোষী করো না'–সালেহ হা হা করে বললো।

'আপনাদের ওখানে হয়তো অন্য রীতি। আমরা সম্মানিত অতিথির পথে ফুল বিছিয়ে দিই'–ফারাহ প্রাণঘাতি হাসি দিয়ে বললো।

'রীতি তো আমাদের ওখানেও আছে। আমরা আপনাদের মতো অতিথির পথে চোখের মণি বিছিয়ে দিই।'

হাসান হো হো করে হেসে উঠলো। সালেহ নুমাইরী মেয়েদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা গেলো।

সালেহের জন্য এমন আয়োজন করা হলো যেন সে কোন রাজা বাদশাহ।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দু'জনে আসল কথায় এলো।

'আপনি কি নবী দাবী করেছেন?'–সালেহ জিজ্ঞেস করলো।

'না না। আমি কিছু একটা পেয়েছি নিশ্চিত। তবে সেটা নবুওয়াত নয়। আমি বুঝতে পারছিনা এটা কি? এটা বলতে পারি যে, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার অবস্থাটা একটু ভিন্ন। আপনিই বলুন আমি কি? খোদা আমাকে কেন এই মর্যাদা দিয়েছেন?'

'আগে বলুন আকাশ থেকে আপনি কি করে অবতরণ করলেন আর আপনার আত্মার মধ্যেই বা কি করে নক্ষত্রের জ্যোতি প্রবেশ করলো? লোকেরা ঐ পাহাড়ের ওপরের ওক ঝাড়ে যে নক্ষত্রের চমক দেখেছে সেটা কি?'

'আমি বলতে পারবো না কিছুই। আমিও শুনেছি এক গাছের ওপর দু'-তিন রাত ধরে তারকা চমকাচ্ছে। ঐ তারকা দেখার ভীষণ ইচ্ছা ছিলো আমার। কিন্তু তারা চমকানোর সময় হতো আমি বেহুঁশ হয়ে যেতাম।'

'কিভাবে হতো সেটা?'

'এর উত্তর দেয়া মুশকিল। অচেতন অবস্থায় দেখতাম, জ্যোতির্ময় চেহারার এক শুভ্রকেশী আমাকে তার সামনে বসিয়ে বলতেন, মানুষকে পথপ্রদর্শনের সৌভাগ্য তোমাকে দেয়া হয়েছে। তিনি আমাকে শিখাতেন কি করে মানুষকে পথে আনতে হবে। একদিন এক গায়েবী শক্তি....

'হাসান ইবনে সবা!'–সালেহ ধমকে উঠলো–'নতুন কাহিনী শোনাও এখন। অনেক ভণ্ড নবীই এই কাহিনী শুনিয়েছে। অচেতন অবস্থায় ওদেরকে খোদা দূত মনোনীত করেন....দেখো হাসান! খোদা তার দূত বা নবী প্রেরণের ধারা গারে হেরাতেই সমাপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ করেছেন।'

হাসান তর্কে গেলো না। সে এমন করে কথা বলে গেলো যেন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

'আমি যদি ভুল পথে থাকি সঠিক পথের দিশা দিন আমাকে। আমার এখানে কয়েকদিন থাকুন আপনি। নিজের ব্যাপারে এতটুকু বলতে পারি, কিছু জাদুবিদ্যা জানা আছে আমার। মাটির নিচের অনেক গোপন রহস্য বলে দিতে পারি। অন্যরকম কিছু একটা টের পাই আমি আমার মধ্যে। আহমদ ইবনে গুতাশ আমার পীর। তিনি এক গোপন বিদ্যা আমাকে দিয়েছেন।'

'শাহদরের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশ?'

'হ্যাঁ তিনিই।'

'হ্যাঁ আমি আগেও শুনেছি তিনি জাদুর জ্ঞান রাখেন। ভবিষ্যতের পর্দাও সরাতে পারেন। তুমি কি তার কাছ থেকে কিছু শিখেছো?'

'অনেক কিছুই শিখেছি। নক্ষত্রের আবর্তন বুঝতে পারি। আর হাতের রেখা পড়া ইত্যাদি তো মামুলি ব্যাপার।'

সালেহ কিছু না বলে তার হাত এগিয়ে দিলো।

'তোমার পরীক্ষা'–সালেহ বললো।

কথার মোড় যে হাসান ঘুরিয়ে দিয়েছে সেটা ধরতেও পারলো না সালেহ। হাসান সালেহের ডান হাত তার হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে গভীর চোখে রেখা পড়তে লাগলো। হঠাৎ সে এমন তীব্রবেগে তার মাথা উঠিয়ে ফেললো যেন সালেহের হাত থেকে সাপ তেড়ে আসছে। চেহারায় চরম দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে সালেহের দিকে তাকালো।

'কি দেখা গেছে?' – সালেহ জিজ্ঞেস করলো।

হাসান কিছু না বলে কলম কাগজ চেয়ে নিয়ে এর মধ্যে একটা বৃত্ত আঁকলো। তারপর বৃত্তের ভেতর সোজা, বাঁকা এবং তেরছা করে কিছু রেখা টানলো। অনেকক্ষণ ধরে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,

'প্রায় চারদিন থাকতে হবে এখানে। এখনো স্পষ্ট হচ্ছে না ব্যাপার।'

'ভালো না মন্দ ব্যাপার?'

'ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে। যাই হোক, মামুলি কিছু হবে না। রাজকীয়ও হতে পারে সাধারণও হতে পারে। চার দিন দেখবো। পঞ্চম দিনে রেখা ও নক্ষত্রের আবর্তনের ফলাফল আপনার সামনে এসে যাবে।'

সালেহ দারুণ অস্থির হয়ে পড়লো। হাসান তাকে তার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলো।

★★★★

পরদিন সকালে তার তাঁবুতে নাস্তা নিয়ে গেলো ফারাহ। নাস্তা দিয়ে সে চলে এলো না, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

'আর কিছু লাগবে?' – ফারাহ জিজ্ঞেস করলো।

'যে নাস্তা এনেছো এতেই তো আমি পেরেশান আবার জিজেস করছো কিছু লাগবে কিনা' – সালেহ বললো।

'আপনার এখানে একটু বসতে পারি' – ফারাহ লাজুক কণ্ঠে বললো।

'জিজ্ঞেস করার দরকার কি? আমার পাশে বসো। তুমি কে? হাসান ইবনে সবার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?

'শাহদরের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশের ভাগ্নি আমি। তিনি আমাকে উনার সঙ্গে সফরে পাঠিয়েছেন।' – ফারাহ মিথ্যা বললো।

'বিয়ে হয়ে গেছে?

'না'।

'এত দিনে তো বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো!'

'আমার মা বাবা নেই। মামা আহমদ ইবনে গুতাশ অনুমতি দিয়ে রেখেছেন আমি আমার পছন্দ মতো বিয়ে করতে পারবো। শর্ত হলো আমার পছন্দের লোক যেন অভিজাত কেউ হয়।'

'এখনো কি তোমার পছন্দের মানুষ পাওয়া যায়নি?'

'এখন পাওয়া গেছে।'

'সে সৌভাগ্যবান কে?'

ফারাহ সালেহের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো।

'এত লজ্জা পাওয়ার কি আছে? সে কি জানে তুমি কাকে পছন্দ করো?'

'না'।

'তাকে তো বলে দেয়া উচিত।'

'ভয় হয়। সে না আবার বলে দেয় আমাকে তার পছন্দ নয়।'

'সে তো জঙ্গলি জানোয়ার যে তোমাকে অপছন্দ করবে।'

'আপনি কি আমাকে পছন্দ করবেন?'

'তুমি কি গ্রহণ করবে আমাকে?' – সালেহ পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ফারাহ আস্তে আস্তে তার হাতটি বাড়িয়ে দিলো সালেহের দিকে। পরক্ষণেই তার আঙ্গুলগুলো সালেহের মুঠিতে বন্দী হয়ে গেলো। তার আর মনেই রইলো না তার সামনে নাস্তা পড়ে আছে।

সেদিন সুযোগ পেলেই ফারাহ সালেহের তাঁবুতে ঢুকে পড়লো এবং হেসে খেলে ফিরে আসল।

পরদিন হাসান ও সালেহ আবার বসলো। হাসান কি ভুল পথে আছে না সঠিক পথে আছে তা নিয়ে কথা হলো। গত রাতে সালেহ যেমন হাসানের প্রতি অনমনীয় ছিলো আজ রাতে দেখা গেলো পুরো উল্টো। তার মাথায় ঘুরছিলো শুধু ফারাহ আর হাসানের হস্ত গণনা। ফারাহকে দেখে তার যৌবন আরেকবার জেগে উঠেছে। আর হাসানের হাত গণনার রহস্য তাকে করে তুলেছে আরো ব্যাকুল।

সে রাতে সালেহ ঘুমাতে গেলো একটু দেরীতে। মাঝরাতে মুখে কারো কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে তার গভীর ঘুমও ভেঙ্গে গেলো। হড়বড় করে উঠে বসে হাতটি খপ করে ধরে ফেললো। হাত নয় যেন মাখনের টুকরো। তাঁবুর ভেতরের জমাট অন্ধকারেও হাতটা চিনতে পারলো সালেহ। হাতধরে টেনে তাকে নিজের দিকে নিয়ে এলো।

ফারাহ হি হি করে হাসতে হাসতে তার ওপর গড়িয়ে পড়লো। সালেহের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবকের মতো সুঠামদেহী ছিলো সে। ফারাহকে এমন করে তার বাহুর বেষ্টনীতে নিয়ে এলো যেন তাদের দু'জনার অস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে।

'এখন নয়, আগে বিয়ে....এখন এমনি গল্প হোক' – ফারাহ চাপা কণ্ঠে বললো।

সালেহ উঠে বসলো। ফারাহ তার মাথা সালেহের বুকে এলিয়ে দিলো। তারপর দু'জনে কথায় কথায় হারিয়ে যেতে লাগলো দূরদেশে।

'ফারাহ! কাজ করো একটা। হাসান ইবনে সব্বা সেদিন আমার হাত দেখে এমন চুপচাপ হয়ে গেলো যে, আমার ভাগ্যে এমনকী ঘটছে যা সে আমাকে বলতে চাচ্ছে

না। তার চেহারায় অস্বাভাবিক কি একটা দেখেছি যেন...চারদিন এখানে অপেক্ষা করতে বলেছে আমাকে। এখানে তো আমি এতদিনের জন্য আসিনি। তার ব্যাপারে আমি প্রভাবান্বিত নই। সে খোদার দূত একথাও মানি না আমি। আমার ভাগ্যরেখার রহস্য জানার জন্যই রয়ে যেতে হলো আমাকে। তুমি কি সেটা জেনে আসতে পারবে?'

'হ্যাঁ বড় কোন বিপদের কিছু না হলে তিনি আমাকে বলবেন।'

'চলেই যেতে চাইছিলাম। আমি কঠোর আহলে সুন্নত। ভাগ্যে যা আছে তা তো ঘটবেই। কিন্তু তুমি আমার পায়ের শিকল বনে গেছো।'

'এখন আপনি যে দিকেই যাবেন এই শিকল সেদিকেই যাবে। উহু মনে পড়েছে, আপনার জন্য ফুল এনেছিলাম।'

ফারাহ খাটের নিচের একটি ঝুড়ি থেকে এক তোড়া ফুল নিয়ে সালেহের হাতে দিলো।

'আহ কি পিয়ারী খুশবু। আমি তো দূর দারাজের জঙ্গলের ফুলের ঘ্রাণও নিয়েছি। কিন্তু এমন ঘ্রাণ আর কখনো পাইনি।'

বারবার সালেহ ফুলগুলো নাকেমুখে লাগাতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার অবস্থার রূপান্তর ঘটতে লাগলো। ক্রমেই সে অনুভব করলো ফারাহর জন্যই তার জন্ম হয়েছে। বাকী জীবন তার গোলামিতে কাটিয়ে দিলেও সুখ।

'আমার একটা পরামর্শ শুনুন। হাসান ইবনে সবাকে খালজানে গিয়ে কয়েকদিন আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতে বলুন। এতে আপনি আপনার হস্তগণনার রহস্যও জানতে পারবেন। হাসান ইবনে সবাও আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি খালজান গেলে উনাকে তখন বলতে পারবো, আমি আর ফিরে যাবো না। বাকী জীবন আপনার সঙ্গে কাটিয়ে দেবো।'

'আমি তাই করছি। তাকে আমি খালজানের দাওয়াত দিয়ে বলবো, যেভাবেই হোক আমাকে বুঝাও তুমি খোদার সম্মানিত দূত। তখন তোমাকে শুধু মেনেই নিবো না তোমার ফেরকার এমন প্রচার চালাবো যে, তুমি হয়রান হয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ পর ফারাহ তার তাঁবু থেকে বের হলো। সালেহ নুমাইরী বাকী রাত ছটফট করেই শেষ করে দিলো।

হাসান ইবনে সবা খালজান যাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। এক দিন পর কাফেলা খালজানের দিকে রওয়ানা দিলো। হাসান তার সঙ্গে আনা মেয়ে তিনজনের মধ্যে ফারাহকে রেখে বাকী দু'জনকে শাহদর পাঠিয়ে দিলো। অন্যান্য খিমাটিমাও পাঠিয়ে দিলো। রাখলো শুধু অল্প কয়েকজন লোক।

সালেহের বাড়িটি বিশাল এক আমীরানা মহল। হাসান ও ফারাহকে পৃথক পৃথক সজ্জিত দু'টি কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো।

ফারাহের কামরাটি সালেহের কামরার একেবারে পাশেই রাখা হলো।

মাঝরাতে ফারাহ সালেহের কামরায় গিয়ে উপস্থিত হলো। সালেহ জানতো ফারহা আজ আসবে। এজন্য তার দুই স্ত্রীর একজনকেও তার সঙ্গে রাখেনি। তার স্ত্রীরাও সেটা হাসিমুখে মেনে নেয়। সেখানকার প্রচলনই ছিলো এটা। বড় বড় আমীররা চার বিয়ে করতো। আর সালেহের তো ছিলো দুই বিয়ে।

'পাওয়া গেছে, খুবই গোপন কথা' – ফারহা বললো– 'বহু কষ্টে হাসান ইবনে সবা বলেছেন আপনার ভাগ্যে একটা গুপ্তধন লেখা আছে।'

'তাহলে এটা সে আমার কাছে গোপন করলো কেন?'

'তিনি বলেছেন, গুপ্তধনটি এমন জায়গায় যেখানে পৌঁছতে হলে প্রাণও বাজি রাখতে হবে। রাস্তা বড় ভয়ংকর বিপদসংকুল। গুপ্তধনটিকে ঘিরে ভয়াবহ সব বিপদ ওঁৎ পেতে আছে। সাপ, বিচ্ছু, মাংশাসী প্রাণী কি নেই সেখানে!'

'গুপ্তধন! সেটা কত বড়? কি আছে তাতে...এসব কি সে বলেনি?'

'বিস্তারিত বলেননি তিনি। শুধু বলেছেন, সেই গুপ্তধন দিয়ে এরকম দশটা খালজান শহর কেনা যাবে। তারপরও এত রয়ে যাবে যে, কয়েক পুরুষও তা শেষ করতে পারবে না।'

'হাসানও তো সেই গুপ্তধন হাতিয়ে নিতে পারে। তার কাছে জাদু আর জ্যোতিষ বিদ্যার শক্তি আছে।'

'না জনাব! দুনিয়ার ধনসম্পদ আর এসব গুপ্তধনের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। যখনই তার কাছে যাবেন তাকে আপনি ইবাদতে রত দেখবেন। খোদার সন্তুষ্টির প্রতিই তার সব ধ্যান-মন।'

'তাহলে সে তোমাকে ওর সঙ্গে রেখেছে কেন?'

'আপনি যেমন ভাবছেন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তেমনটা নয়। আমার প্রতি তার তীব্র মমতা আছে – এটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই মমতা আর ভালোবাসা একেবারেই ভিন্ন। তিনি আমাকে তার কাছে বসিয়ে আমার চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটেন আর বলেন, তোমার এই কোমল রেশম চুল আমার ভালোও লাগে, শুদ্ধতাও পাই এখানে। তিনি কয়েকবারই বলেছেন, আমি তোমাকে একটা পবিত্র ফুল মনে করি। ফুল থেকে সৌরভ নেয়া হয়। তাকে অপবিত্র করা হয় না। তার মনে আমার জন্য যে স্নেহমিশ্রিত ভালোবাসা রয়েছে তা কেবল 'আবে কাওসারের সঙ্গেই তুলনীয়। আপনি মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না।'

'আমি মনে কোন সন্দেহ রাখবো না ফারাহ! তুমি ওকে বলো গুপ্তধনের জায়গা ও সেখানে পৌঁছার পথ বলে দিতে। এত বর্শা ও তলোয়ারধারী সঙ্গে করে আমি নিয়ে যাবো যে, হাজার হাজার সাপ বিচ্ছুও খতম করে দিতে পারবে। ভেবে দেখো ফারাহ! ঐ গুপ্তধন পেয়ে গেলে আমাদের জীবন দেখো কেমন রাজকীয় হয়ে উঠবে!'

'ঐ গুপ্তধনের প্রতি আপনার মতোই আমার আগ্রহ। আমি তাকে জিজ্ঞেস না করে ছাড়বো না।'

ফারাহ্ সালেহের কামরা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো। সালেহ্ পিছু ডেকে বললো, 'ঐ রাতে তুমি আমার তাঁবুতে যে ফুল নিয়ে এসেছিলে সেটা কি এখানে পাওয়া যাবে?'

'সে ফুল পাওয়া না গেলেও এর থেকে তৈরী সুগন্ধি আছে। সামান্য তুলায় লাগিয়ে নিয়ে আসবো। তবে চুরি করে আনতে হবে। হাসান ইবনে সবার কাছেও আছে এই সুগন্ধি। তিনি এটা লুকিয়ে রাখেন। সেদিন ঘটনাক্রমে তার কাছে ঐ ফুল পেয়ে নিয়ে এসেছিলাম'।

সালেহ পরদিন রাতে ঐ সুগন্ধি নিয়ে হাসানের সঙ্গে খেতে বসলো। সেটা লাগানোর পর থেকেই তার ইচ্ছে হচ্ছে হেসে খেলে এই জীবনটা ভোগ করতে।

রাতের খাওয়ার পর হাসানকে সালেহ বললো,

'ফারাহকে যে ডাকলেন না? শত হলেও সে তো এক আমীরের ভাগ্নি।'

'হ্যাঁ তাকে ডাকা উচিত ছিলো – হাসান বললো।'

একটু পর ফারাহ এলো। হাসানকে অনুনয় করে বললো,

'আমার একটা কথা রাখুন। আমীরে খালজান অত্যন্ত পেরেশান। আপনি তার হাত দেখে নক্ষত্র গণনা করেছেন। কিন্তু উনাকে বললেন না কিছুই।'

'হ্যাঁ হাসান! এর চেয়ে ভালো ছিলো আমার হাত না দেখলে! আশংকাজনক কিছু হলে তাও তো আমাকে জানানো উচিত। আপনার নীরবতা আমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে' – সালেহ এবার হাসানকে 'তুমি'র বদলে 'আপনি' করে বললো।

'বলে দিননা, বলে দিননা' – ফারাহ্ বাচ্চাদের গলায় বললো।

হাসান চোখ বন্ধ করে মাথা নুইয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকলো। একটু পর মাথা উঠিয়ে সালেহের দিকে তাকালো। অতি গম্ভীর গলায় বললো,

'আপনার হাতের রেখায় একটা গুপ্তধন ঘুরছে। কিন্তু সেখানে আপনি যেতে পারবেন না। প্রাণের আশংকা তো আছেই, আরো অনেক ধরনের বিপদ আছে। আর যদি দৈবক্রমে আপনি সেটা তুলে আনতে পারেনও এর একটা অংশ আলাদা করতে হবে আপনাকে।'

'আপনি যতটুকু চাইবেন আমি দেবো।'

'সে কথা নয়। আমার কিছু লাগবে না। এজন্যেই আপনাকে এর কথা জানাচ্ছিলাম না। এটা আমার বিদ্যা ও তার প্রয়োগের শর্ত। যা আপনাকে পালন করতে হবে। আর না হয় এমন পরিণাম হবে আপনার যে, বললে তা কল্পনা করতে গিয়েও কাঁপন ছুটে যাবে। এর থেকে কিছু নিতে চাইলে ফারাহ নিতে পারে, আপনার কোন নিকটাত্মীয়ও নিতে পারে। হ্যাঁ, যে বিদ্যার মাধ্যমে এই গুপ্তধনের কথা জেনেছি সে বিদ্যার মাধ্যমেই এখন আপনার বড় কোন ক্ষতি ছাড়া গুপ্তধন যাতে আপনার হাতে আসে তার চেষ্টা করতে পারি। আমি নির্দেশ পেয়েছি, আপনার অনুপস্থিতিতে যে পর্যন্ত এ কেল্লার কোন আমীর আপনার স্থলে না নিযুক্ত করবেন সে পর্যন্ত আপনি গুপ্তধন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না।'

'হাসান! আপনার যা বলার বলুন আমি সব মানবো। শুধু আমার গুপ্তধন চাই।'

'তাহলে আপনাকে আমার প্রতিটি কথা মানতে হবে। সেখানে আপনিই যাবেন। যাওয়ার সব ব্যবস্থাও আপনি করবেন। গুপ্তধন পেলে এক-চতুর্থাংশ তাকে দিতে হবে যে আপনার স্থলে এখানে আমীরির দায়িত্ব পালন করবে।'

'কেল্লার আমীর তো আমার কোন আত্মীয়ই হবে।'

'না। আমি এটাও আমার বিদ্যার আলোকে দেখেছি। এ শহরের প্রতিটি লোকের, প্রতিটি ঘরের দায়িত্ব এবং এই কেল্লার দায়িত্ব আমাকে সোপর্দ করা হয়েছিলো। আমি তো তা গ্রহণ করতে পারি না। আমাকে এরপর হুকুম দেয়া হয়েছে, কেল্লার স্থলাভিষিক্ত আমি যেন নিযুক্ত করি। কেল্লার আমীর কে হবে আমি ফয়সালা করে ফেলেছি। অনেক ভাবনা চিন্তা করেই ফয়সালা করেছি আমি। ফয়সালা করেছি, শাহদরের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশ আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন। আপনি ফিরে এলে গুপ্তধনের এক-চতুর্থাংশ তাকে আপনি দিয়ে দিবেন। আর তিনি আপনাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শাহদর চলে যাবেন।'

'আমি রাজী' – কোন চিন্তা ছাড়াই সালেহ যেন কথাটা মেনে নিলো।

'তাকে আপনার হাতে লেখা চিঠি দিতে হবে। এই চিঠি লিখলেই আপনাকে গুপ্তধনের সন্ধান দেয়া হবে। এটা একটা চুক্তিকারে হবে। যার ওপর আপনার দস্তখত ও সিল থাকবে। আহমদ ইবনে গুতাশের স্থলে আমি দস্তখত করবো। আর সাক্ষী হিসেবে এখানকার মসজিদের দুই ইমাম ও শহরের কাজীর (বিচারপতি) দস্তখতও থাকবে। আপনি জীবিত না ফিরলে খালজানের আমীর আহমদ ইবনে গুতাশই হবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা এই শহর তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি কাউকে না দিলে কেউ তার কাছ থেকে এই শহর নিতে পারবে না।'

'মৃত্যুর আশংকা কি নিশ্চিত'?

'মৃত্যুর আশংকা নিশ্চিত তবে মৃত্যু নিশ্চিত নয়। জীবিত ফিরে আসারও সমান সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ব্যবস্থা যত শক্ত হবে মৃত্যুর আশংকাও তত কমবে।'

সালেহ এক দিকে হাসানের খোদার দূত হওয়ার বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলো না। অন্যদিকে তার মানসিক দৃঢ়তা এমন পলকা হয়ে গিয়েছিলো, হাসান যা বলতো সে তাই মেনে নিতো। গুপ্তধন সত্যিই আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখার ধৈর্য ছিলো না।

এ কথাটা সেখানে সবসময়ই প্রচলিত ছিলো যে, অনেক বনদস্যু-মরুদস্যু শত শত কাফেলা লুট করে, অনেক জলদস্যু অগণিত জাহাজ লুট করে এত বস্তা বস্তা হীরা জহরত সোনা রুপা ইত্যাদির মালিক বনে যায় যে, সেগুলো লোকালয়ের কোথাও নিরাপদে রাখা সম্ভব হতো না। তাই তারা দুর্গম কোন জায়গায় গিয়ে সেগুলো পুঁতে ফেলে। অনেক দস্যু সেগুলো পরে উদ্ধার করার সুযোগ পেয়ে নিয়ে আসে। আর অধিকাংশই তাদের পুঁতে রাখা ধনভাণ্ডার উদ্ধারের সুযোগ পায় না। সেগুলো এমনিতেই পড়ে থাকে। অনেক রাজা বাদশাও এভাবে অনেক শহর, দেশ জয় করে সেখানকার রাজ ধনভাণ্ডার লুট করে নিয়ে আসে। কিন্তু নিজ রাজ্যে এত সম্পদ

নিরাপদে রাখা যাবে না ভেবে দূরদূরান্তের কোন দুর্গম জঙ্গলে পুঁতে রেখে গেছে। তাদের জীবদ্দশায় তারা আর সেসব সম্পদ উদ্ধারের সুযোগ পায়নি বা তাদের প্রয়োজনও হয়নি এসবের। এগুলোই পরে রূপকথা হয় 'সাত রাজার ধন' নামে।

এসব নিয়ে মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে, যে-কোন গুপ্তধনের খোঁজ একমাত্র দিতে পারে কোন জ্যোতিষ বা গুপ্তজ্ঞানের অধিকারী পণ্ডিত ঋষিরা। এটাও কথিত আছে, এগুলো আনতে গিয়ে প্রায় কেউ জীবিত ফিরতে পারে না। কারণ এসব গুপ্তধনের পাহারা দেয় বড় বড় বিষধর সাপ আর রাগী জিনরা। কিন্তু এরপরও এমন কাহিনীও জনশ্রুতিতে আছে, অমুকে এক গুপ্তধনের কিছু অংশ পেয়ে রাজা বনে গেছে।

সালেহ তাই এই গুপ্তধনের কথা শুনেই এর জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠে। তারপর প্রেমসিক্ত ফারাহ আর ড্রাগ মেশানো সেই ফুল ও এর সুগন্ধি সালেহের সাধারণ চিন্তা ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। সে তো দৈনন্দিন নামাযের কথাও ভুলে যায়। গুপ্তধনের কাড়ি কাড়ি হীরা জহরত আর সোনা রুপা এবং ফারাহকে নিয়ে তার মন-মগজ রঙিন স্বপ্নের ফানুস তৈরী করতে থাকে। তার কাছে হাস্যকর মনে হতে থাকে বাস্তব দুনিয়ার প্রতিটি নড়াচড়া।

হাসান সালেহকে আস্তে আস্তে এমন করেই ব্যাকুল করে তুলতে চেয়েছিলো। হাসান যখন দেখলো বেচারা এবার বুক ফেটে মারা যাবে তখন সে কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বসলো। রাস্তার চিত্র আঁকতে লাগলো আর সালেহকে বুঝাতে লাগলো কোথায় কোথায় কি ভয়াবহ বিপদ আছে। হাসান তাকে চিত্রের একটা অংশ দেখিয়ে বললো,

'এই এলাকা দেখে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন। মনে হবে এটা অন্য কোন দুনিয়া। এক জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় দেখবেন অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা। সেখান থেকে আপনার নড়তে ইচ্ছে হবে না। আরেকখানে দেখবেন কাদাময় অঞ্চল। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতে চাইলে ঘোড়াসহ জমিনে ধসে যাবেন আপনি। দুনিয়ার কোন শক্তিই সেই কাদার ভুবন থেকে বেরোতে পারবে না।'

'আমি নজর রেখে এগুবো। সন্দেহ হলেই পাথর ছুঁড়ে দেখবো চোরা কাদার ভূমি কি না– সালেহ বললো'

'কঠিন চোরাবালির স্তর পেরোতে হবে আপনাকে। এমন মরু অঞ্চল পড়বে মরুচর প্রাণীরাও সেখানে বাঁচতে পারে না। পানির বিরাট মজুদ সঙ্গে রাখতে হবে। যেখানে গুপ্তধনটি আছে সেখানে এমন পাহাড় আপনার পথরোধ করবে যেন খাড়া ইস্পাতের প্রাচীর। ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হবে সেখানে আপনাকে।'

'সঙ্গে করে আমি জানবায ও বুদ্ধিমান লোক নিয়ে যাবো। আপনি আমাকে ভালো করে রাস্তা বুঝিয়ে দিন।'

'আপনি একটি দুধেল উটনী নিয়ে যাবেন। গুপ্তধনের জায়গায় পৌছে দুধ দোহন করে বড় একটি পাত্রে দুধ রাখবেন। দুধভর্তি পাত্রটি গুপ্তধনের জায়গা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবেন। তখন সেখানকার সব সাপ দুধের ওপর হামলে পড়বে। দুধ

সাপের সাংঘাতিক প্রিয়। দুধের ওপর সাপগুলো যখন ঝাপ্টাঝাপ্টি শুরু করবে আপনি লোকদের নিয়ে দ্রুত ধনভাণ্ডার নিয়ে সরে পড়বেন। আর জ্বলন্ত মশালও রাখতে হবে। যে গুহায় গুপ্তধনটি থাকবে সেখানে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান অনেক কিছুই থাকতে পারে। মশাল দেখলেই ওরা পালিয়ে যাবে।'

'জরুরী আরেকটি কথা রয়ে গেছে। এখান থেকে আপনি রাতে রওয়ানা করবেন। কেউ যাতে আপনাদের দেখতে না পায়।'

'শহরের চৌকিদাররা তো দেখে ফেলবে। ওদেরকে কি বলা হবে?'

'কেউ দেখলে আসল কথা বলবেন না। আপনি শহরের প্রধান। কোথায় যাচ্ছেন কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না। করলেও উত্তর দেবেন না।'

সালেহ্ সে রাতেই তার লোক নির্বাচন করে ফেললো। পরদিন সকালে নির্বাচিত লোকদের ডেকে শুধু বললো, একটি সফরে যেতে হবে। সফল হলে সোনারুপার অনেক মূল্যবান পুরস্কার পাবে। তবে শহরের কেউ যাতে এ ব্যাপারে জানতে না পারে। কারো মুখ দিয়ে একটি শব্দও যদি এ সম্পর্কে বের হয় তাকে হত্যা করা হবে। রওয়ানা দেয়া হবে মাঝরাতের পর। এই বলে সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলো।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ফারাহ্ সালেহের কামরায় চলে এলো। আজ ফারাহের চোখে পানি। সালেহ যে এমন বিপদসংকুল এক অভিযানে যাচ্ছে এজন্যে তার উদ্বেগের শেষ নেই। সে নানানভাবে বুঝিয়ে দিলো সে এই বিরহ সইতে পারবে না। আর সালেহতো মানতেই পারছিলো না ফারাহকে রেখে সে এক মুহূর্ত কোথাও থাকতে পারবে। তাই ফারাহকে বললো, সেও যেন তার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

'আমি তো যাবোই। কিন্তু আমার কারণে আপনার এত বড় গুরুত্বপূর্ণ অভিযান যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়!' – ফারাহ্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো।

'না কোন ক্ষতি হবে না। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার সাহস অটুট থাকবে।'

'তাহলে আমাকে অনুমতি নিয়ে দিন। কিন্তু আমি নিশ্চিত হাসান ইবনে সবা আমাকে সে অনুমতি দিবেন না।'

সালেহ কোন অনুমতি টনুমতির ধার ধারতে চাচ্ছিলো না। হাসান ইবনে সবা তার কাছে এখন গোপন বিদ্যার অধিকারী একজন জাদুকর ছাড়া কিছুই না। জাদুকর হিসেবে সে গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছে সেটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। সে তাই করেছে এবং গুপ্তধন আনতে যাচ্ছে। কিন্তু জাদুকররা যে তাদের সঙ্গে সুন্দরী মেয়েদের রাখে এটা মেনে নেয়া যায় না। আর ফারাহের মতো একটি মেয়ে–যে এক আমীরের ভাগিনা এবং আরেক আমীরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে–তাকে তো এমন নারীলোভী জাদুকরের কাছে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। কিন্তু ফারাহ যে নিজেও যেতে চাচ্ছে না সালেহ্ সেটা বুঝতে পারলো।

সালেহের মতো এত বড় একজন শহরপ্রধানের পক্ষে এটা মেনে নেয়া এবং সহ্য করা সম্ভব ছিলো না। তখনই সে দুই সৈনিককে হুকুম দিলো, এই মেয়ের মুখ বেঁধে

একটি খাটের সমান বড় একটি বাক্সে ভরে রাখো। এরপর সব দিক দিয়ে বাক্সের মধ্যে ছিদ্র করে দাও। দমবন্ধ হয়ে যাতে মরে না যায়।

পরদিন সকালে হাসান তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়লো। দু'জনকে ডেকে সালেহ নুমাইরীর ব্যাপারে খোঁজ নিলো।

'আপনার ছোড়া তীর তো কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমরা ওদের যাত্রা দেখতে সারা রাত জেগেছিলাম– হাসানের একলোক তাকে বললো।'

'তোমরা দু'জন তাহলে শাহদর গিয়ে আহমদ ইবনে গুতাশকে জানাও। আমি খালজান নিয়ে নিয়েছি। তাকে সালেহ নুমাইরীর সব কথা জানাবে। বলবে ফারাহের কৃতিত্বও এতে কম কিছু নয়। এখনই তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। ফারাহ শুয়ে আছে। ওকে ঘুমুতে দাও।'

হাসান ফারাহের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তার কামরায় গিয়ে দেখলো ফারাহ নেই। তারপর চারদিকে খোঁজ লাগালো। কোথাও তাকে পাওয়া গেলো না।

ফারাহ তখন বাক্সবন্দী হয়ে সালেহের কাফেলার সঙ্গে অনেক দূর চলে গেছে।

হাসান ফারাহের জন্য মোটেও ব্যাকুল হলো না। কোন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করলো না। ফারাহকে নিয়ে তার ঘর বাধার সুখস্বপ্ন যে আরেকজন কেড়ে নিয়েছে এজন্য সে একটুও ভাবান্তর হলো না। তার চোখে একটি মেয়ের এতটুকু গুরুত্ব নেই যে,তার জন্য আকুল হতে হবে। তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুন্দরী মেয়ে প্রয়োজন–এই প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের গুরুত্ব তার কাছে বড় গৌণ। আর ফারাহের মতো একটি মেয়ের প্রেম বেদনায় তার দুনিয়ার সীমানা শেষ হয়ে যাবে তার তো প্রশ্নই উঠে না। কল্পনার রাজ্যে সে গড়ে তুলেছে এই দুনিয়ার বেহেশত। দুনিয়ার মানুষকে এই বেহেশত দেখানোর জন্যই সে শুরু করেছে এই ফেরকাবাজী।

'ইয়া মুরশিদ!–ফারাহ গেলো কোথায় এটা তো জানা উচিত। সে যদি সালেহ নুমাইরীর সাথে গিয়ে থাকে তাহলে তো সালেহকে অক্ষত ফিরিয়ে আনার আশংকা রয়ে যায়'–তার এক শিষ্য বললো।

'সে গেছে তার সাথেই, মরবেও তার সাথে। সালেহের মাথায় যেভাবে গুপ্তধন সওয়ার হয়েছে সে আর কোন দিন ফিরবে না' – হাসান বললো।

সালেহ নুমাইরী ততক্ষণে সে জঙ্গলে পৌঁছে গেছে যেখানকার কোন কোন অংশ চোরা-কাদায় ভরা। ফারাহ তখনো বাক্সে বন্দী। সালেহ তার লোকদের বললো, আমরা অনেক দূর এসে গেছি। এই মেয়ের পিছু ধাওয়া করে কেউ এলে এতক্ষণে সে পৌঁছে যেতো। একে বাক্স থেকে এখন বের করা যায়। অসুবিধা নেই কোন।

'হ্যাঁ আমীরে খালজান! ভয় কিসের? এ পালিয়ে বা যাবে কোথায়?' – সালেহের এক সঙ্গী বললো।

বাক্সটি একটি উটের পিঠে করে বহন করা হচ্ছিলো। উটের পিঠ থেকে বাক্স নামিয়ে এর ডালা খোলা হলো। বাক্সের ভেতর গত রাত থেকে একভাবে শুয়ে থাকায় ফারহীর মেরুদণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলো। ফারাহ বাক্স থেকে বের হলো না। প্রথম তো সে কিছুই বলতে পারছিলো না। প্রচণ্ড রাগে তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো। গলায় বিষ ঢেলে বললো,

'আমাকে কেন সঙ্গে নিয়ে এসেছো?'

'ভালোবাসার দাবীতে' – সালেহ তার লোকদের দূরে হটিয়ে দিয়ে বললো।

'সত্যিই যদি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা থাকে, এই বিপদের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেয়ো না। আমি কি এত কষ্ট সহ্য করতে পারবো?'

'প্রেমের শুরু তো তুমিই করেছিলে ফারাহ! প্রেমের পয়গাম নিয়ে তুমিই কি আমার কাছে আসোনি? তুমি নিজেই তো বলেছিলে আমার সাথে তুমি তোমার বিয়ে দেখতে চাও।'

ফারহীর প্রেম ও ভালোবাসার প্রকৃতি যে কি তা তো ফারহীই জানতো। তাকে তো দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো সালেহ নুমাইরীকে বাগে আনার। সে সে দায়িত্ব পালন করেছে। সে জানতো সালেহ যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে জীবিত ফিরে আসা সম্ভব নয়। ফারাহ ভাবতে বসলো, সে কি হাসানের মিশনকে বাঁচাবে না তার জীবনকে। এটা তো মৃত্যুর বয়স নয়। যৌবনের শুরু মাত্র। কিন্তু এই সালেহ যে একগুয়ে লোক একে বলে কয়ে কিছুই বুঝানো যাবে না।

তার সামনে একটাই পথ খোলা আছে, সালেহকে বলে দেয়া, সে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। ফিরে না গেলে মারা তো যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে খালজানও তার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তার পরিবার মানুষের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে মরবে। আর এটা হাসান ইবনে সবার ষড়যন্ত্র।

কিন্তু ফারাহ পরিষ্কার দেখতে পেলো, হাসান তাকে গাদ্দারীর অপরাধে হত্যা করবে। সে জানে হাসানের মনে বিন্দু পরিমাণও করুণা নেই। মানুষের লাশ দেখে সে আমোদ পায়। ফারাহের জন্য এদিকেও মৃত্যু ওদিকেও মৃত্যু। এখন তার দেখতে হবে কোন মৃত্যু তার জন্য সহজ।

সে যদি হাসানকে সব কিছু ফাঁস না করে দেয় তাহলে এমন ভয়ংকর মৃত্যু তার হবে যা ভাবলেও শরীর কেঁপে উঠে। আর যদি সালেহকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে হাসান তার কোন লোক দ্বারা তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। এ মৃত্যু অনেক সহজ।

তবুও সে জীবিত থাকতে চায়। হাসান তাকে যদিও একটা অস্ত্র বানিয়ে রেখেছিলো, কিন্তু তাকে সুখ দিতো শাহজাদীর মতো। হাসান তার হাত থেকে ছুটে যাক এটা সে চাচ্ছিলো না। সে দেখতে পাচ্ছিলো হাসান রাজাধিরাজ বনতে যাচ্ছে...ভেবে ভেবে ফারহা বেহাল হয়ে পড়ছিলো। সালেহ তার ধ্যান ভাঙ্গিয়ে বলে উঠলো,

'এত কি ভাবছো ফারাহ! ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা মন থেকে বের করে দাও। মনে ঢুকাও সেই গুপ্তধনের কথা। ফিরে এসে বিরাট এক ফৌজ বানিয়ে সমস্ত কেল্লা-দুর্গ, শহর জয় করবো আমি। আমি সম্রাট হবো, তুমি হবে সম্রাজ্ঞী।'

'জীবিত ফিরতে পারলে তো!'

'জীবিতই ফিরবো আমরা।'

'আমি যদি বলি আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কোন গুপ্তধন-টন কিছুই নেই?'

'হতেই পারে না এমন।'

ফারাহ দেখলো গুপ্তধন করতে করতে এ লোকের মাথা বিগড়ে গেছে। সে এবার অন্য পথ ধরলো। বললো,

'আপনি তো একজন পাক্কা মুসলমান এবং নিষ্ঠাবান আহলে সুন্নত। কিন্তু ঐ সম্পদের লোভ আপনার মন থেকে খোদার অস্তিত্ব বের করে দিয়েছে। আমি আপনার কেউ নই। শুধু সুন্দরী একটি মেয়ে বলে আপনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন'...

'রাখো রাখো, জানি কী বলতে চাচ্ছো তুমি'–সালেহ ফারাহকে বাঁধা দিয়ে বললো– 'আমার পথ আগলে দাঁড়ানোর জন্য তুমি একথা বলছো। তুমি বলবে, আমি যেহেতু মুসলমান, আমার সম্পদের লোভ থাকতে নেই। তুমি আমাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সরল জীবন যাপনের কথা শোনাবে। শোন ফারাহ! সে সময় ছিলো ভিন্ন। তারা মুসলমানও ছিলো অন্য ধরনের। আজ যার কাছে সম্পদ আছে খোদাও তার। খোদার সামনে আমি রুকূ সিজদা করে এক জীবন কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু খোদা আমাকে এই সম্পদের ইংগিত দিলেন না' – হঠাৎ তার সুরে কর্তৃত্ব ফুটে উঠলো–

'তুমি আমারই মালিকানায় থেকে নানান ভয় দেখিয়ে এই সফর থেকে আমাকে রুখতে চাচ্ছো। আমি খালজানের আমীরে শহর। আমার হুকুমই চলবে। আমার সঙ্গে যে এগারজন সশস্ত্র লোক আছে এরা আমার গোলাম। তুমিও আমার হুকুমের অধীনস্থ।'

ফারহা চুপ হয়ে গেলো।

সালেহ কাফেলাকে আবার কোচ করতে বলে বড় বাক্সটি ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলো। অতিরিক্ত চারটি ঘোড়া নেয়া হয়েছিলো। এই কঠিন সফরে কোন ঘোড়া মরে গেলে এগুলো কাজে লাগবে। ঐ অতিরিক্ত একটি ঘোড়ার ওপর ফারাহকে সওয়ার করিয়ে দেয়া হলো।

ওরা যতই এগুচ্ছিলো ততই ঘন জঙ্গলে ঢুকছিলো। আর দু'পাশ থেকে টিলা টক্কর আর শিলা পাহাড় পথ করে দিচ্ছিলো আরো সরু। জায়গায় জায়গায় জমে থাকা কাদা পানি বেশ অসুবিধায় ফেলছিলো। ঘন জঙ্গলে খুব তাড়াতাড়ি রাতের অন্ধকার নেমে এলো। সালেহ ভালো একটি জায়গায় তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলো। তারপর একটি জায়গা নির্বাচন করে তাঁবু বসানো হলো।

দুটি মশাল জ্বালানো হলো। সালেহ নুমাইরীর তাঁবু টানানোর সময় ফারাহ বিগড়ে বসলো।

'আমি পৃথক তাঁবুতে ঘুমাবো।'

'তুমি তো আমার স্ত্রীই হবে। আমার তাঁবুতে ঘুমালেও দোষের কিছু হবে না।'

'স্ত্রী হওয়া পর্যন্ত তো আপনি আমার জন্য অন্য পুরুষ। মুসলমানের মেয়ে আমি। ইসলামের পুরো পাবন্দ আমি।'

'ছোট আরেকটা তাঁবু লাগিয়ে দাও' – সালেহ হুকুম করলো।

সব তাঁবু খাটানোর পর সবাই খেতে বসে গেলো। খাওয়ার পর কেউ আর দেরী করলো না। সারা দিনের সফর তাদের হাড়মজ্জা নাড়িয়ে দিয়েছে। শুয়ে পড়তেই সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। শুধু ফারাহ জেগে থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো। শোয়ার আগে মশালগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তবুও চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়নি। চাঁদ একাই প্রতিষ্ঠা করছিলো তার আবছা আলোর রাজ্য।

মাঝ রাতের একটু আগে ফারাহ নিঃশব্দে তার তাঁবু থেকে বের হলো। কাছের একটি গাছের ওপর চড়ে বসে সবগুলো তাঁবুর দিকে তাকালো। না কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। কাফেলার ঘোড়া ও উট তাঁবুর শিবির থেকে কিছুটা দূরে একটা টিলার পেছনে বাধা ছিলো। ফারাহ উঁচু ঘাস ভেঙ্গে ঝাড় ও গাছের ডাল বেয়ে সেখানে পৌঁছে গেলো। ঘোড়ার জিন ইত্যাদি ঘোড়ার কাছেই মাটিতে পড়া ছিলো। ফারাহ একটি জিন বিনা শব্দে উঠিয়ে একটি ঘোড়ার পিঠে রেখে দিলো। তারপর ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো।

প্রথমেই ঘোড়া ছুটালো না। আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলো। কিন্তু পাথরি ভূমি হওয়ায় শব্দ হলো, নিস্তব্ধ রাতের এই হালকা আওয়াজও বেশ উঁচুতে পৌঁছে গেলো। তাঁবুর ভেতরে একজনের চোখ খুলে গেলো। তখনই দূরে সরে যাওয়া ঘোড়ার খুরধ্বনি তার কানে এলো।

সে কাউকে না জাগিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে গিয়ে দেখলো একটি ঘোড়া কম। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললো,

'আরে কে যেন একটি ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে।'

তার সঙ্গীরা হড়বড় করে উঠলো। তারাও ঘোড়ার আওয়াজ শুনলো। এ সময় ফারাহ এই ভেবে জোরে ঘোড়া ছুটালো যে, সে বেশ দূরে চলে এসেছে। ফিরে যাওয়ার পথে সে অনুমানে চলছিলো।

সবার এক সঙ্গের আওয়াজে সালেহও উঠে গেলো। বাইরে বের হয়ে এসবের কারণ জিজ্ঞেস করলো।

'একটি ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে' – এক লোক বললো।

সালেহ এটা শুনতেই ফারহীর তাঁবুর দিকে দৌড়ে গেলো। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখলো।

'গর্দভরা! ওতো পালিয়েছে। এখনই দু'জন গিয়ে ধরে নিয়ে এসো ওকে। মরার ভয়ে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি ওকে এখানেই গাছের সঙ্গে উল্টো করে বেঁধে রেখে চলে যাবো।'

ততক্ষণে ফারাহ কিছু দূর এগিয়ে গেছে। সে ঠিক পথেই যাচ্ছিলো। চাঁদের নির্মল আলোতে পথও দেখা যাচ্ছিলো পরিষ্কার। ফারাহ হঠাৎ খুব জোরে লাগাম টেনে ধরলো। শক্তিশালী ঘোড়াও চট করে দাঁড়িয়ে পড়লো। তখন বিশ পঁচিশটি ঘোড়-সওয়ার ফারাহ থেকে একশ গজ দূরে। ফারাহ ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছিলো। পুরুষ হলে ফারাহ থামতো না। রাতেও এদিকে মুসাফিররা পথ চলে। কিন্তু একজন মেয়ে এই রাতের কোলে খুবই অনিরাপদ। কেউ দেখে ফেললে তাহলে আর রক্ষা নেই।

কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। একজন তাকে দেখে ফেললো। ফারাহ টের পেয়েই একদিকে ঘোড়া ছুটালো। কিন্তু তাদের আরও ঘোড়-সওয়ার তাদের দল থেকে গিয়ে একটু দূরে তাকে ঘেরাওয়ের মধ্যে এনে আটকে ফেললো।

ওদিক থেকে সালেহের পাঠানো দুই সওয়ারও এসে গেলো। ফারাহকে দেখে তারা ঘোড়া থামালো।

'এই মেয়ে আমাদের আমীরের! সে পালিয়ে এসেছে। ওকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও–' এক সওয়ার বললো।

'না, এরা মিথ্যা বলছে। ওদের আমীরের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে এরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলো। পালিয়ে এসেছি আমি। আমাকে খালজান পৌঁছে দাও তোমরা।'

'তোমরা ভাই চলে যাও। এ খালজানের আমীরের মেয়ে। একে তার কাছে পৌঁছে দিবো আমরা।

ফারাহ ওদের সাথে যেতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে দিলো। সেই চার সওয়ার সালেহের সওয়ারদের ফিরে যেতে বললো। কিন্তু ঐ দুই সওয়ার এই চার সওয়ারকে সাধারণ মুসাফির ভেবে তলোয়ার বের করলো। এরাও বিলম্ব করলো না। তলোয়ারে তলোয়ারে টক্কর লেগে গেলো। তখনই ঐ দুই সওয়ার টের পেলো, এরা চারজনই তলোয়ার চালনায় অসম্ভব ক্ষিপ্র। একটু পরেই সালেহের দুই ঘোড়সওয়ার মারা পড়লো। ঐ চারজন ফারাহকে সঙ্গে নিয়ে হালকা চালে ঘোড়া ছুটালো।

'তোমরা কে? কোথায়বা যাচ্ছো?' – ফারাহ পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো।

'ভুল ধারণায় থেকোনা মেয়ে! আমরা কাউকে ধোঁকার মধ্যে রাখিনা। মরুদস্যু আমরা। 'আমাদের সরদারের কাছে যাচ্ছি এখন'।

'তোমরা কি আমাকে খালজান পৌঁছে দেবে? খালজানের রাস্তায় ছেড়ে দিলেই আমি একা পৌঁছে যেতে পারবো।'

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সরদারই দিতে পারবেন' – এক সওয়ার বললো।

'আরেকটি জবাব শোন। তোমার মতো এমন সুন্দরী হীরার কদর আমাদের সরদারই করতে পারবেন। তিনি তোমাকে যেতে দেবেন না'।

ফারহার জন্য এই খবর ছিলো খুবই ভয়াবহ। ভার করার কিছুই ছিলো না। সে কোন তর্ক বা ঝামেলা না করে ওদের সঙ্গে চলতে লাগলো। তার মাথায় ছিলো হাসান

ইবনে সবার শয়তানী শিক্ষা। সরদারকে সে কিভাবে পথে আনবে পথে যেতে যেতে ঠিক করে ফেললো।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় সরদার ফারাহর চেহারা দেখে চরম বিস্ময়ে বলে উঠলো, 'উহ! আমি কিভাবে মানবো তুমি কোন মানবী, অন্য জগতের রহস্যময় কোন প্রাণী নয়।'

সরদারের কথা বলার ভঙ্গি আরবদের মতো। আরবরা এভাবেই কবিতার ভাষায় কথা বলে।

'এ বলছে খালজানের আমীর তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো' – এক সওয়ার বললো।

'দুই সওয়ার পিছু ধাওয়া করে আসছিলো। আমরা মেরে ফেলেছি ওদেরকে' – আরেক সওয়ার বললো।

'আমীরে খালজান? এতো এমনই যেমন কেউ বললো ঐ চাঁদ নয় সূর্য। আমীরের কী দরকার পড়লো যে, সে এক মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? সে কি তোমাকে কোথাও থেকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে? ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের এখানে বসো, আর গোলাপের পাপড়ি নাড়াও খানিক। দেখি তুমি আসলে কে?' – সরদার বললো,

'আগে ফুলের পাপড়ির মূল্য জেনে নাও সরদার! পাথরের সওদাগর হয়ে তুমি হীরার কি কদর বুঝবে! আগে ছিলাম এক আমীরের অপহরণ করা মেয়ে। আর এখন এক ডাকাতের। আমার মূল্য এক ডাকাত বুঝবে কি করে?' – ফারাহ সরদারের ভঙ্গি নকল করে বললো।

'হা হা হা! চাঁদনীতে হীরার ঝলকানির মতো তোমার চেহারা দেখে আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম, কোন মানবীয় চোখও এত নেশা ধরানোও হয়? কিন্তু তোমার মুখের ভাষার রূপ ঐ নেশা নেশা চোখের চেয়েও জাদুময়।'

'আমার রূপই দেখোনা সরদার! দুনিয়ার শাহানশাহ বানিয়ে দিতে পারবো তোমাকে। শুধু সাহসের প্রয়োজন। নিজের অবস্থা দেখে নিজেকে আগে চেনো। শিকারের খোঁজে জঙ্গলের পর জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছো শুধু? কাফেলা লুট করে যতই কামাও না কেন সে ডাকাতই তো রয়ে যাবে। তোমাকে আমি এক গুপ্তধনের পথ চেনাতে পারি। সেটা হাতে পেলে তুমি এক ফৌজ বানিয়ে সেলজুকিদের সালতানাত দখল করতে পারবে। আরব ও মিসরকে তোমার সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।'

'তোমার মাথা কি ঠিক আছে মেয়ে? মাথা ঠিক করে কথা বলো, যাতে বুঝতে পারি।'

'আমীরে খালজান বিরাট এক গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছে।'

'কোত্থেকে?'

'নকশা তার কাছেই আছে, ওতে রাস্তার চিত্র আঁকা আছে, পথে কোথায় বিপদ ওঁৎপেতে আছে তাও নকশায় দেয়া আছে। গুপ্তধন যে গুহায় রাখা আছে তাও নকশায় দেওয়া হয়েছে।'

'গুপ্তধনের সন্ধান কে দিলো?'

'এক দরবেশ। খালজানের আমীর সালেহ নুমাইরী ঐ দরবেশের কী ইচ্ছা যেন পূরণ করে দেয়।'

'আগে বলো তুমি আমার প্রতি এত বড় অনুগ্রহ কেন করছো? এতবড় খবর কেন ফাঁস করে দিচ্ছো?'

'কারণ আমার এর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। একজন মানুষের প্রতি আকর্ষণ ছিলো। কিন্তু আমার অক্ষমতা হলো, আমীরে খালজানের আমি বন্দিনী ছিলাম। দরবেশ তাকে গুপ্তধনের সন্ধান দিলে সে যখন রওয়ানা দেয় আমি খুব খুশী হই এজন্য যে, এবার আমার ভালোবাসার লোকের কাছে ফিরে যেতে পারবো এবং আমরা বিয়ে করতে পারবো। কিন্তু আমীর আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে চললো। সফরে আজ আমাদের প্রথম রাত। সুযোগ পেয়ে পালালাম আমি। তোমার লোকেরা আমাকে না ধরলে কাল আমি আমার লোকের কাছে থাকতাম।

'তুমি কি চাও তোমাকে ছেড়ে দেবো আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি সম্পদের কাঙ্গাল। আমি ভালোবাসার কাঙ্গাল।'

'কিন্তু আমীরে খালজান পর্যন্ত তোমার যেতে হবে। তোমার একথা ধোঁকাও তো হতে পারে। আমি নকশা পেলেই ছেড়ে দেবো তোমাকে।'

'আমাকে তো ছেড়ে দেবে তুমি। তবে আমীরকে তুমি জীবিত ছাড়লে সে আমাকে জীবিত ছাড়বে না।'

'সে জীবিত থাকবে না। উঠো, নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও।'

'ওরা এখনো এলো না?'– তাঁবুর ভেতরে বসে কয়েকবার এ প্রশ্ন করেছে সালেহ নুমাইরী।

'না ওরা ঐ মেয়েকে যেতে দেবে না।'

'জঙ্গলে হয়তো হারিয়ে গেছে। তবুও তাকে ওরা নিয়ে আসবেই।'

তাদের কানে ঘোড়ার আওয়াজ এলো।

'ওরা আসছে' – দু'-তিনজন লোক বললো।

'এখন আমি ওকে প্রত্যেক রাতেই বেঁধে রাখবো' – সালেহ নুমাইরী বললো।

'না আমীরে মুহতারাম! আমরা আরো এগিয়ে গেলে এ আর পালানোর সাহস পাবে না, কালই এ জঙ্গল শেষ হয়ে তৃণ লতাহীন পাহাড়ী এলাকা শুরু হবে।

'রাখো, শোন, দু'তিনটি নয় অনেকগুলো ঘোড়ার আওয়াজ নয় এটা?'

'হ্যাঁ আমীরে মুহতারাম!'

এবার কাছ থেকেই ওরা অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেলো। পর মুহূর্তেই গর্জন শুনলো – 'যে যেখানে আছো সেখানেই থাকো।'

বিশ পঁচিশজনের ডাকাতদল সালেহের ছোট তাঁবুর শিবির ঘিরে ফেলে।

'আমীরে খালজান! নকশাটি দিয়ে দিন আমাকে। ঐ গুপ্তধন আমাদের' – সরদার বললো।

সালেহ কিছুই বললো না। তাঁবু থেকে যখন বের হলো তার হাতে তখন খোলা তরবারি– 'দেখছো কি? হাতিয়ার উঠাও। ঐ সম্পদ আমাদের' – সালেহ তার লোকদের নির্দেশ দিলো।

'সালেহ নুমাইরী! আরেকবার ভেবে দেখো। আমরা ডাকাত, সংখ্যাও বেশি। নকশা দিয়ে জীবিত ফিরে যাও।'

সালেহ কিছু না বলে তীব্রবেগে সরদারের দিকে তলোয়ার বাড়ালো। সরদারের ঘোড়া তার দিকে এগিয়ে এলো। সালেহ চট করে বসে পড়ে সজোরে ঘোড়ার পেটে তলোয়ার চালালো। ঘোড়া চিহি চিহি চিৎকারে লাফিয়ে উঠতেই সরদার পড়ে গেলো ঘোড়ার পিঠ থেকে।

সালেহের সঙ্গে এখন আছে মাত্র নয় জন। পঁচিশজন সওয়ারের মোকাবেলা নয়জন পদাতিক তো হাস্যকর। তবুও এই নয়জন জানবাজী রেখে ওদের ওপর হামলে পড়লো। শুরু হয়ে গেলো তুমুল লড়াই। ফারাহ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলো তার চাল ভালোই সফল হয়েছে। এখন সালেহের লাশ দেখে নিশ্চিত হলেই সে এখান থেকে পালাবে।

'এই মেয়ে এদিকে আসো! তোমার আমীরের তাঁবুতে আসো' – ফারাহ একটি বড় আওয়াজ শুনলো।

ফারাহ ঘোড়া থেকে নেমে সালেহের তাঁবুর দিকে দৌড়ে গেলো। চাঁদ উঠে এসেছিলো মাথার ওপর। চাঁদের আলোয় দেখলো সালেহ নুমাইরীর লাশ পড়ে আছে।

'তাঁবুতে এসো আমার সঙ্গে। বলো নকশা কোথায়?' – সরদার ফারাহকে বললো।

সরদার ও ফারাহ তাঁবুর ভেতরে চলে গেলো। ফারাহ খুঁজে খুঁজে চামড়ার একটি থলি বের করে সরদারের হাতে দিলো। থলি নিয়ে সরদার বাইরে এসে খুলে দেখলো। ভেতরে কি যেন ছিলো, সেগুলো ফেলে দিতেই নকশা বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ এটাই – ফারাহ একথা বলেই হাঁটা দিলো।

'যাচ্ছো কোথায় তুমি?' – সরদার জিজ্ঞেস করলো।

'নকশা পেয়ে গেছো তুমি। ধরে নাও গুপ্তধনও পেয়ে গেছো। আর আমিও ছাড়া পেয়ে গেছি।'

'দাঁড়াও এত তাড়াতাড়ি ছাড়বো না আমি তোমাকে। তুমি তো মরা ফুল নও যে ঘ্রাণ না নিয়ে ছুঁড়ে দেবো!'

ফারাহ বুঝলো, এক ডাকাত সরদারের কাছে তার নিজের ওয়াদার কোন মূল্য নেই। সে তার ঘোড়ার দিকে দৌড়ালো। সরদার তার পথে এসে গেলো। সে অন্য দিকে দৌড় দিলো। তখনও লড়াই চলছিলো। সরদার এবারও তার পথ আগলে দাঁড়াতে চাইলো আর ফারাহ নিহত কারো ঘোড়ার দিকে যেতে চাচ্ছিলো। সওয়ারবিহীন কয়েকটি ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, কিন্তু সরদার ফারাহকে কোন ঘোড়ার কাছে পৌঁছতে দিলো না। ফারাহ এবার দ্রুত তাঁবুর শিবির থেকে বেরিয়ে ঘন ঝোপ-

ঝাড়ের দিকে ছুটলো। কিন্তু এর সামনেই চোরা কাদার ভূমি। ফারাহ মোড় ঘুরে রাস্তা বদলাতে বদলাতে সরদার পৌছে গেলো সেখানে। ফারাহ এবার চোরা ভূমির দিকে এগিয়ে গেলো। কয়েক পা যেতেই তার পা মাটিতে দেবে যেতে লাগলো।

সরদার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবার দুজনেই দ্রুত নিচে যেতে লাগলো, ফারাহ আ ..... আ ..... করে চিৎকার করছিলো, আর সরদার তার লোকদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলো।

সরদারের তিন চারজন লোক চোরা ভূমিতে পৌছে গেলো। তারা শুধু ফারাহ আর সরদারের মাথাই দেখতে পেলো। পরমুহূর্তে ঐ লোকগুলোও তলিয়ে যেতে লাগলো।

★★★★

তিন চার দিন পর খালজান পৌছলো আহমদ ইবনে গুতাশ।

'খালজানের কেল্লা মোবারক হোক আমার পীর মুরশিদ!' – হাসান ইবনে সবা তাকে স্বাগত জানিয়ে বললো।

'সালেহ নুমাইরীর কি আর ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে?' – আহমদ জিজ্ঞেস করলো।

'না গুরু! সম্পদ এমন এক অজগর, আজ পর্যন্ত সে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গিলে খেয়েছে। পরাক্রমশালী বাদশা খোদার বড় দিওয়ানা মুত্তাকী, বড় বিদ্বান কাকে সে ছেড়েছে? যে সালেহ নুমাইরী রক্তচক্ষু নিয়ে আমাকে অভিশাপ দিতে এসেছিলো, দাবী করেছিলো সে খোদার গোলাম– পাক্কা আহলে সুন্নতের অনুসারী। সেই সালেহ খোদার গোলামিকে পায়ে পিষে গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়ে গেলো, ফারাহও গেলো তার সঙ্গে' .....

'তাকে নিয়ে তোমার আফসোস হচ্ছে?'

'না মুরশিদ! আশ্চর্য লাগছে, সে জানে সালেহকে আমরা গুপ্তধনের ধোঁকা দিয়ে গায়েব করে দিচ্ছি। তবুও সে কি করে তার সঙ্গে চলে গেলো?'

এসময় দারোয়ান এসে জানালো, খালজানের আমীর সালেহ নুমাইরীর এক লোক অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় এখানে এসেছে। হাসান লোকটিকে তখনই নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো।

রক্তাক্ত এক লোককে দারোয়ান ভেতরে নিয়ে এলো।

'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো?' – আহমদ জিজ্ঞেস করলো।

'এক দিনের পথ চার দিনে অতিক্রম করেছি' – সে হাঁপাতে হাঁপাতে বড় কষ্টে বললো।

এছিলো সালেহ নুমাইরীর নেমক হালাল করা কর্মচারী। সে শুধু সালেহের খবর জানাতে খালজান আসে। পথে কয়েকবার বেহুঁশ হয়। ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। এভাবে নরক যন্ত্রণা সয়ে চতুর্থ দিন খালজান পৌছে।

সে সালেহ নুমাইরীর মারা যাওয়ার কথা, ডাকাতদল দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সব জানালো। ফারাহের ব্যাপারে বললো। সে ডাকাত সরদারের হাতে বন্দী ছিলো। ফারাহ ও সরদারকে চোরা ভূমিতে ডুবতে দেখেনি সে। কথা বলতে বলতে এক দিকে ঢলে পড়লো সে। আর উঠলো না। হাসান তার লাশ দাফন করে দিতে বললো।

'এই দুর্গ এখন আমাদের। এখন বলো হাসান! এই সফলতা থেকে তুমি কি শিখলে?' – আহমদ ইবনে গুতাশ জিজ্ঞেস করলো।

'এই যে, মানুষ তার প্রবৃত্তির গোলাম। মানুষের মনে এই কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তার এই 'ইচ্ছা' পূরণ হয়ে যাবে। তখন যে পথেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে সে সে পথে চলতে বাধ্য।'

'প্রথমেই তোমাকে আমি এই সবক দিয়েছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শয়তানের অস্তিত্বও আছে খোদার অস্তিত্বও আছে। বলতে পারো, মানুষ একই সময় সৎ ও অসৎও। ইবাদত কী?'

'অসৎ ও মন্দকে দমিয়ে রাখার একটা মাধ্যম এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের এক হাতিয়ার।'

'প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই মন্দত্ব ও শয়তানকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সালেহ নুমাইরী পাক্কা মুসলমান ছিলো, তুমি তাকে এমন গুপ্তধনের রাস্তা দেখিয়েছো যার কোন অস্তিত্বই নেই। এই ধোঁকা থেকে ফারার মতো সুন্দরী বিচক্ষণ মেয়েও বাঁচতে পারেনি। তুমি তো দেখেছো, এই লোকের সততা এমনভাবে উড়ে গেলো যেমন প্রখর রোদে উড়ে যায় শিশির বিন্দু।'

এরপর হাসানরা লোকদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে দিলো, খালজানের আমীর সালেহ নুমাইরী খোদার ঐ দূতের প্রতি এত মুগ্ধ হয়েছে যে, এই দুর্গ খোদার ঐ দূতকে উপহারস্বরূপ দিয়ে নিজে জঙ্গলের জীবন অবলম্বন করেছে।

পরদিন আহমদ ও হাসান তাদের শয়তানী পূজা নিয়ে বসলো। আহমদ বললো, দেখেছো হাসান! মানুষকে জালে জড়ানো মুশকিল কাজ নয়। মানুষ গুজব, প্রোপাগাণ্ডা, রহস্যময়তায় খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবান্বিত হয়।'

'আর মুখের জাদুতেও দারুণ জাদুমুগ্ধ হয়' – হাসান বললো।

'তবে এসব লোকদের আমীর উমারাদের কিছু এবং সমাজের মাথা ওয়ালাদের ব্যাপার একটু ভিন্ন। ওদেরকে এই বিশ্বাস দাও। তুমি লোকদের উপার্জনের বড় হাতিয়ার। ধন-দৌলত আর সুন্দরী নারীদের ঝলক দেখিয়ে দাও ওদেরকে। দেখবে এরা তোমার গোলাম বনে গেছে। তবে শুধুই লোকদের নিয়ে আমরা বেশি এগুতে পারবো না। সব সময় মনে রেখো, প্রশাসন এখন সেলজুকিদের। আর সেলজুকিরা আহলে সুন্নত।'

'লোকদেরকে দলে ভিড়িয়ে সেলজুকিদের বিরুদ্ধে ওদেরকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারি আমরা।'

'না হাসান! এজন্য কমপক্ষে দু'বছর দরকার। এটা ভুলে যেয়োনা, সেলজুকিরা তুর্কী। বড় যুদ্ধবাজ আর জালিম লোক এরা। তাদের কাছে ফৌজও আছে। এখন জরুরী কাজ হলো, যেভাবে আমরা শাহদর ও খালজান নিয়েছি সেভাবে সেলজুকি সালতানাতকেও হাতের মুঠোয় পুরে নিতে হবে।'

'কিভাবে সম্ভব এটা?'

'অসম্ভব কিছু নয় হাসান! দৃঢ় ইচ্ছা, বিশাল উদ্দেশ্য এবং মাথা সচল রাখতে হবে। সেলজুকিদের প্রশাসনে আমাদের ঢুকে পড়তে হবে। একাজ তুমি করতে পারবে। তোমাকে নতুন এক অভিযানের চাবি দিচ্ছি আমি।'

'গুরু! আমি আপনার হুকুমের অপেক্ষায় – কি করতে হবে বলুন আমাকে।'

'আমার গুপ্তচররা একটা খবর জানিয়েছে, সুলতান মালিক শার প্রধান মন্ত্রী হয়েছে এখন খাজা হাসান তুসী। প্রধান মন্ত্রী হওয়া অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু আসল কথা এটা নয়। আমি জেনেছি, সুলতান মালিক শাহ তার প্রতি এতই মুগ্ধ যে, তাকে **'নেযামুল মুলক'** উপাধি দিয়েছেন।'

'গুরু! খাজা তুসী তো প্রধান মন্ত্রী হয়েছে, কিন্তু আমি তাকে কি করবো? তাকে হত্যা করবো?'

'হত্যা-টত্যা পরে। আমাদের পথে যে-ই বাধা হবে সে মারা পড়বে। এখন তোমার কাজ হলো, তার স্থানটি নিতে হবে তোমাকে। তুমি কি ভুলে গেছো খাজা হাসান তোমার সহপাঠী ছিলো?'

'হ্যাঁ মুরশিদ! এ তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গেছো কারণ, মাদরাসা থেকে বেরিয়েই তোমাকে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিলো। তারপর তোমাকে এসব কাজে এমন ডুব দিতে হলো যে, আর সব ভুলেই গেছো তুমি।'

'আরো অনেক কিছু মনে পড়ছে আমার। মাদরাসায় তিন বন্ধু ছিলাম আমরা। উমর খয়াম, খাজা হাসান এবং আমি। আমরা ওয়াদা করেছিলাম, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বড় কোন পদ পায় তাহলে সে অন্য দু'জনকেও এত বড় পদে সমাসীন করবে। আমার কাজ তো সহজ হয়ে গেলো। কাল সকালে আমি রওয়ানা হয়ে যাবো এবং খাজা হাসান থেকে এই ওয়াদার পুরো ফায়দা তুলবো।'

'দেখলে হাসান! আমাদের প্রতিটি কাজই সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে হকের ওপর আছি এটাই এর প্রমাণ। আর শোন, সুলতান মালিক শার দারুল হুকুমত এখন নিশাপুর না, মারুতে।'

১৪

পরদিন সকালে হাসান সাধারণ পোশাকে উন্নত জাতের একটি ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হয়। তার সঙ্গে আরেকটি ঘোড়া দেখা যায়। তাতে সওয়ার ছিলো অসম্ভব রূপসী এক মেয়ে। তার পোশাকও দারিদ্রমাখা। আহমদ ইবনে গুতাশ তাকে শেষ বারের মতো উপদেশ দিয়ে বলে,

'মনে রেখো হাসান! নিজেকে পাক্কা আহলে সুন্নত বলে সবার কাছে পরিচয় দেবে এবং জুমুআর দিন অবশ্যই মসজিদে যাবে। বড় কোন পদ পেলে সুলতান মালিক শার নজরে উঠতে চেষ্টা করবে, সঙ্গে সঙ্গে কৌশল খুঁজবে কিভাবে খাজা হাসান তুসী নেযামুল মুলককে সুলতানের দৃষ্টি থেকে ফেলে দেয়া যায়। একবার মন্ত্রিত্ব যদি নিতে পারো সালতানাতে সেলজুকির ভেতর শুরু হয়ে যাবে আমাদের 'মাটি খোদাইয়ের' কাজ। গুপ্তচর দ্বারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক রেখো। আর মনে রেখো, এই মেয়েকে তোমার বিধবা বোন বলে পরিচয় দিতে হবে। আর সুযোগ পেলেই আমাদের ফেরকার তাবলিগ শুরু করে দেবে।'

প্রথমে হাসান ও আহমদ ইবনে গুতাশের ফেরকার প্রচারণা দ্বারা মনে হচ্ছিলো ওরা ইসমাঈলী ফেরকার। কিন্তু শাহদর থেকে খালজান পৌঁছতে পৌঁছতে ওরা যে নাশতামূলক কাজ দেখায় এতে বুঝা যায় ওরা 'ফেরকায়ে বাতিনী'। কিন্তু ক্রমেই স্পষ্ট হয় এরা কোন ফেরকার ধার ধারে না। দেশ সমাজ ও মানুষের সব কিছু ধ্বংস করে নিজেদের জন্য দুনিয়ার বেহেশত প্রতিষ্ঠা করতে যা যা প্রয়োজন তারা তাই করতে প্রস্তুত।

★★★★

হাসান তখন বসা নেযামুল মুলক হাসান তুসীর কাছে। এর আগে সে তার সঙ্গে নিয়ে আসা মেয়েটির পরিচয় দেয়, তার নাম ফাতেমা, এই যৌবনেই সে বিধবা হয়ে গেছে। নেযামুল মুলক তার বোনকে ভেতরের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

হাসান নেযামুল মুলককে তার মাদরাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং বড় দুঃখভরা গলায় তার দুর্দশার কথা শোনায়। নেযামুল মূলকও তা বিশ্বাস করে নেয়।

'আমি তোমাকে বাধ্য করতে পারবো না খাজা! – করুণ গলায় বললো হাসান ইবনে সবা – 'তুমি প্রধান মন্ত্রী।' আমি তোমার প্রজাদের সাধারণ একজন মানুষ। তুমি সেসব মুসলমানদের একজন যে তাকওয়া ও সত্যের সাধনাকে নিজের জীবনের ব্রত বলে মনে করে। তোমার মতো এমন মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্যের লোকেরা তাদের ওয়াদা পালনকে ফরজ মনে করে। তারা জানে ওয়াদার বরখেলাপ গুনাহের কাজ। এটাও ভেবে দেখো, তুমি যতটুকু পড়েছো আমিও ততটুকুই পড়েছি। কিন্তু তুমি প্রধানমন্ত্রী। আর আমার দু বেলার রুটি রোজগারীও নয়।'

'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা হাসান – নেযামুল মুলক বললেন – 'আমি শুধু আমার ওয়াদাই পূরণ করবো না, বরং আমার স্বীয় পদের সমান অংশীদারও তোমাকে মনে করবো।'

এরপর নেযামুল-মূলক হাসানের বিদ্যা-বুদ্ধি, যোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে সুলতান মালিক শাহের কাছে এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তোলে ধরে যে, মালিক শাহ হাসান ইবনে সবাকে বিরাট এক পদে বসিয়ে দেয় এবং তার উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ সদস্য হিসেবে বেছে নেয়।

কিন্তু হাসান এমন কোন পদ চাচ্ছিলো যাতে অবাধে সে সব কিছু করতে পারে।

এজন্য সে ঠিক করে, নেযামুল মুলককে সুলতানের চোখ থেকে নামাতে হলে প্রশাসনের বড় বড় পদের লোকদের হাত করতে হবে, যাদের কথা সুলতানের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে একজন এহতেশাম মাদানী। সুলতানের প্রধান তিন উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতার একজন তিনি। প্রায় প্রৌঢ়। নামায রোজার প্রতিও বেশ যত্নশীল।

এহতেশাম মাদানী প্রতিদিন সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য শহরের নির্জন এক বাগানে যেতেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি বাগানে পায়চারী করছিলেন। হঠাৎ এক তরুণী তার সামনে এসে পড়লো। বাগানটি অভিজাত লোকদের ভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট। এই মেয়েকে তিনি এই প্রথম দেখলেন এবং ভালোও লাগলো। হঠাৎ এহতেশাম মাদানীকে সামনে দেখে মেয়েটি ঘাবড়ে যায় এবং মুখে নেকাব টেনে দেয়। এ ব্যাপারটাও এহতেশামের বেশ ভালো লাগলো। মেয়েটিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কে এবং এখানে কেন এসেছে?'

'আমি হাসান ইবনে সবার বোন' – মেয়েটি বললো।

'হাসান ইবনে সবা? ও আচ্ছা! সেই হাসান ইবনে সবা যিনি কয়েক দিন আগে সুলতানের উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হয়েছেন?' – এহতেশাম মাদানী বললেন।

কথায় কথায় মেয়েটি জানায় তার বিয়ের পরই সে বিধবা হয়ে যায়। এজন্যে তার ভাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। মেয়েটির প্রতি এহতেশাম মাদানীর বেশ সহানুভূতি জন্মে যায়। আহা এই বয়সে বিধবা হয়ে গেলো এমন একটি মেয়ে। মেয়েটিও এমন বিনয়ী ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকে যেন এহতেশাম মাদানীর ব্যক্তিত্বে সে দারুণ মুগ্ধ। সে তার নাম বলে ফাতেমা। ফাতেমা যখন সেখান থেকে চলে যায় এহতেশাম মাদানী তার ভেতরে কেমন এক ঝাঁকুনি অনুভব করলেন। তার মনে হতে লাগলো ফাতেমার সঙ্গে যদি আবার দেখা হতো। ফাতেমার মতো এমন দৃষ্টি কেঁড়ে নেয়া সুন্দরী তিনি আর দেখেননি কোনদিন।

ফাতেমার সঙ্গে আবার দেখা হলো পরদিন। আগের দিনের চেয়ে আরো খুলাখুলি আলাপ হলো ওদের মধ্যে। এরপর সে বাগানে আরো কয়েকবার ওদের মধ্যে মিলন হয়। ফাতেমা এহতেশামকে একদিন দিনের বেলায় তার ঘরে নিয়ে যায়। ফাতেমা তাকে জানায় হাসান ইবনে সবা সকালে যায় সন্ধ্যায় ফিরে। নিশ্চিন্তে এহতেশাম ফাতেমার ঘরে যায়।

ফাতেমার বন্ধ ঘরে বসে এহতেশাম ফাতেমার দিকে শুধু চেয়ে রইলো, তার রূপ যৌবনে মদমত্ত হতে থাকলো। তখনই বাইরে থেকে কারো পায়ের আওয়াজ আসে ভেতরে।

'কে এলো?' – এহতেশাম ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'খাদেম হয়তো। আমি দেখছি' – ফাতেমা শান্ত গলায় বললো।

ফাতেমা বেরোতে যাবে অমনি হাসান ইবনে সবা দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। হাসান এমন ভাব করলো যেন এহতেশামের মতো এত ভালো মানুষকে তার বোনের ঘরে দেখে রাগে ফেটে পড়েছে। এহতেশাম তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো।

'দু'জনকেই আমি পাথর বর্ষণ করে মারবো। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আমি সুলতানের কাছে যাচ্ছি' – হাসান ক্রুদ্ধ গলায় বললো।

হাসান দরজার দিকে ঘুরতেই ফাতেমা তার পা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, এই লোককে সে ডাকেনি।

'তাহলে কিভাবে উনি আমার ঘরে এলেন?'

'ইনি নিজেই এসেছেন। আমার সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার কথা বলতে লাগলেন। ভালো হয়েছে তুমি এসেছো। আমি ওর হাত থেকে বেঁচে গেছি।'

এহতেশামও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বললেন, তিনি নিজে আসেননি। এই মেয়েই তাকে ডেকে এনেছে। কিছুক্ষণ এ নিয়ে ঝগড়া হলো।

'ব্যাপার যাই হোক, সুলতানকে আমি বলবো, আমার ঘরে আমার বোনের কাছে এই লোককে বদ নিয়তে বসে থাকতে দেখেছি।'

এহতেশাম মাদানী শুধু সম্মানিত লোক নন। সুলতানের বিশেষ পছন্দের লোক। তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু অপমান সহ্য করতে প্রস্তুত নন। এই তিনি হাসানের হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে তার কাছে মাফ চাইতে লাগলেন। ফাতেমাও হাতজোড় করে বলতে লাগলো, যা হোক তিনি তো একজন অতি সম্মানিত লোক। তাকে মাফ করে দাও।

হাসান গভীর চিন্তায় ডুবে যাওয়ার ভান করলো। অনেকক্ষণপর মাথা তুলে এহতেশামের হাত ধরে অন্য কামরায় নিয়ে গেলো। দু'জনে যখন কামরা থেকে বের হলো এহতেশাম মাদানীর একটু আগের ভীত-সাদা মুখ জ্বল জ্বল করছিলো। হাসান তার সঙ্গে সওদা করে নেয় যে, নেযামুল মুলকের বিরুদ্ধে তিনি হাসান ইবনে সবাকে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ দেবেন।

★★★★

এমন কোন যুবক নেই যে যৌবনে সুন্দরী কোন মেয়েকে দেখে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে না উঠে। কিন্তু এহতেশাম মাদানী ফাতেমাকে দেখে শুধু চঞ্চলই নন নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আল্লাহ খোদা ভুলে হাসানের জালে ফেঁসে যান। হাসান তাকে সে ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে যাই বললো তিনি তাই বিশ্বাস করলেন। হাসান তাকে বলেছিলো,

'তুমি নিশ্চয় সুলতানের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা। তবে আমার পদাধিকারও তোমার চেয়ে কম নয়। আমি যা বলতে চাই তা সুলতানের সঙ্গে বলবো সত্যিই তোমার এই আচরণে হতাশ হয়েছি আমি। তখনই আমার ইচ্ছা হয়েছিলো এখান থেকে চলে যাই। আমি তো সালতানাতে সেলজুকির কল্যাণের জন্য এসেছিলাম। আহলে সুন্নতের অনুসারী আমি। কোন পদ বা খ্যাতির দরকার নেই আমার। শাহদর

দুর্গ থেকে খালজান পর্যন্ত লোকে আমাকে পীর বলে মান্য করে। কিন্তু আমি দেখেছি, এই সালতানাতে ইসলামের বিরুদ্ধে নানান ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এখানে এসেছিলাম সেসব ফেতনার পথ বন্ধ করতে। কিন্তু এখানে এসে কী দেখলাম আমি!'

'ভাই! আমি আমার আচরণে অনুতপ্ত' – এহতেশাম মাথা নিচু করে বললেন।

'শুধু এই আচরণই নয়। আমাকে যখন এই পদে মনোনয়ন দেয়া হলো তখন আমার বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে নেযামুল মুলক সুলতানের কান ভারী করা শুরু করলো। তুমি হয়তো জানো, আমি ও নেযামুল মুলক ইমাম মুওয়াকিফের মাদরাসায় এক সঙ্গে পড়েছি এবং সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে নিজেই আমাকে ডেকে এনে এখানে চাকরী দিয়েছে। কিন্তু আমি এসে দেখলাম, সে সরকারী কোষাগার সাফ করে দিচ্ছে এবং সে (বাগদাদের) খলীফার সঙ্গে মিলে এক ফৌজ তৈরী করতে চাচ্ছে এবং চেষ্টা করছে সেলজুকি সালতানাত দখল করে নিতে। এ ব্যাপারে আমি সচেতন হয়ে উঠতেই আমার বিরুদ্ধে সে ক্ষেপে গেলো। ভাবলো তোমাদের সবাইকে বুঝি আমি এসব জানিয়ে দিয়েছি।'

'আমি সুলতানকে সতর্ক করে দেবো। সুলতান শুধু আমার কথাই শুনেন' – এহতেশাম বললেন।

'এই বেকুবি করো না। নেযামুল মুলক আগ থেকেই তোমাকে অপদস্থ করে এখান থেকে বের করে দিতে চাচ্ছে। সুলতান তোমার কথা শুনলে তুসীর কথাও শুনেন। তুমি তাড়াহুড়া করলে এ লোক তোমাকে শুধু দরবার থেকে বেরই করবে না, কয়েদখানায় ভরে রাখবে। আমি তো বাইরের সব বিপদের কথা ভুলেই গেছি। সবচেয়ে বড় বিপদ তো এই লোকই। এ বড় বিষধর সাপ যে সুলতানের আস্তিনে প্রতিপালিত হচ্ছে।'

'আমাকে বলো আমি কি করবো?' – এহতেশাম হাসানকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার কথা শেষ হতে দাও। আমি এই ওযীরে আজমের ব্যাপারে পেরেশান হয়ে ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলবো, কিন্তু তোমার আচরণ দেখে আমি সরে গেছি। যদি সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টা এভাবে এক হাকিমের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে – এই সুলতানের মুহাফেজ হে আল্লাহ! আমি সুলতানকে অবশ্যই বলবো, তার নাকের নিচে কি ঘটছে।

এহতেশাম মাদানী হাতজোড় করে হাসানের কাছে মাফ চাইতে লাগলো যাতে সুলতানের কাছে সে একথা না বলে।

'সুলতানকে যদি তোমার এ কথা বলে দেই তাহলে কি যে হবে তা তো জানো না তুমি। সুলতান নেযামুল মুলকের কাছে পরামর্শ চাইবেন। নেযামুল মুলক যে সুযোগের খোঁজে আছে সে সেটা পেয়ে যাবে। তারপর তুমি সোজা কয়েদখানার বাসিন্দা হবে' – এহতেশাম এভাবে মাফ চাওয়াতে হাসান চিন্তায় পড়ে যাওয়ার ভান করলো। একটু পর বললো – 'আমার সাথে তুমি থাকলে আমরা দু'জন সুলতানের দৃষ্টি থেকে নেযামুল-মুলককে নামাতে চেষ্টা করবো।'

'আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

'কিন্তু নেযামুল-মুলকের সঙ্গে আগের মতোই বন্ধুত্বের আচরণ বজায় রাখবে। তার যেন সন্দেহ না হয় আমরা দু'জন তার বিরুদ্ধে।'

হাসানের কথায় এহতেশাম এত প্রভাবান্বিত হলেন যে তার সঙ্গে কোন সংকোচ ছাড়াই কথা বলতে লাগলেন। যেন তারা বাল্যবন্ধু। কথায় কথায় এহতেশাম এত প্রগলভ হয়ে উঠলেন যে, তিনি মাদানী তার মনের কথা বলে দিলেন।

'আমার একটা অনুরোধ ভেবে দেখো হাসান! – এহতেশাম জিজ্ঞেস করলেন।

'বস্তুত বন্ধুতে এরকম সংকোচ থাকা উচিত নয় এহতেশাম! 'অনুরোধ' বলো না। আমার ওপর তোমার অধিকার আছে এই মনে করে কথা বলো।'

'তোমার বোনের ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তুমি কি পছন্দ করবে?'

'সমস্যা অন্যখানে। আমি পছন্দ করলাম কি করলাম না সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো ফাতেমা পছন্দ করবে কি-না। এই ফয়সালা আমার বোনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি বলে তুমি হয়তো আশ্চর্য হচ্ছো। কথা হলো, বোনটি আমার বড় প্রিয়। তার অপছন্দের কোন কাজই আমি করি না। আমার পছন্দে তার প্রথম বিয়ে হয়। দেখা গেলো স্বামীটি বড় বদ। খুব খারাপ ব্যবহার করতো ফাতেমার সঙ্গে। তার হয়তো বদ দুআ লেগেছিলো। এক বছর পর সে মারা গেলো। এরপর থেকে বিয়ের নাম শুনলেই তার মুখ কুচকে যায়।'

'তাকে কি করে বিশ্বাস করাবো আমি তাকে চোখের পাপড়িতে বসিয়ে রাখবো।'

'আমি এক কাজ করতে পারি। ফাতেমাকে বলবো সে তোমাকে যেন পছন্দ করে নেয়। তোমাদের মিলনে আমি আর বাঁধা দিবো না।'

'তাহলে আমি কি এখন যেতে পারি?'

হ্যাঁ এহতেশাম! আমরা শত্রুর মতো এসেছিলাম। আল্লাহর শুকর, তুমি ভাইয়ের মতো ফিরে যাচ্ছো।'

'আল্লাহ করুন, আমরা সবসময় যেন ভাই বনে থাকতে পারি।'

'আপ্রাণ চেষ্টা করবো আমি আমার ভাই! ফাতেমাকে আমি মানিয়ে নেবো।'

এহতেশাম মাদানী হাসানের ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই অন্য কামরা থেকে ফাতেমা বের হয়ে এলো।

'শিকার ধরেছেন তো?' – ফাতেমা হাসতে হাসতে বললো।

'জালে যদি তোমার মতো দানা ফেলা হয় শিকার কেন ধরা দেবে না' – ফাতেমার দিকে হাত বাড়িয়ে বিজয়ী কণ্ঠে বললো হাসান।

ফাতেমা হাসানের বাহু আঁকড়ে ধরলো। হাসানও তাকে বাহুবন্দী করলো।

'দরজায় কান লাগিয়ে সব শুনেছি আমি। এ লোক আমাকে বিয়ে করতে চায়' – ফাতেমা বললো।

'এটা মনে রেখো, তুমি এখন ফাতেমা। নিজের আসল নাম ভুলে যাও। আর হ্যাঁ, এলোক তোমাকে পাওয়ার জন্য পাগলপারা। তার কাছে তুমি যেতে থাকো। ক্রমেই তার জন্য সুন্দর মরীচিকা বনে যাও। তাকে বলে যাও, আপনাকে আমি ভালোবাসি কিন্তু বিয়ের নাম শুনলেই হাত পা আমার অসাড় হয়ে আসে। প্রেমের নেশায় তাকে বেহুঁশ করে রাখো। তুমি তো জানো তার কাছে যাওয়ার সময় তোমার কাপড়ে ও চুলে কোন সুগন্ধি লাগাতে হবে। এই হাশীসের (হিরোইনের এক প্রকার) সুগন্ধি। আর নিজের দেহ ওর কাছ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

'এসব কথা কি আমাকে বলার দরকার আছে? বার বছর বয়স থেকে আপনাদের প্রশিক্ষণ পেয়ে আসছি। আমার দিল দেমাগে এসব মিশে গেছে।'

'আমি সেদিন তোমার প্রশংসা করবো যে দিন এই সালতানাতের ওযীরে আজম হবো আমি। তোমাকে বিশেষ করে বলছি আমি, ভুলে যেয়ো না। অতি সুন্দরী যৌবনবতী মেয়ে তুমি। তোমার আবেগও কম নয়। এখানে অনেক সুদর্শন – রূপবান শাহযাদা আর আমীরযাদা আছে। দেখো কারো প্রেমে পড়ে যেওনা আবার।'

'এমন হবে না মুনীব!'

'এমন হলে তো জানো, এর শাস্তি মৃত্যু। এত সহজ মৃত্যু নয় যে, দেহ থেকে ধড় আলাদা করে দেয়া হলো। বরং বড় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'

'সে সুযোগ কখনো আসবে না।'

পরদিন সালতানাতের ব্যাপারে এহতেশাম মাদানী আর সুলতান মালিক শাহ আলাপ করছিলেন। কথায় কথায় এহতেশাম মাদানী বললেন,

সুলতানে মুআজ্জম! ঐ নতুন উপদেষ্টার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি?

'তোমার যে মত হবে আমার মতও তাই হবে। আমি আমার এতএত আমীরউমারা ও উপদেষ্টাদের ব্যাপারে পৃথক পৃথক মতামত দিতে পারবো না। খাজা হাসান তুসী আমাকে বলেছেন, হাসান ইবনে সবা তার পাঠ্যবন্ধু। জ্ঞানবিদ্যা, সুক্ষ্ম বিবেচনাবোধ, বিচক্ষণতাবোধ এবং বিশ্বস্ততায় সে উত্তীর্ণ। তুসীর মত আমি গ্রহণ করেছি। এই ওযীরে আজমের ওপর বিশ্বাস আছে আমার। এজন্য তাকে আমি উপাধি দিয়েছি 'নেযামুলমুলুক।' তুমিও আমার বিশেষ পরামর্শদাতা এবং আমার বিশ্বস্ত। তুমি কারো ব্যাপারে মতামত দিলে আমি সঠিক বলে তা ধরে নেবো। আমার মতামত তুমি জানতে চাচ্ছো কেন?' – সুলতান বললেন।

'হাসান ইবনে সবার মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি যা আমাদের কারো মধ্যে নেই। আপনি ওযীরে আযমকে নেযামুল মুলকে উপাধি তো দিয়েছেন কিন্তু তার মধ্যেও সে ব্যাপারটা দেখা যায় না।'

'আরে তুমি কি পরিষ্কার করে বলবে না কিছু? তুমি হাসান ইবনে সবার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতামত কেন জানতে চাচ্ছো?'

'আপনি আমাকে অনেক বড় সম্মান দিয়েছেন। আপনার বিশেষ উপদেষ্টা বানিয়েছেন আমাকে। আমি এই মর্যাদার অধিকারী এটা আমার প্রমাণ করতে হবে। যে ভালো মন্দ জিনিস দেখবো তা আপনাকে দেখাবো এবং যা শুনবো তা আপনাকে শোনাবো– এভাবেই আপনার নেমক হালাল করতে পারবো। সময় সুযোগ মতো হাসান ইবনে সবার জ্ঞান বুদ্ধির পরীক্ষা নিয়ে নিন।'

'ওকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পর হাসান সুলতানের দরবারে সালাম দিয়ে হাজির হলো। সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'রাজা বাদশারা প্রজাদেরকে কি করে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে?'

'নিজের মনকে অসন্তুষ্ট রেখে' – হাসান বললো।

'ব্যাখ্যা করো।'

'বাদশাহ তার মন থেকে সব শাহী ধ্যান-ধারণা বের করে দেবে। সব বাদশাই ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়। নিজের ওপর ধনভাণ্ডার লুটিয়ে দেয়। প্রজাদের কর বাড়িয়ে নিজেদের ধনভাণ্ডার মোটা করে আর তাদের রক্ত-ঘামের ওপর গড়ে তুলে ফেরআউনি রাজত্ব। সে যদি একজন সাধারণ মানুষের মনের মতো নিজের মনকে মনে করে তাহলে তার বিবেক তাকে প্রজাদের কাতারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়ে যাবে।'

'তুমি আমার একজন উপদেষ্টা। তুমি কি বলতে পারো আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন কে? যে যেকোন সময় আমাদের ওপর হামলা করতে পারে?'

'আপনার দরবারের খোশামোদী।'

সুলতান চমকে উঠলেন।

'আমি অন্য দুশমনের কথা বলছি। অন্য কোন দেশের' দুশমনের কথা – সুলতান বললেন।

'মহামান্য সুলতান! জঙ্গলে বা অন্য কোথাও আপনার সামনে সাপ এলে আপনি তাকে মারতে বা তাড়াতে পারবেন। কিন্তু যে সাপ আপনার জামার হাতায় বড় হচ্ছে তার ছোবল থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন না। যেকোন সময় সে ছোবল মারতে পারে।'

'তুমি আমাদের প্রশাসনে কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি দেখেছো?'

'হ্যাঁ মহামান্য সুলতান! এখানে আমি সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতা দেখেছি, তাহলো আপনার ওযীর ও উমারাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস।'

'আমাদের ওযীরে আজমের মধ্যে তুমি কি বিশেষ কোন ত্রুটি দেখেছো?'

'ওযীরে আজম বা কোন উপদেষ্টা অথবা কোন হাকিমের ত্রুটি যদি আমি বলতে থাকি সেটা গীবত হবে। গীবত এমন পাপ যা সালতানাতের শিকড় ঝাঁঝরা করে দেয়। আমি তখনই সেই ত্রুটির কথা বলতে পারবো যখন আপনিও সেটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন।'

'আচ্ছা সালতানাতের প্রসংগ ছাড়া তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কি কখনো বাঘ বা চিতা শিকার করেছো?'

'না সুলতানে আলী!'

'তাহলে এর অর্থ হিংস্র বা বন্য প্রাণীকে তুমি ভয় পাও। তুমি কি মনে করো হিংস্র বা বন্য প্রাণীকে ভয় পাওয়া উচিত?'

'না সুলতানে আলী! এসব চতুষ্পদ জন্তুকে কারোই ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি শুধু একটা বন্য প্রাণীকে ভয় পাই এবং আপনার মনে এর ভীতি ঢুকিয়ে দিতে চাই।'

'সেটা কি?'

'উঁই পোকা।'

সুলতান মালিক শাহ সশব্দে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন,

'তোমার মধ্যে তো বেশ রম্যতা আর কৌতুকবোধ আছে। এটা আমি পছন্দ করি। আর কাউকে এই প্রথম উঁই পোকাকে বন্য বা হিংস্রপ্রাণী বলতে শুনলাম।'

'না সুলতানে মুআজ্জম! আমি বড় গুরুত্ব দিয়ে বলছি একথা। হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয় এটা। কোন হিংস্র প্রাণী আপনার সামনে এলে আপনি তীর চালিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে তার কবল থেকে বাঁচতে পারবেন। কিন্তু উঁই পোকা সেই হিংস্র প্রাণী যে আপনার সামনে আসবে না কখনো। তার ওপর আপনি তীর চালাতে পারবেন না। তার অস্তিত্ব তখনই আপনি টের পাবেন যখন ভেতর থেকে সব কুড়ে কুড়ে খেয়ে শেষ করে দেবে। সালতানাতের ভেতর যখন উঁই পোকা বাসা বাধবে তখনই টের পাওয়া যাবে যখন সালতানাতের ধস নামবে। আপনার সালতানাতেও তোষামোদি দ্বারা উঁই পোকা বাসা বাঁধছে।'

'তুমি জানো তোমার এসব কথা শুনে আমি কি মতামত দাঁড় করিয়েছি?'

'মতামত ভালো নাও হতে পারে। কারণ আমি তোষামোদে নয়। বরং এর বিরুদ্ধে।'

'না হাসান! তোমার কথা শুনে আমি খুশী হয়েছি। কারণ তুমি স্পষ্টভাষী ও সত্যপ্রিয়। তুমি যেতে পারো।'

হাসান চলে যাওয়ার পর মালিক শাহ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তার মাথায় গুঞ্জন করছিলো হাসানের কথাগুলো। তিনি এহতেশাম মাদানীকে ডাকলেন।

'এহতেশাম! আমার এই উপদেষ্টা তো আমার প্রতি বেশ ভালো প্রভাব রেখে গেছে। বয়সের তুলনায় একে অনেক বেশি বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান মনে হচ্ছে।'

এহতেশাম এ অপেক্ষাতেই ছিলেন। হাসানের প্রতি সুলতানের এই মনোভাব জেনে এহতেশাম গদগদে হয়ে গেলেন। একথা ওকথার অজুহাত ধরে হাসানের প্রশংসা করলেন অনেক্ষণ এবং চাপা গলায় নেযামুল মুলকের বিরুদ্ধেও দু'এক কথা বলে দিলেন।

★ ★ ★ ★

এহতেশাম মাদানী হাসানের কাছ থেকে যে দাম উসুল করতে চাচ্ছিলেন তা ভালো মতোই উসুল করলেন। সেটা হলো ফাতেমা। সেদিন দু'জনে সেই বাগানের এক নির্জন কোণে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা ছিলো।

'কাল রাতে তো তুমি আমাকে মেরেই ফেলেছিলে ফাতেমা! তুমি তো পরিষ্কার বলে দিয়েছিলে আমাকে চেনো না জানো না'—এহতেশাম বললেন।

'আর কি করার ছিলো আমার? যদি বলতাম আপনাকে চিনি, আমার ভাই গর্দান কেটে ফেলতো আমার। আপনি পুরুষ, অনেক কিছুই পারেন আপনি। আমি জানতাম আমার ভাইকে ঠাণ্ডা করতে পারবেন আপনি। সে তো করেছেনই আপনি।'

'আমি তো আরো শক্ত লোককে ঠাণ্ডা করতে পারি। আমার শুধু আশংকা ছিলো তুমি যদি আমার সঙ্গে আর সাক্ষাত না করো।'

'ছিঃ ছিঃ একথা বলবেন না। আপনার প্রতি আমার প্রেম সাময়িক ও দৈহিক নয়। আজীবনের জন্য।'

'আমার ভালোবাসাও সাময়িক নয়। তোমাকে আমার জীবন সাথী বানাবো। তুমি বললে আমার দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবো।'

'না, এর প্রয়োজন নেই। আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকলে অন্য দুই মহিলার জীবনকে কেন নষ্ট করবেন আপনি! জানিনা আমার ভাই আপনাকে বলেছে কি-না, আমি যে বিয়ের কথা শুনলেই পালিয়ে যাই!'

'হ্যাঁ ফাতেমা! হাসান তোমার সব কথা বলেছে আমাকে। আরো বলেছে, তোমাকে বিয়ের জন্য সেই রাজী করাবে। দেখো ফাতেমা! সব মানুষ এক নয়। তোমার প্রথম স্বামী সুস্থ মনের ছিলো না। যে তোমার মতো এমন নিষ্পাপ ফুলের কদর করতে পারেনি তার তো মাথাই ঠিক ছিলো না।'

'আমি তো আশ্চর্য হচ্ছি যে, আপনার কাছে শুধু আমি বসেই নয় আপনার বাহু বেষ্টনীতে আমার দেহ। আমি তো পুরুষের মুখ কল্পনা করলেও ঘৃণায় মুখ বিকৃত করতাম। একদিকে আপনার বিয়ের প্রস্তাব যা আমি গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছি। অন্যদিকে আপনার প্রতি ভালোবাসা'...............

'তোমাকে কি করে বিশ্বাস করবো আমি তোমার প্রথম স্বামীর মতো হবো না। আমি আমার ভালোবাসার প্রমাণ তোমায় কি করে দেবো?'

'আমাকে ভাববার সুযোগ দিন। আমি এক বিমূঢ় অবস্থায় পড়েছি। আরেকদিকে আমার ভাইয়ের ব্যাপারে পেরেশানী কম নয় আমার।'

'আমাকে বলো ফাতেমা! তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কি জন্য পেরেশানী তোমার?'

'আমার ভাই অনেক বিদ্বান-ধীমান লোক। তিনি যত যোগ্য ততই সাদাসিধা। ওযীরে আজম নেযামুল মুলক তার তুলনায় কিছুই নয়। আমি দেখছি তিনি তার কাছ

থেকে পরামর্শ নিয়ে সুলতানের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন এই পরামর্শ তার মাথা থেকে বেরিয়েছে। সুলতানকে আসল ব্যাপার অবশ্যই জানানো উচিত। আমি এও জানি, এই সালতানাতের ওযীরে আজম যদি আমার ভাই হন তাহলে সালতানাতের চেহারা এমন পাল্টে যাবে যে, আপনাদের হয়রানে ফেলে দেবে।'

'সময় লাগবে ফাতেমা! হাসান নেযামুল-মুলক সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলেছে। আজই আমি সুলতানের সাথে কথা বলেছি। সুলতান হাসানকে ডেকে অনেক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তিনি আমাকে ডেকে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, হাসানের প্রতি তিনি মুগ্ধ। আমি সুযোগ পেয়ে হাসানকে এত উঠিয়েছি যে, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তায় তাকে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি।'

'আমি কি আমার মনের কথা বলবো? এমন অবস্থা তৈরি করুন সুলতান যাতে নেযামুল মুলকের জায়গায় আমার ভাইকে ওযীরে আজম মনোনীত করেন। এমন হলে সেদিনই আপনাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করে নেবো।'

'এমনই হবে'–এহতেশাম তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বললো–'তবে সময় দিতে হবে। কারো চিন্তা ভাবনা তো দু'একদিনে বদলানো যায় না। তবুও সুলতানকে নেযামুল মূলকের বিরুদ্ধে নিয়ে যাবো।'

এহতেশাম মাদানীর মতো প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষ অভিজ্ঞ একলোক তার অতীত সব কৃতিত্বকে, তার নিজের বিবেক-বোধ ও নৈতিকতাকে জৈবিক বাসনা আর হাসানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রূপবতী এক নারীর পায়ে ধীরে ধীরে বিলিয়ে দিতে থাকেন।

এভাবে প্রতি সন্ধ্যায়, বাগানের সেই নির্জন কোণে ফাতেমার স্থান হতো এহতেশামের বাহু বন্ধনে। ফাতেমার চুলের শরীরের মাদকীয় ঘ্রাণ এহতেশামের বোধ-অনুভূতিকে গভীর ধোঁয়াটে করে তুলতো। এহতেশামের অবস্থা তখন থাকতো এক সুখী পাগলের মতো।

এহতেশাম মাদানী সুযোগ পেলেই সুলতানের কাছে বসে নেযামুল মুলকের বিরুদ্ধে দু'এক কথা বলে হাসানের প্রশংসা শুরু করে দিতো।

এর মধ্যে একদিন হাসানের কাছে আহমদ ইবনে গুতাশের এক কাসেদ এলো। সে বললো আহমদ ইবনে গুতাশ এখানকার অবস্থা জানতে চেয়েছেন। হাসান বললো,

'লিখিত জবাব এখন দেয়া যাবে না। আমার মুরশিদ ইবনে গুতাশ জানেন এসব বিষয় লিখিত পাঠানো যাবে না। তাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, তার এই অযোগ্য শাগরেদ কখনো ব্যর্থ হয় না। সব সমস্যাতেই সে ভালো করে উতরে গেছে। সে পুরো আশাবাদী, এ কাজেও সফল হবে। তাকে বলবে, তিনি যে জিনিস আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন সে দারুণভাবে তার পথ করে নিয়েছে। আমার কথা সুলতানের কাছে পৌঁছে গেছে এবং নিয়মিত পৌঁছবেই। এখন আমি আসল কাজ শুরু করে দেবো। এখন খালজানের অবস্থা জানাও'।

'সেখানে আমরা আশাতীত সফলতা পেয়েছি'–কাসেদ বললো–'লোকে এখনো খোদার দূত খুঁজছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, দূত খোদার পয়গাম ও তার দর্শন দিয়ে

চলে গেছেন। কোন একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন। আহমদ ইবনে গুতাশ কৃষকদের খাজনার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন। এতে লোকেরা খুব খুশি। তারা আহমদ ইবনে গুতাশকে খোদার দূতের বিশেষ প্রতিনিধি মনে করে। তিনি যেদিকেই যান লোকে রুকূর মত ঝুঁকে পড়ে তাকে সালাম করে।

'আমার পীর আহমদ ইবনে গুতাশ বড় বিচক্ষণ মানুষ। তবুও তাকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিয়ো, এখনই ইসলাম ও আহলে সুন্নতের বিরুদ্ধে কোন কথা যাতে না বলেন। আরো বলবে, এক ফৌজ তৈরির কাজ যেন শুরু করে দেন। এমন ফৌজ যারা বেতনভুক্ত হবে না, বরং প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা হবে।'

'একাজ শুরু হয়ে গেছে। লোকদেরকে ঘোড়সওয়ারী, তীর তলোয়ার চালনা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। শিগগিরই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি শেষ কথা বলেছেন, এখানে যদি আপনি শেষ পর্যন্ত সফল না হন তাহলে আমাদেরকে জানাবেন। নেযামুল-মুলককে আমরা হত্যার ব্যবস্থা করবো বা অপহরণ করে কোথাও গায়েব করে দেবো।'

'না এখনই এর প্রয়োজন নেই। সফলতার ব্যাপারে আমি পূর্ণ আশাবাদী।'

সুলতান মালিকশাহ একবার হালাব সফরে গেলেন। সেখানে 'সঙ্গে রিখাম' নামে এক ধরনের মর্মর পাথরের সন্ধান পেলেন তিনি। এগুলো দিয়ে উন্নতজাতের তৈজসপত্র তৈরি হয়। সুলতান পাঁচশ মন সঙ্গে রিখাম ইস্পাহানে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

দুই আরবী উট সওয়ার তখন ইস্পাহান যাচ্ছিলো। একজনের ছয়টি উট আরেকজনের চারটি উট ছিলো। প্রথম থেকেই পাঁচশ মন★ জিনিসপত্র উটগুলোর ওপর ছিলো। সেগুলোর ওপরই এই পাঁচশ মন পাথর ভাগ করে বন্টন করা হলো। খালি উট পাওয়া যেতে কয়েকদিন লেগে যেতো। তাই এ ব্যবস্থা।

সুলতান মারুতে পৌঁছে জানতে পারলেন সঙ্গে রিখামও পৌঁছে গেছে। এত দ্রুত তার হুকুম পালিত হওয়ায় তিনি দারুণ খুশি হলেন। হুকুম দিলেন ঐ উট সওয়ারদের এক হাজার দীনার পুরস্কার দেয়া হোক।

'খাজা তুসী!–সুলতান নেযামুলমুলককে বললেন–'এই এক হাজার দীনার দুই উট সওয়ারের মধ্যে বন্টন করে দিন।

নেযামুল মুলক ছয় উটের সওয়ারকে দিলেন ছয়শ দীনার আর চার উটের সওয়ারকে চারশ দীনার। 'এই বন্টন ভুল হয়েছে। ওযীরে আজমের বুঝে শুনে বন্টন করা উচিত'–হাসান ইবনে সবা বলে উঠলো।

'তুমি এই ভুলকে ঠিক করে দাও। আর ভুল কি হলো তাও বলো'–সুলতান বললেন।

'ছয় উটওয়ালা তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ছয় উটওয়ালাকে আটশ এবং চার উটওয়ালাকে দু'শ দীনার দেয়া উচিত।'

'কিভাবে?'

'সুলতানে মুহতারাম!' উট দশটি। ওজন পনেরশ মন। প্রত্যেক উট দেড়শ মন করে বহন করেছে। যার ছয় উট সে নয়শ মন ওজন বহন করেছে। এভাবে যে, পাঁচশ মন তার উটগুলো আগ থেকেই বহন করছিলো। তারপর চারশ মন পাথর তার উটগুলোর ওপর তোলা হয়। অন্যদিকে চার উটওয়ালা এভাবে বহন করেছে ছয়শ মন। আগে পাঁচশ মন তার চার উটে বহন করছিলো, পরে আরো একশ মন সঙ্গে রিখাম তার উটগুলোর ওপর তোলা হয়। আপনি এক হাজার দীনার পাঁচশ মন ওজনের জন্য দিয়েছেন। এ হিসাবে শ'মন প্রতি দু'শ দীনার করে পড়ে। সুতরাং ছয় উটওয়ালা চারশ মন বহনের জন্য পাবে আটশ দীনার আর চার উটওয়ালা একশ মন বহনের জন্য পাবে দু'শ দীনার....এটাই আমাদের মুহতারাম ওযীরে আজমের ভুল।'

সুলতান মালিক শাহ নেযামুলমুলককে অনেক সম্মান করতেন। তার যোগ্যতার প্রতি ছিলো সুলতানের ভীষণ শ্রদ্ধা। তাই তিনি নেযামুলমুলককে বিব্রত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য হাসানের হিসাবকে হাসি ঠাট্টায় উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু নেযামুলমুলুক গম্ভীর হয়ে গেলেন। এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি, হাসান ইবনে সবা যেকোন উপায়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাচ্ছে।

এর আগেও খাজা তুসীকে তার সচিবরা জানায়, হাসান ইবনে সবা ও এহতেশাম মাদানীকে প্রায়ই ফিস ফিস করতে দেখা যায়। আরেকজনের কাছে তিনি শুনতে পান এহতেশাম মাদানীকে হাসানের বোনের সঙ্গে এক বাগানে দেখা গেছে। নেযামুলমুলক অতি সজ্জন ও উঁচুদরের লোক ছিলেন। এই খবর পেয়ে তিনি হাসানের প্রতি মোটেও সন্দিহান হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন হাসান ইবনে সবা কখনো তাকে ভুলবে না, তার ক্ষতি করবে না।

নেযামুল মুলক হাসান তুসী তার স্বভাবমতে শান্ত রইলেন। হাসানের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিলেন না। কিন্তু হাসান বসে রইলো না। নেযামুলমুলককে অপদস্থ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। একটা সুযোগ সে নিজেই তৈরি করে নিলো।

একদিন সালতানাতের দরবারে হাকিমরা বসে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করছিলো। কথা প্রসঙ্গে কেউ একজন বললো, সুলতান মালিক শাহ বিশ বছর ধরে এই সালতানাতের সুলতান। এ সময় প্রজাদের খাজনা বাবদ কত কোটি কোটি দীনার উসুল হয়েছে এবং সেগুলো কোথায় খরচ হয়েছে তা তিনি নিজেও জানেন না। এ সময় হাসান ইবনে সবা বলে উঠলো,

'কে বলেছে সব পয়সা খরচ হয়েছে? আমি বলবো, এতে অনেক অপচয় হয়েছে এবং আত্মসাতও হয়েছে। সুলতান অনুমতি দিলে আমি বিশ বছরের হিসাব কিতাব তৈরি করে তার সামনে পেশ করতে পারি।'

এহতেশাম মাদানী পরে সুলতানকে গিয়ে হাসানের প্রস্তাবের কথা জানালেন এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সুলতানকে পরামর্শ দিলেন।

ইস্পাহানে তখন 'মন' এর হিসাব ভিন্ন ছিলো। পাঁচ সেরে এক মন হতো।

'ত্রিশ বছরের হিসাব বের করে আমাদের লাভ কি হবে?'–সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু পয়সা এদিক সেদিক হলে সেটা ফিরে পাওয়া যাবে না ঠিক, তবে আমাদের মধ্যে কার কার দুর্নীতির স্বভাব আছে তা বের হয়ে যাবে' –এহতেশাম বললেন।

সুলতান ও এহতেশামের মধ্যে কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা হলো। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এহতেশাম সুলতানকে বিশ বছরের হিসাব বের করার জন্য রাজী করালেন। নেযামুল মুলক ছাড়া সুলতান প্রশাসনের কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত দেন না। তাকে ডেকে তিনি বিষয়টি অবহিত করলেন।

'বিশ বছরের হিসাব কত দিনে তৈরি করা যাবে?'–সুলতান নেযামুল মুলককে জিজ্ঞেস করলেন।

'দিনে?'–নেযামুলমুলক বিস্মিত হয়ে বললেন–'বছরের কথা বলুন। প্রথম আপনার বিশাল সালতানাতের দিকে তাকান তারপর ভেবে দেখুন। কোত্থেকে কোত্থেকে খাজনা আদায় করা হয় তাও তো বের করতে হবে। এই হিসাব তৈরির জন্য আমার দু'বছর দরকার।'

হাসান সেখানে উপস্থিত ছিলো। সে বলে উঠলো,

'সুলতানে মুআযযম! হয়রান হচ্ছি আমি মুহতারাম ওযীরে আজম দু'বছর সময় চেয়েছেন। আমি স্রেফ চল্লিশ দিনে এ হিসাব তৈরি করে দিতে পারবো। শর্ত হলো আমি যত আমলা চাইবো সব আমাকে দিতে হবে। কাজের সবরকম স্বাধীনতা দিতে হবে আমাকে।'

মালিক শাহ এ কাজের হুকুম জারী করে দিলেন। হাসান কাজ শুরু করে দিলো। কিন্তু খাজা তুসী কয়েক দিন বিমূঢ় হয়ে রইলেন। হাসান যদি চল্লিশ দিনে একাজ করে দেখায় তাহলে তো তিনি সুলতানের কাছে ছোট হয়ে যাবেন। এমনকি তার মন্ত্রিত্বও বাতিল হয়ে যেতে পারে। আবার কখনো তিনি এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করতেন যে, হাসান ইবনে সবা এই কাজ চল্লিশ দিনে তো দূরের কথা চল্লিশ মাসেও শেষ করতে পারবে না। তার ভেতরে অনবরত রক্তক্ষরণ চললো অনেকদিন। হাসান ইবনে সবা যে এভাবে তাকে প্রতিদান দিলো এটা তাকে আরো বেদনাকাতর করে তুললো।

★★★★

হাসান ইবনে সবা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালো। বড় বড় ফাইলের বিরাট এক স্তূপ সে সুলতানের সামনে রেখে বললো–

'মহামান্য সুলতান! চল্লিশ দিন চেয়েছিলাম আমি। আজ একচল্লিশ দিন। এই নিন বিশ বছরের হিসাব। আচ্ছা যিনি এই হিসাবের জন্য দু'বছর সময় চায় তার কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে? সুলতানে মুআজ্জম যদি মনে কিছু না নেন তবে বলবো, হাসান তুসী-যাকে আপনি নেযামুল-মূলক উপাধি দিয়ে রেখেছেন সে খাজনার

পয়সা আত্মসাত করেছে। নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য সে বুঝাতে চেষ্টা করেছে হিসাব বের করা তো সম্ভবই নয়, সম্ভব হলেও দু'বছর লাগবে।

সুলতান নেযামুলমুলক ও এহতেশাম মাদানীকে ডাকলেন।

'খাজা তুসী! এটা সেই হিসাবের দলিল যা আপনি দু'বছরের কম সময়ে করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এই দেখুন। হাসান তা চল্লিশ দিনে করে নিয়ে এসেছে।'

নেযামুলমুলক কিছু বলতে পারলেন না। তার কাছে কোন জবাব ছিলো না। তিনি বসে বসে বরখাস্তের হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সুলতান কাগজপত্র উল্টাতে লাগলেন। এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন। হাসানকে বললেন,

'হাসান! এখানে আয় ব্যয়ের হিসাব সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। আমাকে এটা বুঝিয়ে দাও।'

হাসানের বুক কাঁপতে লাগলো। সে কিছুই বলতে পারলো না।

আরেকটি কাগজের ওপর সুলতানের দৃষ্টি আটকে গেলে হাসানকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। হাসান এরও কোন উত্তর দিলো না। সুলতান আরো কয়েকটা হিসাবের ব্যাখ্যা চাইলেন। হাসান নিরুত্তর।

'তুমি এত বড়সর হিসাব তৈরি করলে অথচ তোমার জানা নেই তুমি কি করেছো এসব'–সুলতান হাসানকে বললেন।

'সুলতানে মুআজ্জম! আমি এমনিতে এমনিই বলিনি যে, এত বড় একটা দেশের খাজনা বিশ বছরের হিসাব দু'বছর লাগবে'–নেযামুলমুলক এতক্ষণপর কথা বললেন।

'আপনি বসুন তুসী! তোমরা দু'জন যাও। আমি এর সবটাই দেখবো।'

–ওরা চলে যাওয়ার পর সুলতান জিজ্ঞেস করলেন–'এসব কি হচ্ছে তুসী। সন্দেহ হচ্ছে আমাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।'

'মান্যবর সুলতান! এটা আমার ঈমান যে, কারো যেন আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়। কিন্তু যেখানে আমার অবস্থান ও নৈতিকতা শংকায় পড়ে যাবে সেখানে সত্যের সামনে থেকে পর্দা উঠানো জরুরী মনে করি আমি। এসবে আপনার উপদেষ্টা এহতেশাম মাদানীরও বড় হাত আছে। হাসানের যুবতী এক বিধবা বোন আছে। এহতেশামকে তার বোনের সাথে এক বাগানের নির্জনে প্রায়ই সন্ধ্যার পর দেখা যায়। এহতেশাম প্রায়ই হাসানের ঘরে যায় এবং অনেক সময় ব্যয় করে। যতটুকু মনে আছে আমার, হাসানের কোন বোন ছিলো না। ওর পরিবার সম্পর্কে মাদরাসার জীবন থেকেই জানি আমি।'

'তুসী! আমি এই ষড়যন্ত্রের সব বুঝতে পেরেছি। কয়েক দিন থেকে এহতেশাম আমার কাছে বসে হাসানের প্রশংসা করে এবং চাপা গলায় আপনার বিরুদ্ধে দু'এক কথা বলে দেয়'–সুলতান কথা বলতে বলতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। একটু পর মাথা উঠিয়ে বললেন–'আপনি হাসানের সাথে এমন করে কথা বলুন যেন আমি তার তৈরি

হিসাব বুঝে নিয়েছি এবং এটা বিলকুল সহীহ। বাকী কাজ আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমার সামনে আরো অন্য ছবিও ভাসছে।'

নেযামুল-মুলক বাইরে বের হয়ে দেখলেন হাসান ও এহতেশাম নিচু গলায় কথা বলছে। নেযামুল-মুলককে দেখে দু'জনেই চমকে উঠে।

'হাসান! সুসংবাদ, তোমার এই হিসাব সম্পূর্ণ ঠিক। তুমি যেগুলোর জবাব দিতে পারনি আমি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি। সুলতানকে বলেছি হাসান নতুন লোক। এজন্য অতীতের হিসাব কিতাব তার জানা ছিলো না। সুলতান তোমার প্রতি বেশ খুশি। বলেছেন তোমাকে পুরস্কার দেবেন'–নেযামুলমুলক বললেন।

'আমি তোমার এই অনুগ্রহ সারা জীবনেও ভুলবো না খাজা' –হাসান নেযামুল মুলককে বুকে জড়িয়ে বললো–'তুমি আমার সম্মান বাঁচিয়েছো।'

'তোমরা এখন চলে যাও। কাল তোমাদেরকে সুলতান ডাকবেন।'

★ ★ ★ ★

যেদিন নেযামুল-মূলক হাসানকে সুসংবাদ দিলেন সেদিন এহতেশাম তার বাড়ি সংলগ্ন খালি একটি ঘর পরিষ্কার করালেন। তুলতুলে জাজিমসহ উন্নতমানের পালঙ্ক বিছালেন। মেঝেতে কার্পেট বিছালেন। তার খাছ খাদেম দ্বারা ফাতেমার কাছে চিঠি পাঠালেন–রাতে অমুক দিক থেকে যেন সে এই ঘরে এসে যায়। এই রাত তাদের উৎসবের রাত।

'দেখলে ফাতেমা আমার কৃতিত্ব?'–ফাতেমা এহতেশামের ঘরে এলে এহতেশাম ফাতেমাকে তার বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বললেন–'কাল্পনিক হিসাব দেখিয়ে সুলতানকে মানিয়ে নিলাম এ হিসাব নির্ভুল।'

'মোবারক হুঁ মোবারক!'–ফাতেমা এহতেশামের বুকে গাল ঘঁষতে ঘঁষতে বললো–'আপনি তো আমার ভাইকে ওযীরে আজম বানিয়ে দিয়েছেন।'

'এখন একাজ সহজ হয়ে গেলো। কাল সুলতান আমাদেরকে ডাকবেন। তুসীর বিরুদ্ধে সুলতানের এমন কানভারী করবো তখনই তাকে বরখাস্ত করে দেবেন তিনি।'

এহতেশাম ফাতেমাকে পালঙ্কে নিয়ে বসালো।

'সুলতান কাল হাসানকে পুরস্কার দিচ্ছেন। আজ আমি তোমার কাছ থেকে পুরস্কার নেবো'–এহতেশাম বললেন।

ফাতেমা এমন লজ্জাবতীর অভিনয় করলো যে, এহতেশাম তা দেখে মদমত্ত হয়ে গেলেন। ফাতেমাকে পালঙ্কে শুয়ে দিলেন।

'আত্মার দিক দিয়ে তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিকতা তো একটা প্রথা, তা পরে হলেও চলবে।'

কামরার দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। দরজার ছিটকানি দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলো না তারা কেউ। কারণ আঙ্গিনার দরজা বন্ধ। ফাতেমা হঠাৎ চমকে উঠলো।

'একটু দাঁড়ান। কারো যেন পায়ের শব্দ পেয়েছি'–ফাতেমা বললো।

'বিড়াল-টিরাল হবে। এ ঘরে পা রাখবে এমন সাহস নেই কোন মানুষের' –এহতেশাম কাঁপা গলায় বললেন।

চারটি মূর্তি তখন প্রায় ঘরে পা রেখেছে। এরা ছাদ থেকে সিঁড়ি লাগিয়ে আঙ্গিনায় নেমেছে। ফাতেমা তার ওপর উপুড় হয়ে থাকা এহতেশামকে হটানোর জন্য একবার হালকা ধাক্কা দিলো। কিন্তু এহতেশাম তখন নেশায় মত্ত।'

খট করে দরজা খুলে গেলো। এহতেশাম সেদিকে তাকালেন। ভেতরে তখন দু'লোক দাঁড়িয়ে। তাদের পেছনে আরো দু'জনকে দরজায় দেখা যাচ্ছে। এহতেশাম চিনতে পারলেন এরা শহরের কতোয়ালের লোক।

'বের হয়ে যাও এখান থেকে'–এহতেশাম কর্তৃত্বের সুরে বললেন–'আমার ঘরে আসার সাহস কি করে হলো তোমাদের?'

'আলীজাহ! আমরা সুলতানের হুকুমে এসেছি। আপনাকে ও এই মেয়েকে সুলতানের কাছে নিয়ে যেতে হবে'–তাদের একজন বললো।

'যাও, বের হয়ে যাও এখান থেকে। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

'আপনি নিজে যাবেন না আলীজাহ! আপনাকে ও এই মেয়েকে নিয়ে যাবো আমরা'–কতোয়ালের লোক বললো।

"তৈরি হতে হবে না আলীজাহ! আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে। আপনি ও এই মেয়ে যে অবস্থায় থাকবেন সে অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে।'

দু'জনেই ওরা অর্ধবিবস্ত্র ছিলো।

'হাত ভরে পুরস্কার দেবো.............চারজনকেই.......... সুলতানকে গিয়ে বলো তোমরা আমাকে ও এই মেয়েকে কোথাও দেখোনি'–এহতেশাম ফ্যাকাশে মুখে বললেন।

ফাতেমা কাপড় পরছিলো।

'এই মেয়েকে বাইরে নিয়ে চলো। এ অবস্থাতেই বাইরে নিয়ে চলো' – চারজনের যে প্রধান সে বললো।

'আমার পদমর্যাদার ব্যাপারে তোমরা অবহিত। তোমাদের আমি এত প্রমোশন দেবো যে হাকিম বনে যাবে।'–এহতেশাম কাচুমাচু মুখে বললেন।

'আমাকে তোমাদের কেউ চাইলে কাছে এসো'–ফাতেমা উত্তেজক কণ্ঠে বললো।

'হ্যাঁ ভাইয়েরা! দেখো কত সুন্দরী মেয়ে'–এহতেশাম উদ্বুদ্ধ করলো।

'সুলতানের হুকুম পালন করো'–ওদের প্রধান বললো–'একে পাকড়ে নিয়ে চলো'–সে এহতেশামকে বললো–'আলীজাহ! আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি ঝামেলা করলে মাথায় আঘাত করে বেহুঁশ করা হবে। তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।'

এহতেশাম মাদানী আর কথা না বাড়িয়ে ওদের সঙ্গে মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। ফাতেমাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তার জন্য অর্ধ উলঙ্গ বা পূর্ণ উলঙ্গ কোন ব্যাপার ছিলো না। সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়ে।

দু'জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা কুঠুরীতে বন্দি করে রাখা হলো।

হাসান ইবনে সবা ও এহতেশাম মাদানীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর সুলতান যখন শুনলেন হাসানের বোনের সঙ্গে এহতেশামের মেলামেশার কথা। আরো জানলেন হাসানের কোন বোন নেই। তখন তার মনে খটকা লাগলো। তাই সুলতান নেযামুল মূলককে বললেন, হাসানকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে তার সব সংবাদ সঠিক। এর দ্বারা সুলতান চাচ্ছিলেন, হাসান ও এহতেশাম মাদানী যেন দুশ্চিন্তায় না থাকে এবং নির্ভাবনায় তাদের অপরাধ কর্ম চালিয়ে যায়।

নেযামুলামূলক চলে যাওয়ার পর সুলতান শহরের কতোয়ালকে (পুলিশ প্রধান) ডেকে সব ঘটনা খুলে বলে। বললেন, এহতেশাম ও ঐ মেয়েকে এক সঙ্গে পাকড়াও করতে হবে। সুলতান বললেন, 'এখনই গিয়ে লোক ঠিক করো। সন্ধ্যার পর ওরা কোথাও একত্র হয়। একজন এহতেশামের পিছু লাগবে আরেকজন ঐ মেয়ের। এরা একসঙ্গে হলেই এহতেশামের পদমর্যাদার দিকে না তাকিয়ে দু'জনকেই ধরে এনে থানায় আটকাবে। যে অবস্থায় ওদেরকে পাওয়া যাবে সে অবস্থাতেই থানায় আনতে হবে। আজই যে এরা একত্র হবে এটা জরুরী নয়। কাল বা পরশু বা দশ দিন পরও ওদের মিলন হতে পারে। ছাড়বে না ওদেরকে।'

সূর্যাস্তের পর কতোয়ালের দু'লোক ছদ্মবেশ ধরে কাজে নেমে পড়লো। একজন এহতেশামের ঘরের দিকে আরেকজন হাসান ইবনে সবার ঘরের দিকে চোখ রাখলো। ওদের সঙ্গে আরো একজন করে লোক ছিলো। এহতেশামকে প্রথম দেখা গেলো তার বাড়ি থেকে বের হয়ে পাশের একটি ঘরে ঢুকতে। একটু পর ফাতেমাকে তার ঘর থেকে বের হয়ে এহতেশামের সে ঘরে ঢুকতে দেখলো আরেকজন। নিয়োজিত দু'জন একত্রিত হলো এবং তাদের দুই সঙ্গীকেও ডেকে আনলো সেখানে। চারজন লোক তাকিয়ে দেখলো এহতেশামের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চারজনের একজন অফিসার। অফিসার বাকী তিনজনকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললো। তারপর সে ঘরের পাশের বাড়িতে গিয়ে ওরা বাড়ির কর্তাকে ডেকে এনে জানালো, কতোয়ালের লোক তারা। এই বাড়ির পাশের বাড়িতে ওপর দিয়ে যেতে চায়।

'আসুন আসুন। আমার ঘরের ছাদ থেকে ঐ বাড়ির ছাদে চলে যান। ঐ বাড়ির সিঁড়ি কোন দিকে লাগাতে হবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো'–পাশের বাড়ির কর্তা বললো।

এরপর হাতেনাতে এহতেশাম ও ফাতেমা ওদের ফাঁদে ধরা পড়ে।

★★★★

রাত তখনো বেশি হয়নি। শহরের কতোয়ালকে জানানো হলো দু'জনকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে সে অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছে। সুলতান কতোয়ালকে বলেছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে ঐ মেয়ের আসল রূপ আমাকে জানাবে। কতোয়াল তখনই থানায় পৌঁছে ফাতেমার কুঠরীতে চলে গেলেন।

'নাম কি তোমার?'—কতোয়াল ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ফাতেমা! সুলতানের উপদেষ্টা হাসান ইবনে সবার বোন আমি।'

'হাসান ইবনে সবার বাড়ির ঠিকানা আমরা জানি। সেখান থেকে আমরা খবর আনবো তার কোন বোন আছে কি না? নিজের সত্য পরিচয় দাও। না হয় বড় কষ্টের মৃত্যু হবে তোমার?

'এই শরীরকে আপনি কষ্ট দিতে পারবেন?'—ফাতেমা ঠোঁটে আমন্ত্রণের হাসি ফুটিয়ে ভেজা সুরে বললো—'হাত লাগিয়ে দেখুন, গোলাপের পাপড়ির চেয়ে কোমল'—অর্ধ উলঙ্গ দেহকে আরো আবরণহীন করে দিলো, রসভরা চাহনি দিয়ে বললো—'পুরুষ মানুষ এত ভয় পায়? আসুন কাছে, চুলে হাত লাগিয়ে দেখুন রেশমের চেয়ে আরামদায়ক।'

কতোয়াল তো ফেরেশতা নয়। তার এক হাত চলে গেলো ফাতেমার চুলের ভেতর। সেখানেই ঘুরাতে লাগলো কতোয়ালের কম্পিত আঙ্গুলগুলো। তার আরেক হাত ফাতেমার দু'হাতের উষ্ণতায় আবদ্ধ। তার মনপাখা ঝাপ্টিয়ে চলে গেলো যৌবনের উথাল পাতাল দ্বীপে।

হঠাৎ তিনি আওয়াজ শুনলেন—'বান্দা! ভুলে গেছিস আমাকে?'

আরেকটি আওয়াজ শুনলেন—'কতোয়াল!'—দরজার দিকে চমকে উঠে তাকালেন কতোয়াল।

'খেয়াল রেখো কতোয়াল! শুনেছি মেয়েটি অপরূপা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যদি তুমি উল্টাপাল্টা .... তাহলে তুমি আমাকেই ধোঁকা দেবে। আমার সালতানাতে কোন চরিত্রহীনকে আমি বরদাশত করবো না'—সুলতান মালিকশাহ কতোয়ালকে এহতেশাম ও ফাতেমার ওপর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারীর সময় বলেছিলেন।

তার মনের ভেতরের সেই গর্জন আর সুলতান মালিক শার শব্দগুলো যেন সারা কামরায় ছড়িয়ে পড়লো। সেখানে যেন মালিক শাহ দাঁড়িয়ে আছেন আযাবের ফেরেশতার পেছনে। কতোয়ালের শরীর ঝিম ঝিম করে উঠলো। তার রক্তের ভেতর জলুনি ছড়িয়ে পড়লো—এই ডাইনী মেয়েটি রূপের মায়ায় ফেলে তাকেও এহতেশাম মাদানীর মতো নষ্ট করতে চেয়েছিল! রূপের উল্টো পিঠে এত নোংরা? এত স্পর্ধা? কতোয়ালের যে হাত মেয়েটির উষ্ণ চুলে ঘুরছিলো আচমকা সে হাতটিই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেলো। সে হাতে ছিলো মেয়েটির এক গাছি প্রায় উপড়ে উঠা চুল।

'আ....আ...' ফাতেমা আর্তনাদ করে উঠলো।

'সত্য বল্ তুই কে? ছাদের ঐ আংটার সঙ্গে তোর চুল বেধে তোকে লটকাবো।'

তীব্র ব্যথায় ফাতেমার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগলো। কতোয়াল এবার ফাতেমার চুল ধরে তার পলকা শরীরটা ওপর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কংক্রিটের ছাদের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে স্বজোরে মেঝেতে এসে পড়লো। আবারো ঘর ফাটানো চিৎকার। গললো না কতোয়ালের মন। তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। কতোয়াল তার লোহার একটি ডান্ডা ফাতেমার দু'হাতের আঙ্গুলের খাজে ভরে স্বজোরে চাপ দিলেন। আবার সারা ঘর কেঁপে উঠলো ফাতেমার আর্ত চিৎকারে। আর সহ্য করতে পারলো না ফাতেমা। ভুলে গেলো হাসান ইবনে সবার সব প্রশিক্ষণ।

'মরে যা, কেউ শোনার নেই তোর এই নাকি চিৎকার। সত্য বল কে তুই?' –কতোয়াল ফাতেমাকে দ্বিতীয় আছাড় দিয়ে বললো।

অনেক্ষণ মরার মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো ফাতেমা। তারপর তার মুখ নড়ে উঠলো। আস্তে আস্তে সব বলে দিলো। হাসান তাকে কেন এনেছে? সে আসলে কে? তার আসল কি নাম? কিভাবে সে এহতেশাম মাদানীকে তার জালে জড়িয়েছে এবং হাসান ইবনে সবা কি করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে– সব বলে দিলো সে। কতোয়াল শেষ প্রশ্ন করলো–

'এহতেশাম মাদানী হাসান ইবনে সবাকে কি ধরনের সহযোগিতা করেছেন?'

'তিনি বলতেন, যেভাবেই হোক সুলতানকে নেযামুল-মুলকের বিরুদ্ধে নিয়ে যাবো। ঐ যে হিসাব নিয়ে ঝামেলা হয়েছিলো সেটাও এহতেশামেরই হাতে হয়েছে। তিনি বলতেন, এই হিসাব দেয়ার পর এমন অবস্থা হবে যে, সুলতান নেযামুল মূলককে অপসারণ করবেনই।'

হাসান জানতো ফাতেমা আর এহতেশাম আজকের রাতে আনন্দ করবে। কিন্তু এত দেরি হবে সে ভাবেনি। মাঝরাতের পর সে খাদেমকে এহতেশামের বাড়িতে পাঠালো। খাদেম এসে জানালো এহতেশামের দারোয়ান তার মুনীবের অপেক্ষায় জেগে বসে আছে।

হাসান নিশ্চিত হয়ে গেলো। এহতেশাম ও ফাতেমা অভিসার থেকে ফেরেনি। আজ দারুণ মৌজ করছে ওরা। করুক। আজ সে দারুণ খুশি। কালই তো সে হবে প্রধানমন্ত্রী।

ফজরের আজানের পর হাসানের দরজায় বাড়ি পড়লো। ফাতেমা এসেছে মনে করে হাসান দরজা খুলে দেখলো থানা থেকে দুই সিপাহী এসেছে। কেন এসেছে–হাসান জিজ্ঞেস করলো ওদেরকে।

'নির্দেশ এসেছে আপনি যেন ঘর থেকে বের না হন'–এক সিপাহি বললো।

'কেন? কে এ হুকুম দিয়েছে?'

'কারণ তো জানি না আলীজাহ! কতোয়াল আমাদের হুকুম দিয়েছেন।'

'আপনি ধরে নিন–আপনি গৃহবন্দী'–আরেক সিপাহী বললো।

ফজরের নামাযের পর সুলতান কাতোয়ালকে ডেকে হুকুম দিলেন, হাসান ইবনে সবা, নেয়ামুল মুলক, এহতেশাম ও সেই মেয়েটিকে তার সামনে হাজির করতে। ওরা এলে সুলতান ফাতেমাকে বললেন, গত রাতে কতোয়ালকে যে জবানবন্দী দিয়েছো আজ সেটা আবার দাও। ফাতেমা আবার সব বলে গেলো।

'এসব কি সত্যি এহতেশাম?'–সুলতান এহতেশামকে জিজ্ঞেস করলেন–'এই মেয়ে যদি ভুল বলে থাকে তাহলে বলো সত্য কি? এই মেয়েকে আমি জল্লাদের হাতে তুলে দেবো। যদি তুমি মিথ্যা'....

'না সুলতান মুআজ্জম! ওর বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। আমি শাস্তির উপযুক্ত। আপনার সঙ্গে আমি নেমক হারামি করেছি। আমাকে মাফ করে দিলেও আমি আপনার আশ্রয়ে থাকবো না আর। এটা আপনার আশ্রয়ের অপমান হবে।' এহতেশাম কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন,

'এহতেশাম! তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান যে এক মেয়ের ধোঁকায় পা দিয়েছো এজন্যই আমার আসল দুঃখ।'

সুলতান মুআজ্জম!–এহতেশাম দৃঢ় গলায় বললো–'আমি এখনো আপনাকে বিচক্ষণ বলে শ্রদ্ধা করি। আমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের ওপর আমার এজন্য গর্ব ছিলো যে, যে পরামর্শই আমি আপনাকে দিতাম আপনি সেটা গ্রহণ করতেন এবং সেটা সফল হতো। কিন্তু আমি অনুভব করছি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ক্রটিপূর্ণ ছিলো। আমি জানতাম, পুরুষের সবচেয়ে ভয়ংকর দুর্বল দিক হলো নারীর প্রতি মোহ। এটার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না। নারীর রূপে জ্ঞানবুদ্ধি হরণ করা এক জাদু আছে। সে জাদুর ভয়াবহতা সম্পর্কে আমার জানা ছিলো না। তা জেনেছি এবং এই শিক্ষা পেয়েছি যে, আমার মতো এত বিদ্বান অভিজ্ঞ লোককে যদি একজন নারী এভাবে কাবু করতে পারে তাহলে যে যুবক মনে করে নারীই দুনিয়ায় সব তার কি হবে। এই শিক্ষা নিয়ে আমি আপনার দরবার থেকেই নয় এই সালতানাত থেকেও বেরিয়ে যাবো। আপনি যদি অন্য কোন শাস্তি দিতে চান আমার গর্দান হাজির।'

'এর ফয়সালা পরে করবো আমি। বসো তুমি'–সুলতান এবার হাসানের দিকে মনোযোগ দিলেন–'কেন হাসান? তুমি কি বলো? এই মেয়েকে যদি মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করতে পারো মুখ খোলো। তবে নীরব থাকলেই ভালো করবে। আর মিথ্যা বললে বড় কঠিন শাস্তি পাবে।'

'এ মেয়ে আমার বোন নয়'–হাসান বললো–'ওকে আমি এক ইয়াতীম বিধবা মেয়ে ভেবে নিয়ে এসেছি। আপনার উচ্চ পদস্থ কোন হাকিম যদি একে ভুল পথে চালিত করে থাকে আমার কি অপরাধ তাতে? এই মেয়ের মুখ দেখুন, স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এর প্রতি জোর করা হয়েছে। ভয় দেখিয়ে এই বক্তব্য আদায় করা হয়েছে।'

হাসান সুলতানের চোখের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিলো আর চেষ্টা করছিলো সুলতানকে সম্মোহন করতে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণাদিসহ জবানবন্দি ততক্ষণে নেয়া হয়ে গেছে। এহতেশাম মাদানীর নিজ অপরাধ স্বীকারের কারণে এসব সাক্ষীকে আরো শক্তিশালী করে।

'খামোশ!'–সুলতান গর্জে উঠলেন–'প্রথমেই তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। সত্য বললে মুখ খুলবে। কিন্তু তুমি আমার হুকুমের পরওয়া করলে না'–সুলতান কতোয়ালকে বললেন–ওকে আর ঐ মেয়েকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করো। এদেরকে কয়েদখানা থেকে তখনই বের করা হবে যখন নিশ্চিত হবো এদের মাথা ঠিক হয়ে গেছে....এহতেশাম! তোমাকে কয়েদখানার অপমান থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। তুমি মুক্ত। তবে চিন্তা করে দেখি কি ফয়সালা করা যায়।'

'সুলতান মুআজ্জম!–নেযামুলমুলক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–'অপরাধীকে ক্ষমা করা আল্লাহর অন্যতম একটি গুণ। ইসলাম দুশমনকেও ক্ষমা করতে বলেছে। এরা আমাকে ক্ষতি করতে চেয়েছিলো। আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন সেখান থেকে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলো। আমি আল্লাহর নামে ওদেরকে মাফ করে দিচ্ছি।'

'আমি ওদেরকে মাফ করতে পারবো না'–সুলতান রাগ-প্রকম্পিত গলায় বললেন।

'সুলতানে মুহতারাম! আজ প্রথমবার আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ করছি আমার ব্যক্তিগত প্রশ্নে। আর এটা হবে আমার শেষ অনুরোধ। হাসান ও আমি ছিলাম শিক্ষা জীবনের বন্ধু। অসহায় অবস্থায় সে আমার কাছে এসেছিলো। আমি তার কেবল রুটি রুজি আর সম্মানের ব্যবস্থা করেছিলাম। হ্যাঁ সে পাপ করেছে। কিন্তু আমার কারণে ওকে কয়েদ করা হলে নিজেকে আমি অপরাধী ভাববো।'

সুলতান কিছুক্ষণ নেযামুলমুলকের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখ চিক চিক করে উঠলো। দুনিয়ায় এমন মানুষও আছে? তিনি ধরা গলায় বললেন,

'হ্যাঁ আমি আপনার সম্মান রাখবো খাজা তুসী! কিন্তু ওদেরকে আমি এখানে দেখতে চাই না। হাসান ইবনে সবা ও এই মেয়েকে এখনি শহর থেকে বের করে দিন'–এই বলে তিনি হুকুম কার্যকর করার জন্য কতোয়ালকে নির্দেশ দিলেন।

সেদিনই হাসান ও ফাতেমাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হলো। হাসান ওকে নিয়ে তার পিত্রালয় রায় শহরে পৌঁছলো। সে তার বাবাকে মারুতে কি ঘটেছে সব শোনালো।

'এখনো তোমার বুদ্ধি পুরো হয়নি'–হাসানের বাপ হাসানকে বললো–'তুমি সব কাজই একসঙ্গে এবং খুব দ্রুত শেষ করতে চাও। তাড়াহুড়ার স্বভাব ত্যাগ করো। তুমি তো শুধু তোমার চাকরিই হারাওনি বরং সেলজুকি সালতানাতই হাতছাড়া করেছো। এখন তোমাকে মিসর পাঠাবো। সেখান থেকে কিছু লোক এখানে আসবে।'

রায় শহরের আমীর আবু মুসলিম রাজী গোপনসূত্রে জানতে পারেন, হাসান ইবনে সবার বাবার কাছে মিসরের উবাইদী ফেরকার লোকদের যাতায়াত আছে এবং যেকোন সময় এরা নাশকতামূলক কোন ঘটনার জন্ম দিতে পারে। এসময় আবু মুসলিম রাজীর কাছে সুলতানের পক্ষ থেকে লিখিত এক পয়গাম আসে যে, রায়

শহরের লোক হাসান ইবনে সরাকে সরকারিভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রশাসনিক কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর ওপর নজর রাখা হোক। কারণ সে অতি ধুরন্ধর এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোক।

এই পয়গাম পাওয়ার পর আবু মুসলিম রাজীর তথ্যসচিবরা তাকে জানায় হাসান ইবনে সবা রায় থেকে দূরদূরান্ত এলাকায় ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নিজের এক ফেরকার চারণা চালাচ্ছে। এই ফেরকাবাজদের প্রতিটি কাজই দেশ, সমাজ ও ইসলামের জন্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আবু মুসলিম রাজী হাসানকে গ্রেফতারের হুকুম দিলেন।

গুপ্তচরের মাধ্যমে তখনই হাসান এ খবর জানতে পারে। উট সওয়ারীর পোশাক পরে সেও তৎক্ষণাৎ ধীর পায়ে শহর থেকে বের হয়ে যায়।

হাসান তো ছদ্মবেশ ধারণ করে বের হয়ে গেলো। কিন্তু রয়ে গেলো ফাতেমা। মারুতে ফাতেমা কতোয়ালের চাপে তার যে আসল পরিচয় দেয় তা ছিলো অনেকটা নাটকীয়।

ফাতেমার আসল নাম সুমনা। আহমদ ইবনে গুতাশের লুটেরা দল এক কাফেলা লুট করার সময় অন্যান্য মালামালের সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে ধরে নিয়ে আসে। এর মধ্যে তিন-চার জনের বয়স ছিলো ১১ থেকে ১৪ বছর। ওদেরকে শাহদর নিয়ে এসে আহমদ শাহজাদীর মতো যত্ন করে বড় করে এবং কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে পুরুষকে ফাঁসানোর মোহনীয় গুটি হিসেবে ওদেরকে গড়ে তোলে। সুমনা এদের মধ্যে রূপ যৌবনে, সবরকম ছলচাতুরীর খেলায় অধিক সম্ভাবনাময়ী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে।

হাসান এজন্যই তাকে নিয়ে মারুতে গিয়ে গুটি হিসেবে ব্যবহার করে। সুমনা লক্ষ্যভেদী গুটির মতোই যখন এই চাল প্রায় জয় করে এনেছিলো তখনই কতোয়ালের হাতে পড়ে সব চাল ফাঁস করে দেয়।

আহমদ ও হাসান মেয়েদেরকে সবরকম প্রশিক্ষণ দিলেও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করার মতো কোন শিক্ষা দেয়নি। তবে মেয়েদের মধ্যে ঘোষণা করে দেয়, প্রাণ দিবে কিন্তু ভেদ দেবে না। গোপনীয়তা ফাঁস করা যাবে না। যদি গোপনীয়তা রক্ষা না করে কেউ ব্যর্থ হয়ে আসে তার প্রাণখানি কেড়ে নেয়া হবে।

হাসান সুমনাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে সুযোগ তার হয়নি। আবু মুসলিমের কতোয়াল গ্রেপ্তারির পরোয়ানা নিয়ে তার পিছু নেয়। ফাঁক পেয়ে হাসান পালিয়ে যায় রায় থেকে। তবে পালানোর আগে সুমনার ভাগ্য নির্ধারণ করে যায়। তার দুই গুণ্ডা শিষ্যকে সে বলে যায়,

'ঐ হারামী মেয়ে আমার সামান্য ক্ষতি করেনি। সব শেষ করে দিয়েছে সে। ওকে খালজান নিয়ে যাবে। আমি ঘুরে খালজান যাবো। ওখানে আমাদের সমস্ত মেয়ের সামনে ওকে এমন যন্ত্রণার মৃত্যু দেবো যে, প্রতিটি মেয়ে ভয়ে কেঁপে উঠবে। এখন ওকে কোন বাড়িতে আটকে রাখো। পাঁচ ছয় দিন পর ওকে এখান থেকে বের করবে। এখন কতোয়ালের গুপ্তচররা আমার ও সুমনার ঘরের ওপর নজর রাখবে ...... আহা! সে আরেকটু শক্ত থাকলে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতাম।'

★★★★

সুমনা ফাতেমাকে ওদেরই কারো একজনের ঘরে রাখা হলো। ওকে বলে দেয়া হলো, শহরের আমীর সুমনাকে ও হাসানকে গ্রেপ্তারের হুকুম জারী করে রেখেছে। তাই বাইরে বেরোতে পারবে না এবং ছাদেও যাওয়া যাবে না। সুমনাকে সে ঘরে বেশ অতিথির যত্নে রাখা হলো।

যে ঘরে সুমনাকে রাখা হলো এর মালিকের ছিলো দুই স্ত্রী এবং প্রৌঢ়া এক কাজের মহিলা। রাতের খাবার খেয়ে সেদিন সুমনা তার ঘরে চলে গেলো। ঘরের মালিকটি তার যুবতী বয়সের এক স্ত্রীকে নিয়ে এক কামরায় চলে গেলো। বয়স্ক মতো আরেক স্ত্রী সুমনার কামরায় গিয়ে হাজির হলো।

'তোমার মুনীব তোমাকে কি ক্ষমা করে দিয়েছে?' মহিলা সুমনাকে জিজ্ঞেস করলো।

'বলতে পারবো না আমি'–সুমনা বললো–'তবে উনি মারু থেকে এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে স্বাভাবিক কোন কথা বলেননি। শুধু একবার বলেছিলেন, তুমি শুধু আমারই নয় আমাদের ফেরকার ভবিষ্যত ধ্বংস করে দিলে। উনাকে আমি উত্তর দিয়েছিলাম–আমাকে বাধ্য করা হয়েছে এজন্য। এই দেখুন'–একথা বলে সুমনা তার নড়বড়ে ফোলা ফোলা আঙ্গুলগুলো মহিলাকে দেখিয়ে বলে–'এই দেখুন অবস্থা। লোহার আংটা দিয়ে আমার হাতগুলো চেপে ধরা হয়। আমি যেন আমার আঙ্গুলগুলোর ফটফট আওয়াজ শুনছিলাম। যতই চিৎকার করছিলাম আমি, আমার আঙ্গুলে সেই আংটা ততই চেপে বসেছিলো। আমি প্রায় অচেতন হয়ে....

'থাক থাক, আর বলো না। আমি তোমার সেই ব্যথা যেন নিজের আঙ্গুলে টের পাচ্ছি। তোমার মা-বাবার কাছে চলে যাচ্ছো না কেন তুমি?'

'কোথায় তারা? কে আমার মা বাবা? মনে নেই কিছুই আমার। স্বপ্নের মতো কখনো কখনো দুঃসহ স্মৃতি ভেসে উঠে– এক কাফেলা যাচ্ছিলো। লুটেরা ডাকাতরা কাফেলার পুরুষ মহিলা সবাইকে মেরে ফেলে। আমার মা-বাবা কি ছিলো না ওখানে? আমাদের কয়েকজন মেয়েকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে আসে শাহদর........ না আমার মা-বাবার জন্য আমার এতটুকু আফসোস হয় না।'

'তুমি জানো না, তোমাকে এমন জিনিস পান করানো হয়েছে এবং খাওয়ানো হয়েছে, যার প্রভাবে তোমার মাথা থেকে রক্তের সব সম্পর্ক ধুয়ে মুছে গেছে। কিভাবে যে তোমাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তাও জানি আমি।

আচ্ছা তুমি এত আগ্রহ নিয়ে এসব কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? আমার জন্য বুঝি তোমার মায়া পড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ মায়া পড়ে গেছে। কেন জানো? আমার স্বামী ওদেরই একজন। আমার ছোট বোনকে সে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। অনেক সুন্দরী মেয়ে ওদের কব্জায় আছে। আমি তার জাল থেকে বেরোতে পারবো না। তবে তোমাকে বের করতে পারবো। কিন্তু তুমি এখন ওদের নয়, মৃত্যুর জালে জড়িয়ে গেছো।'

'মৃত্যুর জালে?'

'হ্যাঁ, তোমার জীবনের আর চার-পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে।'

'কিভাবে? কেন?'

'হাসান ইবনে সবা কাউকে ক্ষমা করে না। আমি জানি কি অবস্থায় তুমি মুখ খুলেছো। কিন্তু এরা বলে, মুখ না খুলে তোমার জান দিয়ে দেয়া উচিত ছিলো। হাসান বলে গেছে তোমাকে খালজান নিয়ে যেতে। হাসান সেখানে গিয়ে তোমার মত মেয়েদের সামনে তোমাকে বড় কষ্ট দিয়ে হত্যা করবে। যাতে সবাই সতর্ক হয়ে যায়।

সুমনার হাত পা ঠাণ্ডা হয় এলো।

'না, আমি এখনই মরতে চাই না'–সুমনা কাঁপতে কাঁপতে বললো।

'আমিও এটাই চাই। এমন ইচ্ছা না হলে তোমার কামরায় আসতাম না' আমি–মহিলাটি বললো।

'কিন্তু আমি কি করবো? কোথায় যাবো?'

'আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারবো।'

'কোন বিনিময়ের বদলে?'

'না, আমার বিনিময় এটাই হবে যে, তুমি বের হয়ে যাবে এবং জীবিত থাকবে। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। আর কাউকে এসব কথা বলো না। শুধু এতটুকু বলছি তোমাকে দেখলেই আমার বোনের কথা মনে পড়ে যায়। তুমি এখন নিষ্পাপ হয়ে গেছো। খোদা তোমাকে ভালো ঘরে সংসারী করুন।'

'আমাকে তো বের করে দেবে, কিন্তু যাবো কোথায় আমি?'

'রাত এখনো বেশি হয়নি। আমি তোমাকে রাস্তা বলে দেবো। এ রাস্তা শহরের আমীর আবু মুসলিম রাজীর ঘরে নিয়ে যাবে তোমাকে। সেখানে দরজায় আওয়াজ দেবে। দারোয়ান আটকালে বলবে, আমি মাজলুম মেয়ে। আমীরে শহরের কাছে ফরিয়াদী হয়ে এসেছি। তিনি খুবই ভালো মানুষ। তাকে সব সত্য কথা জানাবে। আমি যে তোমাকে এখান থেকে বের করেছি এটা জানাবে না। বলবে তুমি নিজে পালিয়ে এসেছো।'

'তারপর তিনি কি করবেন?'

'তিনি যা করবেন তোমার ভালোর জন্যই করবেন। হয়তো কোন ভালো মানুষের হাতে তুলে দেবে তোমাকে। ময়লা একটা চাদর দিচ্ছি তোমাকে। নিজেকে ঢেকে নেবে সেটা দিয়ে। কারো সামনে পড়লে ভয় পাবে না। দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাবে। তুমি সতর্ক মেয়ে। এমন প্রশিক্ষণই দেয়া হয়েছে তোমাকে। মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সুমনার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে সে মহিলাকে জড়িয়ে ধরলো। উঠো এবার।'

মহিলার স্বামী হাবেলীর আরেক কামরায় মদ আর হাসান ইবনে সবার তৈরি 'হাশীষের' নেশা করে তার যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমুচ্ছিলো অঘোরে। আরেক কামরা থেকে তার প্রথমা স্ত্রী সুমনাকে মলিন একটি কাপড়ে জড়িয়ে হাবেলীর দরজার দিকে নিয়ে যায়। আবু মুসলিমের বাড়ির রাস্তা সুমনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বলে,

কোন ভয় নেই। আবু মুসলিমকে মানুষ এত ভয় পায় যে, তার নাম বললে কেউ একাকী কোন মহিলার ওপর চোখ তুলে তাকায় না। মহিলা সুমনাকে হাবেলী থেকে বের করে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ে।

সুমনা নিরাপদেই আবু মুসলিমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে। দারোয়ান তাকে তার পরিচয় ও এখানে আসার কারণ জানতে চায়। সুমনা দৃঢ় গলায় বলে,

'এখনই আমাকে আমীরের কাছে নিয়ে চলো। দেরি করো না। না হয় পস্তাবে।'

'খুলে বলো ব্যাপার কি?' –দারোয়ান জিজ্ঞেস করলো।

'তাকে গিয়ে এতটুকু বলো, এক মাজলুম মেয়ে কোথাও থেকে পালিয়ে এসেছে। এটাও বলবে, সে গোপন এক তথ্যও নিয়ে এসেছে।'

আবু মুসলিমের কঠিন নির্দেশ ছিলো, দিনে রাতে তার কাছে যেকোন ফরিয়াদীই আসুক সঙ্গে সঙ্গে তাকে খবর দিতে হবে। সুমনাকে আবু মুসলিমের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আবু মুসলিম সুমনাকে তার ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমার কি হয়েছে বেটি! নির্ভয়ে বলো।'

'অনেক লম্বা কথা। মাননীয় আমীর কি এত লম্বা কথা শুনতে আন্তরিক হবেন?'–সুমনার গলায় আর্তি।

'কেন নয়? আমাদের দু'জনের মাঝে রয়েছে মহান আল্লাহ। প্রতিটি মাজলুমের ফরিয়াদ শোনা আমার ওপর ফরজ করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তুমি বলো বেটি! আমীরে শহর মাজলুমের কথা না শুনলে আল্লাহর কাছে সে কি জবাব দেবে?'

'কয়েক বছর আগের কথা। এক কাফেলা লুট করার সময় আমার মা-বাবা থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেয়। আমার ওপর কোন জুলুম করা হয়নি কোন রকম শারীরিক কষ্টও আমি পাইনি। জুলুম শুধু এতটুকুই যে, আমার মনেই রইলো না আমার মা-বাবা কে? অথচ অপহরণের সময় আমি কিশোরী। আমার অপহরণকারীরা এক শাহী পরিবেশে আমাকে লালন পালন করে। একটি বাচ্চাকে যেভাবে যত্ন করে বড় করে আমাকে সেভাবে যত্ন করা হয়নি। আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয় শয়তানী সব কর্মকাণ্ড। এমন নয় যে, আমার মুনীব আমার দেহ নিয়ে খেলতো। তবে দেহের লোভ-দেখিয়ে পুরুষকে কি করে বশীভূত করা যাবে এবং কি করে দেহকে পুরুষের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এ শিক্ষাই দেয় আমাকে আমার মুনীবরা।'

'সে কে? কোথায় থাকে সে?'

'হাসান ইবনে সবার নাম শুনেছেন আপনি? তার সঙ্গে আমি সুলতান মালিক শাহের অধীনে ছিলাম।'

'কিন্তু সে এখন কোথায়?'

'এটা আমি বলতে পারবো না। শুধু আমার ব্যাপারে সবকিছু বলতে পারবো আমি।'

সুমনা আবু মুসলিম রাজীকে শাহদর, খালজান এবং মারুর সব ঘটনা খুলে বললো। সে জানালো তার মতো আরো অনেক মেয়েকে ওরা এভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। হাসান ইবনে সবা কি করে তাকে মারুতে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করে তাও জানালো রাজীকে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আবু মুসলিম রাজী। কিছুক্ষণ পর সজাগ হয়ে সুমনাকে জিজ্ঞেস করলেন সে তার কাছে কি ধরনের সাহায্য চায়।

'সবার আগে আমি একটা আশ্রয় চাই। আপনি আশ্রয় না দিলে ওরা যে আমাকে মেরে ফেলবে।'

'তুমি আমার আশ্রয়ে এবং নিরাপত্তায় রয়েছো।'

'নিজের ব্যাপারে অনেক বড় শংকার মধ্যে রয়েছি আমি। আমার ভেতরে, আমার মস্তিষ্কে শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নেই। সত্য কথা হলো, আমি একটি বিষধর নাগিনী। ছোবল মারাই আমার স্বভাব। শেষমেষ না আবার আপনাকেই ছোবল মেরে বসি। আমি মানুষের রূপে ফিরে আসতে চাই। আমার ভেতর যেন মানবীয় কোন আবেগ-অনুভূতিই নেই। আমাকে মানুষ করে তোলার কোন ব্যবস্থা কি আপনি করতে পারবেন না?'

'কেন নয়? এখনই তোমাকে সুদর্শন সৎ কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেবো।'

'না-না। এমন কারো প্রতি জুলুম করবেন না। কারো স্ত্রী হওয়ার যোগ্য নই আমি এখন। স্ত্রী হবে অনুগত, বিনয়ী এবং কোমলমতি। কিন্তু প্রতারণা ছাড়া আমি কিছুই জানিনা। আমাকে আগে মানুষ করুন।'

'আজ রাতে তুমি বিশ্রাম করো। কাল তোমার একটা ব্যবস্থা হবে।'

সুমনাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো অন্দরমহলে।

★ ★ ★ ★

রায়-এর এক গ্রামে থাকেন নূরুল্লাহ। প্রায় চল্লিশ তার বয়স। সত্যের খুঁজে তিনি নানান ধর্ম, নানান ফেরকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশেষে আহলে সুন্নতের সান্নিধ্যে এসে তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। আল্লাহকে পাওয়ার একাগ্রতা, সত্যকে ধারণ করার একনিষ্ঠ সাধনা করতে গিয়ে এই চল্লিশেও তিনি অবিবাহিত। তার ধীর-প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব লোকদের মধ্যে তাকে করে তুলেছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এক আধ্যাত্মিক পুরুষে।

লোকেরা তার কাছে এসে ভীড় করে, তার কথা শুনলে তারা এক ধরনের মানসিক স্বস্তি পেয়ে ফিরে যেতে পারে। মাঝে মধ্যে তিনি আধ্যাত্ম বিষয়ে পাঠও দেন। তিনি তার কথায় বেশি জোর দেন এ বিষয়ের ওপর যে, নারীর সৌন্দর্য প্রায়ই ব্যবহার হয় ভয়ংকর অপকর্মে এবং নারী কখনো হয়ে উঠে পাপের উৎস হিসেবে।

আবু মুসলিম রাজী নুরুল্লাহর দারুণ ভক্ত। সুমনার কথা শুনে তার প্রথমেই নুরুল্লাহর কথা মনে পড়লো।

পরদিন সকালে আবু মুসলিম রাজী সুমনাকে ডাকলেন। সুমনা আবু মুসলিমের ঘরে ঢুকে দেখলো, কৃষ্ণকেশী মধ্যবয়সের কাছাকাছি উজ্জ্বল চেহারার এক লোক বসা। চোখে তার অন্তর্লোকি দৃষ্টি।

আবু মুসলিম ফজরের পর পরই লোক মাধ্যমে নুরুল্লাহকে নিয়ে আসেন। তিনি সুমনার আদ্যোপান্ত সব ঘটনা নুরুল্লাকে শোনান। তিনি যখন বলেন, এই মেয়েকে শুদ্ধ করে গড়তে হবে আপনাকেই, তখনই নুরুল্লাহ পেরেশান হয়ে গেলেন।

'আমি কি প্রায়ই এসে তাকে সবক দিয়ে যাবো'? – নুরুল্লাহ পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'না – আবু মুসলিম বললেন – 'এই মেয়েকে আপনার হাতে আমানতস্বরূপ ছেড়ে দিবো। মানুষের গুণাগুণ এর মধ্যে আপনি জাগিয়ে তুলুন।'

'আমার ব্যাপারে আপনি হয়তো জানেন না। আমি বিয়ে তো করিইনি, আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের ছায়ায়ও দাঁড়ায়নি। আপনিই এর দায়িত্ব নিন। আমি রোজ এসে ওকে সবক দিয়ে যাবো।'

'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এজন্যে যে, আপনি অনেক ধর্ম আর বর্ণের সংস্পর্শে নিজেকে প্রাজ্ঞ করে তুলেছেন। সত্যের সঠিক আবেদন বুঝেছেন এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছেন। বুঝি না কেন আপনি নারী অস্তিত্বকে ভয় পান। আপনি কি জানেন আরেকটি বাতেনী ফেরকা সংঘটিত হচ্ছে যারা তাদের ফেরকার প্রচার কাজে নারীদের ব্যবহার করছে। প্রশাসনিক পর্যায়ে আমি তো এর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেবোই। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ফেরকা থেকে যে সব মেয়েদের উদ্ধার করতে পারবো তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য আপনার মতো সাধক আলেমদের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেবো। আপনি এই মেয়ের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ করুন। একে সঙ্গে নিয়ে যান।'

এছিলো এক হাকিমের হুকুম। নুরুল্লাহ এর সামনে কিছুই বলতে পারলেন না। আবু মুসলিম সুমনাকে নুরুল্লার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বললেন।

'সেখানে তুমি অতিথি হয়ে থাকবে না' – আবু মুসলিম সুমনাকে বললেন – 'রাধবে বাড়বে, ঘর ঝাট দেবে, কাপড় ধুবে, গৃহস্থলির সব কাজই করবে। তুমি উনার স্রেফ নওকরনী হয়ে থাকবে। যখন তুমি নিজেই অনুভব করবে ইবলিসী অশুভতা দূর হয়ে গেছে তখন কারো সঙ্গে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করা হবে।

নুরুল্লাহ সুমনাকে নিয়ে চলে গেলেন। নুরুল্লাহ তার ওখানে নিয়ে গিয়ে সুমনার আদ্যোপান্ত আবার শুনলেন।

'নিজের মনকে মেরে ফেলো সুমনা!' – নুরুল্লাহ সুমনাকে বললেন।

'এটা কিভাবে সম্ভব?

'নিজেকে মাটিতে মিশিয়ে দাও। ভুলে যাও কখনো তুমি শাহজাদীর মতো ছিলে। এখানে আমি একটি ইবাদতের ঝুপড়ি (মসজিদ) বানিয়েছি। সেটা দেখে শুনে রেখো। ধ্যানমন রাখবে সবসময় আল্লাহর দিকে। মনের মধ্যে এটা গেঁথে নাও যে, এক দিন না এক দিন এই মাটিতেই মিশে যেতে হবে। মনের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা চিরতরে বিদায় করে দাও।'

এভাবে শুরু হলো নুরুল্লাহর কাছে সুমনার নতুন দীক্ষার জীবন। নুরুল্লাহর কাছে যখন পাঠ নিতে তার ভক্তরা আসতো সুমনা তখন কামরায় চলে যেতো। রাতে সুমনাকে নুরুল্লাহ শক্ত করে বলে দিতেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুবে। ফজর সময় হলে সুমনাকে জাগিয়ে নামায পড়াতেন।

ক্রমেই নুরুল্লাহ অনুভব করলেন মেয়েদের প্রতি তার যে অনীহা ছিলো তা কমে যাচ্ছে। সুমনাও লক্ষ্য করলো তার উস্তাদের হাবভাব মাঝে মধ্যে অন্যরকম হয়ে যায়। নুরুল্লাহও এজন্য ভাবিত নন।

একদিন দুপুর বেলা সুমনা কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার চোখ বুজে আসতে থাকে। সুমনা কোন ক্রমে তার কামরায় গিয়ে দরজা না ভিজিয়েই শুয়ে পড়ে। একটু পর বাইরে থেকে নুরুল্লাহ ফিরে আসলে প্রথমেই তার কামরার দিকে তার চোখ যায়। সুমনা চিত হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো। কপালের চুলগুলো লালাভ গালে তীর্যক হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। তার যৌবন তখন অনাবৃত।

নুরুল্লার একপা দহলিজে চলে গেলো। তিনি পা পিছিয়ে আনলেন। কিন্তু তার ভেতরে অন্য কে যেন জেগে উঠেছে। সেই জেগে উঠা শক্তি তার পা ঠেলে এক কদম সামনে গেলো। নুরুল্লার এবার পূর্ণ দেহ কামরার ভেতর। জেগে উঠা শক্তিকে নুরুল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন। তার পা আর এগুলো না।

সুমনা হয়তো স্বপ্ন দেখছিলো। তার দু'ঠোঁট মুক্তার ছড়ার মতো হেসে উঠলো। নুরুল্লার চোখ আটকে গেলো সেই হাসির দিকে। এবার রসে ভরা ডালিমের দানার মতো সুমনার দাঁতের এক অংশ ভেসে উঠলো নুরুল্লার চোখে। আবার সেই শক্তিটা তাকে চেপে ধরে দুই কদম সামনে নিয়ে গেলো। নুরুল্লাহ চোখ বন্ধ করে ফেলেন। তিনি আর কিছু দেখতে চান না। কিন্তু পিছু হঁটতে গিয়ে তার পা আর নড়াতে পারলেন না। যেন অসাড় হয়ে সেখানে গেঁথে গেছে রক্ত-মাংসের শক্ত পাগুলো।

'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে যে হযরত!' – নুরুল্লার কানে ভেসে এলো সুমনার ঘুম জড়ানো বিস্মিত গলা।

নুরুল্লাহ চমকে উঠে চোখ খুললেন। সুমনা ধড়মড় করে সোজা দাঁড়িয়ে গেলো। নুরুল্লার প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাবোধ সুমনাকে সব সময় সমাহিত করে রাখতো। এজন্য সুমনা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলতে লাগলো– 'কখন এসেছেন হযরত! কখন ঘুমিয়েছি টের পাইনি ..... আপনি নীরব কেন? আমার প্রতি কি ক্ষুব্ধ ....

'না মা!' – নুরুল্লাও ভাঙ্গা গলায় বললেন – 'তোমার কামরার দিকে চোখ পড়তেই তোমাকে দেখলাম .... না আমি কিছু মনে করিনি, ক্ষুব্ধও নই' – হঠাৎ ঘুরেই তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুই তিন দিন পর নুরুল্লার সামনে বসে সুমনা মাথা গুজিয়ে পাঠ নিচ্ছিলো। মাথার কাপড় তার নড়াচড়ার কারণে একটু সরে গেলো। তার রেশমী চুলের একাংশ অনাবৃত হয়ে গেলো। সুমনা লক্ষ্য করলো তার গুরু বলতে বলতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেছেন। সে চট করে চোখ তুলে দেখলো তার উস্তাদের চোখ তার মাথার দিকে ঝুলে আছে। দু'এক মুহূর্ত পর দু'জনের চোখাচোখি হলো। নুরুল্লাহ কেঁপে উঠলেন যেন।

রূপবতী নারীর প্রতি যে-কোন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি ভালোই পড়তে পারতো সুমনা। কিন্তু তার উস্তাদের এ দৃষ্টিকে সে মেনে নিতে পারছিলো না।

'সুমনা উঠো! আজ এতটুকুই থাক। এখন তুমি খাবার তৈরী করো' – নুরুল্লাহ হঠাৎ তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

নুরুল্লাহ নিজের ভেতর অচেনা এক ঝটকা অনুভব করছিলেন। সুমনার মনও স্থির ছিলো না। এমন মহান একটি চোখের এমন কম্পিত দৃষ্টির দৃশ্য তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলো না সে। সে নিজেকে এই বলে ভোলাতে চেষ্টা করলো যে এ তার ভুল ধারণা। তার নিজের মনের পাপ। সে এখনো সেই সুমনাই রয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ।

★ ★ ★ ★

সময় যেমন তীব্র স্রোতের মতো বয়ে চলে এর চেয়ে দ্রুত সুমনা তার মধ্যে এক পবিত্র–সজীব এক পরিবর্তন অনুভব করলো। সে টের পাচ্ছিলো অশুভ নোংরা এক জাল থেকে বেরিয়ে আসছে।

একদিন দুপুরে সুমনা একটু গড়াগড়ি করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ চোখ খুলে দেখলো, তার উস্তাদ তার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে সোজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সুমনার মনে হলো তার গালে ও চুলে কারো হাতের স্পর্শ লেগেছে। সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না, এ তার পবিত্র উস্তাদের হাত। সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে গেলো।

'আপনিই কি জাগিয়েছেন আমাকে?' – সুমনা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

নুরুল্লাহ বিব্রত গলায় এমন উত্তর দিলেন যার মধ্যে হাঁ না দুটোই ছিলো।

সুমনার হাসি মুছে গেলো। নুরুল্লাহ মাথা নিচু করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুমনা সেদিন খুব গম্ভীর হয়ে গেলো। নুরুল্লাও সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব রইলো। নীরব থাকা তার স্বভাব নয়।

আসরের সময় প্রতিদিনের মতো কিছু লোক নুরুল্লার পাঠ নিতে আসলো। নুরুল্লাহ শরীর ভালো নয় বলে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। তারপর আবার চুপচাপ।

এশার পর নুরুল্লাহ একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসতেই সুমনা তার সামনে গিয়ে বসলো।

'কি ব্যাপার? ঘুমুবে না আজ?' নুরুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'এখন নয়। আপনার কাছে একটু বসবো' – সুমনা বড় মোলায়েম গলায় বললো।

'তুমি দেখনি লোকদেরকে বিকালের পাঠ দিতে পারিনি আমি। মাথা ধরেছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমার কালকের কোন কথা তোমার বুঝে না আসলে জিজ্ঞেস করে চলে যাও।'

'হ্যাঁ মুরশিদ! একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করার আছে। আপনি কখনো একথা বলেননি। আমার মাথায় এসেছে।'

'জিজ্ঞেস করো' – নূরুল্লাহ সামান্য হেসে বললেন এবং পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে সরিয়ে রাখলেন।

'আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। দিন দিন আপনি কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন।'

'এটা আমার স্বভাব। কখনো কখনো আমি এমন চুপচাপ হয়ে যাই। আরো কিছু দিন এ অবস্থায় থাকবো আমি।'

'না আমার মুরশিদ! আমি দুঃসাহস দেখাতে পারবো না তবে অবশ্যই বলবো আপনার মুখের আওয়াজ আর অন্তরের আওয়াজ এক নয়। কি যেন বলছেন না আমাকে। আপনার মন আমাকে পছন্দ করছে না।'

'না না তা কেন হবে, যে যত্ন ও মমতা নিয়ে তুমি আমার সেবা করছো তা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'আমি অন্য কথা বলতে চাই মুরশিদ! আপনি আমার বয়স দেখুন। আমার পূর্ব শিক্ষা দেখুন। সুলতান মালিক শার এক বিশেষ উপদেষ্টা–যিনি বড় ঋষি পুরুষ ছিলেন – আমার সামনে মোমের মতো গলে গেছেন। আপনাকে আমি এসব এজন্যে বলছি, আমাকে যেন আপনি অনভিজ্ঞ অপরিণত মনে না করেন। আমি মানুষের মনের কথা তার চেহারা ও চোখের মধ্যে পড়ে নিতে পারি।

'সুমনা! তোমার মনের কথাটি কেন বলে দিচ্ছো না এখনই?'

'ভয় পাই আমার মুনীব!'

'ভয় পেয়ো না। আল্লাহ সত্যবাদীকে পছন্দ করেন।'

'কিন্তু আল্লাহর বান্দারা সত্য শুনতে আগ্রহী নয়। যদি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষী হন তাহলে আমি নির্ভয়ে কথা বলবো। অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করছি, আপনার সামনে বসে আপনার চোখে সেই ছায়া আমার চোখে পড়েছে যা সাধারণ মানুষের চোখে আমি দেখেছি। এ নিয়ে তিনবার আপনাকে দেখেছি, দিনে আমি শুয়ে আছি আর আপনি কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছেন। আমার চুলে মুখে আপনার হাতের স্পর্শও লেগেছে।'

'তোমার কি সেটা ভালো লাগেনি?'

'আপনার যদি ভালো লেগে থাকে আমি কিছুই বলবো না। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আমাকে আপনার কতটুকু ভালো লাগে?'

'সুমনা!' – নূরুল্লাহ সুমনার একটি হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন – 'আমার চোখে যা পড়েছো ঠিকই পড়েছো। তুমি ভুল পড়োনি। তিন চার দিন তোমাকে ঘুমন্ত দেখে শান্ত চোখে তোমাকে পরখ করেছি আমি।'

'কেন?'

'তোমাকে আমার জীবনসঙ্গী বানানোর জন্যে। তুমি কি আমাকে গ্রহণ করবে?'

'না আমার মুরশিদ!'

'চল্লিশ বছর বয়সে কি আমি বুড়ো হয়ে গেছি?'

'না পবিত্র হাস্তি? আপনার পবিত্র অস্তিত্বকে আমার অপবিত্র অস্তিত্ব দ্বারা কলুষিত করবো না। আপনাকে কখনো আমার স্বামী হিসেবে কল্পনাও করিনি। না, আমার মন কখনো আপনাকে স্বামীর মর্যাদায় গ্রহণ করবে না।'

'আমার মনে হয় তুমি আমার কাছ থেকে তোমার দাম শোধ করতে চাচ্ছো' – নুরুল্লা রাগত কণ্ঠে বললেন – 'তোমাকে আমি বিয়ের জন্য তৈরী করতে চাই। অসৎ উদ্দেশ্যে না।'

'আপনার ঐকান্তিক কষ্টে গড়া জিনিসটি পানিতে ধুয়ে ফেলবেন না। বাঁকা পথে ছিলাম আমি, আপনি সোজা পথে এনেছেন আমাকে। শুনেছিলাম আপনি দুনিয়াবিমুখ। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আমি কে? আপনি আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। নিজেকে আমি চিনতে পেরেছি। আমার চোখে আপনি তো ফেরেশতা।'

'যাও সুমনা! শুয়ে পড়ো গিয়ে। শুধু বলবো, আমি দুনিয়া ত্যাগ করিনি। দুনিয়া আমাকে ত্যাগ করেছিলো।' – নুরুল্লা ক্লান্ত গলায় বললেন,

সুমনা উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে গেলো। কিন্তু নুরুল্লাহ তাকে তার কামরায় পাঠিয়ে দিলো।

সুমনা চলে যাওয়ার পর নুরুল্লাহ চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। স্মৃতির দিগন্ত পেরিয়ে তিনি চলে গেলেন তার ছয় সাত বছরের কৈশোরে।

তার এমন কোন মহিলার কথা মনে পড়ে না যে অনাথ শিশু নুরুল্লাকে মমতার হাতে স্পর্শ করেছে। স্মৃতির আবছা পাতা উল্টিয়ে তিনি নিজেকে দেখতে পান, দজলার তীরে কোন ছোট একটি অবুঝ ছেলে কিশতী পরিষ্কার করছে বা পানি সেচছে বা কোন যাত্রীর মালপত্র মাথায় করে কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে। কাজের পর মালিকের চড় থাপ্পর সয়ে নিচ্ছে হাসি মুখে। এর বদলে সন্ধ্যার পর পাচ্ছে দুটি শুকনো রুটি।

ছেলেটি থাকতো একটি ঝুপড়িতে। ঝুপড়ি ওয়ালাদেরকে সে তার মা-বাবা মনে করতো। এরা নদীতে মাঝিগিরি করতো। তার দশ এগার বছর বয়সে তাকে জানানো হলো তার জন্ম এই ঝুপড়িতে নয়। এরা তার মা-বাবা নয়।

দশ এগার বছর আগের কথা এই কিশোরকে জানান হয়। সেদিন দজলা ছিলো চরম বিক্ষুব্ধ। যাত্রী ও মাল বোঝাই একটি বড় নৌকা তীরের দিকে আসছিলো। মাঝ নদীতে নৌকাটি পৌঁছতেই নদী ভয়ংকর আকার ধারণ করলো। পলকে নৌকাটি উল্টে গেলো। তীর থেকে মাঝি মাল্লারা হা হা করে তাদের নৌকা নদীতে ভাসিয়ে দিলো ডুবন্ত যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য। কিন্তু তীব্র স্রোতে খড়কুটার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো যাত্রীদের।

এক মাঝি নৌকা নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে দেখলো এক মহিলা তার দুধের শিশুটিকে এক হাতে ওপরে তুলে রেখে আরেক হাতে সাতরাতে চেষ্টা করছে। মাঝি নৌকা তার কাছে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাটিকে ধরে ফেললো। আরেক মাঝি মহিলার হাত

ধরে ফেললো। কিন্তু মহিলা ততক্ষণে অনেক নেতিয়ে পড়েছে। বাচ্চাকে বেঁচে যেতে দেখে নিজেকে স্রোতের মধ্যে সপে দিলো এবং পলকেই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সে মাঝি ও তার স্ত্রী বাচ্চাটি উট বকরীর দুধ পান করিয়ে লালন পালন করতে শুরু করলো। নাম রাখলো তার নুরুল্লাহ। তার চার পাঁচ বছর বয়স হতেই নৌকা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দিলো।

নুরুল্লাহ যখন তার পরিচয় জানতে পারলো তার অবস্থা এমন হলো যেন সে পথহারা অসহায় মুসাফির।

একদিন সে বড় আমীর লোকের এক যাত্রীর বোঝা মাথায় করে তাকে তার সওয়ারী উটে তুলে দিলো। লোকটি তাকে সাধলো এক দীনারের একটি মুদ্রা। নুরুল্লাহ দীনারে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিলো। লোকটি অভয় দিয়ে বললো এটা তোমার প্রাপ্য। নুরুল্লাহ বললো –

'এই দুনিয়ায় কারো কাছে আমার কোন প্রাপ্য নেই। দিনভর খেটে দু একটি রুটি আর রাতে এক ঝুপড়ির নিচে আশ্রয় পেয়ে যাই। ক্লান্তিতে হাত পা ধীর হয়ে এলেই চড় থাপ্পড় এসে পড়ে আমার গায়ে। এই দীনারটি নিয়ে ওদের ওখানে গেলেই ওরা কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে।'

'তোমার মা বাবা কোথায়?'

'ওই নদীর মাঝখানে।'

নুরুল্লাহ কয়েকদিন আগে যে কাহিনী শুনেছিলো তার সব শোনালো সেই আমীরকে। আমীর লোকটি তাকে বললো,

'আমার সঙ্গে যাবে? রুটি কাপড় তো পাবেই। থাকার জন্য যথেষ্ট ভালো ঘর এবং পয়সাও পাবে।'

নুরুল্লাহ এই প্রথম কাউকে দেখলো, যে তার সাথে আদরের সুরে কথা বলেছে। ভালো থাকা খাওয়া ও পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য মনে করেছে তাকে। নুরুল্লাহ লোকটির সঙ্গে চলে গেলো।

লোকটি তাকে নিয়ে গেলো নিশাপুর। নিশাপুরের বিরাট এক শাহী হাবেলীর মালিক। লোকটির দুই স্ত্রী। একজন প্রৌঢ়া আরেকজন সদ্য যুবতী। একজন পরিচারিকা আছে আগ থেকেই।

সারা দিনে নুরুল্লাহর কাজ করতে হয় খুবই সামান্য। তার কাছে মনে হলো জাহান্নাম থেকে বুঝি জান্নাতে থাকতে এসেছে। উপযুক্ত খাবার পেয়ে দশ বারো বছরের নুরুল্লাহ ষোল সতের বছরের সুঠাম দেহী যুবকের মতো হয়ে উঠলো। এক বছর কেটে গেলো।

একদিন তার মুনীব নিজের প্রথমপক্ষের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে শহরের বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলো। ঘরে রইলো তার দ্বিতীয় পক্ষের কম বয়সী স্ত্রী।

পরদিন রাতে নুরুল্লাহ তার কাজ সেরে তার কামরায় যাচ্ছিলো। খট করে তার মনে হলো হাবেলীর আঙ্গিনা দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকেছে। সে এগিয়ে গিয়ে দেখলো এক যুবক তার ছোট মালকিনের কামরায় ঢুকছে। নুরুল্লাহ পৌছতে পৌছতে দরজা

ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেলো। সে দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে ছোট মালকীন বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো,

'কি চাই?'

'ঘরের ভেতর কে?' – নুরুল্লাহ এর দায়িত্ব মনে করে জিজ্ঞেস করলো।

'তা জিজ্ঞেস করার তুমি কে?' – চোখে আগুন ঢেলে মালকিন বললো।

'আমি সাহেবের হুকুম পালন করছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন ঘরে তুমিই একমাত্র পুরুষ। খেয়াল রেখো ঘরের।'

মালকিন তার গালে সজোরে এক চড় মারলো। চড়ের আওয়াজে কামরার ভেতরের যুবকটি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো,

'এ আবার কে?'

'আমার পাহারাদার হয়ে এসেছে। চিরদিনের জন্য আমি তার মুখ বন্ধ করে দেবো আজ।'

যুবকটি নুরুল্লাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে ফেললো। তারপর তার শাহরগের উপর পা রেখে খঞ্জর বের করলো।

'আমি এর পেট ছিঁড়ে ফেলবো' – যুবক খঞ্জরের ফলা নুরুল্লার পেটে ধরে বললো– 'এরপর এর লাশ কুকুরের সামনে নিয়ে ফেলবো।'

'আজকের মতো ওকে মাফ করে দাও। সে মুখ বন্ধ রাখবে। কখনো মুখ খুললে তার দু'হাত পা কেটে জঙ্গলে রেখে আসবো। তারপর শিয়াল কুকুরে তাকে ছিঁড়ে খাবে' – মালকিন বললো।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত নুরুল্লাহ থর থর করে কাঁপছিলো, এমন ভয় সে কখনো পায়নি। যেকোন আঘাতকেই সে ভীষণ ভয় পেতো। মাথা নিচু করে সে ওখান থেকে চলে এলো তার কামরায়।

তার মুনীব ফেরার আগে সেই যুবক আরো দু'তিনবার তার মালকিনের ঘরে এলো। নুরুল্লাহ তার কামরায় নিঃশব্দে পড়ে থাকলো। মুনীব ফিরে আসার পরও তার মুখ খোলতে সাহস হলো না।

এক রাতে তার মুনীব তাকে শরাবখানায় শরাব আনতে পাঠালো। সে এলাকার মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। এশার নামাযের পর মসজিদের খতীব মুসল্লীদের পাঠ দিচ্ছিলো। নুরুল্লার কানে খতীবের এই শব্দগুলো পৌঁছলো – 'আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছেই সাহায্য চাই .... আমাদেরকে সেসব লোকের পথে পরিচালিত করো যাদের ওপর তোমার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথে নয় যাদের ওপর তোমার গজব নাযিল হয়েছে'। নুরুল্লাহ জানতো না এটা কুরআনের আয়াত। কুরআন কি তাই তো জানতো না সে। আয়াতটির কথা শুনে তার শুধু মনে হলো সেও সেসব লোকদের মধ্যে, যাদের ওপর খোদার গজব নাযিল হয়েছে।

নুরুল্লার দাঁড়ানোর সময় ছিলো না। মুনীব শরাবের অপেক্ষায় বসে আছে। তাড়াতাড়ি শরাব কিনে সে ফিরে গেলো। তার মাথায় শুধু ঘুরছিলো খতীবের কথাগুলো।

পরদিন রাতে ঘরের কাজ শেষ করে মসজিদের দরজায় গিয়ে আবার দাড়াঁলো নুরুল্লাহ। প্রতি দিনের মতো খতীব মুসল্লীদের কিছু বলছিলেন। দরজার দিকে খতীবের চোখ যেতেই তাকে ইশারায় ডাকলেন। সে ভয়ে ভয়ে খতীবের কাছে গিয়ে বসলো। খতীবের কথা শেষ হলে লোকেরা চলে গেলো। খতীব তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'দরজায় দাঁড়িয়ে কি করছিলে খোকা?'

'আপনার কথা শুনছিলাম। গতকাল বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে গেছি'—নুরুল্লাহ বললো।

'মুসলমান?'

'জানিনা। আমি এটাই জানতে চাই আমি কে? ধর্ম কি আমার? এক শেখের ঘরে এখন নওকরী করছি।'

খতীব নুরুল্লার কাছে তার মুনীব শেখের নাম শুনে বললেন, আরে এ লোক তো এক 'বাতিনী ফেরকার লোক। মুখে বলে সে মুসলমান, কিন্তু সবাই জানে সে বেদীন।'

'কাল থেকে তুমি আমার কাছে চলে এসো, এখন যাও' – খতীব মমতার সুরে বললেন নুরুল্লাকে।

পরদিন থেকে খতীবের কাছে নুরুল্লার আসা যাওয়া শুরু হলো। ধীরে ধীরে খতীবকে সে তার মা-বাবা ও মাঝি মাল্লাদের কাহিনী শোনালো। খতীব তাকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। নুরুল্লাও বেশ মনোযোগী হয়ে উঠলো। এক বছর পর সে জানালো, শেখের নওকরী ছেড়ে মসজিদের কোন কাজে নিয়োজিত হতে চায়। খতীব এ প্রস্তাবে দারুণ খুশী হলেন। তাকে মসজিদের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

নুরুল্লাহ খতীবের সংস্পর্শে রইলো দীর্ঘ পনের বছর। এসময়ের মধ্যে নুরুল্লাহ একজন পরিণত আলেম হিসেবে গড়ে উঠলো।

খতীব যখন বিয়ে করেন স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা ও আদর সোহাগে তার জীবনটা পূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু তিন বছরের মাথায় খতীবকে বেদনার সাগরে ভাসিয়ে তার স্ত্রী মারা যায়। খতীব তার স্ত্রীর স্মৃতি ভুলতে না পেরে আর কখনো বিয়ে করেননি। এই ঘটনা নুরুল্লার মনে খুব রেখাপাত করে। এভাবে শৈশব থেকেই তার ভেতরে নারীদের প্রতি এক ধরনের অনীহা জন্মাতে থাকে। তার ভেতরে গেঁথে যায় নারী-পাপের চিহ্ন হয়ে।

কয়েক বছর পর খতীব মারা যান। খতীবের মৃত্যু নুরুল্লাকে এতই বিচলিত করে যে, মসজিদ ছেড়ে নুরুল্লাহ চলে যায় জঙ্গলে। কোন সূত্রে খবর পেয়ে খতীবের ভক্তরা জঙ্গলে গিয়ে নুরুল্লার কাছে ভিড় জমাতে থাকে। নুরুল্লাও তাদেরকে না ফিরিয়ে পাঠ দিতে থাকে। লোক মুখে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে নুরুল্লার নাম।

এভাবেই আজকের নুরুল্লার কথা পৌঁছে আবু মুসলিম রাজীর কাছে। ধর্মীয় জ্ঞান ও আত্ম সাধনার সঙ্গে আবু মুসলিমের সম্পর্ক নাড়ীজাত। তিনি সেই প্রত্যন্ত জঙ্গলে গিয়ে নুরুল্লার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাকে দেখেই তিনি নিজের মধ্যে প্রশান্তি অনুভব করেন। এরপর আরেকদিন জঙ্গলে আলাদা সওয়ারী নিয়ে গিয়ে নুরুল্লাকে রায়-এ নিয়ে আসেন। শহরের পাশেই তাকে ছিমছাম একটি বাড়ি উপহার দেন। এখানে লোকেরা তার কাছে ছুটে আসতে থাকে।

★ ★ ★ ★

আজ আবু মুসলিমের উপহার দেয়া সেই বাড়িতে বসে আছেন নুরুল্লাহ। কিন্তু অপরিচিত কেউ তাকে এ মুহূর্তে দেখলে মানসিক রোগী ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। তার অতীত এবং সুমনার সঙ্গে আজকের ঘটনা তাকে বেহাল করে দিচ্ছিলো।

তিনি ভাবছিলেন, যে সুমনাকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে, নোংরা কলুষ থেকে পরিচ্ছন্ন–সজীব জীবনে নিয়ে এসেছেন তাকে আজ প্রত্যাখ্যানের শব্দ শুনিয়ে গেলো। তীব্রবেগে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটন্ত ঘোড়ার মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার অনাদরের কৈশোরকাল। যেখানে নারীর অস্তিত্ব তার জন্য ছিলো অভিশাপ। তিনি প্রচণ্ড পিপাসা অনুভব করলেন। চার দিকের বঞ্চনা-অতৃপ্তি কাঁটা হয়ে তার কণ্ঠনালীতে বিধে যাচ্ছিলো।

সেই কাঁটার আঘাত তার ভেতরে আগুনের ধাউ ধাউ শিখা জ্বালিয়ে দিলো। সেই শিখা যেন তার প্রজ্ঞাকেও তার জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তিকে অঙ্গার করে দিলো। নিজের কাছেই তিনি অপরিচিত হয়ে গেলেন।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেলেন সুমনার কামরার দিকে। সুমনার মন আজ বড় অস্থির ছিলো। দরজা বন্ধ না করে সামান্য ভেজিয়ে সুমনা শুয়ে পড়ে এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। নুরুল্লাহ ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সুমনার খাটে গিয়ে বসে পড়েন। কামরা পুরোপুরি অন্ধকার ছিলো না। বাইরে মশালের আবছা আলো ভেতরে আসছিলো। আধো আলো আধো অন্ধকারে সুমনার ঘুমন্ত অবস্থা বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছিলো।

নুরুল্লাহ নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না। তার কম্পিত হাত আস্তে আস্তে সুমনার দিকে বাড়তে থাকে। হঠাৎ আকাশে বজ্রপাত হয়। নুরুল্লাহ সন্ত্রস্ত হয়ে হাত পিছিয়ে নেন। যেন চুরির সময় ধরা পড়ে গেছে চোর। যখন বুঝলেন এটা মেঘের গর্জন সাহস ফিরে পেলেন আবার।

এবার সুমনার হাত ধরে ফেললেন। আবার আগের চেয়ে জোরে বজ্রপাত হলো। নুরুল্লাহ হাত না ছেড়ে আরো শক্ত করে ধরলেন। সুমনার চোখ খুলে গেলো এবং পর মুহূর্তেই উঠে বসে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো,

'আপনি? এখানে কেন?' – সুমনার ঘাবড়ে যাওয়া গলা।

'ভয় নেই সুমনা!' – নুরুল্লাহ সুমনার হাত না ছেড়েই বললেন – 'আজ কেমন এক তৃষ্ণা আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। এমন কখনো আমি অনুভব করিনি।'

সুমনা ভয় পেয়ে বসা অবস্থাতেই পিছিয়ে গেলো। নুরুল্লাহ সুমনার আরেকটি হাত ধরে আলতো হাতে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এলেন। অসহায় কণ্ঠে বললেন–

'আমার নিজের মার স্নেহ, বোনের ভালোবাসা, কোন মেয়ের অনুরাগ কখনো পাইনি আমি। কোন মেয়ের গায়ে কখনো আমি হাত লাগাইনি। কিন্তু তুমি যখন কাছে

এলে তখন এই রহস্যের পর্দা উন্মোচিত হলো যে, যে নারীকে আমি ঘৃণার প্রতীক জেনেছি সেই নারীর মধ্যেই রয়েছে ভালোবাসার ঝর্ণাধারা। তুমিই সেই উচ্ছ্বাসিত ঝর্ণা। আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না' সুমনা! – সুমনাকে জোরে তার দিকে টানতে লাগলেন।

'না মুরশিদ! আমি অসৎ থেকে সৎ পথে এসেছি। আপনিই এনেছেন এই পথে। তাই যে পথে থেকে আমি এসেছি সে পথে আপনি যাবেন না। আমাকে পথহারা করবেন না।'

'আমার কথা বুঝার চেষ্টা করো সুমনা!' নুরুল্লাহ নেশাতুর গলায় বললেন– 'সামান্য সময়ের জন্য আমাকে হারিয়ে যেতে দাও। আমাকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ো না।'

একাধারে কয়েকবার আকাশ গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। ঝড়ের উন্মাদনা দরজার পাল্লা দুটি নিয়ে যেন নৃত্য শুরু করে দিলো। কান ফাটানো আওয়াজে পাল্লা দুটি একবার বন্ধ হচ্ছে আবার খুলে যাচ্ছে। বাইরের মশালটিও নিভে গিয়ে চারধার করে তুললো নিকষ অন্ধকার।

নুরুল্লাহ সুমনাকে আরেকবার নিজের দিকে টেনে আনলেন। সুমনা লাফিয়ে পিছু হটলো এবং প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নুরুল্লার চেহারায় চড় কষালো।

'মানুষকে তোমরা যে শয়তানের ভয় দেখাও নিজেরাই তোমরা সে শয়তান' – সুমনা কাঁপতে কাঁপতে বললো।

সুমনা এবার এক ঝটকায় পালঙ্কের এক কোণে লাফিয়ে চলে গেলো। সে ভেবেছিলো নুরুল্লাহ এবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। নুরুল্লার পায়ের আওয়াজ পেলো সুমনা। কিন্তু সেটা সুমনার দিকে না গিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিলো। সুমনা সেখানেই ভীত পায়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে টের পেলো নুরুল্লাহ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সুমনা এবার আশংকা করলো, নুরুল্লাহ বাইরে দড়ি আনতে গেছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে ছুরি দিয়ে খুন করবে এবার তাকে। সুমনা পালঙ্কের নিচে লুকিয়ে গেলো।

প্রচণ্ড ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টিতে বাইরের আঙ্গিনায় দুনিয়া ভেঙ্গে পড়ছিলো যেন।

'আমাকে শান্তি দাও মাবুদ। পরিপূর্ণ মানুষ বানাও আমাকে' – ঝড় বৃষ্টির শো শো আওয়াজের মধ্যে সুমনার কানে নুরুল্লার এই গর্জন পৌছলো। সুমনা খাটের নিচে আরো চেপে গেলো।

অদৃশ্য এক উন্মত্ততা নুরুল্লাকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। মেঘের গুড়ুম গুড়ুম শব্দের ভেতরও শহরবাসী এই উঁচু আয়াজ শুনতে পেলো – 'আমাকে শান্তি দাও, আমি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি ..... ও আমার মাবুদ।' .... ঝড়কে বিনাশী করে দাও। সব অস্থিরতা দূর করে দাও' ....

লোকেরা অনেক্ষণ এই শব্দ শুনতে পেলো। তারপর ধীরে ধীরে ঝড়ের শো শো আওয়াজের মধ্যে এই আর্তনাদ মিলিয়ে গেলো। মানুষ এই ভেবে ভয় পেলো যে, কোন অতৃপ্ত আত্মা বুঝি আর্তনাদ করছে।

সে যেন নুরুল্লাহ নয়। নুরুল্লাহর দেহ। 'শান্তি দাও শান্তি দাও' বলতে বলতে সেই দেহ দুই বাহু ছড়িয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো। জঙ্গলের এক পাশে একটি ছোট খাল ছিলো। কিন্তু আজকের বৃষ্টির ঢলে সেটি বিক্ষুব্ধ নদীর আকার ধারণ করেছে। নুরুল্লার দেহ সেদিকে এগিয়ে গেলো।

হঠাৎ একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে নুরুল্লার মাথার ওপর পড়লো। নুরুল্লা আগেই তো ঘোরের মধ্যে ছিলো। কোথায় যাচ্ছিলেন সেই বোধ ছিলো না। এবার ভাঙ্গা ডালের আঘাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন একেবারে নতুন ফেঁপে উঠা নদীর তীরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড স্রোত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

ঝড় থেমে গেলো ভোরেই। সকালে ভয়ে ভয়ে সুমনা খাটের নিচ থেকে বের হলো। বাইরে বের হয়ে কোথাও নুরুল্লার অস্তিত্ব টের পেলো না। ভেতরে তার ধক করে উঠলো। সেখান থেকেই ছুটতে শুরু করলো এবং আবু মুসলিমের বাড়িতে গিয়ে থামলো।

আবু মুসলিমকে রাতের সব কথা শোনালো।

'সব মানুষের অস্তিত্বেই শয়তান বসবাস করে' –আবু মুসলিম রাজী সব কথা শুনে সুমনাকে বললেন – 'একটি সুন্দরী মেয়ে এত ক্ষমতাবান হয় যে, যে কারো ঈমানকে বরবাদ করে তার ভেতরের শয়তানকে জাগিয়ে তুলতে পারে সে। কিন্তু যার ঈমান দৃঢ় শয়তান তার কিছুই করতে পারে না .... এখন তোমার ইচ্ছা কি?'

'আপনার আশ্রয়ে এসেছিলাম আমি, আপনার আশ্রয়েই থাকতে চাই। আমার আরেকটা ইচ্ছা আছে। আপনি একটু আগে বলেছেন, একটি সুন্দরী মেয়ে যে কারো ঈমান নষ্ট করে তার ভেতরের শয়তানকে উস্কে দিতে পারে। হাসান ইবনে সবাও লোকদেরকে, এবং দেশের আমীর উমারা ওযীর নাযীরকে বশীভূত করার জন্য নারীদের এই শক্তিই ব্যবহার করে। এই শক্তিকে নষ্ট করার জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই। এজন্য আমি আপনার ও প্রশাসনের সহযোগিতা চাই। সুমনা কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললো।

সেদিনই শহরে একথা চাউর হয়ে গেলো যে, কাল রাতের ঝড়ে বদআত্মা বেরিয়ে ছিলো আর– 'শান্তি দাও শান্তি দাও' – বলে আর্তনাদ করে শহরময় বেড়িয়েছিলো। একথা আমীরে শহর আবু মুসলিম পর্যন্ত পৌঁছলে সুমনাও তা শোনে। আবু মুসলিমকে সে জানায় নুরুল্লাহ বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে এসব বলছিলো। তারপর একথাই বলতে বলতে তার আওয়াজ মিলিয়ে যায়।

তিন চার দিন পর শহর থেকে কিছু দূরে নুরুল্লার লাশ পাওয়া গেলো।

★ ★ ★ ★

হাসান ইবনে সবা রায় থেকে পালিয়ে উট সওয়ারের ছদ্মবেশে খালজানের পথ ধরেছিলো। খালজানের পথ প্রায় অর্ধেক অতিক্রম করার পর তার পেছন থেকে দ্রুত বেগে এক ঘোড়-সওয়ারকে আসতে দেখলো সে, ঘোড়-সওয়ারকে হাসান চিনলো, এ তাদেরই লোক।

'কি খবর এনেছো' – হাসান তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'এখন আপনি খালজান যাবেন না' – ঘোড়সাওয়ার বললো– মনে হয় সেলজুকিরা সন্ধিহান হয়ে পড়েছে যে, আপনি খালজান যাচ্ছেন। তারা আপনাকে ধরতে আসবেই। আপনি অন্য কোন দিকে রুখ করুন।'

হাসান কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর বললো,

'আমি ইস্পাহান যাচ্ছি, তুমি খালজান গিয়ে আহমদ ইবনে গুতাশকে বলবে আমি ইস্পাহান যাচ্ছি। সেখানে আমার আবুল ফজল নামে পুরনো এক বন্ধু আছে। ইমাম মুওয়াফিকের কাছে আমরা এক সঙ্গে পড়তাম। এখন সে শহরের অন্যতম রঈস। সে আমাকে আশ্রয়ই দেবে না শুধু সাহায্যও করবে। ইবনে গুতাশকে বলবে কিছু দিন পর খালজান পৌঁছে যাবো আমি। শহরে সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে তার পিছু লোক লাগাতে বলবে। সেলজুকি হলে তাকে জীবিত ছাড়বে না।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। এখানে আমাদের আর দাঁড়ানো ঠিক হবে না।'

ঘোড়-সওয়ার রওয়ানা দিলো খালজানের দিকে। আর হাসান ইস্পাহানের দিকে।

ইস্পাহানে পৌঁছে আবুল ফজলের বাড়ি পৌঁছে হাসান দারোয়ানকে বললো আবুল ফজলকে খবর দিতে। দারোয়ান ভেতরে গিয়ে জানালো এক উট-সওয়ার এসেছে। আবুল ফজল দারোয়ানকে নির্দেশ দিলো, কেন এসেছে জিজ্ঞেস করে এসো। আমি কোন উট-সওয়ারকে ডাকিনি। দারোয়ান হাসানকে একথা জানালে হাসান বললো, তোমার মুনীবকে গিয়ে বলো, উট-সওয়ার আপনার সঙ্গে সাক্ষাত না করে যাবে না।

একটু পর দারোয়ান হাসানকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মামুলি এক কামরায় বসালো। একে তো সে উট-সওয়ারের পোশাকে তারপর আবার দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি চেহারায় চেপে বসেছিলো।

আবুল ফজল কামরায় ঢুকে হাসানকে চিনতে পারলো না। হাসান হো হো করে হেসে উঠলো। এবার আবুল ফজল তাকে চিনতে পারলো এবং তাকে জড়িয়ে ধরে তার অভিজাত মেহমানখানায় নিয়ে গেলো।

ওরা কিছুক্ষণ পুরনো দিনের কথা স্মৃতি চারণ করলো। তারপর আবুল ফজল জানতে চাইলো সে কোত্থেকে এসেছে। হাসান বললো,

'মনে করো আমি আকাশ থেকে পড়েছি। মারু থেকে এসেছি। সুলতান মালিক শাহ আমাকে তার বিশেষ উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন। তুমি তো জানো আমাদের বাল্যবন্ধু

নেযামুলমুলক এখন উযীরে আজম। সুলতান আমাকে উযীরে আজম বানিয়ে ফেলে ছিলেন। কিন্তু নেযামুল মুলক সুলতানকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। সুলতান আমাকে বরখাস্ত করে শহর থেকে বের করে দেয়।'

আবুল ফজল হাসানকে জিজ্ঞেস করলো সে এখন কি করতে চায়। হাসান বললো, 'আমি সেলজুকি সালতানাতকে ধ্বংস করে দিতে চাই। তোমার মতো বন্ধুর সাহায্য পেলে ঐ তুর্কী মালিকশাহ ও নেযামুল মুলককে আগে শেষ করবো।'

আবুল ফজল নীরব রইলো। এ সময় খানসামা দস্তরখান বিছালো। আবুল ফজল আলমিরা থেকে একটা বোতল বের করে তা থেকে সামান্য কিছু একটা পাত্রে ঢেলে হাসানকে দিয়ে বললো, 'এটা পান করে নাও'।

'এটা কি?' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'এটা মেধাশক্তি বাড়ানোর এক ঔষধ। এত দীর্ঘ পথ সফর করে তোমার মাথা অসাড় হয়ে গেছে। না হয় তুমি এমন উদ্ভট উদ্ভট কথা বলতে না। তুমি মালিকশাহ ও তার ওযীরে আজমকে শেষ করে দেয়ার কথা বলছো। অথচ তুমি জানো, সেলজুকিরা না এলে ইসলামের মজবুত সৌধটি চিরতরে মিশে যেতো। মুসলমানরা এখন ৭২ ফেরকায় ভাগ হয়ে গেছে। মুসলমানদের ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে। সেলজুকিরা এসে ইসলামের ভিত্তিকে মজবুত করে দিয়েছিলো। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সবসময়ই উম্মতের এক সুশীল জামাত থাকতে হবে। তারা সেই জামাতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মুসলমান হয়েও তুমি যখন সেলজুকিদের ধ্বংস চাচ্ছো তাহলে বলতেই হয় কোন কারণে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। এই ঔষধটুকু খেয়ে নাও। দেমাগ তরতাজা হয়ে যাবে।'

হাসান যে বন্ধুর কাছে সাহায্য ও আশ্রয়ের জন্য এলো সেই তাকে পাগল ধরে নিচ্ছে। সবচেয়ে বড় হতাশার ব্যাপার হলো তার বন্ধুটি সেলজুকিদের সমর্থকই নয়, ভীষণ অনুগত। হায় হায় আবুল ফজল যদি তার আসল রূপ ও গ্রেফতারীর পরওয়ানা থেকে তার পালানোর ঘটনা জানতে পারে তাহলে তো তাকে গ্রেফতার করিয়ে দেবে।

আবুল ফজলের হাত থেকে ঔষধটুকু খেয়ে নিলো হাসান। কথা আর না বাড়িয়ে খাবার খেলো। তারপর কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

ভোর থাকতেই জেগে উঠে আবুল ফজলের কাছে জরুরী কাজের বাহানা দিয়ে বিদায় নিয়ে নিলো হাসান। সে আসলে পালানোর মতলবে ছিলো। আবুল ফজলের ঘর থেকে সে খালজানের পথ ধরলো। সেখানে গ্রেফতারের শংকা থাকলেও আহমদ ইবনে গুত্তাশের সঙ্গে মিলে জরুরী ভিত্তিতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাচ্ছিলো।

দু'তিন দিন পথ চলে সে খালজান পৌঁছলো। নিখুঁত ছদ্মবেশের কারণে আহমদ ইবনে গুত্তাশও তাকে চিনতে পারলো না। আহমদকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলো তার গ্রেফতারের বিপদ এখনো আছে না কেটে গেছে। তারপর সুমনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো।

তাকে জানানো হলো সুমনা আসেনি, সেখান থেকে ফেরার হয়ে গেছে সে। হাসান চরম ক্রুদ্ধ হয়ে বললো,

'তাহলে তো তাকে হত্যা করা জরুরী। আমাদের জন্য সে এখন আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সেলজুকিদের সাথে হাত মিশালে আমাদের সব খেল ফাঁস করে দেবে।'

'এখান থেকে বের হওয়ার তোমার চমৎকার একটি সুযোগ এসেছে' — আহমদ বললো— 'মিসরের দু'জন আলেম এসেছে। ওরা আমাদেরকে ইসমাঈলি বলে জানে। এজন্যই আমাদের মেহমান হয়েছে। ওরা এদের ফেরকার তাবলিগের জন্য এসেছে। ওরা আমাকে বলেছে, এমন বাকপটু ও চতুর লোক দরকার ওদের, যে ইসমাঈলি ফেরকার তাবলিগ করে মানুষকে এই ফেরকার দিকে ভেড়াবে।'

'এতো আমার আগেরই পরিকল্পনা যে, মিসর গিয়ে সেখানকার প্রশাসনকে সেলজুকিদের ওপর হামলা চালাতে প্ররোচিত করবো এবং আশ্বাস দেবো, এখানে থেকে আমরা লোকবল ও অন্যান্য সহযোগিতা দেবো। আমাদের প্রথম শিকার সেলজুকি সালতানাত। এটা খতম করার পথ যুগম হলে যারা এর দখলে আসবে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবো আমরা।'

হাসান মিসরী দুই মুবাল্লিগকে তার কথার জাদু দিয়ে ভজিয়ে নিলো। তাদেরকে বললো, এই পরিস্থিতে এখানে প্রচার কাজ না চালিয়ে মিসরের কাজ আগে সেরে নেয়াই উত্তম। সে তাদেরকে এমন যুক্তি দেখালো যে, ওরা দু'জনেই তাকে সমর্থন করলো এবং মিসর যাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করে দিলো। দুই সঙ্গী নিয়ে হাসান মিসর রওয়ানা হয়ে গেলো।

★ ★ ★ ★

দুই মাস সফরের পর হাসান মিসর পৌছলো। সে প্রথমে মিসরের প্রশাসনের লোকদেরকে তার দিকে আকর্ষণ করলো। সে ওদেরকে বুঝালো সে অনেক বড় আলেম এবং দেশের মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য লোক। সে গায়েব সম্পর্কে জানে এবং সব ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারে।

উবাইদীরাও কম চতুর নয়। একজন অপরিচিত লোকের এতগুলো গুণের কথা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবে এত বোকা নয় ওরা। তবে ওরা এমনভাব দেখালো যে হাসানের প্রতি দারুণ মুগ্ধ। আবার গোপনে তার বিরুদ্ধে চরও লাগিয়ে দিলো।

দারুণ সুন্দরী এক মেয়েও গুপ্তচর বাহিনীতে ছিলো। সে হাসানের সঙ্গে এমন গদগদে ভাব দেখালো যেন এক দেখাতেই সে হাসানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। হাসান বুঝলো না, তার কৌশলই এখন তার ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

উবাইদীদের সামনে সে এমন অভিনয় করলো যেন আকাশ মেলে এক ফেরেশতা মিসরে অবতীর্ণ হয়েছে। সে গোপনে তার দল বানাতে শুরু করলো এবং সেই

মেয়েকেও তার স্বার্থে ব্যবহার করলো। এর সঙ্গে আবার প্রশাসনকে সে পরামর্শ দিতে শুরু করলো, সেলজুকি সালতানাত দখল করতে যেন চেষ্টা চালায়। সে ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতে থাকে তারা এতে কামিয়াব হবেই।

উবাইদী প্রশাসন এটাই দেখতে চাচ্ছিলো যে, এ লোক আসলে এখানে কি করতে এসেছে। যে ইসমাঈলী দুই মুবাল্লিগ তাকে মিসর পাঠিয়েছিলো উবাইদী প্রশাসনের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না। এরাও মিসর ফিরে এলো এবং হাসানকে ডেকে পাঠালো। হাসান তাদের সাক্ষাতে চলে গেলো। উবায়দী গুপ্তচররা এবার হাসানের আসল পরিচয় পেয়ে গেলো এবং প্রশাসনকে জানালো এই লোকের গতিবিধি শুধু সন্দেহজনকই নয় বিপজ্জনকও।

হাসানের আসল পরিচয় ভালো করে ফাঁস করলো তার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া সেই মেয়েটি। প্রশাসনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট এবং এটাই তারা জানতে চাচ্ছিলো।

হাসান সেদিন ঐ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বদ্ধ এক ঘরে শরাব পান করছিলো। আচমকা কামরার দরজা খুলে গেলো বিকট আওয়াজে এবং ধুপধাপ করে হাতে হাতকড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকলো কয়েকজন সৈনিক। কোন কথা না বলে হাসানের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেলো। হাসান কিছু বুঝে উঠার আগেই তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে শহরের কয়েদখানায় নিয়ে গেলো। এরপর তাকে বলা হলো, মিসরের সুলতানের হুকুমে কয়েদখানায় তাকে বন্দি করা হচ্ছে। তাকে ছাড়া হবে কি-না বা ছাড়া হলেও কবে ছাড়া হবে তা বলা যাচ্ছে না।

হাসান কিছুই বললো না। শুধু কয়েদখানার দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, 'শুনে নাও তোমরা! তোমাদের ধ্বংসের সময় এসে গেছে উবায়দীরা!'

যারা হাসানের একথা শুনলো তাদের মধ্যে কেমন ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। হুকুমত পর্যন্তও পৌঁছলো এ খবর।

ঐ যে বলা হয় শয়তানকে আল্লাহ বড় বড় সুযোগ দেন, হাসান ইবনে সবার বেলায় তা পুরোপুরি সত্য হলো। যে কয়েদখানায় তাকে বন্দি করা হয় তার নাম 'দিময়াত দুর্গ'। দুর্গটি অনেক প্রাচীন এবং ভীষণ নড়বড়ে। যে রাতে হাসানকে সেই কয়েদখানায় বন্দি করা হয় সে রাতে দুর্গের সবচেয়ে বড় বুরুজটি ভেঙ্গে পড়লো। কেউ দেখলো না কি কারণে বুরুজটি ভেঙ্গেছে। সবার মধ্যে প্রচণ্ড ভীতি ছড়িয়ে পড়লো যে, এটা হাসান ইবনে সবার বদ দুআর পরিণাম। মিসরের সুলতানের কানে এটা পৌঁছতেই হুকুম দিলেন, ঐ লোককে মিসর থেকে বের করে দাও।

মিসর সমুদ্র বন্দরে হাসান একটি জাহাজ পেয়ে গেলো। যদিও এর সমস্ত যাত্রী খ্রিষ্টান। তবুও তাকে ও তার সঙ্গী দু'জনকে জাহাজে নিলো।

জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে পৌঁছলো প্রচণ্ড সামুদ্রিক তুফান শুরু হয়ে গেলো। জাহাজের পাল মাস্তুল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। এক দিক দিয়ে জাহাজে ঢুকতে লাগলো পানি। যে কোন মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো।

শুরু হয়ে গেলো জাহাজের ভেতর হুড়োহুড়ি। প্রত্যেকেই জাহাজের পানি সেচতে লাগলো। অনেকে হাহাকার করে প্রার্থনা করতে শুরু করলো। একমাত্র হাসান ইবনে সবা ব্যতিক্রম। এক কোণে নিশ্চিন্ত বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। জাহাজের কাপ্তান তাকে দেখে তেড়ে এলো।

'এই তুমি কে? আমরা সবাই মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে বসে হা হা করছি আর বসে বসে তুমি হাসছো। উঠো, পানি সেচো' – কাপ্তান চরম রেগে গিয়ে বললো।

'ভয় পাওয়ার কিছু হয়নি। ঝড় থেমে যাবে। জাহাজ বা যাত্রী কারোই কিছু হবে না। খোদা আমাকে বলেছেন' – হাসান শান্ত কণ্ঠে বললো।

পাগল যাত্রীর পাল্লায় পড়েছে ভেবে কাপ্তান হাসানের কাছ থেকে কেটে পড়লো।

একটু পরই ঝড় থেমে গেলো। সত্যিই জাহাজ-যাত্রীদের কারোই কিছু হলো না। জাহাজ শান্তভাবে চলতে লাগলো।

'তুমি কে ভাই?' – কাপ্তান তার হাতের কাজ শেষ করে দৌড়ে এসে হাসানকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি ঝড় আনতেও পারি থামাতেও পারি।'

'জাহাজ চালাতে চালাতে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। এমন কঠিন তুফানে কখনো কোন জাহাজকে আস্ত ফিরে যেতে দেখিনি। অথচ কত বড় মুজিযা– আমার জাহাজ আজ অক্ষত রইলো।

'এটা আমার কিছু আমলের মুজিযা।'

'তোমাকে ভাই কিছু একটা দিতে চাই আমি। তুমি কি নেবে বলো?'

'যদি সত্যিই আমাকে কিছু দিতে চাও জাহাজের রুখ পরিবর্তন করে আমাকে 'হলব' পৌঁছে দাও। আমি জাহাজে থাকলে হয়তো আরেকবার তুফান শুরু হবে।

কাপ্তান এমনিতেই আগের ঝড়ের তান্ডবে ভীত ছিলো। এবার আরো ভয় পেয়ে গেলো আরেক বার ঝড়ের সম্ভাবনা শুনে। কাপ্তান জাহাজ ঘুরিয়ে হাসান ও তার দুই সঙ্গীকে হলব পৌঁছে দিলো।

'আচ্ছা! তুমি জানলে কিভাবে ঝড়ে জাহাজের কিছুই হবে না' – জাহাজ থেকে নেমে তার এক সঙ্গী তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'আরে বেকুব! মাথা খাটাও। জাহাজ ডুবে গেলে কে বেঁচে থাকতো আমার কাছে কৈফিয়ত তলবের জন্য? আমি ভেবে দেখলাম ঝড় থেমে গেলে সবার মধ্যে আমার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে এবং কাপ্তানকে বাধ্য করতে পারবো আমাকে সিরিয়ার সমুদ্র বন্দর হলব পৌঁছে দাও, এমনই তো হলো' – হাসান বললো।

মূল হলবে সিরিয়ার কোন সমুদ্র বন্দর ছিলো না। হলব থেকে ৬০ মাইল দূরে ইফতাকিয়ায় হলবের বন্দর। জাহাজ নোঙ্গর করে কাপ্তান হাসান ও তার সঙ্গী এবং আরো কয়েকজন যাত্রীকে নামিয়ে দিলো হলবে।

১৫

হলবে হাসান ও তার দুই সঙ্গীর সঙ্গে আরো সাত আটজন যাত্রী নামলো। এদের মধ্যে নেকাবে ঢাকা একটি প্রায় যুবতী মহিলাও নামলো। জাহাজের যেখানে শেষ গন্তব্য ছিলো ওদের সেখানেই নামতে হতো এবং সেখান থেকে সড়ক পথে সিরিয়ায় আসতে হতো ওদেরকে। জাহাজে হাসান ইবনে সবা থাকায় তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো এবং সড়ক পথের দীর্ঘ সফর থেকে বেঁচে গেলো।

হাসানের চোখ গেলো সেই মহিলার দিকে। পর্দার আড়াল থেকেও তার শুভ্র গোলাপ রাঙা চেহারা, হরিণ চঞ্চল চোখ, এক হারা ঋজু শরীরের অভিজাত ভঙ্গি দেখে হাসান নিশ্চিত হলো এ নিশ্চয় কোন বড় ব্যবসায়ী বা আমীর খান্দানের মেয়ে। এরা সবাই মিসরের সমুদ্র বন্দর সিকান্দারিয়া থেকে হলব পর্যন্ত হাসানের সহযাত্রী ছিলো। ঝড়ের তান্ডবে যখন জাহাজ ভীষণভাবে দুলছিলো হাসানকে তখন শান্ত ভঙ্গিতে হাসি মুখে বসে থাকতে দেখে ওরা তাকে প্রথমে পাগল ভেবেছিলো। পরে ঝড় থেমে গেলে যখন শুনলো ঝড় হাসান ইবনে সবার কারণে থেমেছে তখন তারা পরম শ্রদ্ধায় রুকুর মতো ঝুঁকে তাকে সালাম করলো আর হাতে চুমুও খেলো।

এই সাত আটজন তো হাসানের মুরিদ হয়ে গেলো। কারণ হাসানের কারণে বেশি উপকার তো পেয়েছে ওরাই। সড়ক পথের দীর্ঘ সফর থেকে বেঁচে গেছে।

হাসান ও তার দুই সঙ্গী হলবের এক সরাইখানায় গিয়ে উঠলো। হাসান ও তার দুই সঙ্গী পৃথক কামরা নিলো আর অন্য লোকেরা বড় একটি কামরায় উঠলো। সেই মেয়ে ও তার স্বামীও নিলো আলাদা কামরা।

হাসানরা গোসল করে এবং কাপড় চোপড় পরে তৈরী হয়ে খাবারের খুঁজে যাবে এমন সময় দরজায় টুকা পড়লো। দরজা খুলে দেখা গেলো সরাইয়ের মালিক দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনার অতিথি সেবার সুযোগ পেয়ে আমি কি সৌভাগ্যবান হয়নি?' – সরাইয়ের মালিক বললো – 'আমি সরাইয়ের মালিক আবু মুখতার সাকাফী। এইমাত্র আপনার সহযাত্রীরা জাহাজের সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনালো। খোদার কসম! আপনি জাহাজে না থাকলে এরা আমাকে সেই ঝড়ের কাহিনী শোনাতে এখানে আসতো না।'

'আরে সাকাফী! বসছো না কেন? কিন্তু এক সাকাফী তার দেশ ছেড়ে এত দূর চলে এলো কেন' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'আমার পূর্বপুরুষরা নাকি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরাগভাজন হয়েছিলো। তাদের কাউকে হত্যা করা হয়, কিছু দেশ থেকে পালিয়ে যায়। আর আমার বাপ-দাদাদের কেউ এদিকে এসে বসত গড়ে এবং এই সরাইখানা বানায়। বংশ পরম্পরায় এটার মালিক এখন আমি।'

'এই সরাইতে শুধু মুসলমানরাই আসে না কি?'

' না জনাব! সবার জন্য এর দরজা উন্মুক্ত। এটা একটা দুনিয়া। সব ধর্ম, বর্ণ, জাতির লোকেরা এখানে আসে। কিছু দিন থেকে চলে যায়। আপনার মতো আল্লাহর ওয়ালীরাও– যারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন– তারাও কখনো কখনো পায়ের ধুলো দিয়ে যান। এখন কি আমার আসল মতলবটা বলে ফেলবো?'

'অনুমতির প্রয়োজন নেই।'

'আজ রাতে আমার ওখানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আর আপনার জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দয়া করে ওই কামরায় চলে আসুন।'

হাসানরা ওই কামরায় গিয়ে দেখলো তাদের জন্য বিরাট আলীশান ব্যবস্থা। পুরো কামরা জুড়ে ইরানী গালিচা, রেশমী পর্দা জানালা আর দরজায় ঝুলানো। ওপরে ফানুস। অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশ কামরার ভেতর ফাঁকা।

দস্তরখানায় গিয়ে বসলো ওরা। আরো তিন চারজন অতিথি ছিলো দরস্তরখানায়। খাবারের পর সরাইয়ের মালিক হাতজোড় করে হাসানকে বললো,

'আপনার মেজাজ এবং রুচি কি তা আমার জানা নেই। বেয়াদবীই হয়ে যায় কি-না! আপনি কি নৃত্য গান বা গীটার সংগীত পছন্দ করেন?

'কি মনে করে একথা জিজ্ঞেস করছো তুমি?'

'আপনি এত বড় বুযুর্গ হাস্তি! আল্লাহর যত কাছের আপনি আমরা তো তা কল্পনাও করতে পারবো না।'

'আল্লাহ তার কোন বান্দার ওপর কোন নেয়ামত হারাম করেননি। নর্তকীর নৃত্য ভোগ করা হারাম নয়। হারাম ও নিকৃষ্ট পাপকাজ হলো তার দেহ ভোগ করা।'

'ইসলাম কি অর্ধ উলঙ্গ নর্তকীর নৃত্য দেখারও অনুমতি দেয়?'

'হ্যাঁ, ইসলাম জিহাদের ময়দানে প্রত্যেক মুসলমানের কাছে জান কুরবানী চায় এবং মুসলমানরা বীর বিক্রমে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এজন্য ইসলাম প্রতিটি নেয়ামত ও প্রতিটি প্রমোদের জিনিসকে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছে মুসলমানকে।'

'আমরা আজ পর্যন্ত যা শুনলাম.....'

'সেটা ইসলামের দুশমনরা ছড়িয়েছে' – হাসান সরাইয়ের মালিককে বাঁধা দিয়ে বললো – 'ইহুদী খ্রিষ্টানরা যখন দেখলো অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম অর্ধ বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে গেছে তখন তারা ইমাম ও খতীবের বেশে এসব ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম শুধু আত্মত্যাগই চায়। দুনিয়া কিছুই নয়। শুধু আল্লাহর অনুগত থাকার নাম ইসলাম।'

এভাবেই হাসান ইবনে সবা মন্দ ও অশ্লীলতা মানুষের মধ্যে উস্কে দিয়ে মানুষকে তার ফেরকায় ভেড়াতে থাকে।

হাসানের কথা শেষ হতেই সরাইয়ের মালিক তার এক খাদেমকে ইশারা করলো। খাদেম দ্রুত বাইরে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন তবলা ও ঢোল-বাদক

ভেতরে ঢুকে গালিচার ওপর বসে গেলো। হারমোনিয়াম ও তবলার তাল উঠতেই কামরায় অর্ধনগ্ন এক নর্তকী এমনভাবে প্রবেশ করলো যেন স্বচ্ছ জলে সাতরে আসছে কোন জলপরী। তারপর শুরু হলো উন্মাদ করে দেয়া সঙ্গীত আর মদমত্ত নৃত্য।

দস্তরখানে যারা খাবার খাচ্ছিলো তারা খাবার মুখে তুলতে ভুলে গেলো। ঐ যুবতী নর্তকীটি যেন সবাইকে হিপ্টোনোজিম করে ফেলেছে। কিন্তু হাসান ইবনে সবা তাকে পরখ করতে লাগলো অন্য নজরে। সে তার চোখে খুঁজতে লাগলো তার স্বার্থের কোন গুণ বা প্রতিভা।

মাঝরাতের পর সঙ্গীত ও নৃত্যের মাহফিল শেষ হলে লোকজন চলে গেলো এবং হাসান তার কামরার পালংকে এসে বসলো। সরাই মালিক পিছু পিছু এসে হাসানের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বললো,

'হুজুর! আপনার খেদমতে কোন ত্রুটি করিনি তো?'

'আমি এত কিছুই চাইনি। আমাকে যদি সাধারণ চাটাইয়ের ওপর বসিয়ে ডাল রুটি দিতে তবুও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতাম যে, তার এক বান্দা আমাকে কত সম্মান করেছে – আচ্ছা তোমার কি বিশেষ কিছু বলার আছে না কোন পেরেশানীতে পড়েছো তুমি?'

'হে ঝড় প্রতিরোধকারী ইমাম! এই শহরে প্রথম শুধু আমার সরাইখানাটাই ছিলো। সব মুসাফির আমার সরাইতে উঠতো। কিছু দিন দুই ইহুদী আরেকটি সরাইখানা খুলেছে। এরা মুসাফিরদেরকে শরাবও দেয় মেয়ে মানুষও দেয়। এতে আমার ব্যবসা পড়ে গেছে। আপনাকে খোদা এমন শক্তি' .....

'এখন তার অবনতি বা তোমার উন্নতি দরকার এই তো?'

'সেটা আপনি যা করার করবেন। আমি চাই আমার ব্যবসাটি আগের মতো জমে উঠুক।'

'জমে উঠবে। কাল একটি বকরী জবাই করে তার দুই বাহুর হাড় আমার কাছে নিয়ে আসবে। আর হ্যাঁ, ঐ নর্তকীর মালিক কে?'

'সে এক বুড়ির মেয়ে, প্রায়ই তাকে আমি বিশেষ অতিথিদের জন্য এখানে নিয়ে আসি। ওকে কি হুজুরের ভালো লেগেছে?

'হ্যাঁ, তবে যা ভেবেছো তার জন্য নয়। তুমি যদি এর মাকে ডাকতে পারো তাহলে তার মেয়ে সম্পর্কে কিছু জরুরী কথা বলবো। এই মেয়ে তার দেহটাই চিনে। কিন্তু সে তার দেহের চেয়েও আরো অনেক উপযুক্ত।'

সরাই মালিক এক কর্মচারীকে নর্তকী ও নর্তকীর মাকে ডেকে আনতে বললো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ভেতরে এলো। সরাই মালিক আগেই নর্তকী ও তার মাকে হাসান ইবনে সবা সম্পর্কে যা কিছু জানে সব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলেছে। তখনই ওরা ব্যাকুল হয়ে হাসান ইবনে সবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। কিন্তু এবার হাসানের ডাক পেয়ে ওরা যেন আকাশের চাঁদ-তারা পেলো।

দু'জনেই রুকুর ভঙ্গিতে কামরায় প্রবেশ করলো। নর্তকী মেয়েটি তখনো তার নৃত্যের অতি সংক্ষেপিত পোশাকে ছিলো। হাসান মেয়েটিকে বললো,

হে মেয়ে! আমি তোমার দেহ চাইনা। তোমার অন্তর খুলে দেখবো আমি এবং তোমাকেও দেখাবো' – হাসান নর্তকীর মাকে বললো– 'যাও তাকে এমন কাপড় পরিয়ে নিয়ে আসো যাতে শুধু তার মুখ ও হাতই দেখা যায়।'

'তোমার কাজ হয়ে যাবে' – মা মেয়ে চলে গেলে হাসান সরাই মালিককে বললো – 'এরা চলে এলে তুমি চলে যেয়ো। কাল সকালে আমার কাছে এসো।'

মা মেয়ে চলে এলো। মেয়ের চেহারায় ঘোমটা টেনে দেয়ায় তার রূপ আরো দ্বিগুণ সতেজ হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো এ এক নিষ্পাপ কিশোরী।

'এই পোশাক কি তোমার ভালো লাগে না?' –হাসান মেয়ের মাকে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ হুজুর! হ্যাঁ ভালো লাগছে ওকে দেখতে' – মেয়ের মা উত্তর দিলো।

'ভালো লাগছে কারণ সে এক পবিত্র আত্মার অধিকারী। অপবিত্র দেহী নয় সে। ওর কদর বুঝতে চেষ্টা করো।'

'হুজুর! আমি পথহারা এক পাপিষ্ঠ মেয়ে। আমরা জানবো কি করে যে কাল আমরা কি করবো। আমি আপনার অলৌকিক শক্তির কথা শুনে সরাই মালিককে অনুরোধ করি, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করবো আমার বেটিকে এই পেশায় রাখবো কি-না। আমাদের ভবিষ্যত কী তা বলবেন কি?'

হাসান তার জাদু ও জ্যোতি বিদ্যা প্রয়োগ করলো। মেয়েটির ডান হাতের রেখাগুলো তার হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগলো।

ক্রমেই হাসানের চেহারার ছাপ পাল্টে যেতে লাগলো। একবার হঠাৎ মেয়েটির হাতের ওপর থেকে তার মাথা এমন তীব্র বেগে উঠালো যেন হাতের রেখাগুলো সাপ হয়ে গেছে। মেয়ে মা দু'জনেই চমকে উঠলো।

'কি দেখেছেন হুজুর!' – মা ভীত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'পর্দা উঠছে' – হাসান কোন দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো।

একটু পর তার হাত ছেড়ে তার মুখটি হাসানের দু'হাতের ভাজে নিয়ে একটু ওপরে উঠালো। 'ভালো করে চোখ খোলা রাখো' – হাসান নর্তকীকে বললো।

তার চোখ মেয়েটির দু চোখকে বশ করে ফেললো। তার দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে মেয়েটির কানের লতি আস্তে আস্তে ঘঁষতে শুরু করলো। আর কিছু একটা বলতে লাগলো বিড়বিড় করে।

একটুপর মেয়েটি চাপা গলায় বলে উঠলো – 'কালো পর্দার পেছনে ওই দেখেছি আমি ...... আমি যাবো ...... আমার দেহ না গেলে আমার আত্মা যাবে ওখানে।'

'এই দেহও তোমার সঙ্গে যাবে' – হাসান বললো।

'এই দেহ আমার সঙ্গে যাবে।'

'কি করবে এই দেহকে?'

'এই দেহ নাচবে অন্যকে নাচাবে।'

'একটি দুর্গ দেখছো তুমি।'

নর্তকী মেয়েটি নীরব হয়ে গেলো। হাসান তার চোখে চোখ রেখে একথা কয়েকবার বললো – 'তুমি একটি দুর্গ দেখছো।'

'হ্যাঁ একটি দুর্গ দেখা যাচ্ছে।'

'সে দুর্গে তোমার নিজেকে তুমি দেখছো' – হাসান দূরাগত স্বপ্নের আওয়াজে একথা কয়েকবার বললো।

'দেখো, দেখো মা! আমি আমার নিজেকে দেখছি' – নর্তকী বাচ্চাদের মতো কলকল কণ্ঠে বলে উঠলো।

'নিজেকে নিজে কি অবস্থায় দেখছো?'

'চারটি মেয়ে। যেন রূপবতী শাহজাদী। আমার পোশাকও ওদের মতো। ফলে ফলে ভরা বাগানে ওরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

হাসান নর্তকী মেয়ের চেহারা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটি তীব্র দৃষ্টিতে তার চোখের পলক ফেললো এবং মাথা নামিয়ে নিলো। যখন মাথা উঠালো তার চেহারা বিস্ময়ে অভিভূত। বিস্ফারিত চোখে তাকাতে লাগলো কখনো হাসানের দিকে কখনো তার মার দিকে। পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'আমি কোথায় চলে গিয়েছিলাম? এক অন্ধকার দিয়ে যেতে যেতে অন্য দুনিয়ায় চলে গিয়েছিলাম।'

'তুমি যে দুনিয়া দেখেছো সেটাই তোমার আসল জায়গা। এখানে যেখানে আছো সেটা সুন্দরের প্রতারণা। তোমার পরিণাম এখানে থাকলে খুবই মন্দ হবে। খোদা তোমার জন্য বড় মনোরম জায়গা লিখে রেখেছেন। মাকে বলো কি দেখেছো তুমি .... আমি তোমাকে সে জায়গা দেখিয়ে দিয়েছি।'

মেয়ে তার মাকে সব বললো।

'কিন্তু হুজুর! আমরা সে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছবো কি করে? আপনি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন না?' মেয়ের মা জিজ্ঞেস করলো।

'পারবো তবে করবো না, এর কারণও বলছি। মানুষ আল্লাহর দেয়া নেয়ামত পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না। আমি আরো কয়েকজনকে এভাবে তাদের আসল স্থান দেখিয়েছিলাম এবং সে পর্যন্ত পৌঁছিয়েও দিয়েছিলাম। অল্প কিছু দিন পরেই ওরা আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলো। এখন আমি কাউকে তার সম্পর্কে বলি না কিছু। তুমি হয়তো অক্ষমতা বা পয়সার লোভে তোমার মেয়েকে এমন বিপজ্জনক পেশায় নামিয়েছো। কি কারণে যেন তোমার মেয়ের প্রতি আমার চোখ পড়লো। আমি তার আসল রূপ দেখলাম। কিন্তু তুমি তাকে ছদ্মবেশ পরিয়ে রেখেছিলে। আমি তাকে তার স্থান পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই। তুমি তার সঙ্গে থাকবে। ফিরে পাবে তখন তোমাদের হারিয়ে যাওয়া মান সম্মান।'

'তাহলে আমাদের প্রতি কি দয়া করবেন না?' –মেয়ের মা হাতজোড় করে বললো।

'শুধু এক শর্তে তা করতে পারি। নিজেদের চিন্তা চেতনা সব আমার কাছে সোপর্দ করতে হবে এবং তোমাদের নিজেদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।'

'ছেড়ে দিলাম। আপনি যে হুকুমই করবেন আমরা মা মেয়ে মেনে নিবো।'

'তাহলে শোন! আমি যখন এখান থেকে যাবো আমার সঙ্গে তোমরাও যাবে।'

'অবশ্যই যাবো হুজুর!' – মেয়ের মা বললো।

'আজই ছিলো তোমার শেষ নাচের দিন। এখন তোমার আসল জীবন শুরু হয়ে গেছে। গিয়ে শুয়ে পড়ো। সকালে অসুখের ভান করে পড়ে থাকবে। কেউ তোমাকে নাচতে নিতে এলে ব্যথার আর্তনাদ তুলে আমার কথা বলবে, উনাকে ডাকো তিনি আমার চিকিৎসা করবেন। আমি এসে এমন রোগের কথা বলবো যে, ভয়ে কেউ তোমার কাছেও ঘেঁষবে না।'

নর্তকী ও নর্তকীর মা চলে যাওয়ার পর হাসানের দুই সঙ্গী কামরায় ঢুকলো। হাসান আনন্দিত গলায় বললো,

'আমার তূণীরে আরেকটা তীর ভরেছি। এই নর্তকী মেয়ে এবার বড় বড় শাহবাজ শাহজাদাদের শিকার করবে।'

'তাহলে কি সে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে?' – এক সঙ্গী জিজ্ঞেস করলো।

'মা মেয়ে দু'জনেই যাচ্ছে। তবে লুকিয়ে টুকিয়ে নিতে হবে ওদের।'

'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

★ ★ ★ ★

হলবের দ্বিতীয় দিন। হাসানের কামরার বাইরে তার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ভিড় জমে গেলো।

'ইমাম ইবাদতে মশগুল' এই বলে লোকদের কামরায় ঢুকতে দেয়া হচ্ছিলো না।

অনেকক্ষণপর এক দম্পতিকে ঢুকতে দেয়া হলো। এরা ছিলো ইস্কান্দারিয়া থেকে হলব পর্যন্ত হাসানের সঙ্গের জাহাজ যাত্রী। হলব নামার পরই নেকাবে ঢাকা মেয়েটিকে হাসানের চোখে পড়ে। সেই মহিলা ও তার স্বামী কামরায় ঢুকেই ঝুঁকে পড়ে হাসানকে অভিবাদন জানালো।

'বসো ভাই বসো' – হাসান একথা বলে স্বামীটিকে জিজ্ঞেস করলো – 'তোমরা গিয়েছিলে কোথায়? আর গন্তব্যই বা কোথায়?'

'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রায়' – স্বামীটি বললো – 'আমি আসলে ইস্পাহানী। আমার নাম হাফিজ ইস্পাহানী। রুজির পিছু পিছু অনেক সফর করেছি। ওপরওয়ালা দিয়েছেনও আমাকে ঝুলি ভরে। আর অসংখ্য দেশে সফর করেছি জানার খোঁজে, জ্ঞানের খোঁজে। মিসরে দু'জন আলেমকে দেখেছি, জ্ঞানের সমুদ্র। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই আলেমদের কাছে। কিন্তু জ্ঞানকে তারা সংকীর্ণ কৌটায় বন্ধ করে রেখেছে।'

'ওরা উবায়দী' – হাসান বললো – 'কিন্তু পরিচয় দেয় ইসমাঈলি বলে। তুমি কোন ফেরকার ভাই?'

'আমি এক আল্লাহকেই মানি, যার কোন শরীক নেই। তার শেষ কথা কুরআনকে মানি এবং মানি তার শেষ নবী রাসূলুল্লাহ (স)কে। যার মাধ্যমে আল্লাহর কালাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এর চেয়ে বেশি আমি আর কিছু জানি না। ফেরকা টেরকা তো পরের কথা!'

'রায় কেন যাচ্ছো?'

'আমীর আবু মুসলিম রাজীর কাছে যাবো। তিনি আল্লাহর অনুগত এক হাকিম।'

'সেখানে তোমার কি কোন কাজ আছে?'

'উনাকে আমি কিছু জরুরী তথ্য দেবো। খালজান গিয়েছিলাম আমি। সেখানে বড় ভয়াবহ এক ফেরকা মাথা তুলছে। আহমদ ইবনে গুতাশ নামে এক লোক খালজান দখল করে নিয়েছে। সে নাকি জাদুকর বা ভেল্কিবাজ। কেল্লা শাহদর ও খালজানের মধ্যবর্তী এক পাহাড়ে নাকি খোদার এক দূত এসেছিলো। সে এলাকার লোকেরা তাকে দেখতেই খোদার দূত বলে মেনে নেয়। সেই দূতের নাম না-কি হাসান ইবনে সবা। আপনার সমনাম। আমি তো বলবো এটা আপনার নামের বেয়াদবী। আপনি তো আল্লাহর প্রিয় বান্দা।'

'তুমি তার ভুল নাম শুনেছো। তার আসল নাম আহসান ইবনে সবা। লোকে তাকে হাসান ইবনে সবা বানিয়ে দিয়েছে।'

'যাক ভালোই হলো। তার আসল নাম শুনে আমার পেরেশানী কমলো। আপনার নামের বেয়াদবী হচ্ছে না। শুনেছি সেই আহসান ইবনে সবার মুখে এমন জাদু আছে যে পাথরকে মোম বানিয়ে দেয়। সে আর আহমদ ইবনে গুতাশ লোকদেরকে নিয়ে এক ফৌজ তৈরী করে নিয়েছে। অবশ্য নিয়মিত ফৌজ না। লোকদেরকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে বর্শাবাজি, তলোয়ার চালনা ও তীরন্দাযি এবং ঘোড়সওয়ারী শিক্ষা দেয়।'

'আবু মুসলিম রাজীকে এদের ব্যাপারেই জানাবে?'

'হ্যাঁ হযরত। সুলতান মালিক শার কাছেও যাবো আমি। এই বাতিল ফেরকা খতম করে দেয়ার জন্য তাকে আমি উস্কে দেবো। আমি আরো জেনেছি এরা অনেক দিন ধরে কাফেলা লুট করছে। অলংকারাদি এবং মালপত্র তো লুট করেই, যুবতী মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যায়। আট দশ বছরের বাচ্চারাও রেহাই পায় না। তারপর তাদের কুৎসিত উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য ওদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়। অলংকারপত্রও এ কাজে ব্যবহার করে ওরা।'

'আমি জানি, ওরা ভয়ংকর লোক।'

হাফিজ ইস্পাহানীর মুখে নিজের নাম শুনে হাসান ইবনে সবা মোটেও চমকালো না। বরং তার কথার সমর্থনে আহমদ ইবনে গুতাশকে গালমন্দ করতে লাগলো।

'আমার একটি আর্জি আছে হযরত! অনুমতি পেলে' .... হাফিজ ইস্পাহানী করুণ গলায় বললো।

'আরে অনুমতি আবার কি? যা বলার বলো।'

'কোন সন্তান নেই আমার। আমার প্রথম স্ত্রী থেকেও সন্তান হয়নি। সে মারা গেলে কিছু দিন পর একে বিয়ে করি।'

'এর সাথে বিয়ে হয় কবে?'

'বার তের বছর হয়ে গেছে। এর প্রথম স্বামী এক কাফেলা লুটেরাদের হাতে মারা পড়ে।'

'বারো তের বছর! আমি তোমাদের নবদম্পতি ভেবেছিলাম। ওর আগের স্বামীর কি কোন সন্তান ছিলো?'

'নয় দশ বছরের এক মেয়ে সন্তান ছিলো। ডাকাতরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, – হাফিজ বললো।

'অসম্ভব রূপসী ছিলো মেয়েটি' – হাফিজের স্ত্রী বললো – 'অসম্ভব ভালোবাসতাম ওকে। ওর দুঃখেই আমি আর বাচ্চা ধারণ করতে পারিনি।'

'আর আমার এই স্ত্রীটিকেও এত ভালোবাসি যে, শুধু সন্তানের জন্য আরেকটি বিয়ে করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনাকে আল্লাহ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন' – হাফিজ বললো।

'চেহারা থেকে নেকাব সরাও মেয়ে!' – হাসান বললো।

মহিলা চেহারা থেকে নেকাব সরাতেই হাসান দারুণ চমকে উঠলো। এর একটা কারণ হলো, এই মেয়ে এত অসম্ভব রূপবতী ছিলো যে, চল্লিশের কাছাকাছি এই মহিলাকে পঁচিশ ছাব্বিশের যুবতী মনে হচ্ছিলো। দ্বিতীয়, হাসানের মনে হলো তার সামনে মুখের নেকাব হঁটিয়ে বসে আছে সুমনা। এ যেন সামান্য বয়স্কা সুমনা।

'নাম কি তোমার?' – হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো।

'মায়মুনা' – মহিলা বললো।

নাম নিয়ে কে-ই বা ভাবে। আমীনা, মায়মুনা যমুনা কতধরনের নামই তো হতে পারে। কিন্তু হাসানের মন এই নাম থেকেই গোপন সূত্র পেয়ে গেলো। সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো করে বললো –

'মায়মুনা! সত্যিই তোমার মেয়েকে তুমি ভালোবাসতে। এজন্য তুমি ওর নাম রেখেছিলে সুমনা। তোমার নামের সঙ্গে দারুণ মিল।'

কাফেলা লুটেরা দল তো হাসান ইবনে সবা ও আহমদ ইবনে গুতাশেরই দল। এজন্য সে ধরে নিলো ঐ সুমনা এই মায়মুনারই মেয়ে হবে।

'হে ইমাম! আমি তো আমার মেয়ের নাম আপনাকে বলিনি!' – মায়মুনা সবিস্ময়ে বললো।

'না মায়মুনা! তোমার মেয়ের নাম কি তোমার কাছ থেকে জানতে হবে? তাহলে আমার কৃতিত্বটা কী?'

'হে ইমাম! আমি আপনাকে ইমাম মেনে নিলাম। তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন সে জীবিত না মৃত। জীবিত হলে কোথায় সে?

হাসান চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হওয়ার ভান করে বসলো। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত নাড়তে লাগলো। তারপর তালি বাজিয়ে বলতে শুরু করলো,

'কোথায়? মরে গেছে! আমার প্রশ্নের জবাব দাও .... হুঁ ঠিক আছে .... কোথায় সে? ..... ঠিক আছে .... হ্যাঁ ... তুমি যেতে পারো।'

'সে জীবিতই আছে' – হাসান মোরাকাবার ধ্যান থেকে জেগে উঠে বললো – 'ওকে 'রায়' দেখা গেছে।

'সে রায় শহরের কোথায় আছে তা কি বলা যাবে?' – মায়মুনা জিজ্ঞেস করলো।

'আমীরে শহর আবু মুসলিম রাজীর কাছে হয়তো ওর সন্ধান পাওয়া যাবে। সুমনার সঙ্গে আবু মুসলিম রাজীর চেহারাও এক পলক দেখা গেছে।'

হাসান অনুমান করে নিয়েছিলো সুমনা আবু মুসলিম রাজীর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তার অনুমান সত্য হয়নি এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি তার জীবনে।

'আমার মেয়েকে কি আমি পাবো?' – মায়মুনা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ অবশ্যই পাবে।'

'হে ইমাম! দয়া করে বলুন আমার আর কোন বাচ্চা কাচ্চা হবে কিনা?'

হাসান আবার মোরাকাবায় বসার ধ্যান করলো। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো,

'না না। কিছু একটা করো .... কোন রাস্তা দেখাও .... আমি দুই বাচ্চা দিতে চাই .... হ্যাঁ .... বলে যাও .... কেমন করব? .... ঠিক আছে।'

হাসান অনেক্ষণ পর চোখ খুলে মায়মুনার স্বামী হাফিজ ইস্পাহানীকে বললো – 'একটি বাচ্চার আশা পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার জিনেরা যে পদ্ধতির কথা বলেছে সেটা একটু বিপজ্জনক। এতে প্রাণ হয়তো নাও যেতে পারে। তবে আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু বিপদের জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'আপনি এবার পদ্ধতিটা বলুন' – হাফিজ ইস্পাহানী বললো।

'এ কাজ তোমাকেই করতে হবে। আমি একটা কাগজে কিছু একটা লিখে কয়েক ভাঁজে বন্ধ করে তোমার হাতে দেবো। কাল কবরস্থানে গিয়ে ধসে যাওয়া একটি কবর বের করবে। সঙ্গে একটি কোদালও নিয়ে যাবে। কবরে নেমে অনুমানে তোমার শরীরের ওজন যতটুকু হবে ততটুকুই মাটি বের করবে। দুই বিঘত জায়গা মাটি খুড়বে। যাতে মোটামুটি একটা গর্ত তৈরী হয়ে যায়। মুরদার মাথা যেদিকে থাকে সেদিক থেকে গর্ত খুড়বে। মুরদার খুপড়িও নজরে পড়তে পারে। তাহলে আরো ভালো। তারপর এই কাগজটি গর্তের ভেতর রেখে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসবে। ১১ দিন পর মায়মুনা তোমাকে সুসংবাদ শোনাবে।'

হাসানের লোক দু'জন তার কাছেই বসা ছিলো।

'তোমরা জানো কোন কবরটা উপযুক্ত হবে' – হাসান তার সঙ্গীদের বললো – 'সকালে উনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং একটি পুরাতন ও ধসে যাওয়া কবর দেখিয়ে দেবে। রাতে ইনি একলা যাবে।'

হাসান একটা কাগজের ওপর কিছু একটা লিখে বিড় বিড় করলো। তারপর কাগজে ফুঁক দিলো এবং কাগজটি কয়েক ভাঁজ করে ইস্পাহানির হাতে দিয়ে বললো, 'এটা কিন্তু খুলে দেখবে না।'

হাফিজ ও তার স্ত্রী মায়মুনা চলে গেলো।

'ঐ লোক কি বলেছে তোমরা তো শুনেছো' – হাসান তার সঙ্গীদের বললো – 'এতো সাধারণ কেউ নয়। মালদার এবং সরদার আদমী। আবু মুসলিম রাজীর কাছে যাচ্ছে এ লোক। সে নাকি রাজীকে বলবে খালজান কী হচ্ছে–হা হা হা।'

'আমাদের বিরুদ্ধে তো তুফান দাঁড় করিয়ে দেবে এলোক। কি করতে হবে আপনি হুকুম করুন' – তার এক সঙ্গী বললো।

'এটাও কি বলে দিতে হবে? কাল রাতে যেন সে কবরস্থান থেকে ফিরে না আসে। তাকে যা বলেছি সব তোমরা শুনেছো। কবরস্থানে তোমরা আগেই চলে যাবে।'

'সব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। তার লাশ ঐ কবরের কাছেই পাওয়া যাবে যে কবরে সে তাবীজ রাখতে যাবে।'

'আচ্ছা তার স্ত্রীর কি হবে?' – আরেকজন জিজ্ঞেস করলো।

'আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে সে' – হাসান বললো – 'আমাদের অনেক কাজে আসবে। এর মাধ্যমে এর মেয়ে সুমনাকেও পেয়ে যেতে পারি আমরা।'

পরদিন সকালে হাফিজ ইস্পাহানী হাসানের দুই সঙ্গীর সাথে কবরস্থানে চলে গেলো। তারপর ধসে যাওয়া কবর খুঁজতে শুরু করলো। অনেক খুঁজাখুঁজির পর বৃষ্টির পানিতে ধসে যাওয়া কয়েকটি কবর নজরে পড়লো। এর মধ্যে একটি কবরের মাটি এতখানি ধসে গেছে যে, মুর্দার খুপড়ি ও কাঁধের হাঁড় দেখা যাচ্ছিলো। হাসানের এক সঙ্গী হাফিজ ইস্পাহানীকে বললো –

'এটাই আপনার দারুণ কাজে আসবে। আপনার মাটিও তুলতে হবে না। রাতে এর মধ্যে নেমে ইমামের দেয়া কাগজটি মুরদার মুখে রেখে কোদাল দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিবেন।'

'মাটি কিন্তু ভাই আপনার ওজনের সমান হতে হবে' – আরেকজন বললো – 'আপনাকে সতর্ক করে দেয়াটা জরুরী মনে করছি। আপনি কিন্তু মুরদার খোলা খুপড়ি পেয়ে গেছেন। আপনার বাসনা এটা খুব দ্রুত পূরণ করে দেবে। কিন্তু আপনি বদ নিয়তি হন বা অসাবধান হন তাহলে কিন্তু এ খুপড়ি আপনার প্রাণ নিয়ে নেবে।'

'যা হোক, এই সুযোগ আপনার অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। ইমাম আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহর নাম নিয়ে রাতে চলে আসবেন।'

'আমি অবশ্যই আসবো' – হাফিজ দৃঢ় গলায় বললো।

★★★★

রাত গভীর হয়ে গেলে হাফিজ ইস্পাহানী কবরস্থানে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হতে যাবে এমন সময় মায়মুনা তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

'জানি না আমার মনে কেন এত বড় পাথর চেপে বসেছে। আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না?' – মায়মুনা বললো।

'না মায়মুনা! তোমার সামনেই তো ইমাম আমাকে একা কবরস্থানে যেতে বলেছেন। এই শর্ত অমান্য করলে আমাদের দু'জনের প্রাণের আশংকা দেখা দিবে' – হাফিজ বললো।

'আমার একটা কথা শোন! বাচ্চা কাচ্চার দরকার নেই আমার। তুমিই আমার সব। এখন কবরস্থানে যেয়ো না।'

'তুমি তো অনেক শক্ত মনের ছিলে মায়মুনা!' – হাফিজ বড় আদুরে গলায় বললো – 'আমি যুদ্ধের ময়দানেও যাচ্ছি না, সামুদ্রিক ঝড়ও মোকাবেলা করতে যাচ্ছি না। আমাকে আল্লাহ হাফেজ বলো মায়মুনা! আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'আল্লাহ হাফেজ!'

ইস্পাহানী আল্লাহ হাফেজ বলে চোখের আড়ালে চলে যেতেই মায়মুনার ভেতর থেকে কুঁপানির মতো উঠলো। অন্তর জুড়ে তার হাহাকার করে উঠলো। অশুভ কোন সংকেত দিয়ে গেলো যেন তাকে অদৃশ্য কোন সত্তা।

দ্বিধান্বিত পায়ে কামরায় গিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। ঘুম এলো না সারা রাত। বাইরে থেকে সামান্য পাতা ঝরার শব্দ এলেই দৌড়ে যাচ্ছিলো এবং ফিরে আসছিলো সে আশাহত হয়ে। মুআজ্জিন রাত পোহানোর ঘোষণা দিলো।

হো হো করে উঠলো মায়মুনার ভেতর।

ঝিম ঝিম করে উঠলো তার সমস্ত অস্তিত্ব।

'না, এত সময় তো লাগার কথা না' – তার মন বলে উঠলো।

বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অযু করলো আর নামাজে দাঁড়িয়ে ফজর আদায় করলো। তারপর সূর্যোদয় হলে চার রাকাত নফল পড়ে দু'চোখ ভাসিয়ে স্বামীর জন্য দু'আ করতে লাগলো।

চোখের বিবর্ণ অশ্রুতে ম্লান হয়ে যাচ্ছিলো তার মুখ থেকে বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য।

সূর্য একটু ওপরে উঠতেই হাসানের সঙ্গীদের কামরার দিকে দৌড়ে গেলো মায়মুনা। সশব্দে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। ওরা তখন নাশতা করছিলো। দু'জনে চমকে উঠে দরজা খুলে দিলো।

'মাঝ রাতের দিকে যে হাফিজ কবরস্থানে গেলো আর যে এলো না' – মাইমুনার গলায় কান্নার আভাস।

'আমরা দেখতে যাচ্ছি। আপনি ভেঙ্গে পড়বেন না। তিনি এসে যাবেন' – একজন বললো।

দু'জনেই দ্রুত নাস্তা শেষ করে মাইমুনাকে সঙ্গে নিয়ে কবরস্থানের দিকে রওয়ানা দিলো।

কবরস্থানে পৌছে দূর থেকে ওরা দেখলো একটি কবরের পাশে লোকেরা ভিড় করে আছে। মায়মূনা দৌড়ে গিয়ে ভিড়ের ভেতরে ঢুকে পড়লো। পর মুহূর্তেই তার চিৎকার ভেসে এলো।

লোকেরা ধরাধরি করে হাফিজ ইস্পাহানীর লাশ সরাইখানায় নিয়ে এলো। হাসান ইবনে সবাকে খবর দিতেই দৌড়ে এলো সে। গতকাল রাতে তো তার সঙ্গীরা এসে তাকে জানিয়েই গেছে তার নির্দেশে তারা হাফিজকে ভালো মতোই খুন করে এসেছে। হাসান তখন ওদেরকে প্রচণ্ড নেশা সৃষ্টিকারী মদ পান করায় এবং বলে,

'শোন বন্ধুরা! কারো ওপর সামান্য সন্দেহ হলেই তাকে খতম করে দেবে। এই লোক আমাদের ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারতো। এর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে থাকবে। এর অনেক সম্পদ আছে। এগুলো এখন আমাদের। যাও সকালের জন্য অপেক্ষা করো।'

গতকাল রাতে হাফিজ ইস্পাহানী যখন তার চিহ্নিত কবরে গিয়ে হাসানের দেওয়া তাবীজটি রাখছিলো তখনই হাসানের দুই সঙ্গীর একজন পেছন থেকে তার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে আরেক হাতে তার মুখ চাপা দেয়। অন্যজন এসে শরীরের পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার পেটে অনবরত ঘুষি মারতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই হাফিজের সৌখীন দেহ দুই দানবের নির্মম মারে নেতিয়ে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে তার দেহ নিথর হয়ে যায়। হাফিজের মৃত্যুর ব্যাপারে দুজন যখন নিশ্চিত হয়ে যায় তাকে সেই ধসে যাওয়া কবরে চিত করে শুইয়ে দিয়ে ফিরে আসে।

হাসান দৌড়ে লাশের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর তার চেহারায় হাবভাবে এমন চরম ভীতির ছায়া ফেললো যে, সে ভীতি লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। সে মায়মুনার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কাঁদতে কাঁদতে তার দুই চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

'মায়মুনা!' – হাসান ভীতিপ্রদ গলায় বললো – 'আমার সাথে সাথে এসো ..... এক মুহূর্ত নষ্ট করো না', – সে তার সঙ্গীদের বললো – 'তোমরাও এসো। সময় খুব কম।'

সে মায়মুনা ও তার লোক দু'জনকে কামরায় নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

'কান্না বন্ধ করো মায়মুনা' – ঘাবড়ে যাওয়া কণ্ঠে বললো হাসান – 'বিছানায় বসো আগে। তোমার স্বামী বড় কোন ভুল করে বসেছে। এক ভয়ংকর পিশাচ আত্মা তার প্রাণ নিয়ে নিয়েছে। পিশাচটি এখনো রেগে আছে। আমি তার ফিসফিসানি শুনেছি। তোমার পেটে বাচ্চা হবে এজন্যই যেহেতু এই তদবীর করা হয়েছে তাই তোমার প্রাণও বিপদের মধ্যে রয়েছে। পিশাচটি এখন তোমাকেও মারতে চাচ্ছে। রাখো তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি আগে।

হাসান মায়মুনার মুখটি তার দু'হাতের করতলে নিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে কিছু একটা পড়তে শুরু করলো। একটু পরপর মায়মুনার চোখে ফুঁক দিতে লাগলো। হু হু করে যে মায়মুনা কাঁদছিলো সে মায়মুনা শান্ত হতে শুরু করলো ধীরে ধীরে।

অনেকক্ষণ পর মায়মুনা স্বস্তির একটি নিঃশ্বাস ফেললো। যেন তার স্বামী জীবিত হয়ে গেছে। হাসান এবার গম্ভীর গলায় বললো,

'আমি হাফিজকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সন্তানের জন্য সে এতই ব্যাকুল ছিলো, আমার কথা মন দিয়েও শুনলো না। তোমাকে আমি নিরাপদ করে দিয়েছি আর ঐ পিশাচটিকে দেখে নিয়েছি। সে এখনও হাফিজের মুণ্ডুপাত করছে আর তোমার দিকে তাকাচ্ছে বারবার। তোমার কোন ভয় নেই এখন। দুই চাঁদ (দুই মাস) আমার সঙ্গে তোমার থাকতে হবে। আমার ছায়া থেকে এর আগে তুমি সরে গেলে তোমার স্বামীর চেয়েও ভয়ংকর হবে তোমার পরিণাম।'

'এটা আপনার দয়া' – মায়মুনা কৃতজ্ঞতার স্বরে বললো – 'আমি আপনার ছায়ায় না থাকলে যাবো কোথায়? আমার পরের গন্তব্য ইস্পাহান।'

'সে পর্যন্ত তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়া হবে। আমার মুহাফিজ তোমার গন্তব্য পর্যন্ত যাবে। কিন্তু তোমার স্বামী চাচ্ছিলো সুলতান মালিক শার কাছে মারুতে যেতে।'

'মারুতে কেন যাবে তাও তো বলেছিলো সে। আমরা খালজান ও শাহদরে যা দেখেছি সুলতান মালিক শাহকে তা বলতে চেয়েছিলো ইস্পাহানী। বিশেষ করে খালজানে এমন এক ফেরকা সংগঠিত হয়েছে যারা অতি কুসংস্কারে বিশ্বাসী। এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে কিন্তু এদের কর্মকাণ্ড ইসলাম ধ্বংসকারী। এরা জানবাজ একটা দল তৈরী করছে যারা নিজেদের জানবাজি লাগিয়ে তাদের বিরোধীদের জান তুলে নেয়।'

'হাফিজ এসব কিছুই বলেছে আমাকে। তুমি এখন এ ব্যাপারে কি করতে চাও?'

'কিছুই না, স্বামীই যখন নেই যে ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ছিলো! তখন আমি কেন ওসব নিয়ে ভাববো? আমি এখন ইস্পাহান গিয়ে আমার ভবিষ্যত চিন্তা করতে চাই।'

'তোমার ঘরে কি স্বর্ণ, দিরহাম ও দীনার আছে?'

'হাফিজ ইস্পাহানী একটা জায়গীরের মালিক ছিলো। সোনা রুপা, দীনার দিরহাম কি ছিলো না তার। ঘরের একটা দেয়ালে এসবের একটা ভাণ্ডার লুকানো আছে। কিন্তু যেখানে আমার জীবনসঙ্গীই নেই সেখানে ধনভাণ্ডার দিয়ে আমার জীবনে কি আর হবে? এখন আমার মেয়ের খোঁজে মারু ও রায়তে যাওয়াই আমার আসল কাজ। আপনিই বলেছেন আমীরে শহর আবু মুসলিম রাজীর কাছে আছে ও।'

এক রাত আগে হাসান একথা এই মহিলাকে বলেছে। এখন যদি সে মারু বা রায় যায় তাহলে খালজানে সুলতান হামলা করে দেবে। একে কোনভাবেই সুলতান মালিকশাহ ও আবু মুসলিম রাজীর কাছে যেতে দেয়া যাবে না। এজন্য সে কথা ঘুরিয়ে বললো,

'আগে নিজের আসল গন্তব্যে যাও। আমাকে জিজ্ঞেস না করে যেয়ো না কোথাও। তোমার মেয়েকে তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু এখনই তার পিছু ছুটতে যেয়ো না।'

মায়মুনার ভেতর তখন শোকস্তব্ধ একলা নারীর অসহায় অস্তিত্ব। আশ্রয় নেয়ার মতো সামান্য খড়কুটার সন্ধানও তার জন্য সান্ত্বনার। হাসান ইবনে সবার মতো অদৃশ্য জ্ঞানসম্পন্ন এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি যেখানে নিজেই তার দায়িত্ব নিচ্ছে সেখানে এর চেয়ে ভালো আশ্রয় আর কি হতে পারে।

মায়মুনা মেনে নেয় তার স্বামীকে কোন পিশাচ আত্মা কেড়ে নিয়েছে। ইমাম হাসান ইবনে সবার নির্দেশ মতো সবকিছু করতে না পারার কারণেই এ অবস্থা হয়েছে তার স্বামীর।

কিন্তু মায়মুনা টেরও পেলো না হাসান তাকে জাদু দিয়ে সম্মোহন করে নিয়েছে। তার কোন খুনী দুশমনও যদি তাকে হত্যা করতে আসে তাহলে তার প্রিয়তম শিষ্য হয়ে ফিরে যাবে।

মায়মুনা সিদ্ধান্ত নিলো হাসান ইবনে সবার সঙ্গেই সে যাবে।

কিছুক্ষণ পর হাফিজ ইস্পাহানীর লাশ গোসল ও কাফন দিয়ে সরাইখানা থেকে নামানো হলো। হাসান ইবনে সবা তার জানাযার নামাজ পড়ালো। তারপর তার লাশ সেই কবরে দাফন করা হলো যে কবরে হাফিজ সন্তান লাভের তদবীরের জন্য গিয়েছিলো।

মায়মুনা একা এক কামরায় রাতে থাকতে ভয় পাচ্ছিলো। তাই সে হাসানের অনুমতি নিয়ে হাসানের কামরার এক কোণায় পর্দা ফেলে চলে আসে।

এই সরাইয়ের মুসাফিররা অপেক্ষা করছিল বড় কোন কাফেলা জমে উঠার। কেউ লুটেরাদের ভয়ে একা সফর করতে সাহস করতো না।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। চৌদ্দ পনের দিন পর বড় এক কাফেলা তৈরী হয়ে গেলো। নারী শিশু, ব্যবসায়ী সাধারণ লোক এবং বিচিত্র পেশার লোক কাফেলার মধ্যে ছিলো। সরাইয়ের সবাই কাফেলায় যোগ দিলো। হাসান তার দুই সঙ্গী ও মায়মুনার জন্য একটি ঘোড়া ও দুটি উট ভাড়া করলো। একটি উটের ওপর দারুণ সুদৃশ্য একটি পালকি বাধা হলো। মায়মুনাকে সে পালকিতে বসিয়ে দিয়ে হাসান তার সঙ্গীদের নিয়ে একটু সরে গিয়ে বললো।

'এই মহিলার ওপর নজর রেখো তোমরা। স্বামীর চেয়ে এ আরো বেশি বিপজ্জনক হতে পারে। আমি ওর পথ যদিও বন্ধ করে দিয়েছি তবুও অন্য মুসাফিরদের সঙ্গে যাতে সে মেলামেশা না করে। তার ইস্পাহানের বাড়ির দেয়ালে যে একটা সম্পদের ভাণ্ডার আছে সেটা উদ্ধার করে ঐ দেয়ালের মধ্যে ওকে দাফন করে দিতে হবে। না হয় সে একদিন না একদিন তার মেয়েকে খুঁজে বের করতে আবু মুসলিম রাজীর কাছে চলে যাবে।'

★★★★

দীর্ঘ দিন সফরের পর কাফেলা বাগদাদ গিয়ে পৌঁছলো। লোকেরা কিছু দিন বিশ্রাম করে নিতে চাচ্ছিলো। হাসান তার সঙ্গী দুজন ও মায়মুনাকে নিয়ে উঠলো একটি সরাইতে। ভালো একটি কামরাও পেয়ে গেলো। কাফেলার কিছু মহিলাও সে সরাইতে উঠলো।

পরদিন সকালে মায়মুনা তার কামরা থেকে বের হলো। হাসানের জাদুর প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও আজ হাফিজ ইস্পাহানীর কথা বেশ করে মনে পড়ছিলো তার। নানান টুকরো টুকরো স্মৃতি তাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো নিঃসঙ্গ এক জগতে। হাসান তাকে সরাইয়ের বাইরে যেতে মানা করে গিয়েছিলো। তবুও সে বের হলো।

বাইরে যেতেই হলবের সরাই থেকে এক সঙ্গে আসা কাফেলার সহযাত্রী – প্রায় তার সমবয়সী এক মহিলার সামনে পড়লো। মহিলা যেন মায়মুনাকেই খুঁজছিলো। সে এত দিন জিজ্ঞেস করতে পারছিলো না তার স্বামী পিশাচ– আত্মার হাতে কি করে মারা গেলো। মায়মুনাকে একলা পেয়ে সে বেশ খুশি হলো। তার মনের জিজ্ঞেস করলো,

'দেখো, আমরা তো এক সহযাত্রী। তারপর এক নারীর কষ্ট তো বুঝতে পারে আরেক নারীই। আমাদের কামরায় কি একটু বসবে না? আমার সঙ্গে আমার স্বামী, ছোট একটি ভাই ও দুটি বাচ্চা আছে।

মায়মুনা একটু বিষণ্ন হেসে মহিলার সঙ্গে তার কামরায় চলে গেলো। মহিলার স্বামীটি আরেক দিকে সরে বসলো এবং মায়মুনাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলো,

'আচ্ছা! আপনার স্বামীটি রাতের বেলায় কবরস্থান গিয়েছিলো কেন?'

'ইমাম তাকে পাঠিয়েছিলেন। আসলে মৃত্যুই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো। একটা সন্তানের বড় শখ ছিলো তার' – মায়মুনা বললো।

মায়মুনা হুবহু পুরো ঘটনা শোনালো।

'আপনার স্বামী কি আরো অন্য কিছু বলে ছিলেন? আসলে আমার জানার বিষয় হলো, আপনার স্বামী কি ঐ লোককে চিনতো যাকে আপনি ইমাম বলছেন?'

'কথা তো অনেকেই বলেছিলো। না সে ইমামকে চিনতো না। মিসর থেকে আমরা জাহাজে আসছিলাম। হঠাৎ শুরু হলো ভীষণ ঝড়। জাহাজ প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলো। কিন্তু ইমাম বলে উঠলেন জাহাজ ডুববে না। ঝড় চলে যাবে। তাই হলো। জাহাজ নিরাপদ সমুদ্র পাড়ি দিলো।'

সেই মহিলার স্বামী আরো অনেক কথা খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো মায়মুনাকে। মায়মুনার সন্দেহ হলো এ-লোক মনে হয় অন্যকিছু জানতে চাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করলো,

'আচ্ছা ভাই! মনে হচ্ছে আপনি অন্য কিছু জানতে চাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ বোন! আমার ধারণা, যা জানার আমি জেনে নিয়েছি। ঐ লোক সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করে দেয়া উচিত। ঐ লোকের নাম হাসান ইবনে সবা। এক শয়তানী ফেরকার প্রধান সে। সে আসলে শয়তানী ফেরকার ইমাম। তার গুরু হলো আহমদ ইবনে গুতাশ। এদের আড্ডাখানা খালজান। ইসলামের নামে এরা শয়তানের পূজারী বানাচ্ছে মানুষকে।'

'আমার স্বামীও তাকে এসব বলেছিলো। সে বলেছিলো, সুলতান মালিকশাহ ও রায়ের হাকিম আবু মুসলিম রাজীর কাছে গিয়ে বলবে, তারা যেন আহমদ ইবনে গুতাশ ও হাসান ইবনে সবার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান করে ইসলামের মূল বুনিয়াদকে রক্ষা করেন। একথা শুনে তিনি বললেম এলোকের নাম হাসান ইবনে সবা নয়, আহসান ইবনে সবা।'

'শুনুন বোন! আপনার এত বিত্তবান বুদ্ধিমান স্বামীটি একথাও বুঝতে পারলো না। কোন মৃত কি জীবিত কাউকে সন্তান দিতে পারে? এটাও বুঝলো না, হাসান ইবনে সবার মতো সাক্ষাত শয়তান এক লোকের দেয়া তাবীজের কারণে আল্লাহ কারো

মনোবাসনা পূর্ণ করবেন না। আপনার স্বামীর মনোবাসনা শুনে হাসান ইবনে সবা ফন্দি আটে কি করে তার বিরুদ্ধ এত বড় বিপজ্জনক লোককে হত্যা করা যায়। সে আপনার স্বামীকে গভীর রাতে নির্জন কবরস্থানে পাঠায়, আর আপনার স্বামীর পিছু পিছু তার লোক পাঠিয়ে তাকে হত্যা করায়।'

মায়মুনা আবার ফুঁপিয়ে উঠলো। ফুঁপাতে ফুঁপাতে বললো,

'তাহলে তো সে আমার কাছ থেকে আরো অনেক কথা জেনে নিয়েছে। আমার স্বামী ইস্পাহানে তার নিজ বাড়িতে এক দেয়ালে অনেকগুলো সোনা ও বড় ধরনের টাকার স্তূপ লুকিয়ে রেখেছে।'

'সে আর কি বললো?'

'বললো, আমার লোকেরা তোমাকে নিরাপদে ইস্পাহানে পৌছে দেবে।'

'হ্যাঁ তার লোকদের আপনার সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবে। তারপর কি হবে জানেন? দেয়াল থেকে আপনার স্বামীর সব সম্পদ বের করে নেবে। আর সে জায়গায় তারা রাখবে আপনাকে। কেউ জানবে না কোথায় গায়েব হয়ে গেছেন আপনি। এই হাসান ইবনে সবার ফেরকার লোকেরা কয়েক বছর ধরে কাফেলা লুট করছে। কাফেলা থেকে এরা স্বর্ণালংকার, টাকা পয়সা এসব তো লুট করেই, সঙ্গে সঙ্গে কমবয়সী মেয়েদেরও অপহরণ করে নিয়ে যায়।'

'আমার প্রথম স্বামীও এক কাফেলায় মারা গেছে। আমার একমাত্র মেয়েটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে ওরা।'

'আপনার মেয়ে তাহলে ওদের কাছেই আছে।'

মায়মুনা কিছুক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। একটু পর দৃঢ় গলায় বললো,

'হ্যাঁ আমি সব বুঝে গেছি। আমি দেখেছি, এই হাসান ইবনে সবা যখন চোখে চোখ রেখে কথা বলে তখন তার এক একটি শব্দ ভেতরে এমনভাবে গেঁথে যায় যেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে। আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে, সেলজুকি সুলতান ও তার উমারারা নিজেদেরকে সঠিক আকীদার মুসলমান মনে করে এবং ইসলামের ধ্বজাধারীও ভাবে। অথচ দেশে কি হচ্ছে তারা সে স্পর্কে কিছুই জানে না।'

'তাদের আসল খবর না জানার কারণ আছে। তাদের গুপ্তচররা এসব বাতিল ফেরকার এলাকায় ঠিকই যায়। কিন্তু জাদু বা কৌশলে কোন কিছু পান করিয়ে ওদেরকে নেশাতুর করে ওদের দলে ভিড়িয়ে নেয় বাতিনীরা। তাদের কিছু তো উল্টো ঐ শয়তানদের গুপ্তচর হয়ে ফিরে আসে। তারপর প্রশাসনকে সেখানকার ভুল খবর দেয় এবং সেলজুকিদের তৎপরতার খবর নিয়ে এসে বাতিনীদের সতর্ক করে দেয়। আর যারা পূর্ণ সততার সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তি করে যায় রহস্যজনকভাবে তারা নিহত হয়ে যায়। হাসান ইবনে সবা গোয়েন্দা বাহিনীতে যে ব্যবস্থা রেখেছে এর মাধ্যমে তারা বাইরের গুপ্তচর দেখলেই চিনতে পারে। সামান্য সন্দেহযুক্ত কাউকে পেলেই তারা তাকে ওপারে পাঠিয়ে দেয়।'

'আপনি সব জেনেও কেন সুলতান মালিক শার কাছে এখবরগুলো পৌছাচ্ছেন না?'

'এই যে আমার সন্তানদের জন্য। আমি মারা গেলে ওদের কি হবে?'

'কিন্তু রায় বা মারুতে কিভাবে আমি যেতে পারবো? শুনেছি আমার মেয়ে আছে ওখানে। জানি না এটা কতটা সত্যি। কিন্তু সম্বল এখন আমার মেয়েটিই। যে করেই হোক আমাকে তার খোঁজে যেতে হবেই। মুশকিল হলো আমি এখন হাসান ইবনে সবার বন্দি। সেখানে পৌঁছতে পারলে আমি সুলতানের কাছেও যাবো।'

'এছাড়াও আপনার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। ঐ লোক শেষ পর্যন্ত আপনাকে খুন করবেই।'

এতক্ষণ লোকটির প্রায় সদ্যযুবা ভাইটি চুপচাপ শুনছিলো সবকিছু। এবার বলে উঠলো,

'উনার জন্য আমি একটা কিছু করতে চাই ভাইজান! উনি যদি পালাতে চান তাহলে আজ রাতেই তা করা উচিত। আমি উনার সঙ্গে যাবো। আমার কাছে একটি ঘোড়া আছে। আরেকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আর হ্যাঁ আমার কাছে ভাড়ার ঘোড়াও আছে। ঘোড়সওয়ারীতে আমি মোটামুটি পাকাই বলতে পারো। যে কোন ঘোড়া কাবুতে আনতে পারি আমি। যে কোন গতিতে ছুটাতে পারি ঘোড়া'– মায়মুনা বললো।

'ভাইজান কি আমাকে অনুমতি দিবেন না?' – যুবকটি তার বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করলো।

'এতো একটা জিহাদ। জিহাদে যেতে তোকে আমি কি বাঁধা দিতে পারবো মুযাম্মিল আফেন্দী?' – বড় ভাই বললো।

'শুকরিয়া ভাইজান!'

কিভাবে কি করতে হবে সবকিছু তারা ঠিক করে নিলো।

তারপর মায়মুনা চলে এলো হাসানের কামরায়।

'যাদের ওখানে গিয়েছিলো ওরা কারা? কেমন লোক ওরা?' – হাসান মায়মুনাকে কামরায় ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো।

'এমনিই সাধারণ লোক। ইস্পাহান যাচ্ছে। হাফিজ ইস্পাহানীকে চিনতো ওরা। তার ব্যাপারে আলাপ হলো।'

'ঠিক আছে, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তুমি আরাম করো।'

হাসান চলে যাওয়ার পর মায়মুনা তার অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিসপত্র মাঝারি ধরনের একটি থলিতে নিয়ে নিলো। তারপর সেটা খাটের নিচে রেখে দিলো। রাতে যখন হাসান গভীর ঘুমে মায়মুনা কোন শব্দ না করে উঠলো। খাটের নিচ থেকে পাটুলির মতো থলেটি নিয়ে আলতো পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। সরাইয়ের সবার ঘোড়া বাইরে বাঁধা ছিলো। ঘোড়ার জিন ইত্যাদিও সেখানে রাখা। মুযাম্মিল আফেন্দী দিনের বেলাতেই মায়মুনার ঘোড়াটি চিনে নেয়। রাত নির্জন হতেই মুযাম্মিল ঘোড়ার জিন ইত্যাদি বেঁধে দেয়।

মায়মুনা ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেলো। থলেটি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে সওয়ার হয়ে গেলো। মুযাম্মিলও সওয়ার হয়ে গেলো। খুব কম আওয়াজে ঘোড়া ধীরে ধীরে

হাঁটিয়ে শহরের দরজা পর্যন্ত পৌছলো। শহরের দরজা থেকে বের হয়েই দু'জনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটালো ঘোড়া।

'সে সেলজুকিদের কাছে চলে গেছে' – সকালে হাসান ঘুম থেকে উঠে মায়মুনাকে না পেয়ে অনেক খুঁজাখুজি করে। তার দুই সঙ্গীও অনেক খোঁজাখুঁজির পর এসে জানায় তার ঘোড়াটিও গায়েব। হাসান তখন একথা বলে – 'কাফেলা রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষা করবো না আমরা। তাড়াতাড়ি আমাদের ইস্পাহান পৌঁছা উচিত। সেখান থেকে খালজানের অবস্থা জেনে নিয়ে সেখানে যেতে হবে। আহমদ ইবনে গুতাশকে সতর্ক করাটা জরুরী।'

দু'টি উট তাদের আগেই ভাড়া করা ছিলো। উন্নত জাতের আরেকটি ঘোড়া ভাড়া নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো তখনই। তাদের সঙ্গে দুই উট ও এক ঘোড়ার মালিকরাও রওয়ানা দিয়ে দেয়।

মুযাম্মিল ও মায়মুনা খুব কম ছাউনি ফেলে এবং তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তিন দিনের দিন রায় পৌঁছে যায়। সোজা তারা আবু মুসলিমের বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছে। দারোয়ান তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে।'

'কি নাম আপনাদের? কোত্থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন এসব বলতে হবে।'

'আমাদের ঘোড়ার ঘাম দেখে কি বুঝছো তুমি? আমাদের মুখ দেখো, কাপড়ের ধুলো দেখো। আমীরে শহরকে বলো এক মা তার মেয়ের খুঁজে এসেছে' – মায়মুনা বললো।

একটু পর ওদেরকে আবু মুসলিম রাজীর কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো।

'মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছো?' – আবু মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন।

'বাগদাদ থেকে' – মুযাম্মিল বললো।

'ওহ! তাহলে তো অনেক দূর থেকে এসেছো? – মায়মুনার দিকে ফিরে বললেন আবু মুসলিম রাজী – দারোয়ান বলেছে তুমি নাকি তোমার মেয়ের খুঁজে এসেছো। কে তোমার মেয়ে? এখানে কি করে সে?'

'ওর নাম সুমনা। এক লোক বলছে সে আপনার এখানে আছে।'

'সুমনা? একজন সুমনা এখানে অবশ্য আছে' – তিনি এক পরিচারিকাকে ডেকে বললেন – 'সুমনাকে নিয়ে এসো।'

সুমনা সেখানে এলো।

দু'জনই দু'জনকে চিনতে পারলো। কিন্তু কেউ জায়গা থেকে নড়তে পারছিলো না। দু'জন দুজনের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎই যেন কেউ বিমূঢ়তার শিকল খুলে দিলো মা ও মেয়ের পা থেকে। উড়ে এসে দু'জনের বুকে দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুখে দু'জনার কান্নাভাঙ্গা হাসি। চোখে কৃতজ্ঞতার আঁসুবিন্দু।

'বেটি! তোমার মাকে চিনেছো তো সুমনা?' – আবু মুসলিম বললেন।

একথার উত্তরে সুমনা হুশ হুশ আওয়াজে কাঁদতে কাঁদতে তার মার বুকের ভেতর আরো সেধিয়ে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে আবু মুসলিম ও মুযাম্মিলের চোখও বাঁধ মানলোনা।

'আমি শুধু আমার মেয়ের খুঁজেই আসিনি আমীরে শহর!' – মায়মুনা মেয়েকে বহুকষ্টে নিজের বুক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো – 'আমার আরেকটা উদ্দেশ্য আছে। আপনি কি হাসান ইবনে সবাকে চিনেন?'

'হাসান ইবনে সবা! কেন? কেন চিনবো না? সুলতান তাকে জীবিত ধরার জন্য সালার আমির আরসালানকে হুকুম দিয়েছেন।'

১৬

সুলতান মালিক শাহ হাসানকে জীবিত ধরার জন্য আমির আরসালানকে হুকুম দিলেও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না।

'সে কোথায় আছে জানেন?'–মুযাম্মিল আফেন্দী আবু মুসলিম রাজীকে জিজ্ঞেস করলো।

'না, এই একটা প্রশ্ন যার জবাব কারো কাছেই নেই। একটা খবর পাওয়া গিয়েছিলো সে মিসর চলে গেছে। আবার জানা গেলো সে মিসর থেকে ফিরে এসেছে' – আবু মুসলিম রাজী বললেন।

আমরা তাকে বাগদাদ রেখে এসেছি। 'সে এখন ইস্পাহান যাবে। মিসরে সিকান্দারিয়া থেকে আমি ও আমার মরহুম স্বামী তার সহযাত্রী ছিলাম। এছিলো আমার দ্বিতীয় স্বামী। হলবে তাকে হাসান ইবনে সবা হত্যা করায়' – মায়মুনা বললো।

'হত্যা করায়? কিভাবে?

মায়মুনা পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললো –

'তারপর সে আমাকে জাদু দিয়ে সম্মোহন করে নেয়। এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলে যে, আমি তাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা মনে করতে লাগলাম। তার কথা শুনে আমি মেনে নিলাম আমার স্বামীর প্রাণ এক পিশাচ আত্মা কেড়ে নিয়েছে, আমার প্রাণও কেড়ে নেবে এবং মহাবুযুর্গ হাসান ইবনে সবা ঐ পিশাচের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে।'

'তার কাছে কি রেখে ছিলো তোমাকে সে?'

'সরাইতে সে পৃথক কামরায় ছিলো। পরে ভয় পেয়ে তার কামরায় পর্দা টাঙ্গিয়ে আমি থাকতে থাকি।'

'আমি হয়রান হচ্ছি তুমি তার পাঞ্জা থেকে কি করে বেরিয়ে এলে?'

'এই যে মুযাম্মিল আফেন্দী ও তার বড় ভাইয়ের কারণেই সেখান থেকে বেরোতে পেরেছি। ওদের কৃতজ্ঞতা কখনো ভুলতে পারবো না আমি।'

মুযাম্মিল ও তার বড় ভায়ের সঙ্গে ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ এবং হাসান ইবনে সবাকে নিয়ে আলাপ-ইত্যাদির ঘটনা সব শোনালো মায়মুনা।

'আমীরে শহর! মুযাম্মিল বললো – 'আমরা ইস্পাহানের পেশাদার ব্যবসায়ী। শহর থেকে শহরে এবং গ্রাম থেকে গ্রামে এমনকি দেশ বিদেশের যেখানে মানুষের সংস্পর্শে আসি প্রথমেই গভীর থেকে দেখতে চেষ্টা করি কোথাও ইসলামের প্রকৃত রূপকে বিকৃত করা হচ্ছে না তো!'

'তোমরা ঐসব কেল্লায় কি দেখে এসেছো?' – আবু মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন।

'ঐসব কেল্লা ঘেরা এলাকার লোকেরা হাসান ইবনে সবাকে আল্লাহর দূত মনে করে' মুযাম্মিল বললো –

'তাদের আকীদা হলো হাসান ইবনে সবা আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। তারপর আকাশে চলে গেছে। এরপর আরেকবার তার প্রকাশ হয়।'

'এর কিছু কিছু আমরা জেনেছি। কিন্তু লোকদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করবো না। এরা তো ফসলক্ষেত্রের মতো। শস্যক্ষেত্র তো যেকোন বীজই গ্রহণ করে। গাজা হিরোইনের বীজও সে উৎপন্ন করে আবার সুগন্ধিময় দুর্লভজাতের মেহদীও উৎপন্ন করে। আমরা ধরবো তাদের যারা মেহদী উৎপন্নকারী জমিনে গাজা উৎপন্ন করে।'

'আমার একটা সন্দেহ আছে আমীরে শহর! ওদেরকে আপনি ফৌজও বলতে পারেন অথবা ওদের জানবায অনুগামীও বলতে পারেন – ওদেরকে সত্যিই হাশীষ বা হিরোইন সেবন করানো হয়। নেশাকাতর অবস্থায় তাদের দিল দেমাগে হাসান ও আহমদরা নিজেদের কুফরী ও নাশকতামূলক চিন্তা চেতনা গেঁথে দেয়। এরা অন্যভাবেও লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আহমদ ইবনে গুতাশ লোকদের খাজনা এতটা কমিয়ে দিয়েছে যে, অতি দরিদ্র কৃষকরাও সহজে তা আদায় করতে পারে।'

'এরা কর খাজনা পুরোটাই মাফ করে দিতে পারে। কাফেলা লুট করে এরা 'কারুনের' চেয়েও বড় ধরনের ধনভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। লুটপাট তারা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ হত্যা এবং গুম করা এদের আসল রীতি। এই মহিলাকে দেখো, তার মেয়ে সুমনাকে হাসান ইবনে সবার লুটেরারা তার কৈশোরেই অপহরণ করে নিয়েছিলো। তার মাকে দেখো, তার দুই স্বামী ওদের হাতেই নিহত হয়েছে।'

'আমীরে মুহতারাম! আপনাদের সালার আমির আরসালান হাসানকে গ্রেফতারের জন্য কবে রওয়ানা হচ্ছেন?'

'এটা এখন জরুরী কথা নয়। জরুরী যেটা সেটা হলো, আমাকে বলো বাগদাদ থেকে তার কাফেলা কবে রওয়ানা হচ্ছে?'

'আমাদের আসার সময়তো ওদের রওয়ানার কোন চিহ্ন দেখিনি। আর রওয়ানা হলেও পথেই আছে ওরা।'

'তোমার ভাইয়ের কাছে কি তোমার যেতেই হবে?'

'যেতেই হবে। না হয় তিনি পেরেশান হবেন আমার জন্য। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, উনাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে এসেছি। তিনি ছিলেন আসলে হাসান ইবনে সবার হাতে বন্দি। হাসান ইবনে সবার খুনের হাত থেকে উনাকে আমি কেড়ে নিয়ে এসেছি। কোনভাবে সে যদি এটা জানতে পারে, আমাকে খুন না করে কি ছাড়বে'?

'তুমি একলা যাবে না। আমি মারু যাচ্ছি। সুলতানকে বলবো, এখনিই সালার আরসালানকে বাগদাদ পাঠাতে। ঐ কাফেলা ইস্পাহানের পথ ধরলে তাদের পিছু ধাওয়া করে হাসান ইবনে সবাকে পাকড়ে নিয়ে আসবে। তার সঙ্গে তোমার এমনিতেও

যেতে হবে। আমার মনে হয় আরসালান হাসানকে চিনে না। তুমি তাকে চিনিয়ে দেবে। আর সে তোমাকে তার নিরাপত্তায় রাখবে। তিন চার দিন তোমার থাকতে হবে এখানে এজন্যে। আমীরে আরসালান এখানে এসে তোমাকে নিয়ে রওয়ানা হবে। আবু মুসলিম মুযাম্মিলকে বললেন।'

★★★★

আবু মুসলিম রাজী সেদিনই মারু রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার হুকুমে মুযাম্মিল আফেন্দীর থাকার ব্যবস্থা করা হলো সে মহলেই। সুমনার মা মায়মুনাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সুমনার কামরায়।

সুমনার কামরা মুযাম্মিলের কামরা থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু সকাল থেকে এই বিকাল অবধি সুমনাকে একবারও দেখা যায়নি। সেই সকালের প্রথম দেখা থেকে সুমনার মুখটি মুযাম্মিলের চোখ থেকে মুহূর্তের জন্যও সরতে চাচ্ছিলো না। সুমনার রূপ যেকোন পুরুষের জন্য আরাধ্য হতে পারে। মুযাম্মিলের চোখও সে রূপে অভিভূত হয়েছে। কিন্তু সে রূপের ছায়া মুযাম্মিলের চোখে ঘুরছে না। ঘুরছে সুমনার ভেতরের যে নিটোল শুভ্রতা তার রূপের কায়াকে পবিত্র করে তুলেছে তার অধরা সেই ছায়াটি।

সুদর্শন রূপবান মুযাম্মিল অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে। রূপের সওদা নিয়ে অনেক মেয়ে তার কাছে সমর্পিত হতে এসেছে। সে সবের সাময়িক মুগ্ধতা তার চোখ থেকে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। কিন্তু এই সুমনা তার ভেতর যেন ক্ষণিকের ঝড়ে সব এলোমেলো করে দিয়েছে। মুযাম্মিল এই এলোমেলো ভাব যতই গুছাতে চাচ্ছে ততই আরো বিশৃংখল হয়ে পড়ছে। এমন অবস্থায় সে কখনো পড়েনি। সে কল্পনাও করতে পারছিলো না তার মতো এমন দৃঢ় পুরুষ এই দূরদেশে এসে এক মেয়ের ভাবনায় এমন ব্যাকুল হবে কোনদিন।

মুযাম্মিল চিন্তা করতে লাগলো কোন ছুতোয় মা মেয়ের ঘরে গিয়ে হানা দেয়া যায়। অযথাই কয়েকবার কামরা থেকে বের হলো সে, যদি দেখা হয়ে যায় কিংবা ওকে যদি সুমনার মা ডেকে নিয়ে যায় এই আশা।

সন্ধ্যা গভীর হওয়ার পর মুযাম্মিল মাত্র খাবার থেকে উঠেছে সুমনা কামরার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। মুযাম্মিল বিশ্বাস করতে পারছিলো না সে কি সুমনাকে দেখছে না আকাশ থেকে নেমে আসা হুর পরী দেখছে। সে তাকিয়ে রইলো সুমনার দিকে ঘোর লাগা চোখে।

'তোমার চেহারায় পেরেশানী দেখছি যে? তুমি কি বিস্মিত এত রাতে তোমার কামরায় এসেছি বলে?' – সুমনা স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল।

মুযাম্মিল তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলো না। যথাসম্ভব সপ্রতিভ গলায় বললো –

'হ্যাঁ সুমনা। আমি বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু তুমি যে সরল গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছো এতে আমার পেরেশানী দূর হয়ে গেছে। তোমাকে তো আমি হেরেমের সাধারণ একটি মেয়ে মনে করেছিলাম যে কৈশোরে অপহৃত হয়ে এখান পর্যন্ত পৌঁছেছে।'

'আমি অপহৃত হয়েছি ঠিক কিন্তু কারো হেরেমে বন্দি ছিলাম না আমি। না আমাকে দেহ বিনোদনের কোন উপকরণ বানানো হয়েছিলো। আমাকে এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো, যে কোন পাথর-দিল মানুষকেও আমি মোমের মত গলিয়ে নিজের মতো ব্যবহার করতে পারি।'

'দুঃখিত সুমনা! তোমাকে সেভাবে আমি হেরেমের কথা বলিনি। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ কে দিয়েছিলো তোমাকে?'

'হাসান ইবনে সবার দল। কিন্তু মুযাম্মিল আমি তোমাকে এই কাহিনী শোনাতে আসিনি যে, আমি কি ছিলাম এবং এখন কি?'

প্রথম আলাপেই যে এরা নিজেদেরকে 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' করে সম্বোধন করছে সে বোধও ছিলো না তাদের। যেন তারা কতকালের পরিচিত।

'পুরো কাহিনী না হলেও কিছু কিছু তো অবশ্যই আমি জেনে নেবো' – মুযাম্মিল জোর দিয়ে বললো – 'তুমি যেমন সরল গলায় আমার সঙ্গে কথা বলেছো আমিও সেরকম নিশ্চয় তোমার সঙ্গে কথা বলার অধিকার রাখি। অবশ্য ভালো না লাগলে আমাকে থামিয়ে দিয়ো।'

'আফেন্দী! তুমি হয়তো আমাকে একটি বেপরোয়া মেয়ে ভাবছো। কিন্তু সে মানুষই আমার পছন্দ যার মুখ বুক এক কথা বলে।'

'সুমনা! আমার কথাগুলো হয়তো তোমার মতো দৃঢ়চেতা একটি মেয়ের কানে মোটা–স্থূল শোনাবে কিন্তু তোমার একথা শোনার পর আমার বুকের কথাই আমার মুখে উচ্চারিত হবে...........

'আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেই তোমার কাছে সহজ স্বীকারোক্তি দিচ্ছি– বুক থেকেই তোমার নামটি আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। আজই তোমাকে দেখলাম আমি এবং আমার অন্তর বলেছে, এই মেয়ের এই রূপ দৈহিক নয় আত্মিক রূপের আলোকচ্ছটা। আমার কাছে মনে হয়েছে সেই কৈশোর থেকে তোমাকে চিনি এবং কৈশোর থেকেই তুমি আমার অন্তরে। আমার কথা অতিরঞ্জিত মনে হলে শুধু এটুকু মনে রেখো, আমি প্রাণের আশংকা নিয়েও আমার মাতৃতুল্য এক নারীকে এখানে নিয়ে এসেছি। না তোমাকে খুশী করার জন্য উনাকে এখানে নিয়ে আসিনি। তোমাকে তো চিনতামই না। জানতামনা যে এক প্রতারিত নারীকে শয়তানের জাল থেকে বের করে নিয়ে আসছি। তিনি বলতেন আমার মেয়ে সেলজুকিদের কাছে আছে। আমি এটাকে শুধু এক সন্তানহারা মায়ের আবেগসিক্ত কল্পনাই মনে করতাম। তাকে আবু মুসলিন রাজীর কাছে রেখে ফিরে যাবো এই চিন্তা করেই এসেছিলাম আমি।'

'আমি বুঝতে পেরেছি আফেন্দী! তুমি যে আমার জন্য আসোনি তাও জানি আমি।'

'এটা কাকতালীয়, দৈবক্রম বা লৌকিক সবই বলতে পারো যে, তোমাকে এখানে পেয়েছি আমি।'

'মহান আল্লাহ আমার তাওবা কবুল করেছেন এটা তার অনেক বড় পুরস্কার। আমার দিল দেমাগ চিন্তা-চেতনা শয়তানের কুমন্ত্রণায় লালন পালন করা হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সজাগ করে দিয়েছেন। আমি ভাবিনি, শয়তানের অশুভতা থেকে

পবিত্র হয়ে মানুষের কাতারে আসতে পারবো। কিন্তু এই সত্য আমার কাছে ধরা দিয়েছে, মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষই। তার প্রথম ও শেষ পরিচয় সে মানুষ। হ্যাঁ অবস্থা কখনো তাকে শয়তানের দিকে নিয়ে যায়। শয়তানের সবকিছুতেই সে উপভোগের আনন্দ পায়। সে শয়তানের পূজারী হয়ে যায়।'

'তবুও সে মানুষের আদলে আসে। শয়তানের আদলে তার অবয়ব পাল্টে যায় না। তখনই সাধারণ মানুষ তার কাছে প্রতারিত হয়। তবুও মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। সে যদি একবার বুঝতে পারে আল্লাহর দৃষ্টিতে তার অবস্থান কোথায় তখন সে এক ঝটকায় শয়তানের পাঞ্জা থেকে বের হয়ে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে ছুটতে থাকে .... আমার বেলায় তাই হয়েছে। আর এর পুরস্কারস্বরূপই আল্লাহ আমার হারিয়ে যাওয়া মাকে এনে দিয়েছেন।'

'কিন্তু তোমার এই ষোড়শী বয়সে এই রূপ, এই গাম্ভীর্যতা?'

'কেন এই গাম্ভীর্যতা কি তোমার ভালো লাগেনি?'

'হ্যাঁ আমার তো ভালো লেগেছে এটাই। আমি বলতে চেয়েছি তোমার এই বয়সেই তুমি এতখানি পরিণত ...... তুমি চেয়েছো অন্তরের কথা যেন মুখের কথার সঙ্গে মেলে .... তাহলে আমার অন্তরের আওয়াজ শুনে নাও সুমনা! আমি তোমার সেই পবিত্র ভালোবাসা জায়গা করে নিয়েছি আরেক পবিত্র অন্তরে এবং অন্তরের সঙ্গেই শুধু যার সম্পর্ক। এমন দুর্লভ প্রেমকাহিনী তুমি নিশ্চয় শুনেছো।'

সুমনা চমকে উঠলো। সে যেন ভয় পেয়েছে এমনভাবে চোখ বড় বড় করে মুযাম্মিলের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন এই সুদর্শন যুবকটি বলছে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

'কেন সুমনা! এমন করছো কেন? আমি কি তোমাকে কষ্ট দিলাম?'

'না আফেন্দী! আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার প্রেম আর মৃত্যুর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ঘটবে না।'

আফেন্দীর পুরো অস্তিত্বই যেন প্রশ্নবাণে জর্জরিত।

'আজ আমি অন্য কিছু বলতে এসেছিলাম। তুমি যে আমার মাকে এখানে নিয়ে এসেছো এজন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না। তাই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি আল্লাহর দরবারে এজন্যে যে, আমার মা আমাকে মানুষ রূপে পেয়েছেন। এর আগে দেখলে তিনি বলতেন– না, এ আমার মেয়ে নয়।'

একথা বলে সুমনা উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি যাচ্ছো?' – আফেন্দী কোনক্রমে বললো – 'আমি কি বুঝবো? তুমি কি রেগে চলে যাচ্ছো .....?'

'কাল আসবো আমি। না রাগ করে চলে যাচ্ছি না আমি। এত অভদ্র নই আমি। কাল তোমার সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ে কিছু কথা বলবো।'

কাটা কাটা শব্দে কথাগুলো বলে সুমনা চলে গেলো।

★ ★ ★ ★

নির্ঘুম একটি রাত পার করলো মুযাম্মিল আফেন্দী। সকালের নাস্তা সবে আফেন্দী শেষ করেছে এমন সময় কামরায় ঢুকলো সুমনা ও তার মা মায়মুনা।'

'মুযাম্মিল! আমার মেয়ে বলেছে তুমি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করেছো' – মায়মুনা খাটের এক পাশে বসতে বসতে বললো।

'না' – মুযাম্মিল বললো– 'নিজের জন্য পছন্দ করার আরো অর্থ আছে। সুমনা বাজারের কোন মেয়ে নয় যে, ওকে আমার পছন্দ হলো আর আমি তা কিনে নিলাম। সোজা ব্যাপার হলো সুমনার ভালোবাসা আমার আত্মায় মিশে গেছে। সুমনা আমাকে গ্রহণ না করলেও আমার অন্তরে ওর নাম সজীব থাকবে অনেক দিন।'

'তোমাকে গ্রহণ করা না করার ফয়সালা করবে সুমনা। কিন্তু তুমি কি ওকে বিয়ে করতে চাও?' – মায়মুনা জিজ্ঞেস করলো।

'তখনই ওকে বিয়ে করবো যখন সে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করবে। কিন্তু মুহতারাম মা! আমি এখন বিয়ের কথা বলবো না। যে জন্য আমি এখানে রয়ে গেছি সে কাজটা আগে করবো আমি ..... হাসান ইবনে সবার গ্রেফতারি ...... সুলতান হুকুম দিয়েছেন, হাসান ইবনে সবাকে জীবিত তার সামনে উপস্থিত করতে। কিন্তু আমার সামনে সে পড়লে তাকে জীবিত ছাড়বো না আমি। আমার তলোয়ার তার রক্তের জন্য বড় তৃষ্ণার্ত।'

'একি এজন্য যে, সে আমার প্রথম স্বামীকে ডাকাতদের হাতে হত্যা করিয়েছে? এজন্য যে সে আমার দ্বিতীয় স্বামীকেও হত্যা করিয়েছে? নাকি আমাদের মা মেয়েকে খুশি করার জন্য?' – মায়মুনা সরাসরি জিজ্ঞেস করলো।

'কখনোই না। কারো খুশি অখুশি আমার কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ ও তার রাসূল (স) এর খুশিই আমার জন্য যথেষ্ট। অসংখ্য অসহায় নারীকে হাসান বিধবা করেছে, অসংখ্য শিশুকে অনাথ করেছে, সে ইসলামের প্রাণবন্ততাকে হত্যা করেছে।'

'আফেন্দী!' – সুমনা তার অজান্তেই বলে উঠলো– যদি তুমি ঐ ইবলিসকে হত্যা করতে পারো খোদার কসম! আমার এই দেহ, এই আত্মা সেদিনই তোমার পায়ে সপে দেবো।'

'ওর কাছ থেকে আমার দুই স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। সে আমার মেয়েকে দিয়ে যে ঘৃণ্য কাজ করিয়েছে আমি এরও প্রতিশোধ নেবো – মায়মুনা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো।

'কিন্তু মা!' – সুমনা বললো – 'আপনি ও আফেন্দী যে আবেগ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন তা কি বুঝতে পারছেন? আপনারা হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করা যতটা সহজ ভেবেছেন আসলে কি অতটা সহজ তাকে হত্যা করা? তার সঙ্গে আমি থেকে এসেছি। কেউ যদি তাকে হত্যা করতে যায় তাহলে তাকে দেখে চিন্তায় পড়ে যাবে – একে হত্যা করা ঠিক হবে কি না।'

'আমি ওর এই শক্তি দেখে এসেছি। একে আমি জাদু না বললে ভুল হবে' – মায়মুনা বললো।

'শক্তি বলুন আর জাদু বলুন, ওকে আমি যতটুকু জানি আপনারা দু'জন ততটুকু জানেন না। আমি বলতে চাচ্ছি ওকে হত্যা করার অন্য কোন কৌশল ভাবতে হবে। ওকে ধরার জন্য সুলতান ফৌজ পাঠাচ্ছেন, আমি আপনাদের বলছি সে ধরা পড়বে না। ধরা পড়লেও চমৎকার কোন ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যাবে। ওকে হত্যা করার জন্য কেরামতিদের ব্যবহার করলে হয়তো সফল হওয়া যাবে।'

'এটা কোন যুক্তিতে বলছো তুমি?'–মুযাম্মিল আশ্চর্য গলায় সুমনাকে জিজ্ঞেস করলো।

'এই যুক্তিতে যে, আমি হাসানের সঙ্গে ছিলাম। তিন চারবার তার মুখ থেকে শুনেছি – 'একমাত্র কেরামতিয়ারাই আছে যাদের ব্যাপারে আমি শংকিত।' এর কারণ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলেছে, কেরামতিয়ারা রক্তপায়ী মানুষ। তাদের ইতিহাসে খুনখারাবি ছাড়া আর কিছুই নেই। কেরামতিয়ারা পবিত্র কাবাতেও মুসলমানদেরকে পাইকারী দরে হত্যা করেছে।

'কিন্তু এখন তো আর কেরামতিদের মধ্যে সে ব্যাপার নেই' – মুযাম্মিল বললো।

'আমি কিন্তু কথা বলছি হাসান ইবনে সবার। সে দুনিয়ার কাউকেই ভয় পায় না। আল্লাহকেও নয়। কিন্তু তার ভেতর কেরামতিদের ব্যাপারে সবসময় একটা ভয় কাজ করছে। একবার সে আমাকে এক মা-ছেলের একটি ঘটনা শোনায়। সে বলতো এটি সত্য ঘটনা। ঘটনাটা ঘটে বাগদাদের বিখ্যাত এক ডাক্তার আবুল হাসানের সঙ্গে......

'সেই ডাক্তারের কাছে একবার কাঁধে লম্বা এবং গভীর একটি ক্ষত নিয়ে এক মহিলা আসে। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করেন কি করে সে আঘাতপ্রাপ্ত হলো। মা কুল কুল করে কেঁদে বললো, তার এক যুবক ছেলে কিছু দিন লাপাত্তা ছিলো। মহিলা শহর বন্দর কোন জায়গা খুঁজতে বাদ রাখেনি কিন্তু ছেলেকে খুঁজে পায়নি ..... 'রাক্কা' নামক এক শহরে থাকতো ওরা। ওখানেও তার ছেলে ছিলো না। কেউ তাকে বললো, বাগদাদে গেলে হয়তো সে তার সন্ধান পাবে। মা বাগদাদ রওয়ানা হলো। ক্লান্ত শ্রান্ত মা বাগদাদের কাছে পৌঁছতেই ছেলেকে দেখতে পেলো। ছেলে কেরামতিদের এক ফৌজের সঙ্গে যাচ্ছিলো। দেখে মার ভেতর শুকিয়ে গেলো। ছেলের নাম ধরে মা ডাকলো। ছেলে তাকে দেখতেই বের হয়ে এলো ফৌজ থেকে। জড়িয়ে ধরলো মা ছেলেকে। তারপর কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অভিমান ভরা গলায় অভিযোগ করতে লাগলো ছেলে তার মাকে ভুলে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি .....

'ছেলে নির্বিকার গলায় বললো– এসব বাজে কথা বন্ধ করো মা! আগে বলো তোমার ধর্ম কি? মা পেরেশান হয়ে বললো, হা-রে, বাইরে বাইরে ঘুরে পরদেশী হয়ে তোর মাথা কি বিগড়ে গেছে? আমি সে ধর্মই মানি যা আগে মানতাম। সেটা হলো দীনে ইসলাম। এটাই সত্য ধর্ম। ছেলে ফেটে পড়ে বললো, বাজে কথা বলোনা মা! সেটা মিথ্যা ধর্ম যা আমরা মানতাম। আমি এখন যে ধর্মের পূজারী সেটাই সত্যধর্ম। সেটা হলো কেরামতি। ইসলামকে মানলে তুমি কেরামতি ইসলাম মানো .....

'মার যেন মাথা ঘুরে উঠলো। ঘুরেই ছেলের মুখে এক থাপ্পর মেরে বললো, হতচ্ছাড়া! কানে হাত দে, তওবা কর। আল্লাহর কাছে মাফ চা! ..... ছেলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মার দিকে তাকালো, তারপর ধুপধাপ পা ফেলে ফৌজের মধ্যে ভিড়ে গেলো। যে ছেলের জন্য মা এত ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে অবশেষে ছেলেকে পেয়েছে সে ছেলেকে আবার হারিয়ে মা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ....

বাগদাদ কাছে ছিলো। অনেকক্ষণ পর মা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে বাগদাদ পৌঁছলো। তার চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরছিলো। আরেক মহিলা এই মার প্রতি সহমর্মী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোন পাষাণ্ড তোমাকে কাদাচ্ছে গো! মা মহিলাকে সব কথা শোনালো। মহিলা বললো, সে হাশেমী খান্দানের। সে ইসলাম ছেড়ে কেরামতী হয়নি বলে কেরামতীদের কয়েদখানায় তাকে বন্দি থাকতে হয়েছে ....

'সে মহিলা এক ব্যথিত মা-কে তার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় আবার সেই কেরামতি ছেলে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। মাকে সে জিজ্ঞেস করলো, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো এখন.............?'

'মা বললো, আমি আমার গোমরা ছেলেকে ত্যাগ করার ফায়সালা করেছি। ছেলে চোখের পলকে তলোয়ার বের করে চিৎকার করে বললো– আমি আমার মাকে কেরামতি ধর্মের জন্য কুরবানী দিচ্ছি। একথা বলেই সে স্বজোরে মার ওপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। মা একপাশে সরে গেলো। কিন্তু তলোয়ারের আঘাত তার কাঁধের ওপর পড়লো। লোকেরা দৌড়ে এসে কেরামতি ছেলেকে ধরে ফেললো। মা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলো, তারপর ডাক্তার আবুল হাসানের কাছে চলে এলো।'

পরে মার ওপর হত্যার জন্য হামলা করার অপরাধে সেই ছেলেকে ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয়। একদিন মা তার যখমের ওপর নতুন ব্যান্ডেজ বাধার জন্য ডাক্তারের কাছে আসছিলো। পথে দেখলো একদল কয়দীকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মা সেখানে তার ছেলেকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো 'আল্লাহ তোর ভালো না করুন। যে তার সত্যধর্মকে বাতিল বলেছে এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যাপারে বেয়াদবী করেছে তার ধ্বংস হোক। এই কয়েদী থেকে তোর যেন কোন দিন মুক্তি না মেলে।'*

সুমনা এ ঘটনা শুনিয়ে বললো,

'হাসান ইবনে সবা বলতো, আমিও এরকম শিষ্য চাই যে তার আকীদার জন্যে তার মা-বাবা এবং নিজ সন্তানকেও জবাই করতে পারবে– হোক না সেটা মিথ্যা আকীদা।'

'কিন্তু আমরা কেরামতিয়া পাবো কোথায়?' – মুযাম্মিল আফেন্দী জিজ্ঞেস করলো।

'পেয়ে যাবো বা ইসলামের জন্য কেরামতি তৈরী করতে হবে। আমীরে শহরের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে কথা বলবো। তবে এখন নয়। এখন তো উনি ফৌজ পাঠাচ্ছেন। আল্লাহ করুন সে ধরা পড়ুক। ধরা না পড়লে কেরামতিয়ারই ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সুমনা! আমি যদি সেই কাজ করে দিতে পারি যেটার ব্যাপারে তুমি মনে করছো কেরামতিয়াদের ছাড়া আর কেউ পারবে না তখন' .....?

'তাহলে তুমি যা চাইবে আমীরে শহর থেকে তা নিয়ে দেবো।'

'না সুমনা' – মুযাম্মিল আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো – 'আমি কোন আমীর, কোন ওযীর বা সুলতান থেকে পুরস্কার চাই না – একথা বলে সে সুমনার চোখে চোখ রেখে তীর্যকভাবে তাকিয়ে রইলো।

মায়মুনা উঠে দাঁড়ালো এবং কিছু না বলে সুমনাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

---

* ইবনে আছীর : তারীখে কামিল : খ: ৭, পৃ: ১৭৩

★ ★ ★ ★

আমীরে শহর আবু মুসলিম রাজীর মহলের পেছনে ঘন বৃক্ষে ছাওয়া একটি চমৎকার বাগান আছে। এমন নির্জন সবুজ বাগান রায় শহরে আর একটিও নেই।

সেদিনই বিকালে সুমনা হঠাৎ মুযাম্মিলের কামরার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বললো – 'আমি বাগানে যাচ্ছি, ইচ্ছে হলে এসো ওখানে' – এই বলে চলে গেলো সুমনা।

দু'জনে বৃক্ষ লতার আড়াল হওয়া একটি মনোরম কোণে গিয়ে বসলো।

'তাহলে কি তুমি আমার .... গ্রহণ করে নিয়েছো?' – মুযাম্মিল প্রত্যাশার গলায় কোন মতে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি তো তোমার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করিনি, কিন্তু মুযাম্মিল! তোমাকে সতর্ক করে দেয়া জরুরী মনে করছি এজন্য যে, আমার ভালোবাসা তোমার জন্য হয়তো জ্বালাই বয়ে আনবে। হাসান ইবনে সবার ওখানে আমাকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো যে, যাকে তুমি জালে জড়াবে তার ওপর নেশা হয়ে সওয়ার হও এবং তাকে টেরও পেতে দিয়োনা সে ভয়ংকর এক প্রতারণার শিকার হচ্ছে। মারুতে আমি আমার এই বদ শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সত্যিকার এক আবেদ ও বিচক্ষণ লোককে আমার মুঠোয় পুরে নিয়ে ছিলাম। পরে আমার এসব কিছু কোন এক কারণে ফাঁস হয়ে যায়। আমি হাসানের ব্যাপারও ফাঁস করে দিই ....

'আমি এখানে এসে আমীরে শহর আবু মুসলিম রাজীর কাছে আশ্রয় চাইলে তিনি আমাকে আশ্রয় দেন। আমি অনুভব করি আমার মধ্যে ন্যূনতম মানবতা এখনো জীবিত আছে। তাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই নিজেকে ইবলিসের অশুভতা থেকে পবিত্র করতে হবে। আবু মুসলিম রাজী আমাকে সত্যিকার এক অধ্যাত্ম পুরুষের কাছে সোপর্দ করেন। তাকে আমি আমার পীর মুরশিদ মেনে নিই। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ। আমি তার যথাসাধ্য সেবা করার চেষ্টা করি। কিন্তু এক সময় আমার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েন।'

সুমনা মুযাম্মিলকে নুরুল্লার পুরো ঘটনা শোনালো।

'আমি জানি তিনি নিজেকে মৃত্যুর শাস্তি দিয়েছেন' – সুমনা বললো– তিনি তো মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু আমার ভেতর আশ্চর্য এক অস্থিরতা এখনো তাড়িত হয়। আমার অস্তিত্বের ব্যাপারে নিজের মধ্যে কেমন ঘৃণা বেড়ে গেলো। মনের মধ্যে কাজ করতে শুরু করলো, প্রতিটি সুন্দরী নারী শয়তানের গুটি। আবু মুসলিম রাজী বলেছেন, সুন্দরী এক মেয়ের মধ্যে এমন শক্তি থাকে যে, সে যেকোন পুরুষের ঈমানকে ধ্বংস করে তার মধ্যে শয়তানকে জাগিয়ে তুলে। কিন্তু দৃঢ় ঈমানের অধিকারীকে শয়তান কিছুই করতে পারে না।'

'তুমি আমাকে এ ঘটনা কেন শোনালে?'

'কারণ .... কারণ তোমার ভালোবাসা আমার অন্তর গ্রহণ করে নিয়েছে' – এই প্রথম সুমনাকে মুযাম্মিল রমণীয় সুলভ লজ্জারাঙা হতে দেখলো। সুমনা মুযাম্মিলের দিকে না তাকিয়েই বললো– 'তুমি একজন আমীরজাদা হলে আমার কাছে সাধারণ হতে। কিন্তু তোমার মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যা সবার মধ্যে নেই। আমার ভয় হয় আমাকে রূপবতী মেয়ে মনে করে আমার ভালোবাসা যদি তোমার মনকে নেশাকাতর করে তুলে

তাহলে নিজেকে আমি অপরাধী ভাববো। কখনো সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ করি কেন আমাকে নারী বানানো হলো .... সেই কৈশোরে আমি অপহৃত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি যে জীবন কাটিয়েছি তার সব শুনলে আজো হয়তো আমাকে তুমি বিশ্বাস করবে না। আমাকে তুমি এক মনোলোভা প্রতারক বলবে। তবে আমার সত্তায় যে পরিবর্তন দেখছো এতে আমার কোন হাত নেই। এটা এক মুজিযা। আমি বুঝে নিলাম, মহান আল্লাহ তার সত্যধর্মের জন্য আমাকে দিয়ে কিছু একটা করাতে চান।'

'জানি না তুমি এটা বুঝেছো কিনা – মহান আল্লাহ তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমার সঙ্গে যে আমার এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাত ঘটলো এর নিশ্চয় মহৎ কোন উদ্দেশ্য আছে। আর বিধাতাই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন – তুমি ঠিকই বলেছো যে, রূপসী ভেবে যেন তোমার প্রেমে নেশাকাতর হয়ে না পড়ি .... না সুমনা! আমি এমন করবো না। সেই স্থূলতা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। প্রথমেই তোমাকে বলেছিলাম তোমার মধ্যে আমি অন্যকিছু দেখেছি।'

'সেই অন্য কিছুটা তোমাকে বলছি আমি। সেটা হলো হাসান ইবনে সবাকে আমি হত্যা করতে চাই। সে আমার আপন এবং সতালু পিতাকে হত্যা করেছে। আমার মাকে করেছে দুই দুইবার বিধবা। এতো আমার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ। দ্বিতীয় ব্যাপার হলো ইসলাম। সে নিজেকে ইসলামের ধ্বজাধারী বলে ইসলামের শিকড় উপড়ে ফেলছে। আর হ্যাঁ সে আমাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে। তার এক লোকের ঘরে আমাকে বন্দি করে রাখে সে। সে লোকের মহৎ প্রাণ এক স্ত্রী কোনভাবে জানতে পারেন আমাকে খুন করা হবে। রাতে আমাকে তিনি পালিয়ে আসার সব ব্যবস্থা করে দেন। তারপর আমি আবু মুসলিমের কাছে এসে আশ্রয় নিই।'

'হ্যাঁ একই সংকল্প আমারও। আমাকে তা পালন করতে হবে। আমি ব্যর্থ হলে তুমি এগিয়ে যেয়ো। আমি জীবিত থাকতে তোমাকে আমি আমার আগে যেতে দেবো না সুমনা! ফৌজের সঙ্গে যাচ্ছি আমি। সালার আরসালান সুলতানের নির্দেশমতে হাসান ইবনে সবাকে জীবিত গ্রেফতার করবে। কিন্তু ওকে আমি ওখানেই হত্যা করবো।'

দু'জনে কথা বলতে বলতে ওরা পরস্পরের হৃদয়ের উষ্ণতায় পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলো। সুমনা যখন বাগান থেকে বের হলো মুযাম্মিলের ভালোবাসা তার অন্তরময় সিক্ত করে তুলেছে তখন।

তিন-চারদিন পর মারু থেকে ফিরে এসে আবু মুসলিম মুযাম্মিলকে ডেকে পাঠালেন। সালার আমির আরসালানও ফৌজ নিয়ে এসে গেছেন।

'পাচশ সওয়ারের একটি ফৌজ এসেছে' – আবু মুসলিম মুযাম্মিলকে বললেন – 'আজই যত দ্রুত সম্ভব রওয়ানা দিতে হবে। কাফেলা বাগদাদ থেকে বের হয়ে গেলে তার পিছু ধাওয়া করতে হবে। হাসান ইবনে সবাকে তুমি চেনো। আরসালান চিনে না। আর তুমি আমাদের মেহমান। সৈন্য অফিসার বা কর্মচারী নয়। এজন্যে তোমার ওপর এ দায়িত্ব বর্তায় না যে, সেখানে লড়াই শুরু হলে তোমাকেও লড়তে হবে।'

'সেখানে লড়াই হবে বলে আপনি কি আশা করছেন?' – মুযাম্মিল বললো।

'হ্যাঁ, তুমি হয়তো জানো না, যাকে তুমি কাফেলা বলছো তাতে রীতিমতো হাসান ইবনে সবার লড়াইয়ের মতো লোকজনও আছে।'

'যদি লড়াই পর্যন্ত ব্যাপার গড়ায় তাহলে আমি দেখবো না লড়াই করা আমার দায়িত্ব কি-না।

সুলতান যদিও হাসানকে জীবিত ধরার হুকুম দিয়েছেন কিন্তু ওকে আমি পেলে জীবিত রাখতে পারবো কিনা এ মুহূর্তে বলতে পারছি না।'

'আমিও তো তাই চাই। ঐ লোককে আমিও জীবিত দেখতে চাই না। যা হোক আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি কোন হুকুম বা বাধ্যবাধকতা নেই।'

★★★★

বিকাল গড়ানোর পর আমির আরসালানের নেতৃত্বে পাঁচশ সওয়ারের দলটি রওনা করলো।

ওদেরকে কেউ বলার মতো ছিলো না যে, হাসান ইবনে সবা কাফেলা ত্যাগ করে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে সেদিনই ইস্পাহানের দিকে রওয়ানা হয় যেদিন মায়মুনা ও মুযাম্মিল বাগদাদ ত্যাগ করে।

চলার গতি দ্রুত রেখে সওয়ার দলটি কয়েক দিন পরই বাগদাদ পৌঁছলো। কিন্তু দেখা গেলো কাফেলা আরো তিন দিন আগে বের হয়ে গেছে। আমির আরসালান ফৌজকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে সেখান থেকে আবার কাফেলার পিছু কোচ করালেন। কাফেলা যেহেতু তিন দিন আগে রওয়ানা হয়েছে তাই কাফেলাকে ধরতে এই সওয়ার দস্তার জন্য দুদিন তো অবশ্যই লাগবে। আমির আরসালান দস্তাকে শুধু একটি ছাউনিতে বিশ্রাম করিয়ে সবসময় দ্রুত রাখলেন চলার গতি।

পরদিন। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। ছোট্ট সেনাদলটি এক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নামছিলো। ছোট একটি মোড় ঘুরতেই পাহাড়ের নিচ দিয়ে চলন্ত কাফেলা তাদের নজরে পড়লো। কাফেলার লোকসংখ্যা প্রায় হাজারখানেক হবে। আমির আরসালান তার দলকে থামালেন।

'একটু ভেবে নাও আফেন্দী!' – আমির আরসালান মুযাম্মিল আফেন্দীকে বললেন – 'আমরা যদি কাফেলার পেছন দিয়ে যাই তাহলে কাফেলা আমাদেরকে ডাকাত মনে করে পালাবে। আমাকে বলা হয়েছে, হাসান ইবনে সবা ও তার সঙ্গীরা এত ধূর্ত যে পাহাড়ের মধ্যে ওরা গায়েব হয়ে যাবে।'

'এতো আমিও জানি' – মুযাম্মিল বললো – 'হাসানের স্বভাব ধূর্ত শেয়ালের মতো। আমাকে বলা হয়েছে, সে চোখের পলকে গায়েব হয়ে যায়। তাই কাফেলাকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে নিতে হবে।'

আমির আরসালান অভিজ্ঞ সালার। তার ছোট সেনাদলকে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে এক অংশের কমান্ডারকে কাফেলা দেখিয়ে বললেন, সে যেন দূর থেকে ঘুরে গিয়ে ঐ সামনের উপত্যকার সামনের অংশে পৌঁছে এবং কাফেলার পথ এমনভাবে আগলে দাঁড়ায় যে, কেউ পালানোর বা লুকানোর সুযোগ না পায়।

দ্বিতীয় অংশে রইলেন আমির আরসালান নিজেই। আগের অংশ যখন কাফেলার পথ আগলে দাঁড়াতে যাবে তখনই তিনি তার অংশকে আগে বাড়াবেন। প্রথম অংশের সওয়াররা যখন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দূরে চলে গেলো আমির আরসালান তার সওয়ারদের নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন। উঁচু পথে তিনি এ কারণে যেতে চাচ্ছিলেন না যে কাফেলার কেউ যদি তাদেরকে দেখে ফেলে তাহলে কাফেলার সবাইকে সতর্ক করে দেবে এবং হাসান ইবনে সবা পালানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। কাফেলা নিজস্ব গতিতে এগুচ্ছিলো।

ঐ দিকে কাফেলা সামনের পাহাড়ি পথে ঢুকার আগে কাফেলারই চার পাঁচজন লোক কাফেলার গতিরোধ করে ঘোষণার সুরে বললো,

'আমরা বিপজ্জনক একটি জায়গায় এসেছি। কয়েকটি কাফেলা এখানে লুট হয়েছে। ডাকাতরা মালপত্র তো নিয়েছেই যুবতী মেয়েদেরও ধরে নিয়ে গেছে। যুবকরা সবাই সতর্ক হয়ে যাও। যার কাছে যে হাতিয়ারই আছে তা হাতে নিয়ে নাও। মহিলা ও শিশুদের কাফেলার বাইরের দিকে এক জায়গায় একত্রিত করে নিজেদের বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে যেন অগ্রসর হয়। কারো ওপর যেন ডাকাতদের ভীতি ছড়িয়ে না পড়ে। দেখা যায় এই ভয়ের কারণে সবাইকে এত দুর্বল করে দেয় যে, ডাকাত দেখলেই তখন প্রাণ নিয়ে সবাই পালিয়ে যায় বা হাতিয়ার ফেলে দেয়।'

দেখতে দেখতে চারশরও বেশি যুবক ও প্রৌঢ় লোক কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে কাফেলার চার পাশে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের কারো ছিলো তলোয়ার, কারো কাছে বর্শা কারো কাছে খঞ্জর। এরা সবাই সেনার মতো কাফেলাকে বেষ্টনীতে নিয়ে বড় সারি করে এগুতে লাগলো। দুই পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছেও শৃংখলা না ভেঙ্গে সারিবদ্ধতা বজায় রাখলো কাফেলা।

আসরের সময় ছিলো তখন। কাফেলার সামনে আচমকা কয়েকটি সাওয়ার দেখা দিলো।

'হুশিয়ার হয়ে যাও। ডাকাতরা এসে গেছে। ভয় নেই। আমরা লড়বো – উত্তেজিত কণ্ঠে একজন গোষণা করলো।

'আমরা ডাকাত নয়। ভয় নেই। যেখানে আছো দাঁড়িয়ে যাও'– সওয়ারদের কমাণ্ডার বললো।

'বুযদিল ডাকুরা! এগিয়ে এসো! আমরা লড়াই করবো।' – কাফেলা থেকে চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

কমাণ্ডার তার সওয়ারদের এগিয়ে না নিয়ে বুদ্ধিমানের মতো একটি কাজ করলো। তার সওয়ারদের দু অংশে ভাগ করে দুই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে চড়তে বললো এবং ঘোষণা করে দিলো, কাফেলার কেউ যেন লড়াইয়ের বোকামি না করে। আমরা সুলতানের ফৌজের সিপাহী। তোমাদের নিরাপদে রাখা আমাদের জন্য জরুরী।'

এসময় আমির আরসালান তার সওয়ারদের নিয়ে কাফেলার পেছনে চলে এলেন এবং ঐ অংশের কমাণ্ডারের মতো তার সওয়ারদের কাফেলার এক দিকে না গিয়ে ঢালের ওপরের দিকে রাখলেন।

কাফেলার মধ্যে যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেলো। নারী শিশুর ভীতি চিৎকার আকাশ কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো। ওদিকে সওয়ারাও ঘোষণা চালিয়ে গেলো– আমরা ডাকাত নই – সুলতানের ফৌজ। কিন্তু কাফেলার যুবকরা লড়াইয়ের জন্য চিৎকার করে আহবান করতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সালার আমির আরসালান ও মুযাম্মিল আফেন্দী পাহাড়ের উঁচুতে চলে গেলো। আমির আরসালান ঘোষণা করলেন–

'আমি সালার আমির আরসালান। হাসান ইবনে সবা ও তার সঙ্গীরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াও। হাসান ইবনে সবা তুমি জীবিত থাকতে চাইলে সামনে এসে আত্মসমর্পণ করো। তোমাকে খুঁজতে হলে তোমার প্রাণের দায়িত্ব আমরা দিতে পারবো না।'

এই ঘোষণার জবাবে উত্তেজিত কয়েকজন জোয়ান চিৎকার করে বললো, আমরা তোমাদের ধোঁকায় পা দেবো না। প্রাণ থাকতে লড়ে যাবো।

'কাফেলার ভাইয়েরা!' – মুযাম্মিল উঁচু আওয়াজে বললো– 'আমাকে দেখো। তোমরা নিশ্চয় চিনতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে আমি বাগদাদ পর্যন্ত সফর করেছি। আমার বড় ভাই, তার স্ত্রী ও দুই বাচ্চা এই কাফেলায় রয়েছে। আমাকেও কি তোমরা ডাকু ভাববে?'

মুযাম্মিলের বড় ভাই কাফেলা থেকে বের হয়ে দৌড়ে পাহাড়ের ঢালে উঠে এলো। মুযাম্মিল ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তার ভাইকে জড়িয়ে ধরলো। মুযাম্মিল ভাইকে সব জানিয়ে বললো, এরা সুলতানের ফৌজ। হাসান ইবনে সবাকে গ্রেফতারের জন্য এসেছে। মুযাম্মিলের বড় ভাই সালারকে বললো,

'সালারে মুহতারাম! সে তো এই কাফেলার মধ্যে নেই। আমার ভাই যেদিন হাসান ইবনে সবার কব্জা থেকে এক মহিলাকে উদ্ধার করে বাগদাদ ত্যাগ করে সেদিনই সে বাগদাদ থেকে বেরিয়ে যায়।'

'সে কোন দিকে গেছে এটা কে বলতে পারবে'? – আমির আরসালান জিজ্ঞেস করলেন।

'এই কাফেলার অনেকে তার মুরিদ হয়ে গিয়েছিলো' – মুযাম্মিলের বড় ভাই বললো– 'গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সে আল্লাহর বিশেষ বান্দা এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও তার জ্ঞান আছে। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে নাকি সে জাহাজ উদ্ধার করে। বাগদাদ থেকে বের হওয়ার সময় তার ভক্তরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করে, সে কোথায় যাচ্ছে। কিছু লোক তো তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু সে সবাইকে বাঁধা দিয়ে বলে, আসমান থেকে এক ইশারা পেয়ে সে ইস্পাহান যাচ্ছে। ইস্পাহান যাওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে সে আরেকটি ইশারা নাকি পাবে। তারপর সে চলে যায়।'

তারপরও সতর্কতামূলক প্রায় মাইলখানেক দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা কাফেলার সবাইকে শনাক্ত করা হলো। মুযাম্মিল ও তার বড় ভাই আমির আরসালানের সঙ্গেই ছিলো। উটের হাওদা এবং পালকির পর্দা সরিয়েও দেখা হলো। কয়েকজনকে হাসান ইবনে সবার কথা জিজ্ঞেস করা হলো। তারা সবাই জানালো হাসান ইবনে সবা তার দুই সঙ্গী ভাড়ার উট ও ঘোড়া এবং এর মালিকদের নিয়ে ইস্পাহানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে।

সালার আমির আরসালান ঘোষণা করে দিলেন, কাফেলা নির্বিঘ্নে এখন যেতে পারে। কোন লুটেরা দল এখন এই কাফেলার ওপর হামলার সাহস করবে না। কারণ এই পাঁচশ সওয়ার এই এলাকায় ইস্পাহান পর্যন্ত নিয়োজিত থাকবে।

★ ★ ★ ★

সওয়ারদলের এখন দ্রুত ইস্পাহান পৌঁছা জরুরী। তাই তারা কাফেলাকে পিছু ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ঘন পাহাড়ি এলাকা থেকে টিলা টুক্করের এলাকায় চলে এলো। এসময় দূরের কয়েকটি টিলার পেছন থেকে ছুটন্ত এক ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শোনা গেলো। কিন্তু ঘোড়া এই ফৌজের সামনে এলো না। আস্তে আস্তে ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই কাফেলার দিক থেকে এক সওয়ার এদিকে দৌড়ে এলো।

'মুহতারাম সালার!' –সওয়ার বললো– 'আপনারা চলে আসার পর আমাদের কাফেলা থেকে এক সওয়ার হঠাৎ ঘোড়া নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। মনে হয় এ হাসান ইবনে সবার লোক। সে ইস্পাহান বা অন্য কোথাও গিয়ে হাসান ইবনে সবাকে সতর্ক করে দেবে তাকে গ্রেফতারের জন্য এক সালার আসছে।'

ঐ সওয়ারকে যদিও ধরা সম্ভব ছিলো না তবুও আমির আরসালান তার সেনাদলকে ক্ষিপ্রগতিতে চলার নির্দেশ দিলেন।

হাসান ইবনে সবা কয়েকদিন আগে ইস্পাহান পৌঁছে যে বাড়িতে উঠে সেটির আদল অনেকটা দুর্গের মতো। সেখানে পৌঁছেই আহমদ ইবনে গুতাশকে ইস্পাহানে তার আসার সংবাদ দিলো। আহমদ ইবনে গুতাশ খালজান থেকে এত দীর্ঘ পথও অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে ইস্পাহান পৌঁছে যায়।

হাসান ইবনে সবা তাকে মিসরের ঘটনা হলবের ঘটনা এবং বাগাদাদের ঘটনাসহ সবকিছু শোনায়। তারপর জিজ্ঞেস করে এখন কি সে খালজান আসবে কি-না।

'অবশেষে তোমার খালজান আসতেই হবে' – আহমদ ইবনে গুতাশ হাসানকে বললো– 'কিন্তু আমাদের গুপ্তচররা জানিয়েছে, সুলতান মালিক শাহের নির্দেশে তোমাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এখন তুমি এখানেই থাকো।'

'মান্যবর গুরু! আগে তো বলুন লোকে আমাকে ভুলে যায়নি তো?'

'তুমি ভুলে যাওয়ার কথা বলছো হাসান! লোকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। আমি যে কী সফলতা পেয়েছি সেটা তুমি সেখানে গিয়ে দেখবে। লোকদের আমরা বলছি, খোদার দূত আবার আগের মতো কোন এক এলাকায় আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। যারা তার অনুসারী হবে দুনিয়াতেই তারা বেহেশত পেয়ে যাবে। তোমার নামে লোকেরা জান দিতেও প্রস্তুত। জানবাযদের একটি দল আমি তৈরী করেছি। যারা শুধু ইশারার অপেক্ষায় আছে। খুব শিগগিরই সেলজুকিদের মোকাবেলার উপযুক্ত হয়ে উঠবো আমরা। ঐ এলাকার প্রায় সব মসজিদের ইমাম ও খতীবরা আমাদের লোক। ওরা লোকদেরকে কুরআন ও হাদীস থেকে যে ব্যাখ্যা শোনায় তাতে আমাদের খোদার দূতের অবতরণ সম্পর্কেও ভবিষ্যৎবাণী থাকে। লোকেরা একেই আসল ইসলাম মনে করছে এখন।'

'মেয়েদলের অবস্থা কি? আর জানবাযদের 'হাশীষ' (এক প্রকার হিরোইন) দেয়া হচ্ছে তো?'

'হাশীষই' তো আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছে। লোকদের বিশেষ করে জানবাযদের তো জানা-ই নেই যে, আমরা ওদের খাবার এবং পানীয়তে 'হাশীষ' দিচ্ছি। আর আমাদের মেয়েরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে সেখানে গেলেই সেটা তুমি দেখতে পাবে। যেসব গোত্র-সরদাররা আমাদের বিরোধী ছিলো আমাদের মেয়েরা ওদেরকে এমন রাম বানিয়ে রেখেছে যে, ওরাই এখন আমাদের অন্যতম শক্তি হয়ে গেছে।

আলাপের মাঝখানে জানানো হলো অনেক দূর থেকে এক সওয়ার এসেছে। আহমদ ইবনে গুতাশ তাকে তখনই ভেতরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো। সওয়ার বড় ক্লিষ্ট-ক্লান্ত ছিলো। কোনক্রমে সে হাসানকে বললো,

'সুলতানের পাঁচ ছয়শ সওয়ার আসছে আপনাকে গ্রেফতার করতে। আপনি সেখান থেকে আগেই চলে এসে ভালো করেছেন। কেউ একজন আপনার ইস্পাহান আসার কথা বলে দিয়েছে। ওরা এদিকেই আসছে।'

'এখান থেকে তো আমার তাহলে বের হয়ে যাওয়া উচিত' – হাসান বললো– 'কিন্তু যাবো কোথায়? খালজান? না শাহদর?'

'না' – আহমদ বললো– 'বড় কোন শহরে যাওয়া যাবে না। 'তিবরীজ' নামে অখ্যাত একটা কেল্লা আছে। সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত লোকজন আছে। প্রয়োজনে তারা প্রাণও দিয়ে দেবে।'

রাতের অন্ধকারেই হাসান ইবনে সবা তিবরীজ কেল্লায় পৌছে গেলো।

এর একদিন পর ইস্পাহানে পৌছলো সুলতানের পাঁচশ সওয়ার। তুফানের মতো সওয়াররা ইস্পাহানের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং ঘোষণা করতে লাগলো, হাসান ইবনে সবা বের হয়ে এসো। প্রতিটি ঘরে আমরা তল্লাশি চালাবো। যে ঘরেই হাসান ইবনে সবাকে পাওয়া যাবে সে ঘরের সবাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে।

দুর্গ সদৃশ সেই দালানের প্রতি কারো সন্দেহ হলো না, যেখানে হাসান ইবনে সবা ছিলো। তবে আহমদ ইবনে গুতাশ সে বাড়িতে রয়ে যায় এবং সে বাড়ীর আস্তাবলের একজন বুড়ো সহিসের ছদ্মবেশ নিয়ে আস্তাবলের মধ্যেই পড়ে থাকে।

কোথাও হাসান ইবনে সবার খোঁজ পাওয়া গেলো না। তল্লাশির ব্যাপারে আমির আরসালান নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এক রাস্তার মোড়ে এক বুড়ি আমির আরসালানের কাছে এসে বললো –

'গত রাতে আমি কেল্লা তিবরীজ থেকে এসেছি। সেখানে আমার এক যুবক নাতি থাকে। ওর জন্য আমার বড় টান। মাঝে মধ্যে ওকে দেখতে যাই। সেখানে সে কোন কাজ করে না তবে থাকে বড় শান শওকতে। ওকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। রাতের প্রথম প্রহরে ফিরবো বলে তার ঘর থেকে বেরোতে যাবো অমনি ছয় ঘোড়সওয়ার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। আমার পথ আটকিয়ে ওরা জিজ্ঞেস করলো আমি কে? আমি বললাম নিজেরাই দেখে নাও। কবরে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। এখানে নাতিকে দেখতে এসেছিলাম ইস্পাহান ফিরে যাচ্ছি। ওদের মধ্যে একজন বললো, আরে ওকে যেতে দাও। বুড়ির তো নিজেরই হুশ নেই। .... এসময় ভেতর থেকে ছয় সাতজন লোক দৌড়ে এলো। আমি দরজায় পৌছে গিয়েছিলাম। এক লোক বলে উঠলো, খোশ আমদেদ হাসান ইবনে সবা! আজ আমাদের ভাগ্য জেগে উঠেছে। আরেক লোক বলে

উঠলো, নাম নিয়োনা বেকুব। তোমার আওয়াজ তো ইস্পাহান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। জানিনা একি সেই হাসান ইবনে সবা কিনা যাকে তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছো।'

আমির আরসালান সে বুড়ির ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কার ছেলে কেল্লা তিবরীজে থাকে।

'আমার ছেলে' – এক লোক এগিয়ে এসে বললো।

'সে ওখানে কি করে?'

'গোমরা হয়ে গেছে। বাতিনীদের জালে ফেঁসে গেছে এবং খোদার মিথ্যা দূতের জানবায বনে গেছে। আমরা সঠিক আকীদার মুসলমান।'

আমির আরসালান কেল্লা তিবরীজের দিকে কোচ করার হুকুম দিয়ে বললেন কেল্লা তিবরীজ অবরোধ করতে হবে।

কেল্লা তিবরীজে মাত্র সত্তর জন হাসান ইবনে সবার শিষ্য ছিলো এবং এরা সবাই ছিলো জানবায। আমির আরসালান তার পাঁচশ সওয়ার নিয়ে তিবরীজে পৌঁছে দেখলেন কেল্লা দুটির দরজা খোলা এবং দরজার বাইরে কয়েকজন হাসান ইবনে সবার ঘোড়-সওয়ার। আমির আরসালানের সওয়াররা যখন একেবারে কাছে চলে এলো সেই সওয়াররা তখন দরজার ভেতরে চলে গেলো।

দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। আমির আরসালান সওয়ার দলের ছোট একটা অংশকে দরজা কজার জন্য আগে বাড়ালেন। কিন্তু ভেতর থেকে জানবাযরা এমন নির্ভীক কৌশলে মোকাবেলা করলো আরসালানের সওয়াররা ভেতরে ঢুকতে পারলো না। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

কেল্লাটি খুব বড় নয় যে, এর দরজা খুব মজবুত লোহার বা শাহবলুত কাঠের হবে। দরজা খুবই সাধারণ কাঠের। সওয়াররা ঘোড়া থেকে নেমে দরজা ভাঙ্গতে শুরু করলো।

অন্যদিকের সওয়াররা কেল্লার খাজকাটা দেয়ালের ওপরে চড়ার জন্য আংটাওয়ালা রশি ছুঁড়ে মারতে লাগলো। কিছু কিছু আংটা রশি সমেত আটকে গেলেও হাসানের জানবাযরা রশি কেটে দিলো এবং ওপর থেকে তীর ছুঁড়তে লাগলো। তীরের জবাবে সওয়াররাও তীরন্দাযী শুরু করে দিলো। তীরের ছায়ায় কয়েকজন সিপাহী ওপরে চড়ে বসলো। কিন্তু দেয়াল লড়ার মতো চওড়া ছিলো না। তারা ভেতরে লাফিয়ে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে জানবাযরা বেষ্টনীতে নিয়ে নিলো। কিন্তু একটি আওয়াজ তাদের বেষ্টনী ভেঙ্গে দিলো।

'দরজা ভেঙ্গে গেছে। সবাই দরজায় চলে এসো। দুশমন যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে' – উভয় দরজা থেকে এই ভীত গলার আওয়াজ উঠলো।

হাসান ইবনে সবার জানবাযরা দরজার দিকে ছুটতে লাগলো। আমির আরসালানের যেসব সওয়ারা তখন পদাতিক হয়ে গেছে তারা সংখ্যায় কম হলেও এবং কেল্লার ভেতরে থাকলেও জানবাযদের ওপর অনবরত হামলা চালিয়ে গেলো।

জানবাযরা যদিও বাইরের সওয়ারদের কোনরকমে ভেতরে ঢোকা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলো, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো বেশিক্ষণ তারা এভাবে জমে লড়তে পারবে না।

হাসান ইবনে সবা কেল্লার ওপর থেকে দেখছিলো তার এই সত্তর জন জানবায এতবড় সওয়ার দস্তাকে রুখতে পারছে না বরং ক্রমে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সে তখন ছাদের উঁচু একটি স্থানে উঠে উভয় হাত আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে বলতে লাগলো–

'আল্লাহ!' তোমার দূত বিপদে পড়েছে। ফেরেশতা পাঠাও আল্লাহ! ...... তোমার নামের ওপর জান কুরবানকারীদের এত কঠিন পরীক্ষায় ফেলো না আল্লাহ! ..... ফেরেশতা পাঠাও আল্লাহ ..... কাফেরদের তুফান থেকে বাঁচাও আল্লাহ!'

সে বোবা হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার জানবাযদের অনেকেই এ অবস্থায় তাকে দেখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'ইয়া হাসান!' – তার এক লোক কাছে এসে ঘাবড়ে যাওয়া কম্পিত গলায় বললো– আপনার 'ফেদায়েন'রা (জানবাযদের নাম) সাহস হারিয়ে ফেলেছে। ওরা বাইরে পালানোর রাস্তা খুঁজছে।'

হাসান লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলো তার কাপড় রক্তে লাল। সে একবার চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবারো উঁচু আওয়াজে বললো –

'ওহী' নাযিল হয়ে গেছে। আল্লাহর হুকুম এসেছে যে, কেউ যেন বাইরে বের না হয়। যে বের হবে সে দুনিয়ায় জ্বলে পুড়ে মরবে। আর যে আমাদের সাথে থাকবে সে দুনিয়াতেই বেহেশত দেখবে। বেহেশতের হুর নেমে আসছে। ফেরেশতা নেমে আসছে। আমাদের সঙ্গ ছেড়ে যারা যাবে তাদের জন্য আগুনের শাস্তি আসছে .... সাহায্য আসছে।'

এই 'ওহী' সমস্ত জানবাযদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং জমে লড়তে লাগলো।

'আমরা হাসান ইবনে সবার সঙ্গে আছি' – বাতিনী জানবাযরা শ্লোগান দিতে লাগলো।

ওদের লড়াইয়ে সৃষ্টি হলো নতুন উদ্যম ও ক্রদ্ধতা। আমির আরসালানের যে কয়জন পদাতিক সৈন্য রশির সাহায্যে দেয়াল টপকে ভেতরে গিয়েছিলো বাতিনীরা ওদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিলো। আচমকা তিনশ সওয়ারের একটা দল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে লাগলো। আমির আরসালানের সামান্যতম সন্দেহও হলো না যে এ তার দুশমন সওয়ার। আবার কোথাও থেকে সেনাসাহায্য আসবে এ আশাও তার ছিলো না। তার তো সেনাসাহায্য দরকারও ছিলো না। সওয়াররা প্রত্যেকে খোলা হাতিয়ার নিয়ে এলোপাতাড়ি আসতে লাগলো। আমির আরসালানের তবুও বিশ্বাস হচ্ছিলো না এরা হামলা করতে আসছে। তখনও তার মাথায় প্রতিরোধ চিন্তা এলো না। অথচ ঐ জঙ্গী সওয়াররা তার মাথার ওপর এসে শ্লোগান দিতে লাগলো – 'হাসান ইবনে সবা জিন্দাবাদ'। তার মাথায় শুধু ঘুরছিলো এই সওয়ার দল কোত্থেকে এলো? ঐ শ্লোগানের আওয়াজ শুনেই তার হুঁশ এলো, কিন্তু তখন সামলে উঠে লড়াইয়ে নামার সময় চলে গেছে। তার সওয়াররা ঐ জঙ্গী সওয়ারদের ঘেরাওয়ের মধ্যে তখন।

এই সওয়াররা আমির আরসালানের পাঁচশ সওয়ারকে খড়কুটার মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। সেলজুকিরা জমে লড়াইয়ের চেষ্টা করলো অনেক, কিন্তু হামলাকারীদের আক্রমণে এত ক্রুদ্ধতা ও ক্ষিপ্রতা ছিলো যে, সেলজুকিরা অল্প সময়ের মধ্যে কেটে কুচি কুচি হয়ে গেলো। তারা জানলোও তাদের সালার আমি আরসলানও শহীদ হয়ে গেছেন।

অবশ্য কিছু সওয়ার পালিয়ে যেতে পারল। তবুও এরা সবাই ছিলো যখমী। মুযাফ্মিল আফেন্দীও চরম যখমী হয়ে পড়ে এবং এই যখম নিয়ে তার ঘোড়া রুখ করে দেয় মারুর দিকে। কিছু যখমী এদিক সেদিক লুকিয়ে পড়লো। তাদের পালানোর শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিলো না।

এ ব্যবস্থা ছিলো আহমদ ইবনে গুতাশের। আহমদ নিশ্চিত হয়েই আশংকা করেছিলো, সেলজুকি ফৌজ ইস্পাহান এসে হাসান-ইবনে সবাকে অবশ্যই খুঁজবে এবং যে কোনভাবেই হোক তারা জেনে যাবে হাসান তিবরীজে আছে।

ইস্পাহানে হাসান ও আহমদরা যে বাড়িতে ছিলো সেটা ছিলো এক গোত্র সরদারের বাড়ি। এলোক হাসানের শিষ্য বাতিনী ছিলো। আহমদ ঐ সরদারকে বলেছিলো, হাসান ইবনে সবাকে বাঁচানোর জন্য অনেক দক্ষ ও জানবায লড়াকু দরকার। সরদার তখন তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তার পেছন পেছন আরেকটি ঘোড়া যায়। এক সহিস সেই ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়দল চলতে থাকে। রাস্তায় লোকেরা সরদারকে দেখে ঝুঁকে সালাম করে যায়। কিন্তু মলিন-নোংরা কাপড়ের সরদারের সহিসের দিকে কেউ তাকালো না পর্যন্ত। কারো সামান্য সন্দেহও হলো না এই সহিস আসলে সরদারের গুরুর গুরু এবং শয়তানেরও গুরু।

শহর থেকে কিছু দূরে গিয়ে ঘোড়ার সহিসের ছদ্মবেশি আহমদ ইবনে গুতাশ ঘোড়ায় চড়ে বসলো। দুই ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। ইস্পাহান থেকে সামান্য দূরের কাযবীন নামক এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছলো। কাযবীনের রঈস হলো আবু আলী। আশে পাশের বড় বড় এলাকায় তার একচ্ছত্র প্রভাব। হাসান ইবনে সবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক মেয়ে ও হাশীষের প্রয়োগের মাধ্যমে সরদার আবু আলী হয়ে উঠে হাসান ইবনে সবার অন্ধ ভক্ত।

আহমদ ও ইস্পাহানের সেই সরদার আবু আলীর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনজন আলোচনায় বসলো। তারপর ফয়সালা করলো, যে করেই হোক অধিক সংখ্যক সওয়ার যোগাড় করে খোদার দূতকে সাহায্য করতে হবে। আবু আলী অল্প সময়ের মধ্যেই জঙ্গী মেজাযের তিনশ সওয়ার প্রস্তুত করে কেল্লা তিবরীজের সামান্য দূরে তাদের একত্রিত করলো। ঐ জঙ্গী সওয়ারদের বলা হলো তারা যেন প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকে এবং ইশারা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লা তিবরীজে পৌঁছে যায়।

বাতিনীরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও কর্মতৎপর এক গুপ্তচর বাহিনী এতদিনে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সালার আমির আরসালান ইস্পাহান পৌঁছে যখন কেল্লায় আক্রমণ চালায় কেল্লা থেকে অনেক দূরের এক মাঠে কয়েকজন কৃষককে দেখা যায়। পরমুহূর্তেই তারা সেখান থেকে লাপাত্তা হয়ে যায়। তারা আবু আলীকে গিয়ে লড়াইয়ের অবস্থা জানায়। তিনশ সওয়ার তখন টানটান উত্তেজনা নিয়ে প্রস্তুত। তাদের মনে আগেই সেলজুকিদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করা হয়। তারা অপেক্ষা করতে থাকে, সেলুজকিদের সামনে পেলেই কেটে কুচি কুচি করা হবে।

ইশারা পেতেই এই জঙ্গিরা ঝড়ো গতিতে কেল্লা তিবরীজে পৌঁছলো এবং সেলজুকিদের অসর্তকতার পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগালো। কিন্তু হাসানের জানবায ও কেল্লা তিবরীজের লোকেরা কোন দিনও জানতে পারলো না 'আকাশ থেকে নেমে আসা তিনশ সওয়ার ফেরেশতা' এর ব্যবস্থা আগেই করে রাখা হয়েছিলো।

★ ★ ★ ★

মুযাম্মিল আফেন্দী তার যখমের জায়গাগুলোতে কাপড়ের পট্টি বেঁধেও রক্তঝরা বন্ধ করতে পারছিলো না। তবুও সে প্রচণ্ড আত্মশক্তি দিয়ে সংকল্পবদ্ধ হলো, যে করেই হোক জ্ঞান না হারিয়ে সুলতান মালিক শাহকে কেল্লা তিবরীজের খবর দিয়ে বলতে হবে, এখনিই জরুরী হামলার জন্য ফৌজ পাঠানো হোক।

দেড়গুণ কম সময়ে মাত্র একদিন এক রাতে সফর করে পর দিন রাতে সে মারু পৌঁছলো। সুলতানকে রাতের ঘুম ভাঙ্গানোর সাহস কার আছে? কিন্তু সুলতানের দেহরক্ষীরা সালার আরসালানের খবর শুনে এবং মুযাম্মিলের রক্তরাঙা অবস্থা দেখে সুলতানকে না জাগিয়ে পারলো না। সুলতান তাড়াতাড়ি তার শয্যা ত্যাগ করে সাক্ষাত কামরায় চলে এলেন। মুযাম্মিল যখন দরজা দিয়ে ঢুকলো তখন ভেঙ্গে যাওয়া গাছের মতো সে দুলছিলো। মাথা সরে যাচ্ছিলো কখনো ডানে কখনো বামে। ওদিকে যখম থেকে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছিলো বিরামহীনভাবে। সুলতান দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেললেন।

'ওকে দিওয়ানের ওপর শুইয়ে দাও' – সুলতান দেহরক্ষীকে বলে নিজেও তাকে ধরলেন। সুলতানের কাপড়ের সম্মুখভাগ রক্ত লাল হয়ে গেলো।

'ওর জন্য তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হওয়ার শরবত নিয়ে এসো এবং এখনই ডাক্তার ও শল্য চিকিৎসককে ডেকে নিয়ে এসো।'

সুলতান মালিক শাহ শরবতের গ্লাস এক হাতে নিয়ে অন্য হাতের সাহায্যে মুযাম্মিলকে উঠিয়ে শরবত পান করালেন।

'এখন শুয়ে পড়ো' – সুলতান মুযাম্মিলকে শুইয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন – 'তুমি এত যখমী হলে কি করে? আরে একে এখন বাঁচানোই তো মুশকিল হয়ে পড়বে।'

'ইনশাল্লাহ ...... আমি জীবিত থাকবোই .... আফেন্দী বড় কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো – 'আমি হাসান ইবনে সবাকে হত্যার সংকল্প করে রেখেছি ..... আমার নাম মুযাম্মিল আফেন্দী। আপনার ফৌজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই...... আপনার সওয়ার দস্তার সালার আমির আরসালান মারা গেছেন। সম্ভবত আপনার পাঠানো সওয়ার দস্তার প্রায় সবাই মারা গেছে।'

'কি....... কি বললে?' – সুলতান অত্যন্ত পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন – 'আরসালান মারা গেছে? কিভাবে হলো এটা? এই লড়াই কোথায় হলো?'

'কেল্লা তিবরীজে।'

এর মধ্যে ডাক্তার ও শল্য চিকিৎসকরা দৌড়ে এসে যখমগুলো পরিষ্কার করে যখমে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করে দিলো। সুলতান মুযাম্মিলের জন্য বিভিন্ন জাতের ফল আনালেন। যখমে ব্যাণ্ডেজ চলতে থাকে, মুযাম্মিল ফলের টুকরো মুখে দিতে থাকে এবং সুলতানকে শোনাতে থাকে, কিভাবে মায়মুনাকে হাসান ইবনে সবার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেছে, কিভাবে রায়ের আমীর আবু মুসলিম রাজীর কাছে মায়মুনাকে নিয়ে পৌঁছেছে, মায়মুনার মেয়ে সুমনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সে হাসান ইবনে সবার পিছু ধাওয়া করা থেকে নিয়ে কেল্লা তিবরীজের লড়াইয়ের পুরো ঘটনা শোনালো।

সুলতান মালিকশাহ রাগে ফেটে পড়লেন। তখনই তিনি আরেক সালার কযুল সারুককে ডেকে পাঠালেন। এই সালার ছিলেন তুর্কী। সেলজুকি বীরযোদ্ধা হিসেবে দারুণ সুখ্যাতি ছিলো তার।

সুলতান তাকে তখনই এক হাজার সওয়ার নিয়ে কেল্লা তিবরীজে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

কযুল সারুক বুঝলেন খুব দ্রুত তিবরীজ পৌঁছতে হবে তাকে।

তিনি এক হাজার সওয়ার নির্বাচন করে অত্যন্ত কম সময়ে তিবরীজ পৌঁছে গেলেন। কিন্তু সেখানে সালার আমির আরসালান ও তার সওয়ারদের লাশ ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। কোন লাশের সঙ্গে হাতিয়ার বা ঘোড়া পাওয়া গেলো না। পাঁচশ সওয়ারের হাতিয়ার ও ঘোড়া বাতিনীরা নিয়ে যায়।

কযুল সারুক কেল্লার ভেতরে গিয়ে জনমানুষের কোন চিহ্ন পেলেন না। প্রতিটি ঘরই খালি পড়েছিলো।

'আগুন লাগিয়ে দাও' – কযুল সারুক বললেন।

একটু পরই ধাউ ধাউ করে জ্বলন্ত কেল্লার আগুনের ধোয়ায় চারদিক অন্ধকার ঝাপসা করে তুললো।

'কবর খনন করে আমাদের শহীদ সঙ্গীদের দাফন করে দাও' – তিনি তার সওয়ারদের নির্দেশ দিলেন – 'আমরা হয়তো আমাদের শহীদ সঙ্গীদের দাফন করতে ও কেল্লাটিতে আগুন দিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য এসেছিলাম ...... না এখানে কিছু দিন আমরা যাত্রাবিরতি করবো।'

১৭

সুমনা যেন প্রতিদিনের এই রুটিন বানিয়ে নিয়েছে যে, সুযোগ পেলেই বার বার ছাদে চলে যাওয়া এবং যেপথ ধরে মুযাম্মিল আফেন্দী ইস্পাহান গিয়েছে সে পথের দিকে তাকিয়ে থাকা। সুমনা জানতো তিন চার দিনের মধ্যে সেখান থেকে কোন খবর আসবে না। কিন্তু সুমনার মন এই বাস্তবকে গ্রহণ করতে পারছিলো না। আফেন্দী আফেন্দী বলে তার ভেতরের গুঞ্জন তাকে যেন বাস্তবের জগৎ থেকে সরিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন এক জগতে নিয়ে যাচ্ছিলো।

সে ব্যাকুল হয়ে কল্পনা করতো মুযাম্মিল আফেন্দী এই পথ ধরেই বিজয়ের গর্বিত মুখে, বুক ফুলিয়ে, ঋজু ভঙ্গিতে ফিরে আসবে........ আর .... আর তার সঙ্গে থাকবে হাসান ইবনে সবা .... জীবিত বা মৃত।

দিনের পর দিন কেটে গেলো। নির্ঘুম কতরাত কেটে গেলো। মুযাম্মিল আফেন্দী এলো না, তার কোন কাসেদও এলো না।

'সুমনা!' – সুমনার মা মায়মুনা একথা তাকে দু'তিন বার বলেছেন – 'একজন মানুষের ভালোবাসায় তুমি তোমার দুনিয়া ভুলে গেছো। কোনটা রাত কোনটা দিন সেদিকে হুঁশ নেই তোমার। জীবন তো তোমার এভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।'

'তোমার মতে আমি যাকে চাই শুধু তারই প্রতীক্ষায় থাকি না মা! আমি প্রতীক্ষায় আছি হাসান ইবনে সবার। সে যদি জীবিত আসে শিকলে বেঁধে তার অবস্থাটা দেখবো আমি। যদি তার লাশ আসে বুঝবো আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে। মুযাম্মিল তাকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে।'

দিন দিন সুমনার অস্থিরতা বাড়তে লাগলো। নিজের প্রতি কেমন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো সে। তার কোমল স্বভাব হয়ে উঠতে লাগলো রুক্ষ-দুর্বিনীত। অবশেষে এক বিকালে তার নজর আটকে গেলো এক ঘোড়-সওয়ারের ওপর। ঘোড়-সওয়ার শহরের দিকেই আসছিলো।

শহরে ঢোকার পর ঘোড়সওয়ার অলিগলিতে হারিয়ে গেলো, একটু পর তাকে আবু মুসলিম রাজীর মহলের ফটকে দেখা গেলো, সুমনা দৌড়ে যেন উড়ে উড়ে নিচে চলে এলো।

'তুমি কাসেদ নয় তো!' – সুমনা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

'হ্যাঁ বিবি! আমি কাসেদ! এখনই আমীরে শহরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই।'

'কোত্থেকে আসছো?'

'মারু থেকে।'

'সালার আমির আরসালান ও মুযাম্মিল আফেন্দীর কোন খবর এনেছো?' – সুমনা শিশুর ব্যাকুলতা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ ওঁদের খবরই এনেছি।'

'কি খবর?' – সুমনা ছটফট করে জিজ্ঞেস করলো।

'আমীরে শহর ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না' – কাসেদ বললো।

সুমনা দৌড়ে ভেতরে চলে গেলো। আবু মুসলিম কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুমনা এত জোরে দরজা খুললো যে, আবু মুসলিম রাজী চমকে উঠলো।

'মারু থেকে কাসেদ এসেছে। ওকে এখনি ডেকে পাঠান' – সুমনা এক নিঃশ্বাসে বললো।

আবু মুসলিম কোন জবাব দেয়ার আগেই সুমনা আবার দৌড়ে বেরিয়ে গেলো এবং কাসেদকে ভেতরে নিয়ে এলো।

'কি খবর নিয়ে এসেছো?' – আবু মুসলিম রাজী জিজ্ঞেস করলেন।

কাসেদ একবার সুমনার দিকে আবার আবু মুসলিমের দিকে তাকালো। অর্থাৎ কাসেদ সুমনার সামনে মুখ খুলতে চাচ্ছিলো না।

'তুমি একটু বাইরে যাও সুমনা!'

সুমনা সেখান থেকে নড়লোও না কিছু বললোও না। আবু মুসলিম রাজীর মুখের দিকে দৃঢ় চোখে তাকিয়ে রইলো। রাজী এর অনুবাদ বুঝলেন। অল্প সময়েই মেয়েটি তার মনে যথেষ্ট জায়গা করে নিয়েছে।

'ঠিক আছে বলো কি খবর এনেছো?' রাজী জিজ্ঞেস করলেন।

'খবর ভালো নয় আমীরে শহর! সালার আমীর আরসালান মারা গেছেন এবং তার পাঁচশ সওয়ারের কেউ প্রায় জীবিত ফিরেনি' – কাসেদ বললো।

'মুযাম্মিল আফেন্দীর কি খবর?' – সুমনা আর সহ্য করতে পারলোনা, তড়পে উঠে জিজ্ঞেস করলো।

'চুপ থাকো সুমনা!' – রাজী তাকে ধমকে উঠলেন – 'তোমাকে বের করে দিতে বাধ্য হবো আমি।

তুমি একজনের চিন্তায় বসে আছো। আর আমরা পুরো সালতানাতে ইসলামীর জন্য পেরেশান হচ্ছি– এ কথা বলে কাসেদকে বললেন – 'তারপর বলো।'

'মুযাম্মিল আফেন্দী জীবিত আছেন। কিন্তু বড় মারাত্মকভাবে যখমী হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন মারুতে মুহতারাম সুলতানের কাছে আছেন। তিনিই তিবরীজের খবর নিয়ে এসেছিলেন।'

কাসেদ মুসলিম রাজীকে মুযাম্মিলের সুলতানের কাছে আনা সংবাদের পুরোটাই শোনালো। তারপর সালার কমুল সারুকের কথাও জানালো। কাসেদের পয়গাম শেষ হলে রাজী তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

'আমি মারু যেতে চাই। ঐ কাসেদের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিন' – সুমনা অনুনয় করে বললো।

'তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?' – রাজী জিজ্ঞেস করলেন।

'আফেন্দীকে আমি দেখে রাখবো। সে আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছে আমি কি তা ভুলতে পারবো? আমার হারিয়ে যাওয়া মাকে সে এনে দিয়েছে। আমীরে শহর! এছাড়াও আমি আর মুযাম্মিল শপথ করেছি হাসান ইবনে সবাকে আমরা খুন করবোই। মুযাম্মিলের সঙ্গে আমার থাকা এজন্যই জরুরী।'

'এ কাজ তো আবেগ উত্তেজনায় হবে না সুমনা! এজন্যে অভিজ্ঞতা, সচেতনতা দূরদৃষ্টি এসবের বিকল্প নেই। তোমার মা এখানে তুমি এখানেই থাকো। আমিও তাই চাই। হাসান ইবনে সবা যখন এখানে এলো আমি তাকে গ্রেফতারীর হুকুম জারী করলাম। সে টের পেয়ে পালিয়ে গেলো। হাসান ইবনে সবাকে আমিও আমার জীবনের লক্ষ্য করে রেখেছি। তা ছাড়া তোমাকে সেখানে এজন্যেও যেতে দিতে চাই না যে, মুযাম্মিল আফেন্দী যার কাছে আছে তিনি সুলতান। আমার কথা ভিন্ন। কিন্তু সুলতানের ওখানের পরিবেশ আমাদের মতো সাধারণ নয়। ....

'মুযাম্মিল আফেন্দীকে সুলতান তার তত্ত্বাবধানে রেখেছেন ঠিক কিন্তু তিনি পেরেশানও। আমির আরসালান তার সব সওয়ার নিয়ে নিহত হয়েছে। পেরেশানী আমারও কম নয়। হাসান ইবনে সবা ফৌজি শক্তিতে এত মজবুত হলো কি করে যে, সে পাঁচশ সেলজুকি সওয়ারকে খতম করে দিয়েছে? সেলজুকি বললে যা বুঝায় তাহলো– এক একজন সেলজুকি অসম সাহসী এক বীরযোদ্ধা। এজন্যে আমি যে ফলাফল পাচ্ছি তাহলো হাসান ইবনে সবার এক শিষ্য এক সেলজুকির চেয়ে অনেক বেশি আত্মত্যাগী। যা হোক তুমি এখানেই থাকো। সুলতান হয়তো তোমার সেখানে যাওয়াটা পছন্দ করবে না। কিংবা সুলতান তোমাকে এজন্যে সন্দেহ করতে পারেন যে, তুমি হাসান ইবনে সবার কাছে এক সময় ছিলে।'

আবু মুসলিম রাজী সুমনার মাকে ডেকে বলে দিলেন, তার মেয়েকে যেন তিনি শান্ত করেন। না হয় চরম আবেগ তাকে দুঃখজনক কোন পথেও নিয়ে যেতে পারে।

★ ★ ★ ★

সালার কযুল সারুক যে কেল্লা তিবরীজ জ্বালিয়ে দিয়েছেন সেটা ছিলো তার প্রচণ্ড ক্ষোভের প্রকাশ। কিন্তু ক্ষোভ ঝেড়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। চার গুপ্তচরকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এদিক ওদিক পাঠিয়ে দিলো। তিনিও বসে রইলেন না। কয়েকজন কমাণ্ডারকে নিয়ে তিবরীজের বাইরের ভূখণ্ডে তল্লাশি চালালেন। হাসান ইবনে সবা ও তার অনুসারীরা কোন পথ দিয়ে গিয়েছে তার সামান্যতম চিহ্ন পাওয়া যায় কি-না এছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

এক জায়গায় চিহ্ন পাওয়া গেলো। যেখানকার মাটি সাক্ষ্য দিচ্ছিলো এখান দিয়ে কোন কাফেলা বা ফৌজ অতিক্রম করেছে। কযুল সারুক চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন। সামনের রাস্তা খুবই অসমতল। সারুকের লোকেরা কখনো উঁচু কখনো নিচু পথ দিয়ে চলতে লাগলো।

পায়ের ছাপ দেখে বুঝা যাচ্ছিলো ওরা কোন দিকে গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে সেটা বুঝা যাচ্ছিলো না। সামনে এমন পাহাড়ি পথ শুরু হয়ে গেলো যেখানে আবাদীর কোন চিহ্নও ছিলো না। কযুল সারুক এক জায়গায় থেমে গেলেন। এর আগে যাওয়া তার ঠিক হবে না। কারণ দূর থেকে তাকে কোন সালার বা শহরের আমীর বলে অনায়াসেই চেনা যেতো।

তিনি এক কমাণ্ডারকে বললেন, তিবরীজে ফিরে গিয়ে আমাদের কাউকে ছদ্মবেশ দিয়ে সামনের দিকে পাঠাতে হবে। অনেকক্ষণ পর তীব্রবেগে এক উট-সওয়ারকে আসতে দেখা গেলো। সওয়ার কাছে এলে বুঝা গেলো এতো সকালের পাঠানো সেই ছদ্মবেশ নেয়া গুপ্তচর। সে উট থেকে নেমে তার সালারের কাছে হাজির হলো।

'মনে হয় পাওয়া গেছে' – ঐ ছদ্মবেশী গুপ্তচর বললো – 'উট, ঘোড়া ও মানুষের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এক জায়গায় গিয়ে পেলাম তিনটি বাড়ি। কয়েকটি বাচ্চা ওখানে খেলছিলো। ওদেরকে উট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলাম। এখান দিয়ে এক কাফেলা গেছে, আমি কাফেলা হারিয়ে ফেলেছি। কাফেলা কোন দিকে গেছে তা কি বলতে পারো? বাচ্চারা আমাকে শুধু দিক বললো।'

গুপ্তচর লোকটি আরো বললো, এসময় একটি ঘরের ভেতরের থেকে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো সে কে? কি চায়? সেই গুপ্তচর বললো, আমি ঐ কাফেলাটি হারিয়ে ফেলেছি।

'ঐ কাফেলা ছিলো বেশ আশ্চর্য ধরনের' – ঐ লোকটি বললো– 'ওদের মধ্যে অনেকেই ছিলো যখমী। কাপড় খুনে লাল। তাদের মধ্যে ঘোড়-সওয়ার উট-সওয়ার এবং কিছু ছিলো পদাতিক। আমাদের মনে হয়েছে এটা লুটেরাদের কাফেলা। দুটি উটের ওপর পালকিও ছিলো। পালকিতে হয়তো মহিলাও ছিলো। মনে হয় কোন কাফেলা লুট করতে গিয়ে কাফেলার লোকদের হাতে মার খেয়ে পালিয়েছে।'

'তুমি ঠিক বলছো ভাই' – গুপ্তচর বললো – 'ওরা ডাকাত দলই। এক কাফেলার ওপর ওরা হামলা চালায়। কিন্তু কাফেলার লোকজন এত বেশি ছিলো যে, কয়েকজন ডাকাত মেরে ফেলে। আমি আসলে ভাই সেলজুকি ফৌজের লোক। ঐ কাফেলাকে

খুঁজছি। তুমি যদি কাফেলার সন্ধান দিতে পারো সুলতানের পক্ষ থেকে ঝুলি ভরে পুরস্কার দেয়া হবে তোমাকে।'

'ওরা কোথায় গেছে তা বলতে পারবো না আমি। তবে ঐ পাহাড়ি এলাকার ভেতর একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। দুর্গ মানে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ওরা ওখানেও যেতে পারে। ঐ পাহাড়ি এলাকায় কোন আবাদী নেই। বড় বড় পাহাড়ি গুহা আছে। ডাকাতরাই ওসব ব্যবহার করে।'

সেই গুপ্তচর ফিরে এসে তার সালার সারুককে সব জানালো।

কিন্তু গুপ্তচর সেখান থেকে যখন ফিরে আসে তখন ঐ ঘরগুলোর ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে সে লোককে জিজ্ঞেস করে ঐ উট-সওয়ারটি কে এবং কেন এসেছিলো। বৃদ্ধকে লোকটি সব বললো। বৃদ্ধ তাকে ধমক দিয়ে বললো,

'আরে বেকুব! জানো তুমি কি করেছো?'

'আরে এতো সুলতানের ফৌজের লোক' – সে লোকটি বললো– 'এখান দিয়ে ডাকাতদের যে দলটি গিয়েছে উট-সওয়ার ওদের সন্ধান চাচ্ছিলো। আমি যা জানতাম তা বলে দিয়েছি। সুলতানের ফৌজ ওই ডাকাতদের ধরতে পারলে আমি পুরস্কারও পাবো।'

'পুরস্কার তুমি পাবে। কিন্তু পুরস্কার পাওয়ার জন্য তুমি জীবিত থাকবে না। আমরাও জীবিত থাকবো না। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তোমার কথা বলা উচিত ছিলো। তুমি তো হাসান ইবনে সবার সন্ধান দিয়ে দিয়েছো। হাসান ইবনে সবা কে জানো?' – বৃদ্ধ বললো।

'হ্যাঁ সে আকাশ থেকে নেমে আসা খোদার দূত' – লোকটি ভয় পাওয়া গলায় বললো।

'খোদার বান্দাদের তিনি সঠিক পথ দেখান। তার বিরুদ্ধে যত বড় লশকরই এসেছে ধ্বংস হয়ে গেছে।

'আকাশ থেকে কী জ্বিন নেমে আসে না আযাবের ফেরেশতা আসে জানি না – যে লশকরই আসে ওদের সামনে কচুকাটা হয়ে যায়। কেন তুমি কি তিবরীজের লড়াইয়ের কথা শোননি?'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

ঘরগুলো থেকে আরেক লোক বের হলো। বৃদ্ধ তাকে বললো, এ লোক সুলতানের এক গুপ্তচরকে বলে দিয়েছে হাসান ইবনে সবা এদিক দিয়ে গিয়েছে।

'আরে এতো অর্ধেক পাগল' – দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো।

'এতো আমি জানি। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, সুলতান যদি হাসান ইবনে সবার বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠিয়ে দেয় তাহলে কি আমরা জীবিত থাকবো?' ভেবে দেখো কি করবে?'

হাসান ইবনে সবা তার বেঁচে যাওয়া শিষ্য ও আবু আলী কযবীর তিনশ সওয়ার নিয়ে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় যখন এই বাড়িগুলোর কাছে পৌঁছে তখন এখানকার লোকেরা সব বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসান এদেরকে দেখে তার সঙ্গীকে বলে, এদেরকে বলে দাও, এখান দিয়ে যে আমরা যাচ্ছি কেউ যেন না জানে। কাউকে যদি এরা বলে তাহলে এদের বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবগুলোকে খুন করা হবে এবং এদের ঘরে আগুন দেয়া হবে।

★ ★ ★ ★

সালার কয়ুল সারুক আরেকজন গুপ্তচর থেকেও একই তথ্য পেলেন যে ঐ পাহাড়ি এলাকা দিয়েই হাসান ইবনে সবা গিয়েছে। তিনি তার এক হাজার ফৌজকে কোচ করার হুকুম দিলেন।

ফৌজ ঐ বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে গেলো। তারপর ফৌজ পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়লো। সামনের রাস্তা কঠিন সংকীর্ণ হওয়ায় ফৌজের চলার গতি ধীর হয়ে এলো। প্রায় পনের ষোল মাইল পর শুরু হলো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে জঙ্গলের পথ। তাই টুপ করে রাতের অন্ধকার নেমে এলো। তবুও সালার তার লশকরকে থামালেন না। কোথাও কোথাও লশকরকে পাহাড়ের সরু কার্নিশ বেয়েও চলতে হলো। এক সওয়ারের ঘোড়া তো পা পিছলে সওয়ারসহ নিচে গড়িয়ে পড়লো। সেখান দিয়ে লশকর অতি কষ্টে পথ পেরোলো। একটুপর প্রশস্ত এক উপত্যকা পেয়ে সারুক এখানেই রাতের ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিলেন। সিপাহীরা ঘোড়ার জিন নামিয়ে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে শুয়ে পড়লো।

সকাল হতেই লশকরকে কোচ করার হুকুম দেয়া হলো। ঘোড়ার ওপর সওয়াররা জিন বাঁধছিলো। এক দিক থেকে টাট্টুর লাগাম ধরে মধ্যবয়সী লোককে এক মহিলার সঙ্গে আসতে দেখা গেলো। সাথে চৌদ্দ বা পনের এবং দশ বা এগার বছরের দুটি মেয়েও আছে। লশকরের সামনে দিয়েই এদের যেতে হবে। তারা লশকরের এক পাশ দিয়ে সমীহ জোগানো পায়ে পথ অতিক্রম করছিলো।

'এরা কে?' – সালার সারুক জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা জিজ্ঞেস করিনি' – এক কমাণ্ডার বললো।

'জিজ্ঞেস করো ওদের। এদিক দিয়ে ওদের যাওয়ার অর্থ হলো সামনে বা এ এলাকায় কোথাও আবাদী আছে। এখানকার লোক হলে ওরা জানবে কদীম বা প্রাচীন কেল্লাটি কোথায়? তাহলে হয়তো আমরা ভুল পথ এড়াতে পারবো।'

লোকগুলো কাছে আসলে থামানো হলো।

'আসসালামু আলাইকুম' – মধ্যবয়সী লোকটি সালাম দিয়ে বললো – 'মনে হচ্ছে আপনি এই লশকরের সালার। আপনি বাধা না দিলেও আমি থামতাম।'

'আপনারা যাচ্ছেন কোথায় বা আসছেন কোত্থেকে।' – সারুক জিজ্ঞেস করলেন।

'সালারে মুহতারাম! এক বছর পর আমরা ঘরে ফিরছি। আল হামদুলিল্লাহ পবিত্র হজ্জ আদায় করতে গিয়েছিলাম আমরা।'

'পায়দলই গিয়েছিলেন?'

'কখনো সওয়ার কখনো পায়দল। এই টাট্টু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। পালা করে এর ওপর সওয়ার হয়েছি আমরা। কখনো ভাড়ার সাওয়ারীও পেয়েছি। এভাবে আরবে পৌঁছে পবিত্র হজ্জ পালন করেছি। পবিত্র স্থানগুলো যিয়ারত করেছি। তারপর ঐ স্মৃতিময় ময়দানগুলো দেখেছি যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) কাফেরদের সঙ্গে লড়েছেন। বদর ওহুদ সব দেখেছি। যেখানে আমাদের রাসুল (স) যখমী হয়েছেন সেখানটায় চুমু

খেয়েছি। ফিরে আসতে মোটেও ইচ্ছে হচ্ছিলো না। কিন্তু নওকারের কাছে বুড়ো মা বাপ রেখে গেছি ওদের জন্য আসতে হলো।'

'আল্লাহ আপনার হজ্জ কবুল করুন, আচ্ছা আপনাদের আবাদী কি কাছেই?

'খুব কাছে নয়। প্রায় পুরো একদিন সফর করতে হবে।'

'এই এলাকায় কি কোন প্রাচীন কেল্লা আছে? শুনেছি এর ধ্বংসাবশেষ এখনো কিছু কিছু আছে।'

'হ্যাঁ মুহতারাম! বলতে গেলে ঐ পাহাড়ি এলাকার পেছনেই। তবে ওখানে পৌঁছতে গেলে একদিন চলে যাবে। ঐ কেল্লায় কি আপনি যেতে চান?

'হ্যাঁ, তবে পথ জানা নেই।'

'আমি বলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে বিবি বাচ্চা না থাকলে আমিই যেতাম আপনাদের সঙ্গে। তাহলে আর পথ হারানোর ভয় থাকতো না। আপনারা যে দায়িত্ব পালন করছেন একে তো আমি হজ্জের চেয়েও বড় মনে করি। নিশ্চয় আপনারা সেলজুকি।'

'হ্যাঁ হেজাযের মুসাফির! সবার আগে আমরা মুসলমান তারপর সেলজুকি।'

হাজী পরিচয় দেয়া ঐ লোক কযুল সারুককে ঐ (কদীম) প্রাচীন কেল্লার রাস্তা বুঝাতে লাগলো। রাস্তা আঁকা বাঁকা না হলেও কঠিন। কযুল সারুক নিজের ধারণার ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি উল্টো পথে যেতে চাচ্ছিলেন।

'আপনি তো ফেরেশতা হয়ে এসেছেন। আমরা তো অন্যত্র যেতাম। আসলে আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাদের পথ দেখানোর জন্য – কযুল সারুক বললেন।

'আল্লাহ তো উপায় খুঁজেন শুধু। তিনি আমার জন্য এই সৌভাগ্যও লিখে রেখেছেন যে, আমি মুজাহিদদের রাস্তা দেখিয়ে দেবো। আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত না হলেও জিজ্ঞেস করছি ঐ কদীম কেল্লায় কেন যাচ্ছেন আপনারা?' – হাজী জিজ্ঞেস করলো।

'হাসান ইবনে সবার নাম শুনেছেন?'

'ঐ ইবলিসের নাম কে না শুনেছে? বাগদাদ থেকে এ পর্যন্ত তার নামই শুনতে শুনতে এসেছি। দুঃখ হয় মানুষ তাকে নবী বা আল্লাহর দূত মনে করে। এক জায়গায় শুনেছি ঐ ইবলিস নাকি কদীম কেল্লায় আছে। তার সঙ্গে আছে বড়ই মারদাঙ্গা একদল জানবায। আপনি যদি ঐ ইবলিসকে খতম করতে পারেন হজ্জে আকবরের সওয়াব পাবেন আপনি।'

'আমাদের সফলতার জন্য দুআ করুন হাজী সাহেব।'

'উনাদেরকে একটি করে খেজুর দিন এবং একঢোক করে জমজমের পানি পান করান – হাজীর স্ত্রী হাজীকে বললো,

টাট্টুর পিঠ থেকে একটা গাঁঠুরি নামিয়ে ছোট একটি থলে বের করলো হাজী। সেটা থেকে অনেকগুলো খেজুর বের করে সালার কযুল সারুক ও তার অধীনস্থদের একটা একটা করে দিলো। তারপর বললো, 'এগুলোর ভেতর বীচি নেই। সেখান থেকে এমনই পাওয়া গেছে। খুব উন্নতজাতের খেজুর। আপনাদের পানির মটকাতে পানি ভরে নিন। এতে জমজমের পানি মিশিয়ে দিচ্ছি। পুরো লশকরকে দু'ঢোক করে পান করান।'

সালারের হুকুমে তিনটি মটকা পানিতে ভরা হলো। হাজী শুকনো চামড়ার একটা সুরাহী বের করে তিন মটকায় ঢেলে সেটা খালি করে দিলো এবং বললো কোচ করার আগে সবাই পান করে নিন।

'তারপর দেখবেন সালার মুহতারাম! রাস্তার কোন সংকটই টের পাবেন না আপনারা। আপনার প্রতিটি সওয়ার অনুভব করবে উড়ে উড়ে ঐ কেল্লায় পৌঁছেছে ওরা'– হাজী বললো।

কযুল সারুকের হুকুমে তাই করা হলো। তার সওয়াররা আবে জমজমের পবিত্রতা অনুভব করে সে পানি পান করলো। সালার কযুল সারুকও মক্কার খেজুর খেয়েছেন এবং আবে জমজম পান করেছেন এই ধারণায় নিজের মধ্যে দারুণ সতেজতা অনুভব করলেন। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে এমন তাজা ভাব অনুভব করলো।

পুরো লশকর সেই হাজীর বলে দেয়া পথে নেমে পড়লো। ওদেরকে আবার অতিক্রম করতে হলো পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ। গত রাতে আরো কম সরু পথে তাদের এক সওয়ার পা পিছলে পড়ে মারা গেছে। আজকের এ পথ আরো অনেক ভয়ংকর। একজনের পেছনে আরকজন এভাবে তারা লাইন বেঁধে এগুচ্ছিলো। ক্রমেই সংকীর্ণ হতে হতে একখানে গিয়ে পথ শেষ হয়ে গেলো। সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো দানবের মতো এক পাহাড়।

'ঐ হাজী কি এ পথের কথাই বলেছে' – কযুল সারুক এক কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হাজী বলেছিলো এই রাস্তা ওপরে গিয়ে নিচের দিকে নেমে যাবে' এখানে অন্য কোন রাস্তা নেই। – এক কমাণ্ডার বললো।

'এক সওয়ার নিচে নামো, তবে ঘোড়া থেকে নেমে যেতে হবে। ঘোড়াও সঙ্গে রাখবে' – সারুক নির্দেশ দিলেন।

একটি জায়গা পাওয়া গেলো যেখানে পাহাড়ের ঢাল এত ভয়ংকর না। এক সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে নিচের দিকে নামতে লাগলো। তার কষ্ট হলেও ঘোড়া সহজেই নেমে গেলো।

কযুল সারুক সবাইকে এভাবে নিচে নামতে নির্দেশ দিলেন। মনে হচ্ছিলো পুরো পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে যেন। কয়েকটি ঘোড়া হোঁচট খেতে খেতে পড়তে পড়তে আবার দাঁড়িয়ে গেলো। এক হাজার সওয়ারের সবাই যখন নিচে নামলো তখন সূর্য অনেক পথ সফর করে গেছে।

সবাই একত্রিত হয়ে হাজীর বলে দেয়া চিহ্ন অনুসরণ করে আবার এগুতে লাগলো। অনেক দূর যাওয়ার পর এক পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা মিলে গেলো। কুদরত এখান দিয়ে নিপুণ হাতে পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। একটু এগুনোর পর টলটলে

পানির একটি পাহাড়ি নদী তাদের থামিয়ে দিলো। স্রোত তীব্র হলেও ঘোড়ার পা ডুবে যাওয়ার মতো গভীর নয় নদী। ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেয়া হলো। নদীর মাঝখানে গিয়ে একটু অসুবিধা হলেও স্রোতের ধাক্কায় খুব তাড়াতাড়িই নদী পার হওয়া গেলো।

সামনে পড়লো অসমতল মাটির ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও কাদাময় জমি। এর মধ্য দিয়েই ঘোড়া অতিক্রম করলো।

★★★★

অতি প্রাচীন কেল্লা এটি। এক দেয়ালের জায়গার পাথর এত ধসে গেছে যে, ঘোড়ায় চড়েও কেল্লার ভেতরে দেখা যায়। দরজার কাঠ ঘুণে খেয়ে নড়বড়ে করে দিয়েছে সেই কবে। লোহার ফ্রেমটা অবশ্য এখনো দরজার আদল ধরে রেখেছে। কেল্লার ভেতরে কাঁচা পাকা অনেক পোড়া বাড়ি রয়েছে। যেগুলোর অধিকাংশের ছাদই বসে গেছে। কয়েকটি বাড়ি মোটামুটি দাঁড়িয়ে থাকলেও ভেতরে পেঁচা চামচিকার বসত এখন।

বড় ফটকের পেছনে একটি দেয়াল আছে। এর লাগোয়া বড় একটি বাড়ি আছে। এত কঠিন বন্ধুর এলাকা অতিক্রম করে কেন এই কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছিলো এর কোন হদিস পাওয়া যায় না। তবে এলাকাটি দারুণ সবুজ -মনোরম।

এত দিন এই কেল্লামুখী হওয়ার দুঃসাহস কেউ করেনি। যারা কোন কারণে এখান দিয়ে যেতো এই ভূতুড়ে কেল্লা এড়িয়ে অনেক দূর দিয়ে যেতো। অবশ্য ডাকাত বা লুটেরা দলের জন্য কেল্লাটি ছিল বাইরের দুনিয়া থেকে নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু কিছু দিন ধরে এই কেল্লা আবার আবাদীর চেহারা ফিরে পেয়েছে। আবাদীর সংখ্যা কম বেশি তিনশ। এর মধ্যে সাত আটজন নারী। আরো কয়েকজন মারাত্মক যখমীও আছে।

এদের এখানে আসা সাময়িকের জন্য। গন্তব্য অন্য কোথাও। গন্তব্য এবং গন্তব্যের পথ এখনো নির্ধারিত হয়নি।

সেলজুকি সালার কযুল সারুকের গন্তব্য এই কেল্লাই। তার শিকার এই কেল্লাতেই আছে– সে হলো হাসান ইবনে সবা।

হাসান ইবনে সবা জানে সেলজুকিদের পাঁচশ সওয়ার ও সালারকে মেরে তার রাস্তা এখন পরিষ্কার তো হয়ইনি, বরং আরো অনেক কঠিন হয়ে গেছে। সেলজুকিদের সঙ্গে এতদিন তার বিরোধ ছিলো মতবাদের। সে নিজেও জানে তার মতবাদ মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের। আর সেলজুকিরা সত্য বিশ্বাসী মুসলমান। এখন সে বিরোধকে সে নিজেই খুনী দুশমনের রূপ দিয়েছে। সে এখন সেলজুকিদের খুনী দুশমন ব্যক্তিগতভাবেও ধর্মীয়ভাবেও এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তো অবশ্যই।

এটা ভেবেই সে তার সব শিষ্য, ফেদাইন (জানবায বাহিনী) এবং তিবরীজের সামান্য যে কয়কজন আবাদী ছিলো সবাইকে নিয়ে এই প্রাচীন কেল্লায় এসে লুকিয়ে পড়ে।

হাসান ইবনে সবাকে শুধু সালার বা সরদার হিসেবে লোকে মর্যাদা দিতো না, তাদের চোখে সে ছিলো কোন নবীর মর্যাদার সমকক্ষ লোক। তিবরীজের লোকেরা দেখেছে তারা যখন পালানোর পথ দেখেছে তখন হাসান ইবনে সবা আল্লাহকে ডাকতেই তিনশ সওয়ার এসে গেলো। এরা সেলজুকিদের নিমিষেই ধ্বংস করে দিলো।

হাসান ইবনে সবাকে ওরা যেমন নবীর মর্যাদা দিতো তেমনি বড়সড় একটা কামরা খুব করে ধুয়ে মুছে শাহী সাজে সাজালো ওরা। সেই কামরায় তার সামনে বসে থাকা কিছু লোককে হাসান বলছিলো –

'আর তোমরা তো জানো, সব নবীকেই পালাতে হয়েছে, লুকাতে হয়েছে, বিপদে দৈর্য ধারণ করতে হয়েছে। কোথাও না কোথাও তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। হযরত ঈসা (আ)কে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছে, মূসা (আ)কে ফেরাউন হত্যা করতে চেয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই আজ আমাকে এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষে বসে থাকতে দেখে এটা মনে করো না আল্লাহ আমাকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর ইশারাতেই আমি এসেছি এখানে। নবীগণের সঙ্গী বর্গদের তিনি সাধারণ লোকের চেয়ে উঁচু মর্যাদা দান করেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমরা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার। যখনই তোমাদের ওপর কোন বিপদ আসবে আল্লাহর সাহায্য তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে'.......

এতটুকু বলতেই বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেলো – 'হামলা আসছে ...... হুশিয়ার হয়ে যাও।'

হাসানের কান খাড়া হয়ে গেলো।

'সেলজুকি লশকর আসছে।'

'অনেক বড় লশকর।'

'ইমামকে খবর দাও।'

এর সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকদের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো তখন হাসান উঠে বাইরে বের হলো। দেখলো লোকদের মধ্যে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ কেল্লার ভাঙ্গা নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাচ্ছিলো, কেউ অন্য আরেকটি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নিচে নামছিলো। চারদিক থেকে ভীত-বিহবল লোকদের চিৎকার চেচামেচি শোনা যেতে লাগলো–

'হায়! হায়! যখমীদের কি হবে?'

'এত বড় লশকরের সঙ্গে আমরা লড়তে পারবো না।'

'থামো সবাই' – হাসান ইবনে সবা তার গম্ভীর গর্জনে বললো –' যে যেখানে আছো সেখানেই থাকো।'

সে বড় ধীর ও শান্ত ভঙ্গিতে সিঁড়ির ওপর উঠে সেদিকে তাকালো যেদিকে লোকেরা তাকিয়েছিলো। এক হাজার সওয়ারের দৃশ্যটি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো ধেয়ে আসছিলো। হাসানের কাছে মাত্র তিন'শ জনের যে দলটি আছে এই এক হাজারের সামনে তো তারা খড়কুটার সমান। আবার এর মধ্যে অনেকে যখমীও। এরা আর্তনাদ তুলছিলো– এত বড় লশকরের সঙ্গে লড়তে পারবে না। কিন্তু ওরা তাদের ইমামের চেহারা শান্ত-স্থির দেখছিলো।

সালার কযুল সারুকের এক হাজার সালার এগিয়ে আসছিলো। কিন্তু তাদের চলার গতি দেখে মনে হচ্ছিলো খুব আরাম করে কোন সফরে আসছে।

'কি মনে হয়' – হাসান তার বিশেষ এক শিষ্যকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

'আরো কাছে আসতে দিন। তাদের চলার গতি তো বলে দিচ্ছে আমাদের ওষুধ কাজে লেগেছে' – তার সেই শিষ্য বললো।

'হ্যাঁ তাই তো দেখছি। ওখান থেকে তাদের গতি আক্রমণাত্মক হওয়ার কথা ছিলো। ওষুধের ক্রিয়া কিছুটা দেখতে পাচ্ছি বোধ হয়।'

সারা কেল্লাজুড়ে এমন হল্লা, চিৎকার চেচামেচি চলছিলো যে, কানে অন্য কোন শব্দ পৌছছিলো না।

'সবাই যার যার হাতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে যাও' – হাসান ইবনে সবা তার লোকদের হুকুম দিলো – 'তীরন্দাযরা ওপরে চলে এসো।'

হাসানকে তারা ইমাম মানতো। ইমামের হুকুম অমান্য করার দুঃসাহস ছিলো না ওদের। সবার চেহারায় বুযদিলির ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। যখমীদের আর্তনাদ চারদিক ভারী করে তুলছিলো। ওরা দেখছিলো এই অক্ষম অসহায় অবস্থায় নিশ্চিত মারা যাচ্ছে তারা।

'অন্যদিক দিয়ে পালাও' – কেল্লা থেকে একটি আওয়াজ উঠলো।

'আমাদের নিয়ে চলো' – যখমীদের কামরা থেকে হাহাকার উঠলো।

হাসান দেখলো, সেলজুকি সওয়ারদের মধ্যে হামলাকারী দলের সেই ক্রুদ্ধতা নেই। কেমন নিস্তেজ অসহায় ভঙ্গিতে কেল্লার একেবারে কাছে এসে পৌছেছে। হাসান আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে উঁচু আওয়াজে বলে উঠলো –

'আল্লাহ! আমাকে জমিনে অবতরণকারী আল্লাহ...... তোমার দূত .... যাকে তুমি নেতৃত্ব দান করেছো ...... সে বড় বিপদে পড়েছে। তোমার পথে লড়াই করে যারা যখমী হয়েছে ওদেরকে রহমত করো ...... ফেরেশতা নামিয়ে দাও ...... আমার ইমামত ও তোমার খোদায়ীর লাজ রাখো।'

হাসান ইবনে সবা এসব বলে ঘুরেই দেখলো তার সামনে সালার কযুল সারুক দাঁড়িয়ে। সালার তার সওয়ারদের তখনো কোন হুকুম দিচ্ছিলেন না। হাসানের চেহারার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তাকে যেন চিনতে চেষ্টা করছিলেন।

'তোমরা এখানে কী নিতে এসেছো?' – হাসান ইবনে সবা কেল্লার ওপরের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কর্তৃত্বের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা এখানে কী নিতে এসেছি?' সালার তার এক কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন।

কমাণ্ডার একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে ওপরের দেয়ালের কাছে সিঁড়িতে দাঁড়ানো হাসান ইবনে সবার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হাসান আরেকবার কেল্লার ভেতরের দিকে মুখ করে গর্জন করে উঠলো – 'ফেরেশতা নেমে এসেছে। নিজেদের মন শক্ত করো। দুশমন এখনই পালাবে।'

হাসান আবার ঘুরলো। দুই তীরন্দাযকে ডেকে কিছু বললো। দু'জনে দুটি তীর ছুঁড়লো। এক তীর এক সেলজুকি সওয়ারের বুকে আরেক তীর আরেক সওয়ারের শাহরগে গিয়ে বিঁধলো। দুজনেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো।

'তোমরা আমার সওয়ারকে মেরেছো কেন?' – সালার কযুল সারুক অসহায় এবং বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'তোমার সওয়ারদের এখান থেকে নিয়ে যাও। না হয় তোমাদের প্রত্যেক সওয়ারকে এভাবে মারা হবে, তারপর তোমাকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

সালার কযুল সারুক কিছুই বললেন না। তিনি তার ঘোড়া পেছনে নিয়ে ঘুরিয়ে চলতে লাগলেন। পুরো সওয়ার দল তার পেছন পেছন চলতে শুরু করলো।

'ইমাম দুশমনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ওপরে এসে দেখো' – দেয়ালের ওপর থেকে কেউ গর্জে উঠলো।

'দেখো আমাদের পীর মুরশিদের মুজিযা।'

'পীর মুরশিদ নয় ...... নবী বলো ..... খোদার প্রেরিত ইমাম বলো– কেউ গলা ফাটিয়ে বললো।

নিচ থেকে মেয়েরা দৌড়ে ওপরে এসে অকল্পনীয় বিস্ময়ে সেলজুকি সওয়ারদের চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে লাগলো। সওয়াররা সামনের সবুজ মনোরম জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। এর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য হারিয়ে গেলো পশ্চিমের পর্বতচূড়ার আড়ালে।

★ ★ ★ ★

হাসান ইবনে সবা অস্তেয়মান সওয়ারদের দিকে তাকিয়ে রইলো। এসময় এক আওয়াজ উঠলো–

'সবাই সিজদায় চলে যাও।'

যে যেখানে ছিলো হাসান ইবনে সবার দিকে মুখ করে সিজদায় চলে গেলো। হাসানের পাশে মধ্যবয়স্ক এক লোক দাঁড়ানো ছিলো। সেও সিজদায় চলে গেলো। হাসান যেন বিরক্ত হলো। লোকটিকে পা দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোকর মারলো। লোকটি সিজদা থেকেই মাথা উঠালে হাসান চোখ রাঙিয়ে তাকে ইশারা করলো। সে উঠে দাঁড়ালো। তাকে কানে কানে কী যেন বললো হাসান।

'আমি কি আমার ফেরেশতাদের ফিরিয়ে নেবো?' – সে লোকটি গনগনে গম্ভীর গলায় বললো– বলো হে আমার ইমাম!'

'হ্যাঁ খোদাওয়ান্দে আলম! – হাসান ইবনে সবা বিগলিত কণ্ঠে বললো – 'আমি তোমার এই বান্দাদের পক্ষ থেকে তোমার শুকরিয়া আদায় করছি। তোমার ফেরেশতারা আমাদের দুশমনকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

লোকেরা তখনো সিজদায় ছিলো। তারা হাসান ইবনে সবার সঙ্গীর আওয়াজকে খোদার গায়েবী আওয়াজ বলে পরম শ্রদ্ধা নিয়ে বিশ্বাস করলো।

'উঠো সবাই। তোমরা আল্লাহর পবিত্র আওয়াজ শুনে নিয়েছো' – হাসান স্বাভাবিক গলায় বললো।

সবাই সিজদা থেকে উঠলো। তখন তাদের চেহারায় পেরেশানী, অবিশ্বাস আবেগ এবং চরম বিস্ময় খেলা করছিলো। হাসান ইবনে সবার দিকে সবাই এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন সে আল্লাহর কোন ফেরেশতা। যে এখনই অদৃশ্য হয়ে আকাশে চলে যাবে।

মেয়েরা দৌড়ে এসে প্রত্যেকে পালা করে হাসানের হাতে চুমু খেলো এবং তারা হাসানের হাত দুটি তাদের চোখে ঠোঁটে ছোয়ালো। এরপর কেল্লার প্রত্যেকেই এই চেষ্টা করলো কিভাবে তার হাতে চুমু খাওয়া যায় এবং কীভাবে দেখে যায় এ কি মানুষ না আল্লাহর বিশেষ কোন আসমানী মাখলুক। পরম শ্রদ্ধাভরে সবাই তখন স্মরণ করছিলো– তিবরীজেও তিনি তার 'আল্লা'র কাছে মদদ চেয়ে ছিলেন তখন তার 'আল্লা' এমনই মদদ পাঠিয়েছিলেন। সমস্ত সেলজুকি মারা গিয়েছিলে তখন।

এই বিজয় উপলক্ষে রাতে উট যবাই করে সবাই পেট পুরে খেলো। তারপর শুরু হলো বিজয় উৎসব। মেয়েরা নেচে নেচে গান গাইলো। আর পুরুষরা নাচলো বেহুঁশের মতো। সব চেয়ে বেশি আনন্দ উদযাপন করলো যখমীরা। কারণ তারা তো নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বেঁচে গেছে।

মধ্যরাতের পর। হাসান তার কামরায় বসে আছে। কামরায় ফানুস জ্বলছে। তার কাছে বসা আছে মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ এবং সুন্দরী যৌবনবতী এক মহিলা, মধ্যবয়স্ক লোকটি সেলজুকি সালার কযুল সারুকের সঙ্গে আজ সকালেই 'হাজী' এর অভিনয় করে এসেছে। আর মহিলাটি অভিনয় করে তার স্ত্রী হিসেবে। এ আসলে হাসানের বাতিনী দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা। এদের মেয়ে পরিচয় দেয়া মেয়ে দুটি তিবরীজ থেকে আসা এক লোকের মেয়ে।

'এটা আসলে তোমাদের কৃতিত্ব' – হাসান ইবনে সবা মধ্যবয়স্ক ঐ লোককে বললো – ইসমাঈল! আমি আশা করিনি এত তাড়াতাড়ি তোমরা এ কাজ করতে পারবে। না করতে পারলেও তোমাদেরকে অপারগ মনে করা হতো।'

'হ্যাঁ ঐ সেলজুকিদের সেখানে পাওয়া না গেলে অন্য কোথাও পাওয়া যেতো ঠিক তবে সৌভাগ্য আমাদের। ওদেরকে পেয়ে গেছি খুব দ্রুত – মহিলাটি বললো।

'ওরা ঠিক পথেই আসছিলো' – ইসমাঈল বললো – 'আমি ভুল পথ বলে দিই ওদের। ভুল পথ দেখিয়েছি এই ভেবে যে, খেজুর এবং পানির সঙ্গে মেশানো জিনিসটি ক্রিয়া করার পুরো সময় পেয়ে যাবে। আপনি বলেছিলেন, এতে যে জিনিস মেশানো হয়েছে দেরী করে এর ক্রিয়া শুরু হয়।'

'আমি তোমাদের প্রশংসা করেছি। আমি খুশী এই কারণেও যে, এই ওষুধের প্রয়োগ এই প্রথম করা হলো। এক হাজার ফৌজকে মানসিকভাবে এমন নিস্তেজ করে দেয়ার মতো ওষুধটির প্রয়োগ সফল হবে আমি এতটা নিশ্চিত ছিলাম না। আর এক হাজার সওয়ারের চেতনা এমন নিস্তেজ করলো যে, প্রত্যেকে স্বাভাবিক সব কাজ করবে ঠিক কিন্তু মানসিকভাবে অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়বে। লড়াই ঝগড়ার জন্য কাউকে ডাকবে না। কেউ যদি ওদেরকে ডাকে বুযদিলের মতো মুখ ফিরিয়ে নেবে।'

'এরা কি সুস্থ এবং ঠিকভাবে গন্তব্যে পৌছতে পারবে?' – ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলো।

'এখানে কি ওরা ঠিকভাবে পৌছেনি?' – হাসান বললো – 'তোমাদের বলে দেয়া এত কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে যেমন এখানে চলে এসেছে ফিরেও যাবে এভাবে।'

'এই প্রতিক্রিয়া কত দিন থাকবে?' – ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলো।

'সম্ভবত দুই দিন' – হাসান বললো।

'আরেকটা কথা ইমাম!' – যৌবনবতী সেই মহিলা বললো– 'ঐ ওষুধ যদি খেজুর ও পানিতে আরো বেশি পরিমাণে মেশানো হতো তাহলে তো এই লশকর যেখানে ছিলো সেখান থেকে ফিরে যেতো!'

'কিন্তু এখানে যে একটা রহস্য আছে' – হাসান মুচকি হেসে বললো – 'সেলজুকি লশকরকে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো যেতো ঠিকই। আবার তোমাদের দেওয়া খেজুর ও নদীর পানিকে যে আবে জমজম বিশ্বাস করে খেয়েছে তাতে এমন বিষ মেশানো যেতো যার কোন গন্ধ স্বাদ কিছুই নেই.......।

'কিন্তু ওদেরকে কেল্লা পর্যন্ত জীবিত আসতে দেয়া এবং ফিরে যেতে দেয়ার মধ্যেও রহস্য আছে ...... পীর নেতা বা নবী যে কেউ হতে পারে না। হতে পারে সেই যার চিন্তার বিস্তৃতি আকাশ পর্যন্ত চলে যায়। আমাদের লোকদেরকে আমি মুজিযা দেখাতে চেয়েছিলাম। তারা দেখলো, আমার বলার কারণে আকাশ থেকে গায়েবী সাহায্য এসেছে। তারপর তারা দেখলো এত শক্তিশালী ফৌজী সওয়ার দল আমার হালকা ধমকে ফিরে গেছে। এখন এসব লোক যেখানে যাবে আমার মুজিযা শোনাবে। মানুষের স্বভাবে অতিরঞ্জন ব্যাপারটি তো আছেই। এসব লোকেরা আমার মুজিযা বলার সময় কম অতিশয়োক্তি করবে না, এই তিনশ মানুষ আমার কাছে তিন হাজারেরও অধিক লোককে আমার মুজিযা শুনিয়ে আমার কাছে এভাবে মুগ্ধ করে নিয়ে আসবে।'

'এই সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি হবে' – ইসমাঈল বললো – 'মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাসের শেষ নেই। কাগজের ভেতর একটা মাটির টুকরো পেঁচিয়ে দিয়ে যদি বলো এটা মক্কা মদীনার তোহফা। তাহলে সে ভাবনা ছাড়াই খেয়ে ফেলবে। এভাবেই ঐ সেলজুকি সালার ও সাওয়াররা আমাদের দেয়া খেজুরকে মক্কার খেজুর এবং নদীর পানিকে আবে যমযম মনে করে পান করলো।'

'তুমি তো দারুণ কাজের এক জিনিস খাদীজা' – হাসান ইবনে সবা ঐ যৌবনবতীকে কাছে টেনে নিয়ে বললো –

'এখন থেকে তোমাদের কাছ থেকে আমার অনেক কাজ নিতে হবে'– একথা বলে ইসমাঈলের দিকে তাকালো হাসান।

ইসমাঈল ইশারা বুঝতে পারলো এবং বের হয়ে গেলো কামরা থেকে।

সালার কযুল সারুক এতগুলো ফৌজী সওয়ার নিয়ে কেন এদিকে এসেছিলো সেটা তার মাথায় ধরছিলো না। তার সওয়ারদের মাথায়ও ধরছিলো না। সব কাজই তাদের স্বাভাবিকভাবে চললো। সেই পাহাড়ি রাস্তাও অতিক্রম করেছে তারা। তবে কখন কোন কাজটা করতে হবে সে অনুভূতি তাদের ছিলো না। রাতে বিশ্রামের জন্য কোথাও ছাউনি ফেলার কথা সালার কযুল সারুকের মনে ছিলো না। তার কমাণ্ডারদেরও মনে ছিলো না। রাতের ছাউনি ফেলে তারা দিনে যখন আকাশে গনগনে সূর্য তখনই তারা ঘুমোয়-বিশ্রাম করে পরদিন সকাল পর্যন্ত।

মারু থেকে কিছু দূরে থাকতে সালার কযুল সারুক হঠাৎ তার মাথা ঝাঁকালেন এবং লশকরকে পথে থামালেন। তার ও তার ফৌজের সবার ভোঁতা অনুভূতি বদলে যেতে লাগলো। প্রত্যেকের চেহারায় দ্বিধা, সংশয় এবং বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো।

'তোমরা কেমন বোধ করছো?' – সালার কযুল সারুক তার কমান্ডারদের জিজ্ঞেস করলেন– মনে হচ্ছে আমরা স্বপ্নে কোথাও ঘুরে ফিরে এসেছি এবং হাসান ইবনে সবাকে হয়তো দেখেছিও।'

'আমি এমনই বোধ করছি' – এক কমাণ্ডার বললো – 'কিছু কিছু মনে পড়ছে। যেন আমরা ওখানে গিয়ে ছিলাম।'

'আমার মনে আছে, এক হাজী তার স্ত্রী ও দুটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিলো। তারপর একটা নদীর কথাও মনে আছে' – আরেক কমাণ্ডার বললো।

সালার কযুল সারুক চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তার সবকিছু যেন মনে পড়ছে এখন।

'আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে' – সালার বললেন – 'সুলতানকে মুখ দেখানোর উপযুক্ত রইলাম না আর আমরা। কিন্তু বন্ধুরা! সুলতানের সামনে মিথ্যা বলবো না কেউ। যা হয়েছে হুবহু বর্ণনা দেবে। সুলতানের দয়া হলে আমাদেরকে মাফ করে দিতে পারেন, না হয় তিনি যে শাস্তিই দেবেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবো আমরা।'

'তাহলে একটা কাজ করতে হবে বন্ধুরা!' – এক কমাণ্ডার বললো– 'সুলতান যদি আমাদেরকে বরখাস্ত করে দেন তাহলে এসো আমরা শপথ করি আমরা নিজেদের মতো করে হাসান ইবনে সবাকে জীবিত অথবা মৃত সুলতানের সামনে পেশ করবো এবং তার দলের একটাও জীবিত রাখবো না।'

'সুলতান আমাদেরকে কয়েদ করলে তাকে আমরা বলবো আমাদের ভুলের ক্ষতি পূরণের জন্য আমাদেরকে সুযোগ দিন' – আরেক কমাণ্ডার বললো।

'ভেবে দেখো বন্ধুরা!' – সালার বললেন – 'হাসান ইবনে সবার জায়গায় অন্য কোন দুশমনের কাছে এভাবে আমরা ধোঁকা খেলে সুলতান আমাদেরকে মাফ করে দিতেন। কিন্তু এখানে ব্যাপার হলো হাসান ইবনে সবা ও ইসলামকে হেফাজতের। সুলতান আমাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন এবং আমি মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুতও। কিন্তু আমাদের ওফাদারী হলো, আমরা তার সামনে যাবো এবং প্রস্তুত হয়ে যাবো মৃত্যুর জন্য।'

১৮

সালার কযুল সারুকের প্রতি সুলতান মালিকের আস্থা একটু বেশিই। তার এই সালার সফল হয়ে আসবে এটা তার বদ্ধমূল ধারণা। ওযীরে আজম খাজা হাসান তুসী কয়েকবারই তাকে বলেছেন, এখনো কেন কযুল সারুকের কোন পয়গাম এলো না। কমপক্ষে একটা পয়গাম তো আসা উচিত ছিলো।

'খেক শিয়ালের শিকার সহজ হয় না খাজা!' – সুলতান মালিকশাহ এর উত্তরে বলেছিলেন – 'আপনি কি জানেন না হাসান ইবনে সবা আমাদের যুদ্ধবাজ দুশমন নয়? সে খেক শিয়াল, সে তলোয়ার দেখিয়ে মারে বর্শা। আমাদের সালার আমীর

আরসালান তার ধোঁকায় পড়ে মারা গেছে। বাতিনীদের বিরুদ্ধে সে প্রাণপণ লড়াই করেছে। কিন্তু তার আঘাত ব্যর্থ হয়েছে। কযুল সারুক ধোঁকায় পড়বে না। সে দৃঢ় ভাবে বলে গিয়েছে, সে যখন ফিরে আসবে হাসান ইবনে সবা তার সঙ্গে থাকবে না হয় সে নিজেও ফিরে আসবে না।'

নেযামুল মুলক তখন আর কিছু বলেননি। সুলতানের এ কথাকে তিনি মনে মনে গ্রহণ করেননি। সালার কযুল সারুকের সফলতার ব্যাপারে তার মন খুঁত খুঁত করছিলো। মালিক শার দূরদর্শীতা যেখানে শেষ নেযামুল মুলকের সেখান থেকে শুরু – এই মূল্যায়ন স্বয়ং মালিকশাহর।

একদিন সুলতানের মহলের কাছে বিরাট আওয়াজ উঠলো–'লশকর ফিরে আসছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেলো।

'সালার কযুল সারুক আসছে।'

'লশকরের সবাই তো ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বিজয়ী লশকর আসছে।'

'সুলতানে আলী মাকাম' – দ্বাররক্ষী দৌড়ে গিয়ে মালিক শাহকে জানালো – 'সালার কযুল সারুকের লস্কর ফিরে আসছে। শহর থেকে সামান্য দূরে রয়েছে এখন।'

'এখনই আমার ও নেযামুল মুলকের ঘোড়া তৈরী করো' – মালিকশাহ বললেন।

নেযামুল মুলক বাইরে আওয়াজ শুনে সুলতানের কাছে গেলেন।

'কযুল সারুকের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবো শহরের বাইরে' – মালিক শাহ বললেন।

সুলতান ও নেযামুল মুলক ঘোড়ায় করে শহরের বাইরে বের হলেন। চারজন করে মুহাফিজ বাহিনীর কমাণ্ডার তাদের আগে ও পেছনে রইলো। লশকর তখন সামান্যই দূরে।

'কযুল সারুক আমাদের দেখেও ঘোড়া ছুটায়নি। এটা কি কোন বিজয়ীর আচরণ?' –মালিক শাহের গলায় দ্বিধা।

'তাদের চেহারা ও হাবভাবে তো তা মনে হচ্ছে না। বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত যদি হতো আমাদেরকে দেখেই ছুটতে ছুটতে চলে আসতো' – নেযামুল মুলক বললেন – 'মনে হচ্ছে বড় কষ্টে এরা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে।'

'আর লশকরও তো নিশ্চুপ–' মালিক শাহ বললেন এবং তার ঘোড়া একটু সামনে নিয়ে গেলেন।

কাছে এসে কযুল সারুক তার ঘোড়া লশকর থেকে পৃথক করে মালিক শাহর সামনে এসে থেমে গেলেন।

'খোশ আমদেদ সারুক!' – সুলতান মালিকশাহ তার হাত সারুকের দিকে বাড়াতে বাড়াতে বললেন–

'হাসান ইবনে সবাকে জীবিত বা মৃত আনতে পারোনি বলে লজ্জার তো কিছু ঘটেনি।'

মালিক শাহ হতভম্ব হয়ে দেখলেন তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছেন আর কযুল সারুক তার হাত নাড়ছেও না।

'সারুক'। নেযামুল মুলক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন – 'মহামান্য সুলতান যে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছেন – এক সওয়ারের মর্যাদা তো এত উঁচুতে নয় যে, সে সুলতানের হাতকে এভাবে উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখাবে!'

'ঠিক বলেছেন মুহতারাম ওযীরে আজম!' – কযুল সারুক বললেন – 'কিন্তু আপনার সালারের এখন সে যোগ্যতা নেই যে, সে সুলতানের হাতকে স্পর্শ করবে।'

'কেন'? সুলতান তার হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন – 'আমাদের ধারণা কি তবে ভুল যে, তোমরা জয়ী হয়ে ফিরেছো? সেলজুকি সালার কি পরাজয় মেনে নিতে পারে?'

'সুলতানে মুকাররাম!' কযুল সারুক বললেন– 'আমার বিজয় এটাই যে, আমি আমার পুরো ফৌজকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। শুধু দুই সওয়ার মারা গেছে। কিন্তু লড়াই ছাড়া আমাদের ফিরে আসাটাই হাসান ইবনে সবার বিজয়। সে যদি হামলা করতো তাহলে আমাদের কেউ জীবিত ফিরে আসতো না। আরাম করে পুরো ঘটনা শোনার ইজাযত দেবেন সুলতানে মুহতারাম?'

দুজন কম এক হাজার সওয়ারের লশকর তখন কেমন শোক স্তব্ধ থমথমে মুখে ধীরে ধীরে শহরের সেনা ছাউনির দিকে যাচ্ছিলো।

'আমাদের সঙ্গে এসো' – সুলতান সারুককে বললেন।

সুলতানের মহলে গিয়ে কযুল সারুক সুলতান ও নেযামুল মুলককে পুরো ঘটনা শোনালেন। কিছুই লুকাননি।

'সেই প্রাচীন কেল্লার দেয়াল থেকে দুটি তীর ছুটে এলো এবং মারা গেলো আমার দুই সওয়ার। আমি বেশ আশ্চর্য হলাম ঐ দুই তীরন্দায কেন আমার দুই সওয়ারকে মেরে ফেললো। দেয়ালের ওপর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলো আরেক লোক। সেই হাসান ইবনে সবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখানে কেন এসেছো? আমি আমার কমাণ্ডারদের জিজ্ঞেস করলাম আমরা এখানে কেন এসেছি। হাসান ইবনে সবা বললো এখান থেকে চলে যাও তোমরা' ....

'আর তোমরা চলে এলে' – সুলতান বললেন।

'হ্যাঁ সুলতানে মুকাররম। কিছুই বুঝতে পারিনি আমি' – তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে এলো।

'সেখানে আর কি কি হয়ে ছিলো মনে আছে তোমার?' – নেযামুলমুলক জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে আছে' – সারুক চাপা কান্নার গলায় বললেন – 'সব মনে আছে কিন্তু স্বপ্নের মতো মনে হয় এখন।'

'হতাশ হয়োনা সারুক' – সুলতান বললেন – 'আমি জানি কি হয়েছে। আচ্ছা! ফিরে আসার সময় তোমরা যখন নিজেদের অনুভূতি ফিরে পেলে তখন কি একবারও ভাবোনি যে ফিরে গিয়ে সেই কেল্লায় হামলা করবে?'

'হ্যাঁ ভেবেছিলাম। কমাণ্ডারদের সঙ্গে পরামর্শও করেছি। সবাই বললো ফিরে যাওয়া বৃথা...........

'বাতিনীরা যেভাবে আমির আরসালান ও তার পাঁচশ সওয়ারকে হত্যা করে তিবরীজ থেকে পালিয়েছে ঐ প্রাচীন কেল্লা থেকেও পালাবে ওরা। আসলে এমন অনুতপ্ত ছিলাম তখন যে, কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। যুদ্ধের ময়দানে আমার পূর্ব লড়াই সম্পর্কে আপনারা তো জানেনই। আমার শরীরে কতগুলো যখমের চিহ্ন আছে তা আমি নিজেও গুণতে পারবো না। সেলজুকি সালতানাতের জন্য আমি যে রক্ত ঝরিয়েছি শুকলে এখনো আপনারা গন্ধ পাবেন। কেউ কি এটা মানতে পারবে যে, লড়াইকে ভয় পেয়ে আমি ফিরে এসেছি'

'তোর ওপর কোন অভিযোগ নেই সারুক!' – নেযামুল মুলক বললেন – 'তোমার ও তোমার লশকরের হুঁশ নষ্ট করে দিয়েছে সেই খেজুর ও আবে জমজম যা তোমরা মক্কাবাসিদের তোহফা মনে করে খেয়েছো।'

'খাজা তূসী'! – সুলতান বললেন – 'ফৌজের ওপর আজ থেকে হুকুম জারী করে দিন যে কোন ফৌজ বাইরে গিয়ে– সে সালার হোক বা সাধারণ সিপাহী হোক – অপরিচিত কারো হাতের কিছু খেতেও পারবে না পানও করতে পারবে না। কযুল সারুক! তুমি আসলে বড়সড় ধোঁকায় পড়েছিলে। এখন যাও। বিশ্রাম করো গিয়ে। তোমার অধীনস্থ সব সিপাহীকে বলে দাও, তোমাদের ওপর কোন অভিযোগ নেই। আর ওদেরকে জানিয়ে দাও, খেজুর ও পানিতে এমন কিছু মিশিয়ে তোমাদেরকে তা দেয়া হয়েছিলো যা বোধবুদ্ধি সব লোপ করে ফেলে। আরেকটা কথা ওদেরকে জানিয়ে দেয়া জরুরী যে, ওরা যেন এই ভ্রান্তিতে না পড়ে হাসান ইবনে সবার কাছে দুশমনের ফৌজকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার শক্তি আছে।'

'আমি ও আমার কমাণ্ডাররা লশকরের সবাইকে একথা বলেছিলাম কিন্তু কয়েকজন এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে যে, হাসান ইবনে সবাকে খোদা এমন অদৃশ্য শক্তি দিয়েছেন যে, সে যদি দুশমনের দিকে তাকায় দুশমন ধ্বংস হয়ে যায় বা আমাদের মতো পিঠ দেখিয়ে পালায়।'

'আচ্ছা এর ব্যবস্থা করা হবে। তুমি যাও' – সুলতান বললেন।

'সুলতানে আলী মাকাম! আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ' – কযুল সারুক ভেজা গলায় বললেন – 'আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। আমি এই প্রতারণার প্রতিশোধ নেবো। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি সারুক!' – সুলতান বললেন – 'কিন্তু তুমিতো তোমার দুশমনকে দেখে এসেছো যে, সম্মুখ লড়াইয়ের দুশমন নয় সে। এর জন্য আমাদের অন্যকোন পথ ভেবে বের করতে হবে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, তোমার মতো একজন অভিজ্ঞ সালার নিজের নির্বাচিত সওয়ারদেরসহ জীবিত ফিরে আসতে পেরেছো। আমির আরসালানের মতো সমস্ত সওয়ারসহ মারা যাওনি তুমি। এই নিকৃষ্টতম দুশমনকে হত্যা করা আমার জন্য ফরজ। আর এই ফরজ আদায় হবে জিহাদের মাধ্যমে।'

সালার কযুল সারুক সেখান থেকে চলে এলেন কিন্তু সুলতান বা নেযামুলমুলক কারো কথাই তাকে শান্ত করতে পারেনি। সারুক নিজের ভেতর উৎক্ষিপ্ত হলকার আঁচ অনুভব করলেন।

★★★★

'এ ব্যাপারে আপনার চিন্তা ভাবনা কি?' – কযুল সারুক চলে যাওয়ার পর সুলতান নেযামুলমুলককে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের কাছে ফৌজ আছে' – নেযামুলমুলক বললেন – 'বাতিনীদের কোন ফৌজ নেই। কিন্তু ওদের ওপর দুই দুইবার হামলা চালিয়ে আমরা কি পেলাম? আমাদের এক সালার ও পাঁচশ সওয়ারকে হত্যা করলো..... তারাই যাদের ওপর হাসান ইবনে সবা তার উগ্র ফেরকাবাজীর উন্মাদনা বিস্তার করে রেখেছে। নিজেদের প্রাণ এরা ঐ একটি লোকের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছে। দ্বিতীয় হামলার পরিণাম দেখুন আরো অদ্ভুত। এ থেকে আমরা যা পেলাম তা হলো, এক লোকের নাম হাসান ইবনে সবা। যে তার অন্ধ ভক্ত-শিষ্যদের দ্বারা আমাদের ফৌজকে রক্তে গোসল করাতে পারবে।'

'কিন্তু খাজা!' আমি আপনার এই পরামর্শ মানবো না যে হাসান ইবনে সবাকে আমরা ভুলে যাই।'

'না না। আমি ওয়াদা করে রেখেছি হাসান ইবনে সবাকে গ্রেফতার করে জল্লাদের হাতে ছেড়ে দেবো।'

কিন্তু 'গ্রেফতার করবেন কিভাবে?'

'এই প্রশ্নের উত্তর এখনই দিতে পারবো না। এতটুকুই বলছি, হাসান ইবনে সবাকে শায়েস্তার জন্য ফৌজি শক্তি ব্যবহার করাটা জরুরী নয়। এ ব্যাপারে আমি অসতর্কও নই আলী জাহ! আমি গুপ্তচর নিয়োজিত করে রেখেছি। এখন পর্যন্ত যেসব খবর আমি পেয়েছি এতে অতি ভয়ংকর ভয়ংকর চিত্র আমাদের সামনে আসছে। আপনি তো আগেই জেনেছেন, হাসান ঐ সব এলাকার মুকুটবিহীন সম্রাট বনে গেছে। তার হুকুম চলে মানুষের মনে। তার জনপ্রিয়তা বড় দ্রুত বাড়ছে।

'খাজা হাসান তুসী!' – মালিকশাহ এমনভাবে বললেন যেন আচমকা জেগে উঠেছেন – 'কোন এলাকা বা রাজ্য জয় করবো না আমরা। মানুষের মনকে আমরা বাতিল ও শয়তানের অশুভতা থেকে মুক্ত করবো। এই সালতানাতের ইতিহাস কি বলে খাজা? সেলজুকিরা ইসলাম গ্রহণ করে এই সালতানাতের গোড়াপত্তন না করলে এই বিশাল অঞ্চলে ইসলামের ভিত্তি টলে যেতো এবং আল্লাহর এই দীন প্রাচীন ধর্মীয় কাহিনীতে পরিণত হতো। প্রথম রক্ষা করতে হবে নিজেদের দীনকে তারপর সালতানাতকে। দীনের অবিচলতাই আমাদের সুরক্ষা। যার মধ্যে ইসলাম ও ঈমান নেই তার দৃষ্টিতে গোলামী ও আযাদীতে কোন পার্থক্য নেই। তাই ইসলামকে সামনে রাখুন। এসব যা কিছু হচ্ছে ইসলামের ধ্বংসের জন্যই হচ্ছে।'

'সুলতানে আলী মাকাম! রাসূলুল্লাহ (স) এর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হচ্ছে ..... তিনি বলেছিলেন, আমার উম্মত ফেরকাবাজিতে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবে....... ইসলামের ধ্বংসে তো এই ফেরকাবাজীই করেছে।

'কথার সময় নেই খাজা! আমাদের কিছু একটা করতেই হবে এখন।'

'সুলতানে মুআজ্জম! শুধু দুজনকে যদি দুনিয়া থেকে উৎখাত করা হয় তাহলে এই ফেতনা এবং এই সন্ত্রাসী এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে।'

'হাসান ইবনে সবা ও আহমদ ইবনে গুত্তাশকে তো? এটা আমি ভেবে রেখেছি। করতে হবে এটাই।'

'একাজ সহজ নয় সুলতানে মুহতারাম! তবুও কঠিনকেই আমাদের সহজ করতে হবে।'

যে বিশাল এলাকা জুড়ে হাসান ইবনে সবার ভক্ত-শিষ্য ও অনুসারীরা রয়েছে সেসব এলাকায় নেযামুল মুলক গুপ্তচর নিয়োজিত রেখেছেন। এসব গুপ্তচরদের কেউ না কেউ সবসময়ই আসছে এবং তাদের সরে জমিনে রিপোর্ট নেযামুল মুলককে পেশ করছে। তাদের প্রায় সবার রিপোর্টেই এতথ্য থাকে যে হাসান ইবনে সবার মুবাল্লিগদের একদল বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে হাসান ইবনে সবার নামে কাল্পনিক ও বানানো অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করে বলে, এসব হাসান ইবনে সবার মুজিয়া বা কারামত। এরা না বলে যা ইসলামের নামে বলে এবং নিজেদের খাঁটি মুসলমান বলে পরিচয় দেয়।

লোকদেরকে তারা বড় ভয়াবহ ভঙ্গিতে ইসলামের প্রথম যুগের যুদ্ধের কাহিনী শোনায়।

কাফেররা কিভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহবায়ে কেরামের ওপর অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচার চালিয়েছে এবং কি করে সাহাবায়ে কেরাম তাদের দীনের জন্য রাসূল (স) এর জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে বিখ্যাত হয়েছে এসব তারা লোকদেরকে শোনায়।

এসব এলাকার লোকেরা মুসলমান হলেও অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং ধর্মীয় ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ (স) এর নির্যাতিত জীবনের ঘটনায় মনগড়া আরো অনেক কিছু সংযোজন করে এদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তেজিত করে তোলে এরা। তারপর বলে হাসান ইবনে সবা সেই ইসলামই নিয়ে এসেছে যা রাসূলুল্লাহ (স) নিয়ে এসেছেন। কাফেররা ষড়যন্ত্র করে রাসূলুল্লাহ (স) এর ইসলামকে বিকৃত করে দিয়েছে। এখন হাসান ইবনে সবার ওপর শুধু কাফেররাই নয় বরং ভ্রান্ত মতবাদের মুসলমানরাও হাসান ইবনে সবা ও তার সঙ্গীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে।

নেযামুল মুলককে পালা করে এসব খবর দিয়ে গুপ্তচররা ফিরে যেতো। একবার নেযামুল মুলক এমন দু'জন গুপ্তচরকে বললেন,

'বন্ধুরা আমার! আজ পর্যন্ত তোমরা যতগুলো খবর এনেছো এর মধ্যে নতুনত্ব ছিলো না কোন খবরেই। আমি অনুমান করতে পারি সেখানে পর্দার আড়ালে কি হচ্ছে। আর এতটুকু নিশ্চিত করে জানি যে, কোন ভয়ংকর নেশা এবং অতি সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করে অনেক প্রভাবশালী লোককে তারা নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। এখন আমাদের দরকার হলো, সেখানে পর্দার পেছনে বন্ধ কামরায় যা হচ্ছে তা জানা এবং হাসান ইবনে সবা ও তার উস্তাদ আহমদ ইবনে গুত্তাশকে কিভাবে হত্যা করা যায় তা খুঁজে বের করা।'

এখন পর্যন্ত কোন গুপ্তচর হাসান ইবনে সবার একেবারে দলের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। এজন্যেই পর্দার আড়ালে কী হচ্ছে তা জানা সম্ভব ছিলো না। তাই নেযামুল মুলক এমন কাউকে খুঁজ-ছিলেন যাকে হাসান ইবনে সবার এত কাছে পৌঁছানো যায় যে, সে তার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভেতরের সব খবর নিয়ে আসবে।

★★★★

হাসান ইবনে সবা যেদিন সেলজুকি সালার কমুল সারুককে হাশীষ পান করিয়ে ধোঁকা দিয়ে ফেরত পাঠায়, এরপর দিন সকালে তার শিষ্যদের নিয়ে কেল্লা আলমোতের দিকে কোচ করে। এ কেল্লাতেই সে তার স্বপ্নের বেহেশত বানাতে চাচ্ছিলো।

উঁচু এবং খুব চওড়া এক পর্বতশৃঙ্গের ওপর শহরে কযবীল ও খাযায নদীর মাঝামাঝিতে কেল্লা আলমোত। কোন এককালে এখানে দায়লেমী সুলতানদের সাম্রাজ্য ছিলো।

এক দিন এক দায়লামী সুলতান তার শিকারী এক ঈগল নিয়ে শিকারে বের হলেন। উড়ন্ত এক পাখির পেছনে তিনি তার ঈগলকে পাঠালেন। শিকারী ঈগল পাখিটি ধরলেও ছটফট করে পাখিটি তার পাঞ্জা থেকে বেরিয়ে যায়। অত্যন্ত যখমী ছিলো বলে পাখিটি বেশি দূর উড়তে পারেনি। হেলতে দুলতে একটি টিলার ওপর গিয়ে পড়ে। পাখিটি বেশ বড় ও দুর্লভ জাতের ছিলো। শিকারী ইগল আরেকবার পাখিটির ওপর হামলে পড়ে পাখিটি তার পাঞ্জায় নিয়ে নেয়।

সুলতানের ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে পর্বতসমান টিলার চূড়ায় উঠে গেলো। তার সঙ্গে কিছু মুহাফিজ ও তার কিছু সঙ্গী ছিলো। সুলতান শিকারী ঈগল থেকে পাখিটি নিয়ে যখন এই চূড়ার উচ্চতা থেকে চার দিকে তার নজর ঘুরালেন তিনি দ্বিধায় পড়ে গেলেন কোন দিক থেকে তিনি তার নজর ফেরাবেন।

মুগ্ধতার তীব্র আকর্ষণ তার দৃষ্টিকে যেন শিকল পরিয়ে দিয়েছিলো। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এত বিপুল সমাহার নিয়ে যে পৃথিবীতে এমন একটি এলাকা আছে তিনি কল্পনাও করতে পারছিলেন না। পাহাড়ের একদিকে কুল কুল করে বয়ে চলছিলো একটি রূপসী নদী। যার নিজের সৌন্দর্যের কোন শেষ ছিলো না।

পাহাড়ের আঁচল থেকে নিয়ে চূড়া পর্যন্ত ঘন বৃক্ষের মখমল কোমল আস্তরণ। কোন বৃক্ষে ফুলের মেলা কোন বৃক্ষে ফলের মেলা। চারদিক মৌ মৌ করছে জাদুময় সৌরভ। পর্বতের এই উচ্চতা থেকে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই এমন শ্যামলময় দৃশ্যের ঢেউ। এ যেন বেহেশতেরই খসে পড়া বিশাল এক অংশ।

এই এলাকা সম্পর্কে এক ইউরোপীয় লেখক লিখেছেন, কেউ যদি আমাকে বলে খোদা আদি পিতা আদি মাতা আদম ও হাওয়াকে এই বেহেশতেই রেখেছেন আমি সত্য বলে তা মানতে বাধ্য হবো।

সুলতানকে নৈসর্গিক এই বিপুল বিস্ময় জাদু করে ফেললো। তিনি আরো দেখলেন প্রতিরোধ এলাকা হিসেবেও এলাকাটি অদ্বিতীয়। কারণ পর্বতসমান এই টিলার চূড়া অংশটি গোল নয় চিরা চেপ্টা – প্রায় এক মাইলেরও বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

'এত অন্তরমুগ্ধ সুন্দর এলাকা জীবনে এই প্রথম দেখলাম' – সুলতান তার লোকদের বললেন – 'পাহাড়ের মতো মজবুত এবং বেহেশতের চেয়ে মনোলোভা –এই

সৌন্দর্যের সমাহারের মধ্যে যদি এখানে একটি কেল্লা বানাতে চাই তোমরা কি আমাকে সমর্থন করবে না?'

'অবশ্যই সমর্থন করবো আলীজাহ!' – সবাই একসঙ্গে বললো – 'এর চেয়ে মনোমুগ্ধকর জায়গা দুনিয়ায় আর একটিও নেই। এখানে কেল্লা নির্মাণ হলে তখন কেল্লার দেয়াল– প্রাচীর এবং দরজা পর্যন্ত কখনো কোন দুশমন পৌঁছতে পারবে না। যত বড় ফৌজই হোকনা কেন টিলা বেয়ে কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে তীর বৃষ্টিতে পড়ে ঝাঝরা হয়ে যাবে।'

শিকার থেকে ফিরে এসে সেই দায়লামী সুলতান প্রথমেই ঐ টিলায় কেল্লা নির্মাণের হুকুম দিলেন। এর ডিজাইনার ছিলেন সুলতান নিজেই। সেই কেল্লা দেখলে আজো পৃথিবীখ্যাত সব স্থাপত্য শিল্পীরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাবে। কেল্লা নির্মাণের পর দেখা গেলো সেটি মজবুত কেল্লাও আবার মনোরম মহলও। কেল্লার নিচে পাতাল মহলও বানানো ছিলো। পাতাল মহলটির প্রবেশ পথটি তৈরী করা হয় অসংখ্য অলিগলির সমন্বয়ে গোলক-ধাঁধার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর নির্মাণ কাজে শ্রম দেয় হাজার হাজার নির্মাণ শ্রমিক।

এই কেল্লার নাম রাখা হয় প্রথমে আলাহ মোত। দায়লামী ভাষায় 'মোত' মানে ঈগল পাখি। আর 'আলাহ' মানে প্রশিক্ষণের জায়গা। সেই দায়লামী সুলতান যদি তার শিকারী ঈগলের পেছনে পেছনে এই টিলার চূড়ায় না পৌঁছতো তাহলে এই কেল্লার কথা কারো মাথায় আসতো না। কিন্তু পরে লোকমুখে বিকৃত হতে হতে এর নাম হয়ে যায় আলমোত।

এখন এই কেল্লার আশে পাশের এলাকাসহ বিশাল প্রদেশের গভর্ণর হলেন আমীর জাফরী। আমীর জাফরী আরেক বড় আমীর মেহদী উলবিকে কেল্লা আলমোতের হাকিম নিযুক্ত করেন।

হাসান ইবনে সবা আলমোতের সামান্য দূরে থাকতেই থেমে গেলো। এখানে আসার আগে সে তার বেশ কিছু ভক্ত-শিষ্যকে আলমোতের কাছের রাস্তাগুলোতে ছড়িয়ে দেয়। তারা কয়েকদিন এ আবাদীতে গিয়ে গিয়ে হাসান ইবনে সবার এই মুজিযা শোনায় – তিবরীজে মাত্র সত্তরজন লোকের ওপর পাঁচশ সেলজুকি সওয়ার হামলা চালায়। কিন্তু ইমাম হাসান ইবনে সবা খোদার কাছে মদদ চাইতেই গায়েব থেকে অসংখ্য সওয়ার এসে সেলজুকিরদের হত্যা করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর প্রাচীন কেল্লায় তিনশ জনের ওপর এক হাজারেরও বেশি সওয়ার হামলা করে দিলো। হাসান ইবনে সবা দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে শুধু ঐ সওয়ার লশকরের সালারের দিকে তাকালো। লশকর মাতা নিচু করে চলে গেলো।

হাসানের লোকজনের মধ্যে মাত্র তিনজন পুরুষ ও এক মহিলা ছাড়া সবাই তার এসব ভণ্ডামিকে 'মুজিযা' বলে জানতো। এই তিনজনই কেবল আসল সত্য সম্পর্কে জানতো। হাসান তার সঙ্গীদেরকে বলে দেয়, বাছা বাছা দু'শজন শিষ্যকে আমার এসব ঘটনা মুজিযা বলে প্রচারের জন্য আলমোত পাঠিয়ে দাও। আর বলে দাও এ হুকুম ইমামের পক্ষ থেকে নয়। এটা আমাদের ফরজ কাজ।

'এই হুকুম ইমামের নয়' – তার তিন বিশেষ সঙ্গীর একজন তারই অন্য সব শিষ্যদেরকে বললো – 'আমাদের প্রত্যেকের ফরজ কাজ হলো সবাইকে একথা জানানো যে, আমাদের ইমাম হাসান ইবনে সবা রাসূলুল্লাহ (সে) এর বিপথগামী উম্মতকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। তিনি কি কি 'মুজিযা' দেখিয়েছেন তার বর্ণনা লোকদের শোনাও। তারাও ইমামকে খোদার প্রেরিত ইমাম বলে মেনে নেবে।'

'খোদার প্রেরিত ইমাম' এর 'মুজিযা' শুনে দলে দলে লোক জামায়েত হয়ে হাসান ইবনে সবার পেছনে রওয়ানা হয়ে গেলো। কেল্লা আলমোত থেকে সে যখন সামান্য দূরে তখন তার শিষ্যের সংখ্যা তিন হাজার। তিবরীজ থেকে রওয়ানার সময় তার শিষ্য ছিলো মাত্র তিনশ জন। একস্থানে গিয়ে হাসান আবার থেমে পড়ে। সেখানে তার বিশাল এক তাঁবু টানানো হয়।

হঠাৎ করেই আবার গুজব ছড়ানো শুরু হয় 'ইমাম' হাসান ইবনে সবাকে তার তাঁবুতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরাও জানেনা 'ইমাম' কোথায় গেছে।

'ইমাম'কে খোদা কখনো কখনো তার কাছে ডেকে নিয়ে যান' – তার এক সঙ্গী এই বলে প্রপাগাণ্ডা ছড়ায় – 'যে কোন সময় তিনি ফিরে আসবেন।'

হাসানের তাঁবুর কাছে কারো যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। তার শিষ্যরা তার তাঁবুর চেয়ে ছিলো অনেক দূরে।

হাসান এখানে পৌঁছানোর তৃতীয় রাতের এক নির্জন সময়ে খালজান থেকে তার তাঁবুতে এসে হাজির হয় তার গুরু আহমদ ইবনে গুতাশ। অনেক দিন পর তাদের এই সাক্ষাত হয়। হাসান তার এত দিনের কার্যক্রম আহমদকে শোনায়। কিন্তু আহমদ ইবনে গুতাশ যখন তার খালজানের গোপন কার্যক্রম শোনালো হাসান ইবনে সবাও হয়রান হয়ে গেলো।

'এখন কেল্লা আলমোত দখল করতে হবে' – আহমদ ইবনে গুতাশ বললো – 'যদিও এটা এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে। আমীর মেহদী উলবীর আছে তিন হাজার সওয়ার। এরা তার মুহাফিজ বাহিনী। কিন্তু তার কোন ফৌজ নেই।'

'তাহলে এই কেল্লা দখল করা কঠিন কিছু নয়। আমার শিষ্যদের মধ্যে তিনশ'রও বেশি লড়াকু লোক আছে। আর এই যে আমার সাক্ষাতের জন্য হাজারো লোকের ভিড় লেগেছে। কয়েকশ লড়াকু লোক এখান থেকেও বেরিয়ে আসবে।'

'না হাসান! আমি তো তোমার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছি। আমরা এর আগে যেসব কেল্লা দখল করেছি তা কি লড়াই করে দখল করেছি? .... রক্তের একটি ফোটাও অপচয় হবে না কিন্তু আলমোত আমাদের হবে। আমাদের কি করতে হবে শোন!'

আহমদ ইবনে গুতাশ ও হাসান ইবনে সবার গলায় আওয়াজ, এরপর ফিসফিসানিতে রূপ নিলো। দু'জনের কথা কেবল তারা দু'জনই বুঝলো শুনলো দু'জনেই। সেসব কথা তাঁবুর দেয়াল পর্যন্তও পৌঁছলো না। একেবারে শেষ রাতের দিকে আমদ ইবনে গুতাশ তাঁবু থেকে বের হলো এবং খালজানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলো।

★★★★

হাসান ইবনে সবাকে এক নজর দেখার জন্য, তার গায়েবী আওয়াজ শোনার জন্য এবং আসমান থেকে প্রেরিত তার 'মুজিযা' দেখার জন্য দিন দিন কেল্লা আলমোতের কাছের পাহাড়ি এলাকায় দলে দলে লোকজন ভিড় করতে লাগলো।

একদিন মাঝরাতে, রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ভীতপ্রদ গলার আওয়াজ উঠলো– 'ঐ দেখো...... লোকেরা .... ঐ দিকে দেখো।'

'জেগে উঠোরে ...... দেখো মাটি থেকে মেঘ উঠছে'.........

'মেঘে রঙের খেলা' দেখো'.............

'এটা নিশ্চয় 'ইমাম' এর অবতরণের সময়'........

তারপর শুরু হলো ঘুমের ঘোরে থাকা হাজারো মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কার আগে কে যাবে? কে এই কুদরতের দৃশ্য আগে দেখবে, কত কাছ থেকে দেখবে। হুড়াহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, ভাগদৌড়, চিৎকার চেচামেচি কেয়ামত নামিয়ে আনলো যেন সেখানে।

ষাট সত্তর হাত উঁচু, আড়াই তিন ফার্লং লম্বা সবুজ গাছ গাছালিতে ছাওয়া একটি টিলা। সেই টিলার গোড়া থেকে লাগোয়া আরেকটি টিলা আরো উঁচুতে উঠে গেছে। সেই উঁচু টিলার অপর পাশে পাদদেশ থেকেই ওপর দিকে মেঘের ভেলা উঠে আসছিলো। এ ছিলো হাসান ইবনে সবার সেই আগের কৌশলের প্রয়োগ। টিলার খাদে বিরাট করে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে ওই আগের মতো আয়নার ব্যবহার করা হয় এবং আগুনে সাদা ধোয়া উৎপাদনকারী বারুদ ব্যবহার করা হয়। লোকেরা এটাকেই ভাবছিলো মাটি থেকে উঠে আসছে মেঘের ভেলা।

রাত এমনিই রহস্যময়। আর অন্ধকার সেই রহস্যময় আরো ঘনীভূত করে তোলে। আর যদি সেখানে দুধ সাদা আলোর বিচ্ছুরণ মেঘের ভেলার আদল নিয়ে ওপরে উত্থিত ধোয়ার আস্তরণ দেখা যায় তখন দর্শক ভেদে এর দৃশ্যপটও চোখে ভিন্নতর ঠেকে। দর্শকদের মস্তিষ্ক তখন তার কল্পনা শক্তির উর্বরতা অনুপাতে বাস্তব অবাস্তব কত কিছু দেখতে পায়। এছাড়াও হাসান ইবনে সবার আগুনের কুণ্ডুলিতে বিভিন্ন ধরনের ক্যামিকেল ব্যবহার করে শিখার মধ্যে লাল, সবুজ, নীল, সাদা, বেগুনি হলুদ এবং ধূসর রঙের সৃষ্টি করে। মনে হচ্ছিলো রং-ধনুর সাতরং বুঝি আরো দ্বিগুণ রঙের মেলা নিয়ে টিলার ওপর উঠে আসছে।

আস্তে আস্তে মেঘের ভেলার ভেতর থেকে একজন মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হতে লাগলো। যার দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত ছিলো।

'হে লোকসকল!' – বড় আওয়াজে ঘোষণা হলো – 'বিসমিল্লা পড়ো, কালেমায়ে তায়্যিবা পড়ো এবং সিজদায় চলে যাও। মহান আল্লাহ তার অবতারিত দূত হাসান ইবনে সবাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন......

'এ সেই হাসান ইবনে সবা, যাকে তার দুশমনেরা ফৌজ দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় – তার আবার আত্মপ্রকাশ ঘটছে।'

সব মানুষ সিজদায় চলে গেলো।

হাসান ইবনে সবার বাছা বাছা তিনশ লোক তাঁবুর ছাউনি থেকে দশ বারটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে টিলার ওপর গিয়ে চড়লো। বাতাস বইছিলো খুব জোরে। মেঘের টুকরাটি এক দিকে সরে গেলো এবং আস্তে আস্তে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেখানে রয়ে গেলো মেঘের টুকরায় চড়ে ভেসে আসা হাসান ইবনে সবা– দুদিকে দু'বাহু প্রসারিত করে। তার গায়ে ঝলমলে সবুজ রঙের আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি। এর ওপর মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো সবুজ রুমাল।

'সবাই সিজদা থেকে উঠো এবং টিলার কাছে চলে এসো'–আবার ঘোষণা হলো।

লোকেরা উঠে দৌড় লাগালো। তলোয়ার এবং বর্শায় সজ্জিত কিছু লোক দৌড়ে আসা লোকদেরকে টিলার কাছে আটকিয়ে সেখানেই বসে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। দশ বারটি মশালের আলোয় হাসান ইবনে সবার চেহারা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো।

'আমি এসে গেছি' – হাসান ইবনে সবার কণ্ঠ থেকে যেন দূরাগত আওয়াজ উঠলো – 'আল্লাহর কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়ে এসেছি যে, যেসব মুসলমানের মুখ আমার মোরাকাবার ভেতর জেগে উঠবে দুনিয়াতেই তাদেরকে আমি জান্নাত দেখিয়ে দেবো। আর তোমাদের সবার গুনাহ আমি মাফ করিয়ে এসেছি।'

'হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।' – ভিড়ের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো – 'আপনাকে আমরা ইমাম বলবো না নবী বলবো?'

'আমি তোমাদেরই একজন। আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারো। শুনে রাখো, আমার পথে যে চলবে সে দুঃখ-কষ্ট বিপদাপদ, সব সমস্যা ও রুগ্নতা ও দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকবে। মুক্ত থাকবে শয়তান ও জ্বিনের অশুভতা থেকে।'

লোকদের মধ্যে বিরাজ করছে শুনশান নিস্তব্ধতা, যেন সেখানে কোন মানুষ নেই। এই নিঃশব্দতাই যেন তাদের চূড়ান্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার একমাত্র প্রকাশ। লোকজন তাদের সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসও চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। যাতে 'ইমাম' এসব পাপী বান্দার নিঃশ্বাসের আওয়াজে অসন্তুষ্ট না হন। হঠাৎ কেউ বলে উঠলো –'মুজিযা' দেখান আমাদের –তখন আরো গভীর হয়ে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো নিঃশব্দতা।

'তোমরা যা দেখেছো সেটা কি মুজিযা না?' – হাসান ইবনে সবা বললো – 'আল্লাহ তাআলা আমাকে বেহেশতের মধ্যে পুঞ্জিভূত মেঘের এক টুকরায় ভাসিয়ে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা কি দেখোনি সেই মেঘের টুকরাটি কত রঙের বাহার ধারণ করে এসেছিলো? আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বেহেশতের সেই পবিত্র মেঘ ফিরে গেছে।'

কথা শেষ হলে তাকে পরম সম্মান জানিয়ে তারই তৈরী সেই তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। এই তাঁবুতে বসেই সে কদিন আগে আহমদ ইবনে গুতাশের সঙ্গে 'বেহেশতের মেঘের টুকরার' পরিকল্পনা করে ছিলো।

ভোর যিয়ারতে আসা ভিড়ের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের সরদার ও সরদার গোছের লোকও ছিলো অনেক। পরদিন সকালে ঐ সব লোকদের বায়আত নেওয়া শুরু করলো হাসান ইবনে সবা।

★★★★

কেল্লা আলমোত সেখান থেকে বেশি দূরে না। আলমোতের আমীর মেহদী উলবীর কাছে খবর পৌঁছছিলো অমুক জায়গায় এক কাফেলা তাঁবু ফেলেছে যে কাফেলার আমীর বড় এক বুযুর্গ ও সম্মানিত লোক। মেহদীকে সেই বুযুর্গের 'মুজিযা'ও শোনানো হয়। কিন্তু তিনি একে কোন গুরুত্ব দিলেন না।

হাসান ইবনে সবার এই ফেরকাবাজীর তুফান যে তার আলমোত কেল্লার ওপর দিয়েও গেছে এবং তার মুহাফিজ বাহিনীর অনেকেই যে এতে প্রভাবান্বিত হয়েছে সেটাও তিনি টের পেলেন না। হাসান ইবনে সবার ঐসব 'মুজিযা' সম্পর্কেও তিনি কিছু জানতেন না। অথচ আলমোতের কিছু লোকও হাসান ইবনে সবাকে 'মহাপুরুষ' বলে মেনে নিয়েছে।

'আমীরে মুহতারাম!' – মেহেদী উলবীর এক সচিব একদিন পেরেশান হয়ে বললেন– 'আমরা এদিকে কোন গুরুত্বই দেইনি অথচ আমাদের সব লোকদের মধ্যে এবং আপনার মুহাফিজ বাহিনীর মধ্যেও এক অদ্ভুত খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, ইমাম হাসান ইবনে সবা নামক এক লোক মেঘের টুকরায় ভেসে এসে নাকি আসমান থেকে নেমেছে এবং দলে দলে লোক তার হাতে বয়আত হচ্ছে।'

'আমরা এখন যা করতে পারি তাহলো আমাদের এলাকা থেকে তাকে বের করে দেয়া'– মেহদী উলবী বললেন – 'কোন ইমাম, কোন বুযুর্গ বা কোন নবী আকাশ থেকে সরাসরি নেমে এসেছে এমন বিশ্বাস করা কোন মুসলমানের জন্য শোভন নয়। আমরা খতমে নবুওয়তের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলমান। নবুওয়তের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে আরো অনেক আগে।'

'আপনি না মানুন' – সচিব বললেন – 'আমিও মানিনা এসব কিন্তু বড় ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে এখানে। লোকজন তো তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেই। আমাদের সিপাহী এবং সওয়াররাও .... আমীরে মুহতারাম! আমি যে তথ্য পেয়েছি এতে বুঝায় এটা কোন নতুন ফেরকা চালু হচ্ছে। এই ফেরকাকে এখানেই খতম করে দেয়া উচিত।'

দু'জনের মধ্যে আরো কিছু আলোচনা হলো। হাসান ইবনে সবা সম্পর্কে দু'জনেই বিভিন্ন মন্তব্য করলেন। অবশেষে মেহদী উলবী তার হুকুম শুনিয়ে বললেন,

'পঞ্চাশ জন সওয়ারের একটা দল নিয়ে যাও। সেখানে হাসান ইবনে সবার মুরীদ ও অনেক অন্ধবিশ্বাসী চেলাও থাকবে। তুমি সঙ্গে যেয়ো। হাসান ইবনে সবাকে তোমার সঙ্গে চলে আসতে বলবে। না আসলে আমার হুকুম শুনিয়ে দেবে যে, সে গৃহবন্দী। তার লোকেরা অবশ্য ঝামেলা করতে পারে। চেষ্টা করবে খুন-খারাবী যেন না হয়। অনেক কিছুই হতে পারে। আবার কিছু নাও হতে পারে। অবস্থা বেগতিক দেখলে এক সওয়ারকে কেল্লায় পাঠিয়ে দেবে। আমি আমার পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দেবো। হাসান ইবনে সবাকে আমার সামনে দেখতে চাই।'

মেহদীর হুকুম তখনই পালিত হলো। পঞ্চাশজন সওয়ার সেদিন সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে গেলো এবং রাতে হাসানের তাবুঁতে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে এখন লোকদের ভিড় নেই। লোকেরা হাসান ইবনে সবার যিয়ারত করে চলে গেছে। সেখানে আছে শুধু তার কাছের লোকেরা।

সওয়াররা তাঁবু ছাউনি ঘিরে ফেললো। হাসান ইবনে সবা ও তার লোকেরা ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলো। তার সঙ্গীদের চেহারায় ভীত ভাব ছড়িয়ে পড়লো। তারা শুধু হাসানের কোন হুকুম বা ইশারার অপেক্ষায় রইলো। এ সময় মেহদীর সচিব– যার নাম আবেদ হাবীবী – তাঁবুতে ঢুকে সালাম দিয়ে হাসান ইবনে সবার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন –

'হে ইমাম! আলমোতের আমীর মেহদী উলবী ইমামের খেদমতে সালাম পাঠিয়েছেন। আর এই আরজিও পাঠিয়েছেন। এই জঙ্গলে ইমামের পড়ে থাকা ভালো দেখাচ্ছে না। যদি ইমাম মেহেরবানী করে কেল্লায় এসে কিছু দিন থাকতেন খুব ভালো হতো। যদি পছন্দ হয় তবে কেল্লাতেই থাকতে পারবেন।'

'দাওয়াতনামা কি কখনো রাতের এই সময় দেয়া হয়?' – হাসান আবেদ হাবীবির চোখে চোখ রেখে সম্মোহনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো – 'তোমাদের এখানে মেহমানকে কি সওয়ারদের দ্বারা ঘেরাও করে দাওয়াত দেয়া হয়?'

'আসলে আমীরে শহর আমাদেরকে হুকুম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। আমরাও এমন সময় রওয়ানা করলাম যে, এখানে এসে অসময়ে পৌঁছলাম। আপনার তাঁবুর আলো না দেখলে কাল সকালে এসে হাজির হতাম...... আর এই সওয়ার?....... এটা আমাদের রীতি। মেহমানদের জন্য আমরা ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে থাকি। আপনার জন্য আনা হয়েছে পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার।'

'আমীরে শহরকে আমার সালাম বলবে' – হাসান ইবনে সবা বললো – 'এবং তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে বলবে, আমি আসবো, কিন্তু আমার রীতি অনুযায়ী। আমার রীতি হলো, আমীরে শহর কমপক্ষে এক রাতের জন্য আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন। তারপর আমি তার সঙ্গেই আলমোত চলে যাবো।'

আমীরে শহর মেহদী উলবীর হুকুম অনুযায়ী আবেদ হাবীবির পরিকল্পনা ছিলো হাসান ইবনে সবা তার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলে গ্রেফতার করে আলমোতে নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু হাসান ইবনে সবা উল্টো আমীরে শহরের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাকে তার আতিথেয়তা গ্রহণ করার অনুরোধ জানালো।

এরপরও আবেদ হাবীবি এসবে প্রভাবান্বিত না হয়ে হাসান ইবনে সবাকে গ্রেফতার করতে পারতো বা তার সমীহের আচরণ না করে কঠোর আচরণ করতে পারতো। কিন্তু হাসান ইবনে সবা তাকে সে সুযোগ দিলো না। তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকে হিপ্টোনেজম করে তাকে তার প্রভাববলয়ে নিয়ে নিলো। দুশমন যত বড়ই হোক হাসান ইবনে সবার সামনে আসা মানেই তার জাদুবন্দী হয়ে যাওয়া।

আবেদ হাবিবী হাসানের জাদুবিদ্ধ হয়ে গোজা হওয়া জানোয়ারের মতো উঠলো এবং তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলো।

★★★★

দু'দিন পর আলমোত থেকে এক ঘোড়সওয়ার এলো। হাসান ইবনে সবাকে পয়গাম দিলো, আলমোতের আমীর তৃতীয় দিন আসছেন এখানে।

হাসান ইবনে সবা তার সম্বর্ধনা ও তার থাকার ব্যবস্থার আয়োজন করতে নির্দেশ দিলো। নিজের শাহী তাঁবু মেহদী উলবীর জন্য ছেড়ে দিলো। আর তার লোকদের বলে দিলো, মেহেদী উলবী আসলে সন্ধ্যায় তার তাঁবু ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দেবে।

অতিথির সম্মান করার তার আরেক অস্ত্র ছিলো খাদীজা। খাদীজাও সেসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের একজন ছিলো যারা পাথর-দিল পুরুষকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলতে পারে।

আহমদ ইবনে গুতাশও তার সঙ্গে এ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুটি রূপসী মেয়ে নিয়ে আসে। এদেরকে আনা হয় কেল্লা আলমোত দখলের কাজে ব্যবহারের জন্য।

তৃতীয় দিন মেহদী উলবী এলেন। হাসান ইবনে সবা তার লোকদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে রাস্তার দু'পাশে দাঁড় করালো। দুই ধারের লোকেরা খোলা তলোয়ারের ফলা উঁচিয়ে তোরণের মতো বানালো। মেহদী উলবী সেই তলোয়ারের তোরণের নিচ দিয়ে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছলেন। হাসান ইবনে সবা তাকে সংবর্ধনা জানালো। যখন তিনি মেহমানখানায় প্রবেশ করলেন তখন খাদীজা ও অন্য দুই মেয়ে তার ওপর ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিলেন। মেহদী দারুণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

'আপনিই কি সেই যে আসমান থেকে নাযিল হয়েছেন?' – খাওয়া দাওয়ার পর মেহদী উলবী হাসান ইবনে সবাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'না!' কোন মুসলমান একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, কোন ইমাম বা নবী আসমান থেকে সরাসরি নাযিল হতে পারেন।'

'আর কোন মুসলমানই আপনার কথা শুনবে না যে পর্যন্ত না আপনি তাকে এই নিশ্চয়তা দেবেন যে, আপনি আসমান থেকেই নাযিল হয়েছেন। নবীগণের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে তা কি আপনি জানেন না?'

'আপনি আসলে কী চান? .... নবুওয়ত? ...... ইমামত?'

'ইবাদত, আমি আল্লাহর ইবাদত ও তার রাসূলের (স) ভালোবাসা আদায় করতে চাই....... আর চাই শান্তির কোন একটি জায়গা। যেখানে আমি একাগ্র মনে ইবাদতে হারিয়ে যেতে পারি। আমার পীর ও মুর্শিদ আমাকে বলেছেন, ইবাদতের মধ্যে আমি একটি ইশারা পাবো। সেটার উপলব্ধি এমন হবে যেমন রাসূলুল্লাহ (স) এর ওপর ওহী নাযিল হতো। সেই ইশারা আমার পথ ও গন্তব্য নির্ধারণ করে দেবে।'

'কিন্তু আপনার শাহী তাঁবু! এই সুন্দরী রূপসী মেয়ে! এসব তো ইবাদতের পরিবেশের জন্য না।'

'আর এসব আমার জন্যও নয়। আমার শিষ্যদের মধ্যে আপনার চেয়েও অভিজাত লোকজন আছে। আমার জন্য এই শাহী ব্যবস্থা তারাই বানিয়েছে। আমি

তো ছোট একটি তাঁবুতে বসে আল্লাহকে স্মরণ করি ...... আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আমি কী চাই....... আমি চাই মুসলমান সব সময় আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত থাকবে। নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখবে।'

'আচ্ছা! আপনার 'মুজিযা' এর রহস্যটা কি? তিবরীজে কি হয়েছিলো?...... আর সেলজুকিদের এক হাজার লশকরকে আপনি কিভাবে পিছু হঁটিয়ে দিয়েছিলেন?'

'এটা আপনি আমার কাছ থেকে না শুনলেই ভালো করবেন। হয়তো আপনি আমার কথাকে অতিরঞ্জিত ভাববেন। এটা সেই সেলজুকিদের জিজ্ঞেস করুন যারা শুধু আমার একথায় চলে গেছে যে – তোমরা ফিরে যাও।'

হাসান ইবনে সবা এমন ভাষায় তার 'মুজিযা' এর কাহিনী মেহদী উলবীকে শোনালো যে, মেহদী উলবী হাসানের প্রতি সম্মোহিত হয়ে পড়লো।

মানুষের দুর্বল দিকের মধ্যে অন্যতম দুর্বলতা হলো সে তার ভবিষ্যত জানতে হাত পা ছোড়তেও দ্বিধা করে না। সে স্বপ্ন দেখে কোন এক সময় অলৌকিকভাবে বিরাট ধনভাণ্ডারের মালিক হবে। কথায় কথায় মেহদী উলবীও হাসান ইবনে সবার সঙ্গে এ ধরনের কিছু কথা বলে ফেললো।

হাসান এটাই শুনতে চাচ্ছিলো। মেহদীর কথা শেষ হলে হাসান চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হওয়ার ভান করলো।

'উহ্'! – হঠাৎই চোখ খুলে ঘাবড়ে যাওয়া কণ্ঠে বললো – 'বড় এক বিপদের ঘনঘটা আলমোতের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। এতে বজ্রপাতও লুকিয়ে আছে। আপনার কেল্লা আমি কখনো দেখিনি। আমার মোরাকাবায় যা ধরা পড়েছে তাতে তো খুব মজবুতই মনে হয়েছে। এর মধ্যে শাহী মহল, পাতালমহল, রাস্তা, চৌরাস্তা, অলিগলি অপূর্ব গোলক ধাঁধার এমন পরিবেশ রয়েছে যে, অপরিচিত কেউ তাতে ফেঁসে গেলে পথ হারিয়ে মারা যাবে ......

'কিন্তু এ মূল্যবান পাহাড়সম মজবুত কেল্লা এবং এত সুন্দর শহরের নিরাপত্তার জন্য কোন ফৌজ আমার চোখে পড়েনি,...... আমি কি সঠিক কথা বলছি না ভুল বকছি আমীরে মুহতারাম?'

হাসানের মুখে নিজের কেল্লার বিস্তারিত বিবরণ শুনে হাসানের প্রতি মেহদীর মধ্যে সশ্রদ্ধভাব ফুটে উঠলো। তিনি হাসানকে বললেন, না আমি ফৌজ রাখিনি, শুধু পাঁচ'শ মুহাফিজ সওয়ার আছে আমার।'

'ফৌজ তৈরী করুন দুশমন বাড়ছে আপনার। বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আপনি যদি ফৌজ প্রস্তুত রাখেন তাহলে বজ্রসম্বলিত এই মেঘের ঘনঘটাও উড়ে যাবে। আর আপনিও নিরাপদ থাকবেন। ফৌজ অভিজ্ঞ হতে হবে। ফৌজ ছাড়া আপনার কেল্লা পরিত্যাক্ত হয়ে যাবে এক সময়ে।'

মেহদী উলবী হাসান ইবনে সবার জালে ফেঁসে গেছেন। হাসানের সঙ্গে তিনি ফৌজ রাখতে পারবেন না এ বিষয়ে আলাপ করতে লাগলেন। কারণ ফৌজের খরচ চালানোর মতো অবস্থা তার নেই। হাসান ইবনে সবা তাকে ভয় দেখাতে লাগলো, ফৌজের ব্যবস্থা না করলে যে কোন সময় দুশমন ফৌজ নিয়ে এসে কেল্লা দখল করতে পারে।

'সেলজুকিরাও হামলা করতে পারে' – হাসান বললো – 'এই যে কালো মেঘ আমি দেখলাম এটা কিন্তু এক ভয়ংকর ইঙ্গিত। আপনাকে আমি যে সহযোগিতা করতে পারি তা হলো, আমার শিষ্যদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিয়ে আপনার ফৌজে শামিল করে দিতে পারি। আপনি শুধু ওদেরকে দু'বেলা রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন......

'ওদের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য খরচাদি আমি নিজেই বহন করবো। সেটা যেখান থেকেই হোক। এটা আমার দায়িত্ব। কেল্লাতে আমাকে সামান্যতম একটু জায়গা দিয়ে দেবেন, যেখানে আমি ইবাদত করতে পারবো এবং আমার যিয়ারতে আসা লোকদেরকে আরামে বসিয়ে দু চারটি সবক দিতে পারবো। আশা করি আমার শিষ্যদেরকে আমি যে হুকুমই দেবো তারা নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবে।'

মেহদী উলবী হাসান ইবনে সবার কথা মেনে নিলেন এবং তারই শর্ত মেনে নিয়ে তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। হাসান ইবনে সবাকে যে মেহদী গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই তিনিই নিজের কোন প্রস্তাব বা শর্ত পেশ না করে হাসানের ভয়ংকর এক প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

★ ★ ★ ★

সুলতান মালিক শাহ ও নেযামুল মুলককে সব সময়ই দুশ্চিন্তা অস্থিরতা আর ব্যাকুলতা খাচ্ছিলো কুঁড়ে কুঁড়ে। সুলতান চাচ্ছেন বড়সড় ফৌজ পাঠিয়ে হাসান ইবনে সবার ওপর প্রচণ্ড এক হামলা চালাতে। কিন্তু নেযামুল মুলক তাকে বাঁধা দিয়ে বলেছেন, এমন বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী গুপ্তচর পাঠাতে হবে যে হাসান ইবনে সবা ও আহমদ ইবনে গুতাশের গোপন আস্তানা পর্যন্ত পৌছে ভেতরের খবর নিয়ে আসতে পারবে। এরপর তার রিপোর্ট অনুযায়ীই পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সবচেয়ে অস্থির আর ব্যাকুল হয়ে পড়লেন সালার কযুল সারুক। প্রতারণার প্রতিশোধ চিন্তা তাকে প্যাগল করে তুলছিলো। সুলতান ও মালিকশাহকে কয়েকবারই বলেছেন তিনি, তাকে যেন গুপ্তচর করে পাঠানো হয়।

'একাজ সালারের নয় সারুক!' – অবশেষে সুলতান একদিন তাকে তার ফয়সালা শুনিয়ে বললেন – 'চূড়ান্ত হামলার জন্য তোমাকে পাঠাবো আমরা। কিন্তু দুটি ব্যর্থ অভিজ্ঞতার পর তৃতীয় আরেকটি ব্যর্থতার কালিমা কপালে মাখতে চাইনা আমরা।'

'আমি হাসান ইবনে সবাকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাই। শুধু এলোককে হত্যা করতে পারলে বাতিনীদের সব খেল খতম হয়ে যাবে–' কযুল সারুক আবার অনুরোধ করলেন।

'তার স্থলে তুমি, নিহত হতে পারো' – নেযামুল মুলক বললো – 'তখন আমাদের অপদস্থতার আর শেষ থাকবে না এবং বাতিনীরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।'

মুযাম্মিল আফেন্দী তত দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সালার কযুল সারুক যে ধোঁকা খেয়ে তার এক হাজার সওয়ার নিয়ে ফিরে আসেন মুযাম্মিলও সেটা জানতে পেরে সারুকের সঙ্গে সে দেখা করে। সারুকের কথা শুনে মুযাম্মিল তার ভেতরের উত্তপ্ততা

টের পায়। কযুল সারুক তাকে একথাও বলে যে, হাসান ইবনে সবাকে তিনি একলাই হত্যা করতে যাবেন। মুযাম্মিল আফেন্দীও তার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং দুজনে মিলে প্ল্যান তৈরী করে। কিন্তু সুলতান মালিকশাহ সারুকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাই মুযাম্মিল একাই নেযামুল মুলকের কাছে যায়।

'যে উদ্দেশ্যে আপনি গুপ্তচর পাঠাচ্ছেন সেটা শুধু আমিই পূরণ করতে পারবো' – মুযাম্মিল বলে – 'আপনার কাছে কেবল একটি ঘোড়া ও একটি উট চাইবো আমি।'

'না মুযাম্মিল! তোমাকে আমরা বিপজ্জনক কোন কাজে পাঠাতে পারি না। কারণ তুমি আমাদের বেতনভুক্ত কোন সৈনিক নও' – নেযামুলমুলক বললেন।

'আলী জাহ! এই বিপজ্জনক মিশনে সেই সফল হবে যে বেতনভুক্ত সৈনিক নয়। সেই এর উপযুক্ত যার ভেতর তীব্র স্পৃহা আর জ্বালা আছে। কর্মচারী তো তার পরিবারের রুটি রুজির জন্য জীবিত থাকতে চেষ্টা করবে। হাসান ইবনে সবাকে আমি ইসলামের নামে হত্যা করবো। আর হত্যা করতে না পারলেও তার পর্দার ভেতরের খবর নিয়ে আসবো। এটা মুসলিম জাতির এবং মানবতার স্বার্থের প্রশ্ন। এই স্বার্থ যতটুকু আপনার ততটুকুই আমার ও আমার পৃথিবীর। না, কোন বিনিময় আপনার কাছে চাইনা আমি। আমাকে জিহাদ ও শহীদের পথ থেকে হটাবেন না।'

নেযামুল মুলক এমন একজনকেই খুঁজছিলেন এবং আগের মুযাম্মিলের দুটি ঘটনাকে তিনি তার অসাধারণ কৃতিত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। একটা হলো মুযাম্মিল সুমনার মা মায়মুনাকে হাসান ইবনে সবার ও তার জঙ্গী সঙ্গীদের কব্জা থেকে নিশ্চিত প্রাণনাশের আশংকা নিয়ে উদ্ধার করে রায়ের আমীর আবু মুসলিম রাজীর ঘরে পৌছে দিয়েছে। মুযাম্মিলের কারণেই মায়মুনা খুঁজে পেয়েছে এক হারানো মেয়েকে এবং সুমনা পেয়েছে তার হারানো মাকে।

দ্বিতীয়টা হলো সুলতান মালিক শাহকে মুযাম্মিলই সেই তিবরীজে হাসান ইবনে সবার বাহিনীর হাতে সেলজুকিদের পাঁচশ সওয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদ এনে দেয় – নিজের মারাত্মক রক্তঝরা যখমকে উপেক্ষা করে। তিবরীজ থেকে মারু পর্যন্ত সে যে জীবিত এবং অচেতন না হয়ে আসতে পেরেছে এজন্য সুলতান মালিক শাহ ও ডাক্তাররাও হয়রান হয়ে যায়। তিবরীজের লড়াইয়ে যখমী হওয়ার আগে তার হাতে বেশ কয়েকজন বাতিনীও কচুকাটা হয়।

মুযাম্মিলের স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রস্তাব শোনার পর নেযামুল মুলকের আরেকবার এই ছেলের এসব কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে। এসবই মুযাম্মিলের প্রতি তার আস্থা উঁচুতে নিয়ে যায়। তাই তিনি তাকে নিয়ে সুলতান মালিক শাহর কাছে যান। মালিক শাহ প্রথমে দ্বিমত করলেও পরে নেযামুল মুলকের অনুরোধে মুযাম্মিলকে গুপ্তচর হিসেবে সেই গোপন মিশনে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন।

মুযাম্মিল আফেন্দী হাসান ইবনে সবা ও আহমদ ইবনে গুতাশের মূল ঘাঁটিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে।

এ সময় একেবারেই আচমকা রায় থেকে সুমনা তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মারুতে এসে উপস্থিত হয়। সুমনা যেদিন জানতে পারে মুযাম্মিল গুরুতর আহত হয়ে মারুতে পড়ে কাতরাচ্ছে সেদিন থেকেই মারুতে তার কাছে পৌছতে সুমনা ব্যাকুল হয়ে

উঠে। কিন্তু সুমনার প্রচণ্ড আবেগের আঁচ পেয়ে আবু মুসলিম রাজী তাকে সেখানে সুমনার যাওয়াটা সমীচীন মনে করলেন না। কারণ অতি আবেগ মানুষকে বিপদের দিকেই নিয়ে যায়। তারপর যখন মুযাম্মিলের সুস্থতার খবর রায় পৌছে আবু মুসলিম রাজী উটের পিঠের ওপর পাল্কি বেধে মা ও মেয়েকে রায় পাঠিয়ে দেন। নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে পাঠান কিছু মুহাফিজ সওয়ার।

আবু মুসলিমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সুমনার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনের পবিত্র প্রত্যাশায় পথে দু'দণ্ডও সে পাল্কিতে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেনি। মা মায়মুনার কাছ থেকে বারবার তার চোখের পানি এবং মুখের চঞ্চলতা লুকোতে হয়েছে।

মারুতে পৌঁছে মুযাম্মিলকে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলোনা সুমনা। মার অস্তিত্ব যেন ভুলেই গেলো সে। প্রায় উড়ে গিয়ে মুযাম্মিলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মুযাম্মিল নিজেকে বড় কষ্টে নিয়ন্ত্রণে রাখলো। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে নতুন মিশনের কথা সুমনাকে জানানোর জন্য বললো,

'আমি আবার যাচ্ছি সুমনা?' – মুযাম্মিল গলায় নির্লিপ্ততা ধরে রাখতে চেষ্টা করে বললো।

'কোথায়?'

'তোমার ও তোমার মার এবং ইসলামের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে – 'মুযাম্মিল তাকে বিস্তারিত সব জানালো।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। কারণ আমার লক্ষ্যও তো তাই' – সুমনা বড় আকুল কণ্ঠে বললো।

'আমার জন্য এবং তোমার জন্যও বিপদ ডেকে এনো না সুমনা! হাসান ইবনে সবার জগৎ থেকে তুমি পালিয়ে এসেছো। সেখানে তুমি সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যাবে।'

হাহাকার করে উঠলো সুমনার ভেতর আবার দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এত দিন পরে দেখা হওয়া মানুষটির মৃত্যুশংকায়। সুমনা জানে, একা হাসান-ইবনে সবার পেছনে লাগতে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। হায় হায়, মুযাম্মিল যে এখন তাকে রেখে একা একা সেই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে কান্নার দলাটা চাপা দিয়ে সুমনা বললো,

'হাসান ইবনে সবার পৃথিবী সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না মুযাম্মিল! আমি ছদ্মবেশ ধরেও তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।'

সুমনা মুযাম্মিলের সঙ্গে যাবে তো যাবেই। কিছুতেই ওকে মানানো যাচ্ছিলো না। নেযামুলমুলককে শেষ পর্যন্ত জানানো হলো সুমনার চরম জেদের কথা। তিনি পরম স্নেহে সুমনার মাথায় হাত রেখে বললেন, শোনরে বেটি! আমরা মুসলমান। কোন মুসলমানই তাদের মেয়েদের ময়দানে নামাতে পারে না। না তাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করতে পারে।

সুমনা একথায় কিছুটা শান্ত হলো। তারপর অনুভব করলো যাওয়ার আগে মুযাম্মিলকে কয়েকটা কথা বলে দিতে হবে।

'কয়েকটা কথা মনে রেখো মুযাম্মিল!'–সুমনা মুযাম্মিলের কাছে এসে বললো– 'ওখানে গিয়ে কোন আত্মতুষ্টিকে প্রশ্রয় দিয়ো না। বাতিনীদের নজর মানুষের রক্ত-শিরা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিশ্বাস করা যাবে না কাউকেই। দেখবে কত সুন্দরী মেয়ে নিজেদেরকে অসহায় আশ্রয়হীন হিসেবে পরিচয় দিয়ে করুণ গলায় বলবে আমি অমুকের দ্বারা নির্যাতিতা, আমাকে সাহায্য করো। একেবারে পাথর বনে যাবে তখন। এটাও মনে রেখো, সেখানে পাথরও মোম হয়ে যায়। তুমি আক্রান্ত হলে এমন যেন না হয়। তুমি হত্যা করার আগে নিজেই নিহত হয়ে গেলে। ওদের শেখানো মন্ত্র দিয়েই কিন্তু আমি ফেরেশতার মতো এক লোককে শয়তান বানিয়ে ফেলেছিলাম। ওরা শয়তানের প্রতিনিধি। বড় বড় আল্লাহওয়ালারাও সেখানে গিয়ে বিপথগামী হয়ে যায়।

সুমনা মুযাম্মিলকে আরো অনেক জরুরী কথা বললো। বললো রাতে ঘুমুলেও যেন দু'চোখ খোলা রাখে। কথা শেষ হলে সুমনা কয়েক মুহূর্তে মুযাম্মিলের দিকে তাকিয়ে রইলো গাঢ় চোখে। মুযাম্মিলও। দু'জনেরই ঠোঁট কেঁপে উঠলো। কিন্তু কারো মুখ দিয়ে কথা সরলো না। এভাবেই সুমনা ছলছল চোখে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

মুযাম্মিল আফেন্দী অনেক দিন থেকেই তার চুল দাড়িতে হাত লাগায়নি। বিশেষ করে মাথার চুল ঘাড় অবধি পৌঁছে যায় এতদিনে। বড় চুল ও দাড়ির কারণে তার চেহারাই পাল্টে গিয়েছিলো। সুলতানের এক অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসার এরপরও তাকে উট চালকের ছদ্মবেশ ধরিয়ে দেয়। সেদিন মাঝরাতের পর মুযাম্মিল আফেন্দী উট চালকের বেশে মারু থেকে বেরিয়ে যায়।

মুযাম্মিল আফেন্দী দীর্ঘ সফরের পর খালজান পৌঁছে। খালজানের এক লোক সেলজুকি গোয়েন্দাদের তার বাড়িতে আশ্রয় দিতো। নিজে গোয়েন্দা ছিলো না সে। গোয়েন্দাদের সাহায্য করতো। সেলজুকি গুপ্তচররা ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলে বিশেষ ধরনের একটি আংটি পরতো। এটা ছিলো এক গোয়েন্দাকে আরেক গোয়েন্দার চেনার সাংকেতিক উপায়।

মুযাম্মিল খালজানে প্রবেশ করলো। ওদিকে হাসান ইবনে সবা মেহদী উলবীর সঙ্গে প্রবেশ করলো আলমোত কেল্লায়।

এর আগে মেহদী উলবী হাসানের কাছে এলে হাসান তাকে এক শাহী তাঁবুতে নিয়ে রাখে। আর নিজেকে অতি সাদাসিধে দরবেশ যাহির করে সে চলে যায় মামুলি এক তাঁবুতে। মেহদী তার তাঁবুতে ঢুকে দেখেন ভেতরে যেন ফুলের বাগান। তাঁবুতে ঢুকতেই কেমন নেশাতুর এক সৌরভ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

বিচিত্র ফুলের সমাহারের মধ্যে জীবন্ত একটি ফুলের প্রতি তার দৃষ্টি আটকে গেলো। যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো, মুচকি মুচকি হাসছিলো। যার মাদকীয় গন্ধ তার দিকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিলো। এ ছিলো খাদীজা। হাসান ইবনে সবার নিজ হাতে তৈরী মোহনীয় এক জাল। খাদীজা এমন ভাব করলো যেন সে মেহদী উলবীর দাসী। তাকে সেবা দানের জন্য এসেছে।

রাতের খাবার হাসান ইবনে সবা ও মেহদী উলবী এক সঙ্গেই খেলো। খাওয়া শেষ হলে হাসান মেহদীর তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলো। একটু পর তাঁবুতে ঢুকলো খাদীজা। গায়ে তার ফিনফিনে কাপড়ের আঁটসাঁট পোশাক।

মেহদী প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গেলেও এত বড় এক-কেল্লা প্রধান হওয়াতে তখনো তার মধ্যে যৌবনের শেষ চাকচিক্যটুকু ছিলো। খাদীজাকে দেখে, তার লজ্জা বিনম্র মোহনীয় ভঙ্গির কথা শুনে তিনি নিজের মধ্যে কম্পন অনুভব করলেন। তার যে আরো দুটি স্ত্রী আছে তাদের কথা তিনি ভুলে গেলেন। খাদীজা জানতো এ ধরনের কোন পুরুষই, তাকে দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। মেহদী উলবীর চোখ তার দেহের দিকে ঝুলে আছে বুঝতে পেরে খাদীজা এটা ওটা তোলার ছুতোয় মাঝে মধ্যে ঝুঁকে পড়ছিলো আর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ খুলে যাচ্ছিলো।

'তুমি কে?' মেহদী জিজ্ঞেস করলেন।

'খাদীজা। বিধবা আমি। স্বামী তিবরিজের লড়াইয়ে মারা গেছে...এখন আমি ইমামের খেদমতের জন্য তাঁর সঙ্গে থাকি' খাদীজা মিথ্যা বললো।

'তার স্ত্রী হিসেবে না বিয়ে ছাড়াই...?

'না মহান অতিথি! কোন মেয়ের সাথে ইমামের এমন সম্পর্ক নেই। ইমাম তো আসমানী মাখলুক। সুন্দরী মেয়েরা তার সঙ্গে থাকে ঠিক কিন্তু ফুলদানিতে ফুল যেমন থাকে ঠিক তেমনভাবেই থাকে।'

'আহা খাদীজা! এত কচি বয়সে রূপের এত বাহার নিয়ে বিধবা হয়ে গেলে! পুরুষের সঙ্গ কি অনুভব করো না তুমি? কোন ধরনের শূন্যতা? কি বলবো বুঝতে পারছি না।'

খাদীজা যেন ধরণী দ্বিধা হওয়া এমন ভাব করে লজ্জাকাতর হওয়ার ভান করলো এবং মাথা সামান্য হেলিয়ে ইংগিতে জানালো যে, সে পুরুষের শূন্যতা অনুভব করে। 'তাহলে কি আমার সঙ্গ পছন্দ করবে? স্ত্রী নয়, তোমাকে আমার সম্রাজ্ঞী বানাবো...আমার কাছে এসো।' এখানে বসো।

'ঠিক আছে বসছি। এর আগে এই শরবতটুকু পান করুন। খুব সুস্বাদু। বিশেষ মেহমানদের আমরা এই শরবত পান করাই।'

মেহদী উলবী শরবত পান করলেন এবং খাদীজাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন। তারপর যখন শরবতের ক্রিয়া শুরু হলো খাদীজাকে তখন মেহদীর মনে হলো লাল টসটসে একটি আপেল।

গভীর রাতে খাদীজা মেহদীর তাঁবু থেকে বের হলো। তার শরীরে তখন লেগে আছে মেহদীর পাপের চিহ্ন।

সকালে চোখ খুলতেই মেহদী সর্বপ্রথম খাদীজাকে ডাকলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি হাসান ইবনে সবাকে তার লোকজনসহ কেল্লা আলমোতে নিয়ে গেলেন। খাদীজা তো তার সঙ্গে ছিলোই।

ওদিকে – মুযাম্মিল আফেন্দী খালজানে যার ঘরে উঠার কথা তার নাম আহমদ আওয়াল। আহমদ আওয়ালের ঘরের ঠিকানা কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে মুযাম্মিল। অবশেষে দুই লোক তাকে আহমদ আওয়ালের ঘর দেখিয়ে দেয়। মুযাম্মিল সেই ঘরের দিকে রুখ করলে দু'জনের একজন আরেকজনকে বলে–

'সম্ভবত এই লোককে আমি চিনতে পেরেছি।'

'চেনাটা তো স্বাভাবিক। লোকটি উট চালক। তুমি হয়তো কখনো তার উট ব্যবহার করেছো – দ্বিতীয় লোকটি মন্তব্য করলো।

'না, এ উট চালক নয়। আর সে যার ঘরের ঠিকানা জানতে চেয়েছে সেও সন্দেহভাজন লোক।'

মুযাম্মিল আফেন্দী চিহ্নিত হয়ে গেলো। কিন্তু সে টেরও পেলো না।

★ ★ ★ ★

রাতের খাবারের পর মুযাম্মিল আফেন্দী ও আহমদ আওযাল কথা বলছিলো। 'আচ্ছা বলোতো মুযাম্মিল! তুমি কি মিশন নিয়ে এসেছো? – আহমদ আওযাল মুযাম্মিলকে জিজ্ঞেস করলো।

'মিশন তো অনেক বড় আহমদ ভাই! হাসান ইবনে সবাকে হত্যা বা জীবিত ধরে সুলতান মালিক শাহের কাছে পেশ করতে হবে।'

'সুলতান নিজে তোমাকে এ কাজ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ আহমদ ভাই! সুলতান এবং নেযামুলমুলক মিলেই একাজ দিয়েছেন আমাকে।'

'নেযামুলমুলকও? আসলে তাঁরা হাসান ইবনে সবাকে সাধারণ কোন ফেরেব্বাজ বা প্রতারক মনে করছেন – যাকে খুব সহজেই হত্যা করা যাবে।'

'আমাকে তারা তোমার কাছে এজন্যই পাঠিয়েছেন। এখন বলো তাকে কোথায় এবং কী করে হত্যা করা যাবে। যদি এটা অসম্ভব মনে করো তাহলে তাও বলো। অসম্ভবকে আমি সম্ভব করে দেখাবো।'

'তুমি আসলে ভাবাবেগের কথা বলছো। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব নয় বরং সম্ভবকে অসম্ভব করে তোলবে। সুলতান ও নেযামুলমুলক হাসান ইবনে সবার হাতে কতল হতে পারে, কিন্তু তাকে কতল করাতে তারা পারবেন না। কিছু দিন এখানে থাকো। তোমাকে আমি আলমোত নিয়ে যাবো। নিজেই সেখানে ভেবে দেখো কিভাবে তাকে হত্যা করা যাবে। এখান থেকে আমরা তিন চারজন সুলতানের কাছে এখানকার ছোট বড় সব খবর পৌঁছাচ্ছি।'

'একটা কথা বলবো আহমদ? দুঃখ পেলে ক্ষমা করে দিয়ো...আমার মতে তোমরা এখানে যারা আছো তারা সুলতানের বেতনভুক্ত লোক। তোমরা প্রাণের আশংকা যে দিকে আছে সেদিকে যেতে পারবে না। কিন্তু আমার আবেগের কাছে মৃত্যুচিন্তা তুচ্ছ ব্যাপার।'

'দুঃখ পাওয়ার মতো কোন ব্যাপার নয় এটা মুযাম্মিল' – আহমদ আওযাল বললো আন্তরিক গলায় – 'আমরা যারা গুপ্তচর হিসেবে এ এলাকায় এসেছি নিঃসন্দেহে সবাই বেতনভুক্ত কর্মচারী। কিন্তু আমরাও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তোমার মতো আবেগ নিয়েই এসেছি–যেটা তোমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। পার্থক্য হলো, পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসাররা কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং পরীক্ষার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিশ্চিত হয়েই আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। শুধু আবেগ তো কিছু করতে পারবে না। হ্যাঁ এটাও বলবো, যার মধ্যে আবেগ ও চেতনার আগুন নেই সেও কিছু করতে পারে না।'

'তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে আহমদ?'

'কেন করবো না? বলেছিই তো, তোমাকে আমি আলমোত নিয়ে যাবো। নিজেই দেখে নিয়ো, কতলের উদ্দেশে হাসান ইবনে সবার কাছে পৌছানো কত কঠিন! সে নবী দাবী না করলেও লোকে তাকে ঠিকই নবী মানতে শুরু করেছে। লোকদেরকে সে বলেছে, দুনিয়াতেই তাদেরকে বেহেশত দেখাবে।'

'এসব আমি জানি। সে নিজেই শয়তান তৈরী করে।'

'হ্যাঁ। তুমি তো এটাও জানো, মানুষের দুর্বল কামনা বাসনাগুলো শয়তানী কর্মকাণ্ড দ্বারাই পূরণ হয়। আর সে যদি নিজের মধ্যেই শয়তানকে লালন করে তাহলে তো কথাই নেই। শয়তানের আসল কাজ তো মানুষকে সত্য থেকে হটানো এবং কুপ্রবৃত্তির লালসায় নিমজ্জিত করা।'

'অনেক কথা হয়েছে আহমদ ভাই। এখন কিছু একটা করতে হবে। ঐ শয়তানের পথ রুখতে হবে। এ শুধু সুলতান মালিক শাহের ব্যাপারই নয়, প্রতিটি মুসলমানের সমস্যা এটা। ইসলামের জন্য এ এখন সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অবশ্য হাসান ইবনে সবার ওপর দু' বার হামলা চালিয়েছি। তার মুঠো থেকে এক মহিলাকে উদ্ধারও করেছি।'

মুযাম্মিল আহমদ আওয়ালকে হাসান ইবনে সবার কবল থেকে মায়মুনাকে উদ্ধার ও পাঁচশ সওয়ার নিয়ে তার ওপর হামলার ঘটনা শোনালো।

'আমি প্রাণ বাজি রাখতে এসেছি আহমদ!' – বললো মুযাম্মিল– 'তোমার কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমার। হাসান ইবনে সবাকে কতল না করে জীবিত ফিরতে চাই না আমি।'

'তোমার সঙ্গে একমত আমি। তোমার মনোবল আমি ভেঙে দিচ্ছি না। শুধু বিপদ সম্পর্কে সাবধান করছি। কয়েকটা বিষয় তোমাকে আমি শিখিয়ে পরিয়ে নেবো। গুপ্তচরবৃত্তিতে এখনো তুমি আনাড়ী। তোমাকে আরো কিছু জানতে হবে। আর কাল সকালে শহরটা ঘুরে দেখো। কেউ গালগল্প করতে এগিয়ে এলে হাস্যমুখে তাকে বরণ করবে। আচ্ছা! কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোত্থেকে এসেছো এবং কেন এসেছো, কি জবাব দেবে? – আহমদ আওয়াল বললো।

'বাগদাদ বা ইস্পাহানের কথা বলতে পারি। কত দেশ কত শহরই তো আমি ঘুরেছি। বলবো এমনি ঘুরতে এসেছি।'

'হ্যাঁ ঠিক আছে। তোমার বুদ্ধি আছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি সারু বা নিশাপুরের কথা বলবে। যা হোক, কেউ যাতে না জানে সেলজুকিদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক আছে। আর আমার ব্যাপারে অমূলক কোন ধারণা পোষণ করো না। মুসলমান হলেও আমি সেলজুকি এবং তুর্কী। এই সালতানাতের সঙ্গে আমি গাদ্দারী করতে পারবো না। আমার বাপদাদাদের রক্তের বিনিময়ে এই সালতানাতের ভিত্তি গড়েছে। তাই প্রথমে আমি মুসলমান তারপর সেলজুকি। বেতনভুক্ত কর্মচারী মনে করো না শুধু আমাকে। আমি সর্বসময় তোমার সঙ্গে আছি। জরুরী আরেকটি কথা, এই শহরে কিন্তু বাতিনি গোয়েন্দারাও আছে। ধরা পড়ে যেয়ো না আবার।'

★ ★ ★ ★

পরদিন সকালে মুযাম্মিল আফেন্দী শহর ঘুরতে বের হলো। সামনের গলিমুখে তার বয়সী এক লোককে দেখতে পেলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না। অন্য গলিতে ঢুকে পড়লো। এ গলি ও গলি করে আরেকটি গলিতে আবার সেই লোকটিকে দেখতে পেলো। এবার তার সহসাই মনে পড়লো, এ লোককে সে আহমদ আওযালের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলো।

কিছুই যেন দেখেনি এমন নির্লিপ্তভাবে সে বাজারের দিকে চলে গেলো। বাজারে খঞ্জর, তরবারি ইত্যাদির একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা খঞ্জর হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো সেই লোকটি ডান দিকের একটি দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মুযাম্মিলের দিকেই। মুযাম্মিল মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি লোকটির দিকে তাকালো। লোকটি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

এরপর মুযাম্মিল যেদিকেই গেলো লোকটি আঠার মতো তার পিছু লেগে রইলো। দুপুরের খাবারের সময় মুযাম্মিল আহমদ আওযালের ঘরে ফিরে এলো। আওযালকে জানালো তার পিছু কেউ লেগে ছিলো আজ। মুযাম্মিল আহমদ আওযালকে বললো,

'সেদিন এই লোকের কাছেও তোমার ঘরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'নিঃসন্দেহে এটা হাসান ইবনে সবার চর' আওযাল বললো- তিন চার দিন একে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করো। অবশ্য সে তোমাকে হত্যা বা গ্রেফতার করবে না। কোন ছুতোয় সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করে তোমার ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে। দেখা যদি হয়েই যায় নিজ থেকেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভাব দেখাবে। তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এমন কোন কথা বলবে না। আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলবে, তোমার সঙ্গে হলবে আমার পরিচয় হয়েছে। শহরে ঘুরে বেড়াও। শহরের বাইরে সুদৃশ্য একটি জঙ্গল আছে, একটি নদীও আছে।'

'সেখানে অবশ্যই যাবো আমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমিক কে না?'

'তবে প্রকৃতির সৌন্দর্যে হারিয়ে যেয়ো না আবার। বরং দেখবে, এখান থেকে পালাতে হলে জঙ্গলের কোথায় কোথায় লুকিয়ে পালাতে পারবে। মনে রেখো মুযাম্মিল! গোয়েন্দা আর বিপ্লবীদের পোকা মাকড়ের মতো জীবন যাপন করতে হয়।'

খাওয়ার পর মুযাম্মিল একটু গড়াগড়ি দিয়ে আবার বাইরে বের হলো। এবার সেই লোকটিকে কোথাও দেখতে পেলো না। শহর থেকে বের হয়ে মুযাম্মিল জঙ্গলের পথ ধরলো। সামনে পড়লো তার সবুজ পত্র-পল্লবে মোড়ানো উঁচু উঁচু কতকগুলো টিলা। দুই তিনটি টিলার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলো মুযাম্মিল। নজরে পড়লো ঘন বৃক্ষের সারির নিচে বয়ে যাওয়া নদীর প্রবাহ। নদীর পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির শ্যামল পোশাক গায়ে এক পাহাড়। পাহাড়ের কার্নিশে ঝুলছে মেঘের কয়েকটি ধোঁয়াটে টুকরো।

মুযাম্মিল মুগ্ধ চোখে আনমনে হাঁটছিলো। হঠাৎ তার পেছন থেকে শুকনো পাতা মাড়িয়ে দেয়ার খসখসে আওয়াজ পেলো। চট করে পেছনে ফিরে দেখলো, কেউ নেই। তার মনে হলো কোন জংলী বিড়াল বা কুকুর এখান দিয়ে গিয়েছে। পাত্তা দিলো

না ব্যাপারটা। নদীর তীরে পৌঁছে গেলো। বয়ে যাওয়া নদীর জলতরঙ্গের মোলায়েম শব্দ এই উপচে পড়া শ্যামল-স্নিগ্ধের বাহার মুযাম্মিলকে স্বপ্নের এক অচিন জগতে নিয়ে গেলো। তার কাছে মনে হলো দূরের পাহাড়ের কার্নিশে ঝুলে থাকা মেঘের ভেলায় মায়াবী এক পরী – না এ যে সুমনা!

আচমকাই মনে পড়লো তার আহমদ আওয়ালের কথা– প্রকৃতির সুন্দরের মধ্যে হারিয়ে যেয়ো না। লুকানোর জায়গা খুঁজে দেখবে আগে.... সব দিকে নজর বুলালো। চোখে পড়লো ঝোপঝাড়ে ছাওয়া উঁচু কয়েকটি জায়গা। কয়েকটি টিলার ঢালে রয়েছে সারি সারি বিশাল বিশাল লতানো গাছ। পেচানো মোটা মোটা পাতাময় লতাগুলো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। মুযাম্মিল ভেবে দেখলো এগুলোর একটার ওপর চড়ে বসলে ঐ লতাগুলোই তাকে নিরাপদে ঢেকে রাখবে।

নদীর তীরের কাছে আরেকটা ঝোপ দেখা গেলো। ঝোপটাকে অনেকগুলো লতানো গাছ একটু ঢাল থেকে উর্ধ্বমুখী হয়ে পরিবেষ্টন করে আছে। দূর থেকে তাই ঝোপের ভেতরটা মনে হচ্ছিলো অদ্ভুতুড়ে এক বৃক্ষগুহা।

মুযাম্মিল সেখানে সোজা না গিয়ে চক্কর কেটে পেছন দিয়ে যেতে লাগলো। ঝোপের ভেতর উঁকি দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে গেলো। সেই লোকটিই ঝোপের ভেতর বসে আছে যে বাজারে তার পিছু নিয়েছিলো। এই নির্জন বন-জঙ্গলেও এই লোক তাকে একা থাকতে দিলো না। ভাবতেই মুযাম্মিল রাগে আগুন হয়ে গেলো। কাপড়ের ভেতর থেকে একটানে খঞ্জর বের করলো। তার মাথায় আহমদ আওয়ালের শব্দগুলো পাক খেয়ে উঠলো– 'এটা হাসান ইবনে সবার গুপ্তচর' – তার মনে হলো আওয়াল বলেছে– 'এ হাসান ইবনে সবা।'

লোকটি উঠতে যাচ্ছিলো। বিদ্যুৎবেগে মুযাম্মিল বাম হাতে তার গলা পেচিয়ে ধরলো। ডান হাতে তার খঞ্জর। এত জোরে তার গলা চেপে ধরেছিলো মুযাম্মিল যে, লোকটি ছটফট করতে লাগলো। খঞ্জরের ফলাটি মুযাম্মিল লোকটির বুকের মাঝখানে ধরলো। একবার ভাবলো লোকটিকে শেষ করে দিই। আবার ভাবলো, না, এ হাসান ইবনে সবার চর হলে এর কাছ থেকে কিছু বের করা যায় কি-না। এটা ভাবতেই লোকটিকে সে অবস্থাতেই পায়ের হেচকা টানে লেংটি মাটিতে চিত করে ফেলে দিলো। মুযাম্মিল এক লাফে তার বুকে উঠে বসলো এবং খঞ্জরের ফলা তার শাহরগে রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার পিছু নিয়েছো কেন?'

'বলতে পারবো না আমি। বললে আমাকে মেরে ফেলবে তুমি' – লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বললো।

'তোমাকে তো আমি মারবোই। তবে সত্য বললে ছেড়েও দিতে পারি।'

'আমার প্রাণ যেহেতু তোমার হাতেই, তাই তোমাকে একথা বলতে পারবো না যে, 'ওয়াদা করো–একথা কাউকে বলবে না।'

'সত্য বললে যা চাইবে তাই করবো।'

'তোমাকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এর আগে একটা বিষয়ে চেয়েছিলাম নিশ্চিত হতে।'

'কি সেটা?'

'এটা জানতে যে, তুমি হাসান ইবনে সবার কত গুরুত্বপূর্ণ চর। তোমরা হাসান ইবনে সবার নির্দেশে দেশের বড় বড় নিরীহ লোকদের হত্যা করো। এজন্য আমি হাসান ইবনে সবাকে হত্যার উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়েছি। তুমি সত্য কথা বলতে বলেছিলে। আমি বলেছি। ইচ্ছে করলে এখন আমাকে মেরেও ফেলতে পারো' – লোকটি কাতর কণ্ঠে বললো।

'কে বলেছে তোমাকে আমি হাসান ইবনে সবার সন্ত্রাসী দলের লোক?' – মুযাম্মিল আফেন্দী জিজ্ঞেস করলো।

'কাল তুমি আমাকে আহমদ আওয়ালের ঘরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। আমার সঙ্গে আরেকটি লোক ছিলো। সেই তোমার ব্যাপারে এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছে। সেটা জানতেই আমি তোমার পিছু নিয়েছিলাম। সন্দেহ সত্য প্রমাণ করতে পারলে তোমাকে কতল করতাম। আমাকে বলা হয়েছে, হাসান ইবনে সবার এক পেশাদার খুনীকে হত্যা করলে হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করার পুণ্য পাওয়া যাবে। সন্দেহ নেই, তোমার হাতে এখন আমার প্রাণ। কিন্তু তুমি কাপুরুষ না হলে সত্যি করে বলো তো আমার সন্দেহ ঠিক না বেঠিক?' – লোকটি বললো।

'আরে বোকা! তোমার সন্দেহ ঠিক হলে তোমার শাহরগের রক্তে আমার খঞ্জর অনেক আগেই রঞ্জিত হতো।'

মুযাম্মিল তার খঞ্জর লোকটির বুক থেকে সরিয়ে তার বুকের ওপর থেকে নেমে গেলো। লোকটিও উঠে বসলো। তার কাছে বসে জিজ্ঞেস করলো–

'তাহলে তুমি কোন ফেরকার? নাম কি তোমার?'

'আমি আহলে সুন্নত। আমার নাম উবায়েদ ইবনে আবিদ। সবাই ডাকে ইবনে আবিদ বলে।'

'হাসান ইবনে সবা কেল্লা আলমোতে। আর তুমি খালজানে তাকে কি করে হত্যা করবে' – মুযাম্মিল জিজ্ঞেস করলো।

'দেখো আমি আমার গোপন কথা তোমার কাছে ফাঁস করে দিয়েছি। এর চেয়ে বেশি কিছু এখন আর জানতে চেয়ো না। তোমার খঞ্জর তখন আমার শাহরগে ধরে আমাকে তুমি কাবু করেছিলে। আমার ওপর আবার হামলা করে দেখো তো। খালি হাতে লড়াইয়ের যথেষ্ট কৌশল জানা আছে আমার। আমাকে বুদ্ধ মনে করো না। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন সাকাফী। আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি নিজে অন্য কোন ফেরকার লোক' – ইবনে আবিদ বললো।

'আমি আহলে সুন্নত ইবনে আবিদ। আমার দাদা ইস্পাহানে বসত গাড়েন...তোমাকে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করছি, হাসান ইবনে সবাকে কি করে হত্যা করবে?'

'এটা একজনের কাজ নয়। আমার একজন সঙ্গী প্রয়োজন। খালজানে আমি এজন্যই রয়ে গেছি। আমি হয়রান হয়ে গেছি, বড় বড় বীর-দুঃসাহসী লোক আছে, এমন মুসলমানও আছে হাসান ইবনে সবার নাম শুনলে থুথু ফেলে। কিন্তু হাসান ইবনে সবাকে হত্যার কথা বললে সবাই পিছিয়ে যায়।'

'কারণ কি?'

'কাপুরুষতা। তারা বলে তাকে কতল করতে গিয়ে লোকেরা নিজেই কতল হয়ে যায়। হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করা অসম্ভব।'

'তোমার ধারণা কি?'

'আমার কোন ধারণা নাইরে ভাই! মুসলমান যা করে সব আল্লাহর হুকুমে করে। তার পথে জান দেয়া ছাড়া আর আর কোন মতামত থাকতে পারে না। আর দুই দিনের মধ্যে যদি কোন সঙ্গী না পাই একাই আমি আলমোতে চলে যাবো। তারপর দেখবো কে কতল হয়...আমি না হাসান ইবনে সবা!

ইবনে আবিদ তার কণ্ঠ আবেগে আরো ভারী করে তুললো। সেই কৃত্রিম আবেগও মুযাম্মিলের অন্তর ছুয়ে গেলো। সে যেন তার মতোই আরেক সহযাত্রী পেয়ে গেলো। সে বলে উঠলো–

'আমি যদি বলি যে সংকল্প নিয়ে তুমি এসেছো আমার সংকল্পও তাই, তুমি বিশ্বাস করবে?'

'না, আমি এখন পস্তাচ্ছি তোমাকে কেন আমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দিলাম। তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি আমার' – ইবনে আবিদ বললো।

'আমি কি করে তোমাকে বিশ্বাস করাবো ইবনে আবিদ! শুধু বুঝে নাও যে সঙ্গী তুমি খুঁজছিলে তাকে পেয়ে গেছো।'

মুযাম্মিল এত আবেগাপ্লুত হয়ে গেলো যে, তার হাতের খঞ্জরটি তার অজান্তেই মাটিতে নামিয়ে রাখলো। ইবনে আবিদ অলস হাতে খঞ্জরটি এমনভাবে উঠিয়ে নিলো যেমন কোন বাচ্চারা খেলনার জিনিস তুলে নেয় তার গুরুত্ব অগুরুত্ব না বুঝেই। মুযাম্মিলের চোখ সেদিকে গেলো না।

সে বসা অবস্থাতেই মুযাম্মিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আচমকা এই হামলায় মুযাম্মিল চিত হয়ে পড়ে গেলো। ইবনে আবিদ তার বুকে চড়ে বসলো এবং খঞ্জরটি শাহরগে রেখে বললো–

'বাতিনী পাপিষ্ঠ! এখন বলো তুমি কে? তুমি তো বাতিনীদের চর। হাসান ইবনে সবার বিশেষ বাহিনীর লোক। আমার সব কিছু তুমি জেনে ফেলেছো। তোমাকে জীবিত রাখি কি করে আমি।'

মুযাম্মিলের অনুনয় বিনয় ছাড়া আর কিইবা করার ছিলো। সে বার বার কসম খেয়ে বলতে লাগলো, সে পাক্কা মুসলমান। হাসান ইবনে সবাকে হত্যার উদ্দেশেই এসেছে। ইবনে আবিদকে নয়। অনেক কষ্টে ইবনে আবিদ বিশ্বাস করলো এবং শর্ত দিলো–

'আমি যেখানে থাকি সেখানে আমার সঙ্গে চলো।'

ইবনে আবিদ এই বলে বুকের ওপর থেকে নেমে গেলো এবং মুযাম্মিল উঠে বসলো। 'আচ্ছা! আওয়াল আমার বন্ধু। তার সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি? আলমোত তো তোমার সঙ্গে যাচ্ছিই' – মুযাম্মিল জিজ্ঞেস করলো সরল গলায়।

ঃ 'তা হয় না। আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তুমি কতটুকু বিশ্বস্ত তা নিশ্চিত হতে। আরেকটি কারণ হলো আহমদ আওয়াল সুবিধের লোক নয়। জানি সে সুলজুকি এবং সেলজুকিদের গুপ্তচরবৃত্তিও করে। তবে আমার বন্ধুদের সন্দেহ হলো, সে তলে তলে বাতিনীদের সাথেও সম্পর্ক রাখে।

দু' মুখো সাপ। তুমি ওকে কি বলেছো?' – ইবনে আবিদ বললো।

'সবকিছুই বলেছি ওকে আমি। সে আমাকে আলমোত নিয়ে যাবে।'

'তুমি কি বাচ্চা ছেলে! আলমোত নিয়ে সে তো তোমাকে কতল করাবে। ঠিক আছে আমার সঙ্গে তোমার থাকতে হবে না। শুধু আমার বন্ধু কথা শুনে ফিরে এসো। তখন নিজেই আমাদের কাছে থাকতে চাইবে। অবশ্য আওয়ালকে এসব জানানো যাবে না'– ইবনে আবিদ বললো।

মুযাম্মিল আবিদের সঙ্গে হাঁটা দিলো। তার মনে হলো, ঠিকই তো আহমদ আওয়ালকে তো সে চিনতোই না। সে আরো প্রথমে তাকে নিরুৎসাহিত করেছিলো।

ইবনে আবিদের ঘরে দু'জন লোক ছিলো। আবিদ ওদেরকে জানালো, মুযাম্মিলও আমাদের মিশনের লোক। ওরাও মুযাম্মিলকে ইবনে আবিদের মতো উপদেশ দিলো। দু'জনের একজন বললো–

'মুযাম্মিল আফেন্দী! মন দিয়ে শোন! এখান থেকে যদি পালাতে চেষ্টা করো জীবিত থাকবে না। দুনিয়ার যে প্রান্তেই যাওনা কেন আমাদের মৃত্যুদূত সেখানে পৌঁছে যাবে। তুমি যদি খাঁটি মুসলমান ও বিশ্বস্ত হও আমাদের সঙ্গে থাকো...আমরা যেহেতু পরস্পরকে পরস্পরের গোপনীয়তা জানিয়ে দিয়েছি তাই এটাও জিজ্ঞেস করছি তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?'

'নেযামুল মুলক' – মুযাম্মিল সত্য কথা বলে দিলো– 'তিনিই আহমদ আওয়ালের ঠিকানা দিয়েছেন।'

'ইবনে আবিদ তোমাকে বলেছে, আওয়াল বিশ্বস্ত লোক নয়' – সে লোকটি বললো– 'সে তোমাকে ধরিয়ে দিলেও আমরা আশ্চর্য হবো না। আবিদের একজন সঙ্গী প্রয়োজন ছিলো। আমরা বলবো আল্লাহ তাআলা তোমাকে পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। এটাও আল্লাহর বড় মদদ, তোমাকে আমরা পেয়ে গেছি এবং তোমাকে আহমদ আওয়ালের কবল থেকে বাঁচাতে পেরেছি।'

'তুমি নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে আমাদের মধ্যে কেউ কেন ইবনে আবিদের সঙ্গী হচ্ছি না'– দ্বিতীয় লোকটি বললো।

'এতো আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো' – মুযাম্মিল উত্তর দিলো।

'একটু ভেবে দেখো মুযাম্মিল! আমরা যদি ইবনে আবিদের সঙ্গে চলে যাই তাহলে এখানে আমাদের কার্যক্রম কে চালাবে? এখানে আমাদের আরো যে কিছু লোক আছে তারা এত বড় অভিযানের উপযুক্ত নয়। আলমোতের নাম শুনলেই ভয় পায় ওরা।'

'ভয় কি জিনিস জানি না আমি' – মুযাম্মিল বললো– 'কিন্তু আমি এটা কি করে নিশ্চিত হবো তোমরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো না?'

'এ তো আমরাও তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আমরা কি করে বিশ্বাস করবো তুমি আমাদেরকে ধোঁকা দেবে না?' – সে লোক পাল্টা জবাব দিলো।

এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মুযাম্মিল নিশ্চিত হলো এরা নির্ভরযোগ্য লোক। মুযাম্মিলকেও তারা বিশ্বাস করলো, সেও নির্ভরযোগ্য। সে জানিয়ে দিলো আহমদ আওয়ালের কাছে আর যাবে না। তারপর ঠিক হলো আজ রাতেই ইবনে আবিদ ও মুযাম্মিল আলমোত রওয়ানা হয়ে যাবে।

'মুযাম্মিল!' – তাদের মধ্যে যে সরদার গোছের সে বললো– 'আমাদের আরো দু'জন লোক ওখানে আছে। ইবনে আবিদ চিনে ওদেরকে। ওরা খুবই নিরাপদ আশ্রয়। তোমাদের কোন ছদ্মবেশেরও প্রয়োজন নেই। কেউ পরিচয় জানতে চাইলে বলবে, আমরা ইমামের শিষ্য। কারো সঙ্গে হাসান ইবনে সবার বিরুদ্ধে কিছু বলবে না।'

'কতল করা হবে কিভাবে?' – মুযাম্মিল জিজ্ঞেস করলো।

'এটা তোমরা ওখানে গিয়ে ঠিক করবে। এমনিতে অবশ্য তার কাছে যাওয়া মুশকিল। সে লোকদের সামনে আসলেও কাছে আসে না। তোমরা তার মুহাফিজের কাছে গিয়ে কেঁদে কেটে অনুনয় বিনয় করে বলবে, সে ইস্পাহান থেকে ইমামের হাতে চুমু খেতে এসেছিল...অনুমতি পেলে তো খঞ্জর তোমাদের সঙ্গে থাকবেই। তবে তাকে কতল করে কিন্তু জীবিত বের হতে পারবে না সেখান থেকে। আরেকটা পদ্ধতি আছে তীর। হাসান ইবনে সবা কখনো কখনো বাইরেও বের হয়। আগেই ঠিক করে নেবে কোত্থেকে তার ওপর তীর চালানো যায়। তখন অবশ্য পালানোর সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'আমি তাকে শুধু কতল করতে চাই। পালাতে চাই না। অবশ্য সুযোগ পেলে ভিন্ন কথা' – মুযাম্মিল বললো।

'উহ চমৎকার! এমন সঙ্গী আমি কোথায় পেতাম'– ইবনে আবিদ সপ্রশংস গলায় বললো।

সেই সূর্যাস্তের পর থেকে মুযাম্মিলের অপেক্ষা করছে আহমদ আওয়াল। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সে মুযাম্মিলকে পইপই করে বলে দিয়েছিলো, সন্ধ্যার পর বাইরে যেন না থাকে। না কি সে রাস্তা ভুলে গেছে। না কি কোন বাতিনীর জালে জড়িয়ে পড়েছে।

আহমদ আওয়াল ঘর থেকে বের হয়ে এ গলি ও গলি করে বাজার পর্যন্ত গেলো। পেলো না মুযাম্মিলকে। ফিরে এলো ঘরে। না, ঘরেও ফিরেনি। আহমদ আওয়াল পেরেশান হয়ে তার আরেক সেলজুকি সঙ্গীর ঘরে গিয়ে মুযাম্মিলের কথা জানালো।

'তুমি তো বিরাট ভুল করেছো আহমদ! সে লোকটিকে দেখালেও না আমাকে। ওকে আমি কোথায় খুঁজবো?' – তার সঙ্গীটি বিরক্ত হয়ে বললো।

'মারু থেকে এসেছে মাত্র গতকাল সন্ধ্যায়। আজ রাতেই তোমার কাছে ওকে নিয়ে আসতাম' – আওয়াল বললো।

'সে তো আর বাচ্চা ছেলে নয় যে রাস্তা ভুলে গেছে। তুমি জানো, খালজান হাসান ইবনে সবার গুপ্তচরে ভরা। ওরা কোন অপরিচিত লোককে দেখেই বুঝতে পারে এ কি তাদের জন্য নিরাপদ না সন্দেহজনক। আমার মনে হয় আমাদের ওই মেহমানটি

এতক্ষণে ওদের জালে পা দিয়ে ফেলেছে। এখন ভয় হলো সে না তোমার কথা ফাঁস করে দেয়' – সে লোক বললো।

'ওযীরে আযম নেযামুলমুলককে আমি কি জবাব দেবো। তিনিই তো আমার কাছে ওকে পাঠিয়েছিলেন' – আওয়াল বললো।

'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কাল রাত পর্যন্ত সে না এলে রাতের মধ্যে মারু রওয়ানা হয়ে যেয়ো। সুলতানকে ঘটনা খুলে বলো।'

'সুলতান কি করবেন? গোয়েন্দা কার্যক্রম নেযামুল মুলকের হাতে। ঐ লোককে তিনিই পাঠিয়েছেন। তিনি দেখলেনও না এর কোন বুদ্ধি সুদ্ধি আছে কি না। তিনি তার আবেগ দেখেই হাসান ইবনে সবাকে হত্যার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ওযীরে আযমকে একথাই বলবে যে, তিনি এমন আনাড়ী লোক যেন আর না পাঠান। এতো আমাদের ধরিয়ে দেবে....এখান থেকে তোমার দ্রুত বের হয়ে যাওয়া উচিত। সে যদি বাধ্য হয়ে তোমার নাম বলে দেয় তাহলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে।'

মুযাম্মিলের ফেরার আশা নিয়ে আহমদ আওয়াল তার ঘরে গেলো। কিন্তু মুযাম্মিল আসেনি। সে মেনে নিলো মুযাম্মিল হারিয়ে গেছে।

আহমদ আওয়াল যখন মুযাম্মিলের জন্য পেরেশান হচ্ছিলো তখন দুটি ঘোড়া শহর থেকে বের হলো। একটার ওপর সওয়ার ইবনে আবিদ, আরেকটার ওপর মুযাম্মিল আফেন্দী। তাদের রুখ আলমোত।

ইবনে আবিদের অন্য দুই সঙ্গীও ওদেরকে শহরের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। বিদায়ের সময় ওদেরকে একজন বললো–

'আল্লাহ তোমাদেরকে নিরাপদে রাখুন'।

'তোমাদেরকে সফল করে ফিরিয়ে আনুক' – আরেকজন বললো।

দু'জনের ঘোড়া রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার পর ওদের একজন আরেকজনকে বললো–

'আমাদের হাতে আরেকজন ধরা দিলো। উমর! এখন বলো পালের গোদাটাকেও এখন পাকড়াও করবো?'

'আহমদ আওয়াল কে? এ ব্যাপারে তো আর কোন সন্দেহ রইলো না। মুযাম্মিলই এর সব ফাঁস করে দিয়েছে। আচ্ছা শামস! আমরা দু'জনে কি ওকে ধরতে পারবো? – উমর নামের লোকটি বললো।

'কেন নয়?' – শামস নামের লোকটি বললো– 'সে একা থাকে। মুযাম্মিলের জন্য সে পেরেশান থাকবে। এই সুযোগে ওর ঘরে আমরা ঢুকতে পারবো।'

'আজ রাতে ওকে ওর ঘরেই বেঁধে রাখবো' – উমর বললো।

'তারপর কাল রাতে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবো এবং ইমামকে নযরানা দিয়ে বলবো, আরেকজন সেলজুকি গুপ্তচর নিয়ে এলাম...ইমাম কিন্তু আলমোত ঢুকে পড়েছেন।'

★ ★ ★ ★

আহমদ আওযাল মুযাম্মিলকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে করতে মাত্র শুয়েছে। এমন সময় বাইরের দরজায় টোকা পড়লো। সে লাফিয়ে উঠলো। 'হে আল্লাহ! এ যেন মুযাম্মিল হয়' – একটু জোরে একথা বললো এবং কুপি জ্বালিয়ে তা নিয়ে বাইরে বের হলো। দরজা খুললো।

দরজা খুলতেই খঞ্জর হাতে দুই লোক তাকিয়ে ধাক্কিয়ে ভেতরে ঢুকলো। আহমদ আওয়ালের দুই পাঁজরে দু'জনের খঞ্জরের ফলা চেপে আছে। সে খালি হাতে। তার হাতে শুধু জ্বলন্ত কুপিটি। কুপিটি বেশ বড়সড়। আজই অনেকগুলো তেল ভরা হয়েছে।

'এই তোমরা কি চাও?' – আহমদ জিজ্ঞেস করলো একটু উঁচু গলায়।

'কথা না বলে ঘরের ভেতরে চলো। ভেতরে গিয়ে বলবো' – শামস বললো।

খঞ্জরের খোঁচায় ধাক্কাতে ধাক্কাতে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে শামস দরজা বন্ধ করে দিলো।

'তোমার কাছে সোনা-রুপা, পয়সা-কড়ি যা আছে দিয়ে দাও আমাদের' – শামস বললো। 'ও তোমরা ডাকাত! খঞ্জর সরাও আমার কাছে যা আছে দিয়ে দিচ্ছি' – আওযাল বললো।

'তোমাকেও নিয়ে যেতে চাই আমরা! আসল প্রয়োজন তো তোমাকে' – শামস বললো।

'কি করবে আমাকে নিয়ে?'

'কি বকবক শুরু করলে শামস! খতম করো এই সেলজুকিকে। এর যা কিছু আছে সব তো আমাদেরই। ওদিক থেকে তুমি খঞ্জর চালাও এদিক থেকে আমি চালাব' – উমর বিরক্ত হয়ে বললো।

'তবে ও যদি বলে দেয় খালজানের কোথায় কোথায় ওর কতজন সঙ্গী আছে তাহলে জীবিত থাকতে পারবে' – শামস বললো।

আহমদ আওযাল এতক্ষণে ওদেরকে চিনতে পারলো। বুঝতে পারলো মুযাম্মিল এখন ওদের হাতেই আছে। সে জানতো, হাসান ইবনে সবার এসব লোকদের মধ্যে মায়া দয়া বলতে কিছু নেই। পিশাচেরও অধম। বড় কষ্ট দিয়ে ওরা মানুষ খুন করে। আহমদ চিন্তা করছিলো বড় দ্রুত।

'তাড়াতাড়ি বলো তোমার লোকেরা শহরের কোথায় কোথায় আছে। এই কুপিটি নামিয়ে রাখো' উমর তাড়া দিলো।

আওযাল কুপি নামিয়ে রাখছে এমন ভান করে হঠাৎ সেটি শামসের মুখ সই করে মারলো এবং হালকা চালে পার্শ্ব বদল করে উমরের পেটে তীব্রবেগে পা চালালো। উমরের হাত থেকে খঞ্জর পড়ে গেলো। ভুস করে দম ছেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে। বিদ্যুৎ গতিতে আওযাল খঞ্জরটি উঠিয়ে সজোরে উমরের পিঠে গেঁথে দিলো। তারপর খঞ্জরটি একটানে বের করে ফেললো। দ্বিতীয়বার আঘাত করার সুযোগ হলো না। উমর পড়ে গেলো নিজের শরীরের প্রবাহিত রক্তের ওপর।

তেলভরা কুপির সব তেল শামসের শরীরে কাপড়ে গড়িয়ে পড়ে। শামসের চো-খেও তেল চলে যায়। কুপির তেলে তখন জলছিলো শামস – ধাউ ধাউ করে। সারা

ঘরে লালাভ আলোর বন্যা। শামসের অর্ধহাত দাড়ি যে কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সেটাও দেখতে পেলো না আওয়াল।

শামস কখনো চিৎকার করছিলো কখনো করছিলো গো গো শব্দ। তার হাত থেকে নিজেই খঞ্জর ফেলে দিয়ে হাত দিয়ে দেহের আগুন নেভাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো। আওয়ালেরও কষ্ট লাগলো। চোখের সামনে একজন মানুষের এমন করুণ মৃত্যু কে সহ্য করতে পারে। আওয়াল শামসের পেটে খঞ্জর চালিয়ে তার মৃত্যু সহজ করে দিলো।

এতসব ঘটনা ঘটলো মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

আহমদ আওয়াল খুব দ্রুত তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো একটি থলেতে ভরলো। তারপর কাপড়চোপড় পরে কোষবদ্ধ তলোয়ারটি কোমরে বাধলো। ঘরের ভেতরে শামসের জ্বলন্ত লাশ রেখে বাইরে এলো এবং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে সওয়ার হয়ে গেলো। ঘোড়া নিয়ে সোজা তার সঙ্গীর ঘরে এলো। তাকে শোনালো পুরো ঘটনা।

'আমি এখন মারু যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ তাড়াতাড়ি রওয়ানা দাও। সকালের আগে অনেক দূর যেতে হবে' – তার সঙ্গী বললো।

'মুযাম্মিল আফেন্দীর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাতিনীদের কব্জায় সে। সেই আমাকে ধরিয়েছে।'

'যেই ধরাক আর যাই হোক তাড়াতাড়ি তুমি বের হও। তুমি খুব ভাগ্যবান–হাসান ইবনে সবার ভয়ংকর দুই লোককে হত্যা করতে পেরেছো। তার জানবাযরা হত্যা করে নিহত হয় না।'

আহমদ আওয়াল আল্লাহ হাফেজ বলে ঘোড়া ছুটালো।

কেল্লা আলমোতের আমীর মেহদী উলবী হাসান ইবনে সবার জন্য বিরাট এক শাহী কামরার ব্যবস্থা করলেন। হাসান ইবনে সবা সে কামরায় থাকতে অস্বীকার করে বললো– 'এমন এক নবীর কথা বলো যিনি এমন বিলাস জীবন যাপন করেছেন। আমাদের রাসূল (স) কি শক্ত চাটাইয়ে ঘুমুননি? খোলাফায়ে রাশেদীনের কেউ কি এমন মহলে থেকেছেন? আমি তো তাদের চেয়ে উত্তম নই। আমাকে একটা কুঠুরীর ব্যবস্থা করে দিলেই হবে।'

'না ইমাম! সাধারণ কুঠুরীতে বসিয়ে খোদার কাছে আমি কি জবাব দেবো' – মেহেদী উলবী বললেন।

'আমার ও খোদার মধ্যে কি কথা হয় আপনি তা জানেন না। খোদার হুকুমের পাবন্দ আমি। তবে কুঠুরীতে থাকা যদি আপনার একান্তই অপছন্দের হয় তাহলে অতি সাধারণ একটি কামরা দিয়ে দিন আমাকে। মাথার ওপর আমার ছাদ হলেই চলে। সরাসরি আকাশ ছাদ হিসেবে পেলেই বরং আমার অধিক প্রশান্তি পায়। অবশ্য এটা আপনার ভালো লাগবে না।'

মেহদী উলবী হাসানের জন্য একটি বাড়ি খালি করে দিলেন। এতে কামরা আছে অনেকগুলো। একটি কামরা হাসান ইবনে সবার জন্য। আর অন্যগুলো তার বিশেষ শিষ্যদের জন্য। বাড়ির মূল দরজায় মুহাফিজ রাখা হলো। কারোই সে বাড়ির কাছে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। এমনকি আমীরে শহর মেহদী উলবিও হাসান ইবনে সবার অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকতে পারতো না।

বাড়ির ভেতর কি হচ্ছে তা মেহদী উলবীসহ শহরের কেউ জানতো না। সবাই জানতো বাড়ির ভেতরে ইমাম সর্বদা ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং তার ওপর 'ওহী' নাযিল হয়। এভাবে দিন দিন তার শিষ্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো।

হাসান ইবনে সবা প্রথম সাক্ষাতে মেহদী উলবীকে বলেছিলো, এত সুন্দর একটি শহরের সামান্যতম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। তাই ফৌজ প্রয়োজন। যে কোন সময় সেলজুকিরা হামলা করে বসতে পারে। হাসান ইবনে সবা তখন আরো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়–যদি মেহদী উলবী ফৌজের ব্যবস্থা না করেন তাহলে কালো বজ্রের মতো দুশমন তার ওপর হামলে পড়বে। মেহদী উলবী ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, তিনি এত বড় ফৌজ রাখতে অপারগ। ফৌজ চালানোর মতো খরচাদিও তার দ্বারা সম্ভব নয়। হাসান ইবনে সবা তাকে বলে, ঠিক আছে, তিনি যদি শুধু ফৌজের দু' বেলার রুটির ব্যবস্থা করে দেন তাহলে অন্যান্য খরচাদি হাসান ইবনে সবাই বহন করবে। মেহদী উলবী এতে রাজী হয়ে হাসানের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেন।

দেখতে দেখতে ফৌজে ভর্তি হয়ে গেলো দু' হাজার লোক। এরা সবাই হাসান ইবনে সবার শিষ্য। যারা তার একটু ইংগিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে সবসময়। এদের প্রশিক্ষণের ভার দেয়া হয় হাসান ইবনে সবার নিজ হাতে গড়া শিষ্যদের ওপর। যারা কারো প্রতি করুণা করে না এবং কারো কাছ থেকে করুণা চায়ও না।

হাসান ইবনে সবা একদিন মেহদী উলবীকে খবর দিলো। মেহদী উলবী দৌড়ে এসে হাসানের সামনে রীতিমতো সিজদায় পড়ে গেলো।

'ফৌজ দেখেছেন আপনি?' – হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'দেখেছি ইমাম!'

'এখন কি নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন অনুভব করছেন?'

'করছি ইমাম! এখন নিজেকে আমি নিরাপদই নয় শক্তিশালীও মনে করছি। কখনো কখনো মনে হয় সেলজুকি বা অন্য কোন সুলতানকে লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসবো।'

'না আমীরে শহর! এটা অহংকার হয়ে যাবে। এমন চিন্তা না করাই ভালো। আপনাকে এখন ডেকেছি অন্য কারণে। গতকাল রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি একটা ইংগিত পেয়েছি– আলমোতে বেহেশত নেমে আসবে, এখানে হুর নাযিল হবে, ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবেন, সব সময় বর্ষিত হবে আল্লাহর সরাসরি রহমত।'

হাসান ইবনে সবা মেহদী উলবীর চোখে চোখ রেখে কথা বলছিলো। তার চোখ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তার চোখ সরাচ্ছিলো না। তাকে হিপ্টোনিযম করছিলো সে। তার প্রতিটি কথা মেহদী উলবী গিলছিলো প্রচণ্ড ক্ষুধার্তের মতো।

'আপনাকে একটা কথা বলে রাখছি। যদি এখন সেটা বলা উচিত নয়। কিন্তু এই বিশাল শহর, পাহাড়, জঙ্গল, নদী সবই আপনার..... এখানে যে অপরূপা সুন্দরী কতকগুলো মেয়ে দেখেন আপনি, এরা আসলে বেহেশতী হুর। আসমানী মাখলুক। পৃথিবীর মানুষের রূপ ধরে আমার কাছে এসেছে এরা। এরা যদি এই দুনিয়ার মানবী হতো আমার সাথে কখনো আনতাম না এদের।'

'এই খাদীজা ও অন্যান্য মেয়েরা....?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এরা সবাই আসমানী মাখলুক। ওদের কাছ থেকে আপনি যে খেদমতই নিতে চান নিতে পারবেন। এদের আত্মা রয়েছে আমার কব্জায়। আপনি এদেরকে আপন মনে করতে পারেন।

হাসান ইবনে সবা জানতো খাদীজা রূপের জাদু দিয়ে মেহ্‌দী উলবীকে গ্রাস করে নিয়েছে। মেহ্‌দী ওকে রাতে তার কাছে রাখে। সে এটাও জানতো, আরো তিন চারটি মেয়ের প্রতি মেহ্‌দীর চোখ পড়েছে। খাদীজা নিয়মিত 'হাশীষমিশ্রিত' সরবত পান করিয়ে মেহ্‌দী উলবীকে তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর করে দিয়েছে।

'হে ইমাম!' – মেহ্‌দী বললেন অনুনয় করে – একটা কথা ছিলো। অনুমতি পেলে ...'

'অনুমতির প্রয়োজন নেই আমার সাথে কথা বলতে হলে আমার বিরুদ্ধেও যদি কোন কথা থাকে নির্ভয়ে বলুন।'

'আমি খাদীজার ব্যাপারে কথা বলতে চাই' মেহ্‌দী প্রায় ফিসফিস করে বললেন।

'আপনি ওকে বিয়ে করতে চান। মানুষের মনের কথা তার চেহারায় লেখা হয়ে যায়। যার দৃষ্টির জোর আছে সেই সেটা পড়তে পারে।'

মেহ্‌দী চমকে উঠলেন। তিনি হয়রান হয়ে গেলেন। মনের এই গোপন কথাটি এই মহাবুযুর্গ কি করে জানলো। কিছু সময় নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করলেন। তারপর বললেন–

'হ্যাঁ ইমাম! আপনি সত্যিই আমার মনের কথাটি পেড়ে এনেছেন। কিন্তু আপনি বলেছেন, এরা আসমানী হুর!'

'তারপরও আপনি ওকে বিয়ে করতে পারবেন। শর্ত হলো, আপনাকে মানুষের স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠতে হবে। আর এটা খুব কঠিনও নয়।'

'আমাকে কিছু করতে হবে?'

'হ্যাঁ। আপনার ভেতরের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে।'

'সেটা কিভাবে?'

'মুরাকাবা, ধ্যান, চিল্লাকাশি আর সাধনা। একেবারে নির্জনে দুনিয়াবিমুখ হয়ে আমার মতো আল্লাহর ধ্যানে বসে থাকতে হবে। আমার 'মাকাম' হাসিল করতে হলে আপনাকে এটাই করতে হবে। আপনি দেখতেই তো পাচ্ছেন, এসব হুরপরীরা আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আপনার চারপাশেও ঘুরে বেড়াবে।'

'সে পথ কি আমাকে আপনি দেখাবেন?'

'আপনি যে সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে আমাকে অতিথি করেছেন এর প্রতিদান আমি অবশ্যই দেবো। আর আমাকে ছাড়া কেউ আপনাকে পথ দেখাতে পারবে না।'

হাসান ইবনে সবা পুরো আলমোত দখল করতে না পারলেও সেদিন সে আলমোতের আমীরকে দখল করে নেয়।

★ ★ ★ ★

চার দিন পর আহমদ আওযাল মারু পৌছে। পৌছেই নেযামুল মুলকের সঙ্গে দেখা করে মুযাম্মিল আফেন্দীর নিখোঁজ সংবাদ শোনায়।

'ভাবাবেগে আক্রান্ত ও এমন আনাড়ী একটি ছেলেকে এত বড় ভয়ংকর মিশনে পাঠানো উচিত হয়নি' – বললো আহমদ আওযাল নির্দ্বিধায়– 'আমি নিশ্চিত সে হাসান ইবনে সবার গুপ্ত বাহিনীর ফাঁদে পা দিয়েছে এবং আমার কথা ফাঁস করেছে সেই। আল্লাহর বিশেষ সাহায্য না থাকলে দুই নরপিশাচকে মেরে আমি অক্ষত এখানে আসতে পারতাম না।

'মুযাম্মিলকে হয়তো ওরা মেরে ফেলেছে...ঠিক আছে তুমি এখন বিশ্রাম করো গিয়ে। আমাকে ভাবতে দাও...' নেযামুল মুলকের গলা ধরে এলো।

'মুহতারাম ওযীরে আযম! আপনাকে সত্য একটা কথা বলছি। বাতিনীদের গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কখনোই পারবো না আমরা। আপনার ফৌজ আছে। খালজান ও আলমোতের ওপর হামলা চালাতে হবে... আর মুযাম্মিলের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। ওকে ওরা এতক্ষণে......'

এদিকে তখন মুযাম্মিল ইবনে আবিদের সঙ্গে আলমোত পৌছে গেছে"। আলমোতের যে বাড়ির একটি কামরায় হাসান ইবনে সবা থাকে সে বাড়িতে মুযাম্মিলকে নিয়ে গেলো ইবনে আবিদ। একটি কামরায় মুযাম্মিলকে বসিয়ে ইবনে আবিদ মুহাফিজ কমান্ডারের কাছে গেলো। এর অনুমতি ছাড়া হাসান ইবনে সবার কাছে যাওয়া যায় না।

কমান্ডার ইবনে আবিদের কাছে মুযাম্মিলের পুরো ঘটনা শুনে তাকে হাসান ইবনে সবার কাছে নিয়ে গেলো। হাসান ইবনে সবা আরেকবার নতুন করে ইবনে আবিদের কাছে সব কথা শুনলো।

তার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি খেলে গেলো। তার সেই বাঁকানো ঠোঁট থেকে এই হুকুমই বের হওয়ার কথা ছিলো – 'কেটে ফেলো ওকে'– হাসান ইবনে সবা মৃত্যুর চেয়ে নিম্নতর শাস্তি দেয় না কিন্তু...

'ওকে বন্দী করে রাখো'– তার বাঁকানো ঠোঁট থেকে নির্দেশ এলো– 'দুদিন ওকে কিছুই খেতে দেবে না। পানিও না। তারপর আমাকে জানিয়ো। এই ছেলেকে আমি নেযামুলমুলকের মৃত্যুর জন্য তৈরী করবো। দেখবে নেযামুলমুলককে হত্যা করে সে দারুণ উল্লাসবোধ করবে'.....

মুযাম্মিল আফেন্দী তার নতুন বন্ধু ইবনে আবিদের অপেক্ষায় বসে আছে। সে খুব খুশী। সে তার মনের মতো এক লোক পেয়েছে। মুযাম্মিলের মাথায় রক্ত টগবগ করছে। হাসান ইবনে সবার রক্ত কেমন– টকটকে লাল নাকি কালচে ধরনের– এসবই সে ভাবছে। তার চোখে ভেসে উঠছে, সে হাসান ইবনে সবার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে তা

তলোয়ারের মাথায় গেঁথে নিয়ে যাচ্ছে। গর্বিত হয়ে সুলতান মালিক শাহর সামনে পেশ করছে। তারপর খণ্ডিত মস্তকটি বর্শার মাথায় গেঁথে ঘুরানো হচ্ছে শহরময়। শাহী সিপাহীরা ঘোষণা করছে মুযাম্মিলের বীরত্ব গাঁথা।

খট করে দরজা খুলে গেলো। তার স্বপ্নের ডালাপালা নিমিষেই উবে গেলো। চমকে সে দরজার দিকে তাকালো। সে জানতো ইবনে আবিদ ছাড়া এখানে আর কেউ আসবে না। কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকলো দু'জন অপরিচিত লোক। ইবনে আবিদ নয়। মুযাম্মিল এদেরকে কখনো দেখেনি।

'ইবনে আবিদের সঙ্গে তুমিই তো এসেছো?' – মুযাম্মিলকে জিজ্ঞেস করলো তাদের একজন।

'হ্যাঁ আমিই।'

'আমাদের সঙ্গে এসো'– লোকটির আওয়াজ বন্ধুসুলভ।

মুযাম্মিল উঠে তাদের দিকে এগিয়ে গেলো। দু'জনে তাকে মাঝখানে রেখে হাঁটতে লাগলো। বুঝলো না সে এখন বন্দী। খুনের নেশা তার সাধারণ উপলব্ধিও কেড়ে নিয়েছে।

'ইবনে আবিদ কোথায়?' – মুযাম্মিলের কণ্ঠে দ্বিধা।

'আশেপাশেই আছে। তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে আমরা।'

আর কিছু বললো না মুযাম্মিল। হাঁটতে লাগলো ওরা। হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে এসে গেলো। মুযাম্মিলের সন্দেহ হলো ইবনে আবিদ এত তাড়াতাড়ি কোথায় গেলো।

'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? এত তাড়াতাড়ি সে এত দূর চলে গেছে?'

'বন্ধু! আমরা জানি তুমি হাসান ইবনে সবাকে শেষ করতে এসেছো'– তাদের একজন বললো।

'হ্যাঁ ভাই'! – মুযাম্মিল বললো টগবগে কণ্ঠে।

'তাহলে আমাদেরকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। তোমরা যা করতে এসেছো তা তোমরা একা করতে পারবে না। কোন শব্দ না করে আমাদের সঙ্গে চলো।

শহর ছাড়িয়ে তারা এখন এমন জায়গা দিয়ে চলছে যেখানকার সবকিছুই কেমন ধূসর। এই এলাকা দারুণ সবুজ, প্রাণ-আকর্ষী। কিন্তু এ অংশটা একেবারেই শুকনো। বান্জার–মৃত। ঘাস বা গাছের একটি পাতাও নেই। যে কয়টা গাছ দাঁড়িয়ে আছে কেমন বিষণ্ন–নগ্ন লাশের মতো লাগছে। মুযাম্মিলের দিকে তাকিয়ে হাসছে দাঁত দেখিয়ে। গা ছমছম করে উঠলো মুযাম্মিলের।

সামনে কয়েকটা নেড়া টিলা পড়লো। আঁকাবাঁকা কয়েকটি সংকীর্ণপথ পেরিয়ে তারা টিলার সারি থেকে বের হলো। সামনে খুব মজবুত কাঠামোর একটা কেল্লা দেখা গেলো। দেয়ালগুলো পাথরের। এত উঁচু যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। দেয়ালের চার কোণে চারটি বুরুজ। সামনের দেয়ালের মাঝখানে বিশাল এক কালো লোহার দরজা। ভেতর থেকে বন্ধ সেটি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন বর্শাধারী লোক। লোহার দরজার একেবারে ওপরে দেয়ালের ওপর একটি পাথরের কামড়া। পাথরগুলো খাঁজকাটা–বিবর্ণ।

মুযাম্মিল কিছুই বুঝলো না। তার মনে হলো এই কেল্লার ভেতরে আরেকটি কেল্লা আছে। এটি নিশ্চয় শাহী খান্দানের জন্য বানানো হয়েছে। দুশমন কেল্লা অবরোধ করলে শাহী খান্দানের লোকেরা অন্দর কেল্লা দিয়ে পালিয়ে যায়।

তাকে এটা বলার মতো কেউ ছিলো না, এটা শাহী খান্দানের কেল্লা নয়। আলমোতের ভয়াবহ এক কয়েদখানা। না জানি কত হাজার মানুষের নিষ্পাপ রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই নিষ্ঠুর কেল্লা। আরো কত হাজার জানি ধুঁকে মরছে এর কালো কুঠুরীগুলোতে।

লোহার ফটকের সামনে ওরা পৌঁছে গেলো। ফটকের পেটে আরেকটি দরজা আছে। তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভেতরে এক লোক চাবির গোছা নিয়ে ঝনঝনিয়ে এসে দরজা খুলে মাথা বের করে বললো–

'নিয়ে এসেছো ওকে? আমরা আগেই খবর পেয়েছি।'

ওরা দু'জন মুযাম্মিলকে দরজার ভেতরে নিয়ে গেলো। দরজায় আবার বিশাল এক তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। এবার মুযাম্মিল একটু চমকে উঠলো। সে ঐ দু'জনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। ওরা তাকে আলতো করে টেনে আরো ভেতরে নিয়ে যেতে লাগলো।

'ইনি কে?'

মুযাম্মিল পেছনে ফিরে তাকালো। সেই চাবিওয়ালা পেছন পেছন আসছে। সে-ই জিজ্ঞেস করেছে কথাটা।

'ইমামকে কতল করতে এসেছে' –আগের দু'জনের একজন বললো উপহাস করে।

তিনজনেই হেসে উঠলো হো হো করে। তাদের হাসি যেন থামতেই চায় না। মুযাম্মিল দাঁড়িয়ে গেলো।

'ইবনে আবিদ কোথায়?' – নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করলো মুযাম্মিল।

পেছন থেকে হঠাৎ একজন তার ঘাড়ে ধরে সজোরে ধাক্কা মারলো। তিন চার কদম দূরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লো মুযাম্মিল। বুকে হাঁটুতে ছিড়ে যাওয়ার ব্যথার কামড় অনুভব করলো। একটু পর হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়ালো। আবার তার ঘাড় ধরে পেছন থেকে ধাক্কা মারলো কেউ। একই কায়দায় আবার উপুড় হয়ে পড়লো মুযাম্মিল। মুযাম্মিলের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। মাতালের মতো এলোমেলো পায়ে উঠে দাঁড়ালো। একজনে তার দু' কাঁধ সাঁড়াশির মতো করে ধরে তাকে আস্তে আস্তে লাটিমের মতো ঘুরাতে লাগলো আর বলতে লাগলো–

'ভালো করে দেখে নাও–তুমি কোথায়!'

এই অনুবাদক পরবর্তী বই

শয়তানের বেহেশত ২য় খণ্ড

চলে বহিয়া নীল দরিয়া

দুই পলকের গল্প

উড়ন্ত ঝাণ্ডা

রক্তাক্ত পাপড়ি

শাহদর থেকে দূরের এক পাহাড়ে নাকি খোদার এক দূতের অবতরণ ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষ স্পষ্ট চোখে দেখেছে, আলোর ভেলায় ভেসে ভেসে শুভ্রপোষাকধারী একজন মানুষ এক পাহাড়ে নেমে এসেছে এবং শুনিয়েছে এক দৈববাণী– 'যে তার কথা শুনবে এই দুনিয়াতেই সে পেয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত বেহেশত। পরকালের বেহেশতের জন্য আর তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।' খোদার সেই দূতের নাম হাসান ইবনে সবা। অথচ খোদার কোন দূত তো দূরের কথা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূলুল্লাহ (স) এর অবতরণও তো এতো বর্ণাঢ্য ও অলৌকিক হয়নি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) এর পরে তো আর কোন নবী বা 'আসমানী দূত' আসবে না।

দেরীতে হলেও টনক নড়লো সেলজুকি প্রশাসনের। কিন্তু ততদিনে হাসান ইবনে সবা তার বিশাল এবং অপ্রতিরোধ্য এক শিষ্যবাহিনী গড়ে তুলেছে। যাদেরকে সে নিয়মিত হাশীষ (এক ধরনের মাদক) পান করায় এবং জাদু প্রয়োগ করে সম্মোহিত করে রাখে। এই জাদু ও হাশীষের প্রয়োগে বিশেষভাবে তৈরি করে শত শত সুন্দরী ও নিঃস্পাপ মেয়েদের। এদেরকে ব্যবহার করে হাসান ইবনে সবা দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী, রঈস, আমীর ও আমলাদের তার অন্ধভক্ত করে তোলে। শুধু তাই নয়, সারা দেশ জুরে তার বাহিনী লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। বড় বড় কাফেলা লুট করে সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে। দখল করতে থাকে একের পর এক দুর্গ ও শহর। ইসলামের নামে অনৈসলামিক, অনৈতিক এবং অশ্লীল কথা সমাজে ছড়াতে শুরু করে হাসান ইবনে সবার শিষ্যরা। প্রতিটি কেল্লা ও শহরের যুবক যুবতীদের তারা নারীসক্ত ও মাদকাসক্ত বানানোর ভয়ংকর সব কার্যক্রম শুরু করে। যারাই প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ করে তাদেরকে তারা খুন করে গুম করে দেয়। সেলজুকিরা তাকে ও তার গুরু আহমদ ইবনে গুতাশকে এবং তার বাহিনীকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্য পাঠায় একের পর এক সেনাবাহিনী। ব্যর্থ হয় প্রতিটি সেনা অভিযান। একবার তো হাসান ইবনে সবা সেলজুকিদের এক হাজার সেনাবাহিনীর একদলকে কৌশলে হাশীষের পানি পান করিয়ে এবং 'রাম' বানিয়ে ফেরত পাঠায়। অথচ সেলজুকিরা কমও দুর্ধর্ষ ছিলো না। সেলজুকিদের ইতিহাসে ব্যর্থতা বা পরাজয় বলতে কোন শব্দ ছিলো না।

সেলজুকিদের এই ব্যর্থতা দেখে এগিয়ে আসে অসম সাহসী, বীরদীপ্ত, সৌম্য দর্শন এক যুবক মুযাম্মিল আফেন্দী। 'রায়' শহরে গিয়ে পরিচয় হয় অসম্ভব রূপবতী এক মেয়ে সুমনার সঙ্গে। দু'জনের মনেই আলোড়ন তোলে পরস্পরের প্রেম স্নিগ্ধ চোখের ভাষা। তবে সে প্রেমের পবিত্র আলপনায় তারা জুড়ে দেয় রক্ত রঞ্জিত এক শপথ বাক্য- সত্য সুন্দরকে বাঁচানোর জন্য মানুষের মুক্তির জন্যে, মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্যে হাসান ইবনে সবা ও তার ফেরকার অস্তিত্ব বিনাশ করতে হবে।

কিন্তু হাসান ইবনে সবার কাছে তার যত বড় শত্রুই থাক তাকে দেখামাত্র তার পরম শিষ্য বনে যায়। তাছাড়া হাসান ইবনে সবা ক'দিন আগে ছদ্মবেশ ধরে সেলজুকি প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিয়েছে। সে হয়ে গেছে এখন সুলতান মালিক শাহর অন্যতম উপদেষ্টা আর কিছুদিনের মধ্যে সে মুঠোয় পুরে নেবে পুরো সেলজুকি সাম্রাজ্য। তারপর নিশ্চিহ্ন করে দেবে মুসলমানের নাম নিশানা। সেখানে প্রতিষ্ঠা করবে শয়তানের রাজত্ব।

ISBN 984-839-055-03
9 789847 020679